পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা

ভারতীয় অর্থনীতির প্রকৃতি ও গতি

I

ভারতীয় অর্থনীতির মূল্যায়ন

ভারতীয় সমস্যা, ভারতের সমস্যা

দেশভেদে অর্থনৈতিক সমস্যারও তারতম্য ঘটে থাকে। ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা একান্তই ভারতীয় সমস্যা। অন্য কোন দেশের অর্থনৈতিক বা সামাজিক বা রাজনৈতিক সমস্যা বা ইতিহাসের পটভূমিতে এর বিচার, বিশ্লেষণ ও সমাধানের চেষ্টা করতে গেলে ভুল করা হবে। অর্থনীতির দিক থেকে ভারতকে ভারত হিসাবে জানতে হলে, তার আশা-আকাঙ্খার সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাকে আর্থিক প্রগতির পথে চালিত করতে হলে সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে তার প্রতিটি অর্থনৈতিক সমস্যা বুঝে নিতে হবে; সমাধানের চেষ্টা করতে হবে ভারতের স্বার্থে, ভারতীয় ভূমিতে।

ইংরেজদের শাসনকালে ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে, ভারতীয় স্বার্থে বোঝার চেষ্টা করা হত না; বোঝার চেষ্টা করা হত ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গীতে—সরাসরি বলতে গেলে ইংরেজদের জাতীয় স্বার্থে। ফলে ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যার প্রকৃত স্বরূপটি ধরা পড়ত না। সে সময় অসত্য ও অর্ধসত্য এবং অপ্রাসঙ্গিক তথ্য ও পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হত। তাও মূলত ব্রিটেনের অর্থনৈতিক পটভূমিতে ইংরেজ অর্থনীতিবিদ্‌দের রচিত বিবিধ অর্থনৈতিক সূত্র অনুসারে। দেশভেদে অর্থনৈতিক সমস্যার যে প্রকৃতিভেদ ঘটে ও এর সমাধানের জন্য যে সাধারণ অর্থনৈতিক সূত্রগুলির প্রয়োগ পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের অপেক্ষা রাখে এ সহজ সাধারণ যুক্তিটি ইংরেজ শাসকগণ বুঝেও বুঝতে চাইতেন না। তাঁরা ব্রিটেনের অর্থনীতির স্বার্থে যা গ্রহণীয় বা বর্জনীয় তা ভারতের জাতীয় স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর হলেও বিনা দ্বিধায় ভারতের উপর চাপিয়ে দিতেন। উদাহরণস্বরূপ 'অবাধ নীতি' প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যেতে পারে। অনুন্নত দেশ ভারতের পক্ষে প্রয়োজন ছিল তার শিল্প সংরক্ষণ ও আর্থিক উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রের সরাসরি হস্তক্ষেপ। অবাধ

নীতি ঠিক এর বিপরীত। এ নীতি রচিত হয়েছিল উন্নত দেশগুলির স্বার্থে যাতে কোন সম্ভাবনাপূর্ণ অনুন্নত দেশ সংরক্ষণ-নীতির সাহায্যে বা রাষ্ট্রের সরাসরি হস্তক্ষেপ দ্বারা উন্নতির পথে এগোতে না পারে। অতি উন্নত দেশ ব্রিটেনের পক্ষে অবাধ নীতি ছিল তার আগ্রাসী অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার যা স্বভাবতই ভারতের পক্ষে ছিল আত্মহত্যার সামিল। তা সত্ত্বেও ভারতে এ নীতি অনুসরণ করা হয়েছিল। ফলে প্রতি স্তরে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়েছিল।

বিচারপতি র‍্যানাডে প্রমুখ তৎকালীন জাতীয়তাবাদী ভারতীয় অর্থ-নীতিবিদ্‌গণ ইংরেজদের ঔপনিবেশিক অর্থনীতির বিরুদ্ধে সরব হয়ে ওঠেন। র‍্যানাডে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, ইংরেজ অর্থনীতিবিদ্‌দের রচিত অর্থশাস্ত্রের অনেক সূত্রই ভারতের ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য নয়। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য ইংরেজ শাসকরা যদি যথার্থই আগ্রহী হন, তবে সর্বাগ্রে তাঁদের ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলি বুঝে নিতে হবে; ভারতীয় স্বার্থে ও ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে তা অনুধাবন করতে হবে। ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন, ভারতবাসীর দৃষ্টিভঙ্গী বস্তুতান্ত্রিক নয়, ব্যক্তিতান্ত্রিকও নয়। ভারতীয় সমাজে ব্যক্তিগত জীবনের উপর পারিবারিক জীবন ও জাতিভেদ প্রথার প্রাধান্য অসামান্য। তাছাড়া ভারতের সামাজিক জীবনের প্রতি স্তরে, আর্থিক প্রতিযোগিতার প্রতি ক্ষেত্রে ধর্মভাব, সামাজিক অনুশাসন ও রীতি-নীতি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে। ভারতের মূলধনও পর্যাপ্ত নয়। শ্রম ও মূলধন উদ্যোগ-মুখী বা গতিশীলও নয়। শ্রমমূল্য ও মুনাফার সম্ভাবনাও উৎসাহজনক নয়। এ সমস্ত বৈশিষ্ট্য অস্বীকার বা উপেক্ষা করে পাশ্চাত্য অর্থশাস্ত্রের মূল সূত্রগুলি ভারতীয় অর্থনীতিতে সরাসরি প্রয়োগ করলে আর যাই হোক না কেন তা ভারতের স্বার্থের অনুকূলে আসবে না; ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির মূল বনিয়াদকে স্পর্শ করতে সমর্থ হবে না।

র‍্যানাডের মূল্য বক্তব্য আজও স্বীকৃত, অভিনন্দিত। জাতিভেদ, ধর্ম-ভেদ, সম্প্রদায়ভেদ, প্রাদেশিকতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ, বিদেশী ভাবধারার ও মডেলের অনুকরণ বা অনুসরণ, উন্নত দেশের প্রযুক্তিবিদ্যার যথেচ্ছ প্রয়োগ, শ্রমের গতিশীলতার অভাব, মূলধনের সীমাবদ্ধতা, শ্রমিক-মালিক সংঘর্ষ, রাজনৈতিক অস্থিরতা প্রভৃতি ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক

ক্ষেত্রে এমন জটিলতা ও বিভ্রান্তি এবং জনগণের মনে এমন হতাশার সৃষ্টি করেছে যে, এ পরিবেশ ও মানসিকতা থেকে ভারতকে মুক্ত করে তাকে সার্বিক সার্থক উন্নতির পথে পরিচালিত করা ভারতের প্রধান ও জটিল সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ সমস্যার সমাধান করতে হলে সমগ্র বিষয়টি ভারতের স্বার্থে, ভারতের সম্পদের পটভূমিতে, ভারতীয় সংস্কৃতি ও চিন্তাধারায় বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে ভারতীয় পথে, ভারতীয় নেতৃত্বে এর সমাধানের পথ নির্ধারণ করতে হবে। নির্ধারিত পথে দেশের সর্বস্তরের মানুষকে সক্রিয়ভাবে যুক্ত করে নিতে হবে। কোন বিদেশী শক্তির আনুকূল্যে বা সম্পদে স্বাধীন ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনার ধারণা শুধু অবাস্তবই নয়, অবাঞ্ছিতও। উন্নত দেশগুলির বন্ধুত্বপূর্ণ সার্বিক সাহায্য ও সহযোগিতা এবং ভারতীয় জনসম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ ও সুষ্ঠু ব্যবহারের উপরই ভারতের উন্নয়ন একান্তভাবে ও অকৃত্রিমরূপে নির্ভর করে।

ভারত পরিচিতি

ভারত পৃথিবীর সপ্তম বৃহত্তম দেশ। ভারতের আয়তন 3,288 হাজার বর্গ কিলোমিটার। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে ভারতের অবস্থান অনুকূল। ভারত পূর্ব গোলার্ধের মধ্যস্থলে অবস্থিত। ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশগুলির সঙ্গেই তার স্থলপথে ও জলপথে ব্যবসা-বাণিজ্য করা সহজ হয়েছে।

নদীমাতৃক দেশ ভারত। জলপথে অভ্যন্তরীণ পরিবহন ব্যবস্থা উন্নত ও সম্ভাবনাপূর্ণ। খরস্রোতা নদগুলি জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে এক নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করেছে। সিন্ধু-গঙ্গাবিধৌত যে বিস্তৃত সমৃদ্ধিশালী সমতলভূমি রয়েছে তা কেবল বসবাসের উপযোগীই নয়, রাজপথ নির্মাণের পথও সুগম করেছে।

বনসম্পদেও ভারত সমৃদ্ধ। সমগ্র ভারতের প্রায় 23 শতাংশ বনাবৃত। ভারত বহু মূল্যবান বৃক্ষ ও বনরাজি শোভিত।

খনিজ সম্পদও উপেক্ষণীয় নয়। ভারত লোহা, কয়লা, তামা, ম্যাঙ্গানিজ, বক্সাইট, অভ্র প্রভৃতি খনিজ সম্পদের অধিকারী। বোম্বে হাইয়ের আবিষ্কৃত খনিজ তৈল সম্ভার নিঃসন্দেহে ভারতের শক্তি জগতে এক নবযুগের সূচনা করেছে।

ভারতের জমি সাধারণত কৃষি উপযোগী। পাট, তুলা, চা, ধান ও গম ভারতের মূল্যবান কৃষিজ সম্পদ।

ভারতের জলবায়ু মৌসুমী বায়ু দ্বারা প্রভাবিত। মৌসুমী বায়ুর স্থিরতার অভাব অবশ্য একটি সমস্যা। তবে এর বিকল্পরূপে রয়েছে প্রসারমান উন্নত জলসেচ ব্যবস্থা ও প্রতিশ্রুতিপূর্ণ কয়েকটি নদী পরিকল্পনা।

ভারতের উপকূলরেখা সুদীর্ঘ। কিন্তু অভগ্ন হওয়াতে বন্দরের সংখ্যা অধিক নয়। তা সত্ত্বেও ভারত বোম্বাই, মাদ্রাজ, কলকাতা, বিশাখাপত্তম, কোচিন, কাণ্ডলা, তুতিকোরিণ ও পারদীপের মত উত্তম বন্দরের অধিকারী। ফলে সমুদ্রপথে ভারতের বহির্বাণিজ্য বিশেষ ব্যাহত হচ্ছে বলা চলে না।

জনসংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীতে চীনের পরেই ভারতের স্থান। বিশাল ও দ্রুত বর্ধমান জনসংখ্যা ভারতের যেমন একটি ভাববার মত সমস্যা তেমনি তা দেশের এক প্রতিশ্রুতিপূর্ণ সম্পদও বটে। ভারতীয় শ্রমিকরা কুশলী, শ্রমে আগ্রহী। ভারতে শ্রমিক-মজুরীও কম। উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যায় ভারত দ্রুত এগিয়ে চলেছে। উন্নয়নমূলক কাজের সর্বস্তরে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে দেশকে সমৃদ্ধশালী করে তোলার প্রতিও ভারতের সর্বস্তরের মানুষের প্রবল আগ্রহ। এ ব্যাপারে নবীন উদ্‌যোগীদের আগ্রহও প্রশংসনীয়। সর্বোপরি ভারতীয় সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে দেশকে গড়ে তোলার প্রতি জাতীয় সরকারের দৃঢ় প্রচেষ্টা একটি কর্মমুখী পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। এসব সত্ত্বেও ভারতের আর্থিক উন্নয়ন আশানুরূপ বলা চলে না। বিশ্বের আর্থিক মর্যাদায় তার স্থান প্রশংসনীয় নয়। এরূপ বিপরীত অবস্থার জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব দায়ী নয়। জনশক্তির অভাবও দায়ী নয়। দায়ী প্রধানত পরিচ্ছন্ন সামাজিক পরিবেশ, সুস্পষ্ট লক্ষ্য ও গণমুখী পরিকল্পনার অভাব, পরিকল্পনা রূপায়ণে ত্রুটি, সামাজিক নিয়মানুবর্তিতার শিথিলতা, সর্বোপরি জাতীয় নেতৃত্বে দুর্বলতা।

2 অনুন্নত অর্থনীতি ঃ বিশ্লেষণ

অনুন্নত অর্থনীতি

"অনুন্নত অর্থনীতি" বলতে সাধারণত দরিদ্র দেশের অর্থনীতিকে বুঝায়। "দরিদ্র দেশ" বলতে এমন দেশকে বুঝায় যে দেশের আর্থিক ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা-পূর্ণ নয়। কিন্তু অনুন্নত দেশের ধারণার মধ্যে সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। অর্থাৎ, দেশটি উন্নত অর্থনীতির স্তরে উন্নীত হবার মত প্রয়োজনীয় উপকরণের অধিকারী। এ বিষয় সে অবহিত ও সচেষ্টও বটে। উন্নয়নের পথে সে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসরও হচ্ছে। উন্নতির উচ্চস্তরে পৌছান সময় সাপেক্ষ মাত্র। এরূপ দেশকে উন্নয়নশীল বা বিকাশশীল দেশরূপেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। তবে সাধারণভাবে অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশকেও দরিদ্র দেশ-রূপে চিহ্নিত করা হয়।

এ প্রসঙ্গে "পশ্চাৎপদ" বা "ব্যাকওয়ার্ড" দেশ সম্পর্কে ধারণার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। "পশ্চাৎপদ" শব্দটির মধ্যে প্রাকৃতিক সম্ভাবনার অভাবের সঙ্গে সে দেশের জনগণ ও সরকারের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতি আগ্রহের অভাবও জড়িত।

কতিপয় ধারণা

অনুন্নত দেশ বা অনুন্নত অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে মতের পার্থক্য রয়েছে। জেকব ভাইনার বলেন, সে দেশকে অনুন্নত বলা চলে যে দেশের আর্থিক ক্ষেত্রে আরো মূলধন অথবা আরো প্রাকৃতিক সম্পদ অথবা এ-জাতীয় যাবতীয় উপকরণ ব্যবহার করার মত উত্তম সম্ভাবনা রয়েছে ও যার ফলে বর্তমান জনসংখ্যার পক্ষে জীবনযাপনের মান উন্নত করা সম্ভব হবে। এরূপ দেশের জনপ্রতি আয় যদি ইতিমধ্যেই উচ্চমানের হয়ে থাকে তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও জীবনধারণের মানের অবনতি না ঘটিয়ে বর্ধিত জনসংখ্যাকে ভরণপোষণ করা সম্ভব হবে।

এ. এন. ম্যাকলিওড মনে করেন, সে দেশ বা অঞ্চল অনুন্নত যে দেশ বা অঞ্চলে মূলধন ও উদ্‌যোগ উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণের অনুপাতে কম।

কিন্তু এরূপ দেশ বা অঞ্চলে সঙ্গত ও উত্তম সম্ভাবনার সঙ্গে অতিরিক্ত মূলধন বিনিয়োগ করা যেতে পারে।

র‍্যাগনার নার্ক্সে'র ধারণা, উন্নত দেশগুলির তুলনায় যে দেশ জনসংখ্যা ও প্রাকৃতিক সম্পদের অনুপাতে কম মূলধনের অধিকারী সে দেশ অনুন্নত।

অস্কার ল্যাঞ্জের অভিমত, অনুন্নত অর্থনীতি বলতে এমন অর্থনীতিকে বুঝায় যে ক্ষেত্রে যে মূলধন দ্রব্য পাওয়া যায় তা যে শ্রমশক্তি রয়েছে তাকে আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতির ভিত্তিতে নিয়োগ করার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

বৈশিষ্ট্য

হার্ভে লিবেনষ্টিন অনুন্নত অর্থনীতির পঁয়ত্রিশটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। এদের আবার তিনি চারটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। যথা, জনসংখ্যা সম্পর্কিত, সংস্কৃতি সম্পর্কিত, প্রযুক্তিবিদ্যা সম্পর্কিত ও বিবিধ। এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

1. জমির আয়তনের অনুপাতে জনসংখ্যা কম।
2. জনপ্রতি প্রকৃত আয় অপেক্ষাকৃত কম।*
3. জাতীয় আয়ে কৃষি আয়ের আধিক্য।
4. জনসংখ্যার অনুপাতে মূলধন ও যন্ত্রপাতির অভাব।
5. প্রাকৃতিক ও জনশক্তির পূর্ণ ব্যবহারের অভাব।
6. জীবনধারণের উপযোগী প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাব।
7. জনপ্রতি শক্তির ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কম।
8. সুদীর্ঘকাল যাবৎ নিঃস্বতা ও প্রাচীন উৎপাদন পদ্ধতি।
9. প্রাথমিক দ্রব্য উৎপাদন-ভিত্তিক অর্থনীতি।
10. বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর অতিশয় নির্ভরশীলতা ও প্রতিকূল বাণিজ্য-শর্ত।
11. দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি।**
12. আয় ও সম্পদ বণ্টনে সমতার অভাব।

---

* ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের সূত্রে দেখা যায়, জনপ্রতি জি-এন-পি (ডলারে) নিম্নআয়বিশিষ্ট দেশগুলির ক্ষেত্রে 270, মধ্যআয়বিশিষ্ট দেশগুলির ক্ষেত্রে 1500 ও শিল্পে সমৃদ্ধ দেশগুলির ক্ষেত্রে 11120।

** ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের সূত্রে প্রকাশ 1979-80 সনে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (শতাংশে) নিম্নআয়-বিশিষ্ট দেশগুলির ক্ষেত্রে 2.1, মধ্যআয়বিশিষ্ট দেশগুলির ক্ষেত্রে 2.4, ও শিল্পে সমৃদ্ধ দেশগুলির ক্ষেত্রে 0.8।

13. উৎপাদনের উপকরণের যোগানে ভারসাম্যের অভাব।

14. বেকার, প্রায়-বেকার ও ছদ্মবেশী বেকারের সংখ্যার আধিক্য।

15. প্রতিকূল করনীতি ও অসংগঠিত টাকার বাজার।

16. কম উৎপাদনশীলতা।

17. ভোগ্যদ্রব্যের উপর ব্যয়ের আধিক্য।

18. দেশীয় বাজারের সীমাবদ্ধতা।

19. জীবনধারণের অনুপযোগী কৃষিকার্য।

20. বার্টার প্রথার প্রভাব।

21. ভিত-কাঠামোর (যানবাহন, সংযোগ, শক্তি, সেচ প্রভৃতি) অনুন্নত অবস্থা।

22. বিদেশী অর্থনৈতিক কাঠামো ও মূল্যবোধের প্রতি অতিরিক্ত আগ্রহ।

মন্তব্য

অনুন্নত দেশ মাত্রই যে এ সমস্ত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবে তা নয়। দেশভেদে এদের সংখ্যাগত ও গুণগত পার্থক্য থাকতে পারে। অনুন্নত অর্থ-নীতি সম্পর্কে যে ধারণা প্রচলিত ও তার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যা বলা হয়ে থাকে সে সমস্ত উক্তির যৌক্তিকতা সম্পর্কেও অনেক প্রশ্ন উত্থাপন করা যেতে পারে। যেমন, উপযুক্ত শ্রমশক্তির অভাবে যে দেশের পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হচ্ছে না সে দেশ অনুন্নত। কারণ সে দেশে জনসংখ্যার অভাব রয়েছে। কিন্তু এ দ্বারা এও প্রমাণিত হয় না যে, যে দেশের শ্রমশক্তি সে দেশের আয়তন অপেক্ষা বেশি সে দেশ অবশ্যই উন্নত। কারণ উৎপাদনে শ্রমিক একটি উপকরণ মাত্র, একমাত্র উপকরণ নয়। জনসংখ্যার আধিক্য যে সব ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিঘ্নস্বরূপ তাও ঠিক নয়। 1954 সন থেকে 1977 সনের মধ্যে হংকঙের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে (2·2 মিলিয়ন থেকে 4.5 মিলিয়ন), কিন্তু তা সত্ত্বেও সে দেশের উন্নয়ন অব্যাহত রয়েছে। ইউ-নাইটেড নেশনসের মতে, যে দেশের বার্ষিক জনপ্রতি প্রকৃত আয় 500 ডলারের কম সে দেশ অনুন্নত ; 500-1000 ডলার আয়ের মধ্যে অবস্থিত দেশসমূহ অনুন্নত দেশগুলি অপেক্ষা অনেক উন্নত, তবে অতি উন্নত দেশগুলির তুলনায় কম উন্নত। এমনও বলা হয়েছে যে, যে দেশের বার্ষিক জনপ্রতি আয় 200 ডলারের অধিক নয় সে দেশ অতিশয় অনুন্নত। এভাবে জন-

প্রতি আয়ের ভিত্তিতে দেশগুলিকে উন্নত ও অনুন্নতরূপে শ্রেণীবদ্ধ করা যে নিখুঁত পদ্ধতি তা বলা চলে না। তাছাড়া জনপ্রতি আয় দ্বারা কোন দেশের জনগণের জীবনধারণের যথার্থ মান নির্ণয় করা যায় কিনা সে প্রশ্নও রয়েছে। কারণ জনপ্রতি আয় গড়ের হিসাব। প্রতি পরিবার বা পরিবারস্থ প্রত্যেকটি ব্যক্তির আয়ের হিসাব এ দ্বারা পাওয়া যায় না। যে দেশে আয় ও সম্পদ বণ্টনে বিরাট বৈষম্য রয়েছে সে দেশে জনপ্রতি আয়ের পরিমাণ দ্বারা দেশের দারিদ্র্যের যথার্থ পরিমাপ করা যায় না। তদুপরি অনুন্নত দেশে জনপ্রতি আয় নির্ধারণ যে ত্রুটিমুক্ত তাও বলা চলে না। যেমন, এসব দেশে অনেক ক্ষেত্রে শ্রমমূল্য টাকার অঙ্কে নির্ধারিত হয় না ; নির্ধারিত হয় ধান-চাল জাতীয় দ্রব্যের বিনিময়ে। এ জাতীয় আয় জাতীয় আয়ের গণনায় ধরা হয় না। আবার উৎপাদনের বেশ কিছু অংশ ব্যক্তিগত ভোগের জন্য ব্যয় করা হয়। কোথাও আবার বার্টার প্রথা প্রচলিত। এ জাতীয় উৎপাদন এবং বিনিময়ও জাতীয় আয়ের গণনায় আসে না। অনেক ক্ষেত্রে জিনিসপত্রের দামের সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। এ সব দেশের জনসংখ্যার একটি অংশ স্বয়ম্ভর। অর্থাৎ, তারা নিজেরাই নিজেদের ঘরবাড়ী নির্মাণ করে, কাপড় বোনে, জালানি সংগ্রহ করে, ঘরবাড়ীর যাবতীয় কাজকর্ম করে। এ জাতীয় কাজকর্মও জাতীয় আয়ের গণনায় ধরা সম্ভব নয়। জনগণের অজ্ঞতা ও অশিক্ষাও জাতীয় আয় নির্ধারণে বাধাস্বরূপ। জনসংখ্যার সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ করাও প্রায় অসম্ভব বলা চলে। জনপ্রতি আয় দ্বারা সব ক্ষেত্রে জীবনধারণের মানেরও তুলনা করা যায় না। প্রয়োজনীয় ব্যয়ের মানের পরিপ্রেক্ষিতে জীবনধারণের মানের তুলনা করা যুক্তিযুক্ত। শীতপ্রধান দেশের জীবনধারণের মানের সম স্তরে আনতে হলে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের জনপ্রতি আয়ের পরিমাণ অনেক বেশি হতে হবে। কারণ শীতপ্রধান দেশ প্রাকৃতিক কারণে ব্যয়বহুল। আবার জনপ্রতি আয় বেশি হলেই যে জনগণের জীবন-ধারণের মান উন্নত হবে, তাও নয়। সব নির্ভর করে জাতীয় আয় বণ্টনের সমতার উপর।

মূলধন ও আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার অভাব অনুন্নত অর্থনীতির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য, সন্দেহ নেই। অনুন্নত দেশ মাত্রেই যে এর অভাব রয়েছে তা নয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, মূলধনের অভাব অপেক্ষা বড় সমস্যা মূলধনের অনুৎ-পাদনশীলতা ও অনুৎপাদনশীল বা কম উৎপাদনশীল ক্ষেত্রে মূলধন

বিনিয়োগ। যথা, গৃহনির্মাণ, জমিজমা ক্রয়, অলঙ্কারপত্র ক্রয়, স্পেকুলেশন, বণ্টনমূলক বাণিজ্য অথবা হাল্কা ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্প। আবার, মূলধন ও প্রযুক্তিবিদ্যার অধিকারী হলেই যে দেশ উন্নত হবে, তাও নয়। এর সঙ্গে জনসম্পদ, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী, রাজনৈতিক অবস্থা প্রভৃতি প্রশ্নও জড়িত।

ইণ্ডিয়ান প্ল্যানিং কমিশনের মতে, অনুন্নত দেশের বৈশিষ্ট্য, একদিকে অব্যবহৃত জনসম্পদ অপরদিকে অব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদ। কমিশন এ দুয়ের মধ্যে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছে। তাদের এ ধারণা নির্ভুল বলা চলে না। নিজের দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার না করে অপর দেশ থেকে তা আমদানি করেও যে দেশের উন্নতি-সাধন সম্ভব এমন দৃষ্টান্ত রয়েছে। ফ্রান্সে কয়লা ও তেলের খনি আছে তবু সে তা বিদেশ থেকে আমদানি করে আর্থিক উন্নতি লাভ করেছে। যুক্তরাজ্য, জাপান এবং সম্প্রতিকালে দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, হংকং ও সিঙ্গাপুরের উন্নয়নের পেছনেও পরসম্পদ ব্যবহারের ইতিহাস রয়েছে।

ইউজিন ষ্ট্যালির মতে, অনুন্নত দেশগুলির বৈশিষ্ট্য ব্যাপক দারিদ্র্য। এ দারিদ্র্য তাদের সহজাত ঐতিহ্য বললেই চলে। অর্থাৎ, দারিদ্র্য তাদের কোন সাময়িক দুর্ভাগ্যজনিত কারণ প্রসূত নয়; প্রাচীন উৎপাদন পদ্ধতি বা সামাজিক কাঠামোর ফল প্রসূতও নয়। অথবা তাদের দারিদ্র্যের জন্য এক-মাত্র প্রাকৃতিক সম্পদের কার্পণ্যকেই দায়ী করা চলে না। অতএব অন্যান্য দেশ যে পদ্ধতি অবলম্বন করে দারিদ্র্য দূর করেছে সে সব পদ্ধতি অবলম্বন করে অনুন্নত দেশগুলিও তাদের দারিদ্র্য দূর করতে পারে এরূপ যুক্তির অবতারণা করা অযৌক্তিক নয়।

ষ্ট্যালি ও র‍্যাগনার নার্ক্সে'র বক্তব্য, "দেশটি দরিদ্র, অতএব দরিদ্র"। দারিদ্র্যের "দুষ্টচক্র" দেশটিকে গ্রাস করে বসে আছে। যোগানের দিক থেকে দেখলে দুষ্টচক্রের স্বরূপটি এরূপ : দেশটি দরিদ্র, অর্থাৎ, তার আয় কম অতএব উৎপাদন ক্ষমতা কম, ঘুরে ফিরে আবার আয় কম। অন্য কথায়, দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে সে আবর্তিত। চাহিদার দিক থেকে দেখতে গেলে আবর্তনের ধারাটি এরূপ : আয় কম, অতএব চাহিদা কম, বিনিয়োগ কম, মূলধন কম, উৎপাদন ক্ষমতা কম। অর্থাৎ, আবার আয় কম। যে দিক দিয়েই দেখা যাক না কেন, দুষ্টচক্রের আবর্তনে দেশটি স্থায়ীভাবে দরিদ্র।

অনুন্নত দেশগুলির দুষ্টচক্রের মূলে রয়েছে, মূলধনের স্বল্পতা, নিম্নমানের প্রযুক্তিবিদ্যা ও প্রতিকূল সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি যার ফলে প্রাকৃতিক ও জনসম্পদের পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হচ্ছে না। এর পরিণতি কম উৎপাদনশীলতা ও অপূর্ণাঙ্গ বাজার। এ ধারণায় ও বিশ্লেষণে বাস্তবতা বোধের পরিচয় রয়েছে। কিন্তু উন্নতমানের প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ উন্নত অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোতেই সম্ভব। কারণ এজন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত মূলধন, সুদক্ষ শ্রম, উন্নত ব্যবসায় সংগঠন, সমৃদ্ধ ও বিস্তৃত অভ্যন্তরীণ বাজার ও অনুকূল সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ। দেশ অনুন্নত বলেই এ সমস্ত সুযোগ থেকে সে বঞ্চিত। সমস্যা সেখানেই।

কৃষিপ্রধান দেশমাত্রই যে অনুন্নত হবে, এ কথাও নিশ্চয় করে বলা চলে না। ডেনমার্ক, নিউজিল্যাণ্ড ও শ্রীলঙ্কা কৃষিপ্রধান, কিন্তু অনুন্নত নয়।

বহির্বাণিজ্যের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা অনুন্নত অর্থনীতির লক্ষণ বলা হয়ে থাকে। কারণ সাধারণত দেখা যায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে এ সমস্ত দেশে "দ্বৈত অর্থনীতি" সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ, একদিকে উন্নত রপ্তানি সেক্টর গড়ে উঠেছে, অন্যদিকে অন্যান্য সেক্টরগুলির বিশেষ কোন উন্নয়ন ঘটেনি। বাণিজ্য-শর্তের ক্রমাগত অবনতি দেখা যায়। তবে সব ক্ষেত্রেই যে তা প্রযোজ্য একথা অবশ্য বলা চলে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যুক্তরাজ্য, জাপান ও শ্রীলঙ্কার উল্লেখ করা যেতে পারে। সাধারণত ক্ষুদ্র দেশগুলির অর্থনৈতিক ভিত বহির্বাণিজ্যের উপর রচিত। কিন্তু সে কারণে ক্ষুদ্র দেশ মাত্রই যে অনুন্নত, এ ধারণা সঠিক নয়।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি একদিকে যেমন আশঙ্কার কারণ অপরদিকে তা তেমনি সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতিও বটে। অতিরিক্ত মানুষটি শ্রমশক্তি নিয়েই জন্মেছে। তাকে শ্রমের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না বলেই সে অবাঞ্ছিত। অপরাধ তার জন্মগ্রহণে নয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়। এ যুক্তি উপেক্ষা করার মত নয়। 1977 সনে বিভিন্ন দেশ মোট 400 বিলিয়ন ডলারেরও বেশি পরিমাণ অর্থ দেশরক্ষার নামে মারণাস্ত্র তৈরি করার জন্য ব্যয় করেছে। বিজ্ঞান যদি মারণ-বিজ্ঞান শাস্ত্রে পরিণত না হয়ে মানব কল্যাণ বিজ্ঞানের স্তরে উন্নীত হত তাহলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি সম্ভবত অবাঞ্ছিত না হয়ে স্বাগতের কারণ হয়ে দাঁড়াত।

আয় ও সম্পদ বণ্টনে অসমতা, উৎপাদনের উপকরণে ভারসাম্যের

অভাব, বেকারত্ব, প্রতিকূল কর-নীতি, কম উৎপাদনশীলতা, ভোগ্যদ্রব্যের উপর ব্যয়াধিক্য, দেশীয় বাজারের সীমাবদ্ধতা প্রভৃতি যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যের কথা অনুন্নত দেশগুলি সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে তা সব দেশেই কিছু না কিছু দেখা যায়। সব দেশেই কিছু না কিছু প্রাকৃতিক সম্পদ ও শ্রম অব্যবহার্য অবস্থায় রয়েছে। তাদের পূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবহার সম্ভবও নয়, ক্ষেত্রবিশেষে অপ্রয়োজনও। কারণ জাতীয় প্রাকৃতিক ও জনসম্পদের ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রে বহিরাগত কারণ ও আনুষঙ্গিক উপকরণের যোগানের উপর নির্ভর করে। আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অস্থিরতা ও আর্থিক বিন্যাস, বাণিজ্য চক্র, পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ লোকের অশেষ দারিদ্র্য, খনিজ তেলের উপর কতিপয় দেশের প্রায় একচেটিয়া অধিকার ও প্রভুত্ব সমস্ত দেশের অর্থনীতিকেই প্রভাবিত করে চলেছে। যার ফলে অনেক দেশেই জাতীয় সম্পদের পূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবহারের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে কোন দেশকেই সুনির্দিষ্টভাবে উন্নত বা অনুন্নত বলা যায় কিনা সন্দেহ।

3 অনুন্নত অর্থনীতি ও ভারতীয় অর্থনীতি

ভারত অনুন্নত দেশ। অর্থাৎ, ভারতের অর্থনীতি অনুন্নত। তবে প্রাকৃতিক ও জনসম্পদ এবং সামাজিক ও আর্থিক চেতনা ও প্রতিশ্রুতির দিক থেকে ভারত উন্নতিশীল বা বিকাশশীল দেশ।

ভারতীয় অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য

1. জনসংখ্যার আধিক্য।
2. অশিক্ষা ও স্বাস্থ্যহীনতা।
3. কৃষি-ভিত্তিক অর্থনীতি।
4. সীমিত মূলধন ও অনুন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা।
5. জনপ্রতি আয় কম এবং আয় ও সম্পদ বণ্টনে অসমতা।
6. বেকারের আধিক্য।
7. বৈদেশিক সাহায্য ও বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীলতা।
8. অনুন্নত ঋণদান ব্যবস্থা।
9. অর্থনীতির উপর রাজনীতির অতিরিক্ত প্রভাব।
10. দ্বৈত অর্থনীতি।

1. জনসংখ্যার আধিক্য

জনসংখ্যায় চীনের পরেই ভারতের স্থান। কিন্তু চীন ও অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি। 1973-82 সনে ভারতের গড় বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার 2·3 শতাংশ, চীনের 1·2 শতাংশ ও শ্রীলঙ্কার 1·7 শতাংশ।*

ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণগুলির মধ্যে রয়েছে জনস্বাস্থ্যের উন্নতি, মহামারী রোধ, দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করার সামর্থ্য বৃদ্ধি প্রভৃতি। ফলে মৃত্যুহার হ্রাস পেয়েছে। মৃত্যুহার যেখানে হ্রাস পাচ্ছে সেখানে জনসংখ্যা হ্রাস করতে হলে জন্মহার হ্রাস করার প্রয়োজন রয়েছে। সেজন্য জন্মনিরোধ প্রচেষ্টার উপর গুরুত্ব দেওয়া দরকার। বস্তুত ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ জন্মনিরোধ প্রচেষ্টার উপর তেমন গুরুত্ব না দেয়া। 1970 সনে

---

*সূত্র: দ্য ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক এ্যাটলাস 1985।

ফিনল্যাণ্ডে 77 শতাংশ বিবাহিতা স্ত্রীলোক জন্মনিরোধের জন্য কৃত্রিম পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। যুক্তরাজ্যে এই শতাংশের পরিমাণ ছিল 72, অষ্ট্রেলিয়ায় 66, ফ্রান্সে 64, যুক্তরাষ্ট্রে 65, ডেনমার্কে 67, জাপানে (1977 সনে) 61 আর ভারতে মাত্র 12। নিঃসন্দেহে বলা চলে ভারতের দ্রুত উন্নয়নের পথে প্রচণ্ড বাধা তথা দারিদ্র্যের অন্যতম প্রধান কারণ জনসংখ্যার আধিক্য। ভারতের জনসংখ্যার প্রায় 50 শতাংশ "দারিদ্র্য রেখার" নিম্নে। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী নারায়ণ দত্ত তেওয়ারী কর্তৃক রাজ্যসভায় প্রদত্ত এক বিবৃতিতে প্রকাশ যে, ভারতের প্রায় 30 কোটি 6 লক্ষ লোক দারিদ্র্য রেখার নিচে বাস করে। এদের মধ্যে 24 কোটি 9 লক্ষ লোক গ্রামাঞ্চলের ও 5 কোটি 70 লক্ষ লোক শহরাঞ্চলের অধিবাসী। গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য জনপ্রতি দৈনিক প্রয়োজন 2400 ক্যালোরী ও শহরাঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য জনপ্রতি দৈনিক প্রয়োজন 2100 ক্যালোরী ধরে এ দারিদ্র্য রেখার সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। 1977-78 সনের দামে এ ক্যালোরীর মূল্য গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে মাসিক 65 টাকা ও শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে মাসিক 75 টাকা ধরা হয়।

ষষ্ঠ পরিকল্পনায় দারিদ্র্য রেখার যে চিত্রটি তুলে ধরা হয়েছে তা নিম্নরূপ :

দারিদ্র্য রেখার নিম্নে জনসংখ্যার শতাংশ*

অঞ্চল	1972-73	1977-78
গ্রামাঞ্চল	54·09	50·82
শহরাঞ্চল	41·22	38·19
সর্ব ভারত	51·49	48·13

[সূত্র : ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা]

2. অশিক্ষা ও স্বাস্থ্যহীনতা

সুশিক্ষা ও সুস্বাস্থ্য জাতীয় উন্নতির মূলে। যে দেশের জনগণ অজ্ঞ ও অশিক্ষিত, দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যহীনতায় আক্রান্ত সে দেশ উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারে না। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের দিক থেকে ভারতের মান অতি নিম্নে। 1981 সনে ভারতে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে মাত্র 36·17 শতাংশের

* ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যবর্তীকালীন মূল্যায়নে বলা হয়েছে যে, 1981-82 সনে দারিদ্র্য রেখার নিম্নে জনসংখ্যা 28 কোটি 20 লক্ষ বা 41·5 শতাংশ।

বর্ণজ্ঞান ছিল। তাদের মধ্যে পুরুষ 46·74 শতাংশ ও স্ত্রী 24·88 শতাংশ। যেখানে জাপান, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নে 99 শতাংশ বর্ণ জ্ঞানসম্পন্ন। ভারতের সাধারণ লোকের শিক্ষার প্রতি যে অনীহা, তা নয়। বস্তুত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দুরবস্থার জন্য তারা শিক্ষার প্রতি আগ্রহী নয়। দরিদ্র পিতামাতার পক্ষে শিক্ষার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব নয়। তাছাড়া খেত-খামারে খেটে খাওয়া মানুষ বা দিন মজুরের দল মনে করে নাবালক পুত্রকন্যাদের বিদ্যালয়ে "আবদ্ধ" না রেখে ঘর বা ক্ষেত-খামারের কাজে লাগালে রুজিরোজগারের দিক থেকে অনেক বেশি কাজের হবে।

স্ত্রীশিক্ষার বাস্তব চিত্রটি আরো করুণ। বিশেষত গ্রামাঞ্চলে ও দুর্বল শ্রেণীদের মধ্যে। সাধারণত সামাজিক সংস্কার, সংরক্ষণশীলতা ও গৃহকর্মের প্রয়োজনের কারণে স্ত্রীশিক্ষা ভারতে বিস্তারলাভ করতে পারেনি। চতুর্থ সর্বভারতীয় শিক্ষা সমীক্ষায় প্রকাশ যে, যেসব শিশুরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় না তাদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ বালিকা। এদের অধিকাংশই দুর্বল শ্রেণীভুক্ত, অর্থাৎ, তপশীলী সম্প্রদায়, উপজাতিভুক্ত, কৃষিশ্রমিক ও শহরের বস্তি অঞ্চলে বসবাসকারী পরিবারভুক্ত।

1977 সনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার মত যোগ্যতাসম্পন্ন শিশুদের (6-11 বৎসর) মধ্যে 80 শতাংশ যথারীতি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। কিন্তু 1979 সনে 12-17 বছর বয়স্ক বালক-বালিকাদের মধ্যে মাত্র 28 শতাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ছিল। আর 20-24 বছর বয়স্ক স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে মাত্র 6 শতাংশ উচ্চশিক্ষার ছাত্র-ছাত্রী ছিল। সমীক্ষাতে আরো প্রকাশ প্রথম শ্রেণীতে যে সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয় তাদের মধ্যে 63 শতাংশ ও অষ্টম শ্রেণীর শেষে 77 শতাংশ বিদ্যালয় ছেড়ে চলে যায়। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির অবস্থা অতিশয় শোচনীয়। 80 শতাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন হয় চালের ছাউনির নিচে বা তাবুতে বা মুক্তাঙ্গনে। সমীক্ষকদের মতে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য 16·1 লক্ষ ক্লাসঘরের প্রয়োজন যা নির্মাণ করতে গেলে অন্তত 1920 কোটি টাকার দরকার। 4,74,636 প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে 1,62,008 বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বসার জন্য কোন বেঞ্চ বা মাদুর পর্যন্ত নেই। 1,88,541 প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ব্ল্যাকবোর্ড ও 2,82,400 প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। তাছাড়া

4,74,636 প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে 1,64,931 একজন করে শিক্ষক আছেন। তিনি ছুটিতে গেলে ছাত্র-ছাত্রীদেরও বাধ্য হয়ে ছুটিতে যেতে হয়। নয়টি রাজ্যকে শিক্ষার দিক থেকে 'পশ্চাৎপদ' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। যথা, অন্ধ্রপ্রদেশ, আসাম, বিহার, জম্মু ও কাশ্মীর, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ। যারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী নয় তাদের তিন-চতুর্থাংশ এ রাজ্যগুলির অধিবাসী।

শিক্ষাজগতে ভারতের স্থান নিম্নরূপ:

প্রাপ্তবয়স্কদের বর্ণজ্ঞানের হার

দেশ	15 ও তার বেশি বয়স্ক ব্যক্তি যারা পড়তে ও লিখতে পারে তাদের শতাংশ, 1980
ভারত	36
শ্রীলঙ্কা	85
চীন	69
ইন্দোনেশিয়া	62
যুক্তরাজ্য	99
জাপান	99
যুক্তরাষ্ট্র	99
সোভিয়েত ইউনিয়ন	100
অষ্ট্রেলিয়া	100
ফিনল্যাণ্ড	100

সূত্র: ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট, 1983

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ভারতের জনপ্রতি দৈনিক ন্যূনতম 2021 ক্যালোরীর প্রয়োজন। 1977 সনে এ প্রয়োজনের 91 শতাংশ পাওয়া গেছে। যেখানে জাপানে ক্যালোরীর প্রয়োজন মিটেছিল 126 শতাংশ, যুক্তরাজ্যের 132 শতাংশ এবং যুক্তরাষ্ট্রের ও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রত্যেকের 135 শতাংশ। অবশ্য জনপ্রতি ক্যালোরীর প্রয়োজনের ভিত্তিতে কোন দেশের জনগণের

শিক্ষা ঃ বিভিন্ন স্তরে ছাত্রসংখ্যা

	1 প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির সংখ্যা (6-11 বছরের বালক-বালিকার শতাংশ)				2 মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির সংখ্যা (12-17 বছরের বালক-বালিকার শতাংশ)				3 উচ্চশিক্ষায় ভর্তির সংখ্যা (20-24 বয়স গোষ্ঠীর শতাংশ)	
দেশ	মোট		পুরুষ		স্ত্রী					
	1960	1981	1960	1981	1960	1981	1960	1981	1960	1981
ভারত	61	79	80	93	40	64	20	30	3	8
শ্রীলঙ্কা	95	103	100	106	90	100	27	51	1	3
যুক্তরাজ্য	92	103	92	103	92	103	66	83	9	20
জাপান	103	100	103	100	102	100	74	92	10	30
যুক্তরাষ্ট্র	118	100	—	100	—	100	86	97	32	58
সোভিয়েত ইউনিয়ন	100	107	100	—	100	—	49	96	11	21
অষ্ট্রেলিয়া	103	110	103	110	103	110	51	86	13	26
ফিনল্যাণ্ড	97	96	109	96	95	96	74	98	7	31

সূত্র.ঃ ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট, 1984.

দৈহিক স্বাস্থ্যের অবস্থা নির্ণয় করা যায় না। প্রকৃত অবস্থা জানতে হলে ব্যক্তি-ভিত্তিক বা পরিবার-ভিত্তিক স্বাস্থ্য তত্ত্বের পরিসংখ্যান নিতে হয়। জনপ্রতি দৈনিক ন্যূনতম ক্যালোরীর প্রয়োজন নিছকই গড়ের হিসাব।

সাধারণভাবে বলতে গেলে ভারতের জনগণের দুর্বল স্বাস্থ্যের কারণ অবশ্যই দারিদ্র্য। তাছাড়া অস্বাস্থ্যকর স্থানে বসবাস, সংক্রামক ব্যাধি সম্পর্কে সতর্কতার অভাব, পুষ্টিকর খাদ্যের উপযোগিতা সম্পর্কে অজ্ঞতা, জন-স্বাস্থ্যের প্রতি সরকার ও জনগণের উদাসীনতাও তাদের দুর্বল স্বাস্থ্যের কারণ।

চিকিৎসকের দিক থেকে দেখা যায় 1977 সনে ভারতে প্রতি 3620 জনের জন্য একজন মাত্র চিকিৎসক ছিল। যেখানে সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রতি 275 জনের জন্য একজন, পশ্চিম জার্মানীতে প্রতি 399 জনের জন্য একজন, যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি 444 জনের জন্য একজন, গ্রেটব্রিটেনে প্রতি 611 জনের জন্য একজন এবং স্পেনে প্রতি 650 জনের জন্য একজন চিকিৎসক ছিল।

ভারতের বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবও প্রকট। 1975 সনে ভারতের মোট জনসংখ্যার মাত্র 33 শতাংশ পানীয় জলের সুযোগ পেত। অর্থাৎ, 67 শতাংশ লোক বলতে গেলে অপরিশুদ্ধ জল পান করত। কোন উন্নত দেশেই পানীয় জলের কোন সমস্যা নেই।

প্রসঙ্গক্রমে আরো উল্লেখযোগ্য, ভারতের অধিকাংশ লোকই স্বাস্থ্য উন্নয়ন প্রকল্পের সুযোগ গ্রহণ করতে সমর্থ হয় না। কারণ প্রচারের অভাবে এসব প্রকল্প সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণা নেই। অনেকে আবার দূরত্বের জন্যও এসব প্রকল্পের সুযোগ নিতে পারে না। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে 'হেলথ কেয়ার' কেন্দ্রগুলির ব্যবস্থাও স্বাস্থ্যকর নয়। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য-কর্মীরা উপযুক্তরূপে শিক্ষাপ্রাপ্তও নয়।

3. কৃষি-ভিত্তিক অর্থনীতি

1980 সনে ভারতে মোট শ্রমশক্তির 71 শতাংশ কৃষির সঙ্গে জড়িত ছিল; জাপানে ছিল মাত্র 12 শতাংশ, যুক্তরাজ্যে 2 শতাংশ, যুক্তরাষ্ট্রে 2 শতাংশ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে 14 শতাংশ। এ দ্বারা ভারতের কৃষির উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা ও তার উৎপাদন ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা প্রমাণ করে।

ভারতে 1960 সনে স্থূল দেশীয় উৎপাদনের 50 শতাংশ ছিল কৃষির দান। 1981 সনে এর পরিমাণ 33 শতাংশ। অর্থাৎ, শিল্পোন্নয়নের ফলে জমির

উপর দেশের আর্থিক নির্ভরশীলতা হ্রাস পেয়েছে। তা সত্ত্বেও এ নির্ভরশীলতা কম বলা চলে না। জাপানে স্থূল দেশীয় উৎপাদনে কৃষি উৎপাদনের শতাংশের পরিমাণ 1981 সনে ছিল মাত্র 4 শতাংশ, যুক্তরাষ্ট্রে 3 শতাংশ ও যুক্তরাজ্যে 2 শতাংশ। চীন ও শ্রীলঙ্কায় যথাক্রমে 37 ও 27 শতাংশ।

ভারতের ক্ষেত্রে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির হারও প্রশংসনীয় নয়। 1970-81 সনে গড় বার্ষিক বৃদ্ধির হার (শতাংশ) ভারতের ক্ষেত্রে 1·9, চীনের ক্ষেত্রে 2·8, শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রে 3·0, বার্মার ক্ষেত্রে 4·7, তানজানিয়ার ক্ষেত্রে 5·5 এবং পাকিস্তান ও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যথাক্রমে 2·6 ও 2·4।

ভারতের ভোগ্যদ্রব্যের উপর ব্যয়িত অর্থের 60 শতাংশ খাদ্যের জন্য ব্যয় করা হয়।

4. সীমিত মূলধন ও অনুন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা

ভারতে মূলধনের অভাব। মূলধন গড়ে ওঠার হারও কম। মূলধনের পরিমাণ আশানুরূপ কিনা তা জনপ্রতি শক্তি ব্যবহারের পরিমাণ দিয়ে পরিমাপ করা হয়। 1980 সনে ভারতে জনপ্রতি শক্তি ব্যবহারের পরিমাণ ছিল সম পরিমাণ কয়লার ওজনের (কিলোগ্রাম অব কোল ইকিউভ্যালেণ্ট) 210 কিলোগ্রাম, যেখানে কানাডায় ছিল 13,153 কিলোগ্রাম, যুক্তরাজ্যে 5363 কিলোগ্রাম, যুক্তরাষ্ট্রে 11,626 কিলোগ্রাম, সোভিয়েত ইউনিয়নে 6422 কিলোগ্রাম, জাপানে 4649 কিলোগ্রাম ও চীনে 618 কিলোগ্রাম।

আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যায়ও ভারত অনুন্নত। উৎপাদনের প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই প্রাচীন ও আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতি পাশাপাশি চলছে। এ সম্পর্কে কৃষি ক্ষেত্রের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উপযুক্ত দক্ষ কর্মী, সুদক্ষ পরিচালনা, প্রয়োজনীয় মূলধন ও বিস্তৃত বাজারের অভাবের ফলে বিদেশী আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা অনেক ক্ষেত্রেই অবাঞ্ছিত, ব্যয়বহুল ও প্রয়োগসমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

5. জনপ্রতি আয় কম এবং আয় ও সম্পদ বণ্টনে অসমতা

1982 সনে ভারতে জনপ্রতি স্থূল জাতীয় উৎপাদন (জি-এন-পি) ছিল 260 ডলার। সে বছর জাপানে জনপ্রতি স্থূল জাতীয় উৎপাদন ছিল 10,100 ডলার, যুক্তরাজ্যে 9620 ডলার, যুক্তরাষ্ট্রে 13,160 ডলার, চীনে 300 ডলার, কুয়েটে 19,610 ডলার। সর্বাধিক ইউনাইটেড আরব এমিরেটস-এ, 24,080 ডলার। ভারতে জি-এন-পির গড় বার্ষিক বৃদ্ধির হারও আশানুরূপ নয়।

1973-82 সনে ভারতে জি-এন-পি বৃদ্ধির হার গড়ে যেখানে 4·1 শতাংশ সেখানে শ্রীলঙ্কায় 4·9 শতাংশ ও চীনে 5·7 শতাংশ। জনপ্রতি আয় দিয়ে জনগণের আর্থিক অবস্থার পরিমাপ করা যায় না। দেশবাসীর প্রকৃত আর্থিক অবস্থা জানতে হলে জাতীয় আয় বণ্টনের অসমতার পরিমাণ জানা দরকার।

1975-76 সনে ভারতের নিম্নতম 20 শতাংশ পরিবার জাতীয় আয়ের 7·0 শতাংশ ভোগ করত। উচ্চতম 20 শতাংশ ভোগ করত 49·4 শতাংশ ও উচ্চতম 10 শতাংশ ভোগ করত 33·6 শতাংশ। 1969 সনে জাপানে এ শতাংশের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 7·9, 41·0 ও 27·2; যুক্তরাজ্যে (1979 সনে) যথাক্রমে 7·3, 39·2 ও 23·8 ও যুক্তরাষ্ট্রে (1972 সনে) 4·5, 42·8 26·66। ভারতের উচ্চতম 20 শতাংশ পরিবার ও নিম্নতম 20 শতাংশ পরিবারের মধ্যে ব্যবধান 7 গুণেরও বেশি। যেখানে জাপানে 5 গুণের কিছু বেশি ও যুক্তরাজ্যে 5·8 গুণ। যুক্তরাষ্ট্রের আয় বণ্টনের ব্যবধানের পরিমাণ 9·5 গুণের সামান্য বেশি। যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় ভারতে আয় বণ্টনের বৈষম্য কম হলেও ভারতের মত দরিদ্র দেশে আয় বণ্টনের বৈষম্য যে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি করে ধনী, বিশেষত যুক্তরাষ্ট্রের মত বনিয়াদী ধনী দেশে আয় বণ্টনের বৈষম্য সে ধরনের বা সে আয়তনের সমস্যা সৃষ্টি করে না। সাধারণভাবে বলতে গেলে সে সব দেশের দুর্বল শ্রেণীর সমস্যা ভাত-কাপড়ের সমস্যা নয়, সমস্যা সমাজের উচ্চস্তরে দ্রুত না পৌছাবার আক্ষেপ। অন্য কথায়, ভারতে অসম বণ্টন দারিদ্র্য; যুক্তরাষ্ট্রে অসম বণ্টন প্রাচুর্য।

6. বেকারের আধিক্য

উন্নত দেশগুলির শ্রমশক্তির সঙ্গে ভারতের শ্রমশক্তির তুলনা করলে দেখা যাবে যে, ভারতের শ্রমশক্তি দেশের সম্পদ না হয়ে সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। 15-64 বছর বয়স্ক ব্যক্তিদের শ্রমশক্তিরূপে ধরে নিয়ে হিসেব করলে দেখা যায় 1982 সনে ভারতে জনসংখ্যার 57 শতাংশ শ্রমশক্তি। এ হিসাবের ভিত্তিতে জাপানে 68 শতাংশ, যুক্তরাজ্যে 64 শতাংশ, যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন উভয় দেশে 66 শতাংশ শ্রমশক্তি। 1980 সনে ভারতের শ্রমশক্তির 71 শতাংশ কৃষিতে নিযুক্ত ছিল, জাপানে ছিল 12 শতাংশ, যুক্ত-রাজ্যে 2 শতাংশ, যুক্তরাষ্ট্রে 2 শতাংশ ও সোভিয়েত ইউনিয়নে 14 শতাংশ। সে বছরে ভারতে শিল্পে নিযুক্ত ছিল 13 শতাংশ শ্রমশক্তি, জাপানে 39

শতাংশ, যুক্তরাজ্যে 42 শতাংশ, যুক্তরাষ্ট্রে 32 শতাংশ ও সোভিয়েত ইউনিয়নে 45 শতাংশ। সেবায় নিযুক্ত শতাংশের পরিমাণ ভারতে 16, জাপানে 49, যুক্তরাজ্যে 56, যুক্তরাষ্ট্রে 66 ও সোভিয়েত ইউনিয়নে 41। 1970-82 সনে ভারতে শ্রমশক্তির বৃদ্ধির হার বার্ষিক গড়ে 2·1 শতাংশ, যেখানে জাপানে 1·3 শতাংশ ও যুক্তরাজ্যে 0·4 শতাংশ, যুক্তরাষ্ট্রে 1·7 শতাংশ ও সোভিয়েত ইউনিয়নে 1·2 শতাংশ। দেখা যাচ্ছে, ভারতে অধিকাংশ শ্রমশক্তি কৃষিতে নিযুক্ত। এর ফলে "ছদ্মবেশী"* বেকারের আধিক্য ঘটেছে। উন্নত দেশের বেকারত্বের কারণ প্রধানত কার্যকর চাহিদার অভাব। অনুন্নত দেশের বেকারত্বের কারণ মূলত কাঠামোগত; অন্য কথায়, মূলধন ও বিনিয়োগের অভাব।

7. বৈদেশিক সাহায্য ও বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীলতা

কোন দেশই স্বয়ম্ভর নয়। তা সম্ভবপর বা সহজও নয়। কিন্তু অর্থনৈতিক, আঞ্চলিক ও রাজনৈতিক কারণে দেশগুলি কতগুলি অর্থনৈতিক গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে নানা প্রকার গোষ্ঠীগত সঙ্কীর্ণতা ও রাজনৈতিক জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। এ গোষ্ঠী নীতির ফলে গোষ্ঠী নিরপেক্ষ দেশগুলি বৈদেশিক বাণিজ্যে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ও নানাভাবে গোষ্ঠী স্বার্থ-ভিত্তিক রাজনীতির শিকার হয়ে পড়েছে। যার ফলে আর্থিক স্বয়ম্ভরতার দিকে তাদের ঝুঁকতে হচ্ছে। উন্নত দেশগুলিও অন্তঃদ্বন্দ্বের ফলে কমবেশি স্বয়ম্ভরতার জন্য সচেষ্ট। আরব দেশগুলির খনিজ তেল নীতি তেল আমদানিকারক দেশগুলির মধ্যে স্বয়ম্ভরতা ও আর্থিক-গোষ্ঠী চেতনা আরো উগ্র করে তুলেছে।

ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামো ও উন্নয়নমুখী অর্থনৈতিক ধারা এরূপ যে তার পক্ষে বৈদেশিক বাণিজ্য, বৈদেশিক সাহায্য ও আন্তর্জাতিক ঋণদানকারী সংস্থাগুলির উপর যথেষ্ট নির্ভর না করে থাকা ছাড়া উপায় নেই। ভারতকে বিদেশ থেকে তেল, সার, খাদ্যশস্য, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণে আমদানি করতে হয়। ভারতের রপ্তানি দ্রব্যের চাহিদার তুলনায় আমদানিকৃত দ্রব্যের চাহিদা

* "ছদ্মবেশী" বেকার বলতে কর্মে নিযুক্ত সেই ব্যক্তিকে বোঝায় যাকে কর্ম থেকে সরিয়ে নিলে উৎপাদন ব্যাহত হয় না, বরঞ্চ বৃদ্ধি পেতে পারে।

অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক। এর ফলে বাণিজ্য-শর্ত সাধারণত প্রতিকূলে যায়। আমদানির উপর এরূপ নির্ভরশীলতার ফলে ভারতের অর্থনীতিকে বহুলাংশে আন্তর্জাতিক অনিশ্চয়তার উপর নির্ভর করতে হয়। জাতীয় স্বার্থে তা অতিশয় বিপজ্জনক। আমাদের দেশে রপ্তানি-ভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তোলার অন্যতম প্রধান কারণ বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর অত্যন্ত নির্ভরশীলতা।

৪. অনুন্নত ঋণদান ব্যবস্থা

সুসংগঠিত ব্যাঙ্কিং প্রথা ও টাকার বাজার ছাড়া ক্রেডিট ব্যবস্থার প্রসার সাধন সম্ভব নয়। আমাদের দেশের ব্যাঙ্কিং ও টাকার বাজার আশানুরূপ উন্নত বলা যায় না। বিশেষত গ্রামাঞ্চলে। মুদ্রাস্ফীতির জন্য ক্ষুদ্র সঞ্চয়ও আশানুরূপ নয়। কালোবাজার বস্তুত সামাজিক স্বীকৃতি পেয়েছে। ফলে তা অত্যন্ত সক্রিয়। 'চিটফাণ্ড' ও নন ব্যাঙ্কিং সংস্থা গড়ে ওঠার ফলে এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির সরাসরি বাজার থেকে আমানত গ্রহণ করার আইনসঙ্গত অধিকার থাকাতে ব্যাঙ্কগুলির আমানত বৃদ্ধি ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার ক্রেডিট ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা ব্যাহত হচ্ছে। যার ফলে সুষ্ঠু ক্রেডিট কাঠামো গড়ে উঠতে পারছে না।

সঞ্চয় সংগ্রহ ব্যবস্থায় ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকাতেও আমানত বৃদ্ধি ব্যাহত হচ্ছে। তাছাড়া ঋণ দেয়ার উপর নানারূপ বাধানিষেধ থাকার ফলে ও ঋণ-প্রার্থীদের উপযুক্ত জামিন ও সিকিউরিটি দেয়ার অক্ষমতার অভাবে ক্ষুদ্র কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসায়ীদের পক্ষে ব্যাঙ্ক ঋণ পাওয়া কষ্টসাধ্য। ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও সাধারণ নিরক্ষতার কারণেও গ্রামাঞ্চলের লোকদের পক্ষে ব্যাঙ্ক ঋণের সুযোগ নেয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। ফলে ঋণের জন্য এখনও তাদের প্রধানত মহাজনদের শরণাপন্ন হতে হয়। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, সরকার বা ব্যাঙ্ক প্রদত্ত ঋণ পরিশোধ না করলেও চলে এ মনোভাব ঋণদানের মূল উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করছে। এর ফলে অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিছুটা এ কারণেই ব্যাঙ্ক ও আর্থিক সংস্থাগুলি দুর্বল শ্রেণীর লোকদের ঋণ দেয়ার ব্যাপারে ক্রমশই সংরক্ষণশীল হয়ে উঠছে।

9. অর্থনীতির উপর রাজনীতির অতিরিক্ত প্রভাব

অর্থনীতি ও রাজনীতি নিঃসন্দেহে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু রাজনীতি যেখানে অর্থনীতির মূল বিধিগুলির উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে চায় সেখানে অর্থ-

নৈতিক জটিলতার সৃষ্টি হয়। অর্থনীতির ক্ষেত্রে রাজনীতির হস্তক্ষেপের প্রবণতা দেশের রাজনৈতিক অব্যবস্থারই পরিচায়ক। সুস্থ রাজনৈতিক অবস্থা জাতীয় উন্নয়নের প্রথম ও অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।

যে কোন সমস্যাই হোক না কেন একমাত্র রাজনীতির পথেই তার সমাধানের চেষ্টার ভ্রান্ত আবহাওয়ায় ভারতের অর্থনীতি আবদ্ধ। ভারতে পশ্চিমী গণতন্ত্র বিদ্যমান বটে, কিন্তু এর মূল শর্তগুলির এখানে একান্ত অভাব। যেমন, শিক্ষা, সামাজিক চেতনা ও জ্ঞান, আর্থিক স্বচ্ছলতা, সহিষ্ণুতা, সর্ববিধ উন্নয়নমূলক কাজে সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণ, ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে আর্থিক ও সামাজিক সমতা প্রভৃতি। ভারতে গণতন্ত্রের দুর্বলতার ফলেই রাজনীতি অর্থনীতির উপর প্রাধান্য বিস্তার করে চলেছে। এর ফলে সঠিক পরিকল্পনা ও রূপায়ণ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

10. দ্বৈত অর্থনীতি

ভারতের আর্থিক কাঠামোর বিভিন্ন সেক্টরগুলির মধ্যে অসমতা রয়েছে। কৃষির কোন কোন ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগ করা হয়েছে। অপর দিকে প্রাচীন পদ্ধতিতেও চাষ-আবাদ চলছে। শিল্প ক্ষেত্রেও একদিকে যেমন অতি আধুনিক শিল্প সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে অপর দিকে তেমনি রয়েছে প্রাচীন পদ্ধতিতে পরিচালিত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প এবং পাটশিল্পের মত প্রাচীন শিল্পগুলি।

উপসংহার

অনুন্নত অর্থনীতির সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি ভারতের অর্থনীতিতে বিদ্যমান, এ সত্যতা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু এও স্বীকার্য যে ভারতের অর্থনীতির চিত্র থেকে এসমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি ক্রমেই অস্পষ্ট হয়ে আসছে; ফুটে উঠছে উন্নয়নশীল দেশের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কর্মধারা ও ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে এক নতুন উন্নত দেশের ছবি। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ধারণা ও রূপায়ণ ভারতের অর্থনৈতিক সচেতন মনের পরিচয় যা ভারতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন সাধন করে দেশকে উন্নত দেশের পরীক্ষিত পথে উন্নয়নের জন্য চালিত করছে। উচ্চ ফলনশীল বীজ ও নতুন কৃষি প্রযুক্তিবিদ্যা ভারতে কৃষি বিপ্লবের সূচনা করেছে। খাদ্যশস্যে ভারত বর্তমানে স্বয়ম্ভর বলা চলে। শিল্প সেক্টরেও সূচিত হয়েছে নব যুগ। বহুপ্রকার শিল্পের সমাগম, বহু শিল্প

ক্ষেত্রে স্বয়ম্ভরতা, রপ্তানি-ভিত্তিক শিল্পগুলির অগ্রগতি প্রভৃতি ভারতীয় অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে। আধুনিক শিল্প প্রযুক্তিবিদ্যা, আর্থিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন, ভিত-কাঠামোর পরিবর্তন, সরকারের উদ্যোগ ও জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছে। জাতীয় আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি আয় বণ্টনে সমতা আনা, আঞ্চলিক বৈষম্য লাঘব করা, সামাজিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা, পাবলিক সেক্টরকে সামাজিক উদ্দেশ্যে শক্তিশালী করে তোলা প্রভৃতি পরিকল্পিত প্রচেষ্টা উন্নয়নশীল ভারতের উন্নত ধরনের সমাজব্যবস্থার প্রতি আগ্রহের প্রকাশ।

ভারত অনুন্নত কেন

কারো কারো মতে ভারত অনুন্নত, অনুন্নত বলেই ভারত অনুন্নত। অর্থাৎ, ভারত এক দুষ্টচক্রে আবদ্ধ। এ জাতীয় বক্তব্য দ্বারা অনুন্নত অবস্থার যথার্থ কারণ জানা যায় না। আবার এও বলা হয়ে থাকে, ভারতের অগ্রগতির মন্থরতার কারণ জনাধিক্য, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, ধর্মীয় এবং সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক সংস্কার। ভারতীয় শ্রমিকগণ অন্দোলনমুখী, কাজে তাদের প্রবল অনীহা। নেতৃবর্গ ধার করা অর্থনীতি ও রাজনীতিতে আগ্রহী। ভারতের সমস্যা ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশ্লেষণ ও সমাধানের চেষ্টার প্রতি তাদের আগ্রহের অভাব।

ঐতিহাসিক কারণ

প্রায় দু'শ বছর ভারত ইংরেজদের অধীনে ছিল। এই সুদীর্ঘকাল ইংরেজরা ভারতকে শ্রেষ্ঠতম ব্রিটিশ উপনিবেশের মর্যাদা দিয়ে তার প্রাকৃতিক সম্পদ নানা কৌশলে লুণ্ঠন করেছে। ভারতকে কৃষিপ্রধান দেশের গৌরব রূপে চিহ্নিত করে কৃষি বা শিল্প কোনটিরই উন্নতিসাধন করেনি। কৃষির সীমিত উন্নয়ন কাঁচামাল ও খাদ্যশস্যের মধ্যে আবদ্ধ রেখে নিজেদের দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার সাধন করে গেছে। ভারতের পরিবহন ব্যবস্থার যেটুকু উন্নতি সাধিত হয়েছিল তার পশ্চাতে ভারতীয় স্বার্থ জড়িত ছিল না, জড়িত ছিল ব্রিটিশ স্বার্থ। যাতে ভারতের দূর-দূরান্ত থেকে কাঁচামাল ও খাদ্যশস্য সহজে ও সুলভে ভারতীয় বন্দর মারফত বিদেশে রপ্তানি করা যায় ও সুদূর গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত বিদেশী শিল্প দ্রব্যের বাজার প্রসারিত করা চলে। বলা বাহুল্য, ভারতের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে তখন ছিল ইংরেজদের

প্রায় একচেটিয়া অধিকার। শিল্পোন্নয়নের যে দুর্বল প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল তাও প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (1914-18) ব্রিটেনের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার ফলে। সে সময় ইংরেজ শাসকগণ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, ভারতকে স্থায়ীভাবে অনুন্নত রাখা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের পক্ষে অতিশয় বিপজ্জনক। এ অভিজ্ঞতার ফলে বিক্ষিপ্তভাবে যেসব শিল্প গড়ে উঠেছিল তাও প্রধানত কৃষি-ভিত্তিক শিল্প। যেমন, চা ও পাট বা এমন ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প যা ব্রিটিশ শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আসবে না। যেমন, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প।

পরবর্তী কালে ম্যানচেষ্টারের বস্ত্রশিল্পের প্রতিযোগী রূপে ভারতে যে বস্ত্র-শিল্প গড়ে ওঠে ও খনিজ শিল্পের প্রসার সাধন ঘটে তাও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থে। অন্যান্য যে সমস্ত শিল্প গড়ে উঠেছিল, যেমন, চা ও পাট, তাও তাদেরই স্বার্থে বলা চলে। কারণ এ সমস্ত শিল্প তাদেরই মালিকানায় ও পরিচালনায় গড়ে উঠেছিল।

1947 সনের পনেরোই আগস্ট ভারতে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটে। তবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিষময় চিহ্নরূপে থেকে যায় দ্বিখণ্ডিত ভারতবর্ষ —ভারত ও পাকিস্তান। 1971 সনে পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত হয়ে পূর্ব পাকিস্তানে উদ্ভব হয় "বাংলাদেশ"। বস্তুত, ভারতবর্ষ আজ ত্রিখণ্ডিত। ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ। এই দ্বিখণ্ডন, ত্রিখণ্ডন সমগ্র ভারতভূমিতে যে কেবল সামাজিক ও রাজনৈতিক জটিলতাই সৃষ্টি করে চলেছে তাই নয়, সমগ্র অর্থনীতির মূলেও প্রচণ্ড আঘাত হেনে যাচ্ছে। যে সময় (15 আগষ্ট 1947 সন) ভারত দ্বিখণ্ডিত হয় তার কিছু পূর্বে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (1939-45) সমাপ্তি ঘটে। এ যুদ্ধে ইংরেজ শাসকগণ ভারতকে যুক্ত করে নিয়েছিল। ফলে দেশে দারুণ মুদ্রাস্ফীতি ও খাদ্য সঙ্কট ঘটে। এর প্রকোপ থেকে কিছুমাত্র উপশম পাবার আগেই আপোসমুখী দ্বিখণ্ডিত স্বাধীনতা স্বাধীন ভারতের কাছে এক ঐতিহাসিক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এ সঙ্কটের মোকাবিলা করার মত অভিজ্ঞতা ও দৃঢ়তা তৎকালীন জাতীয় নেতাদের ছিল না বললেই হয়। ফলে সর্বমুখী সঙ্কট আরো জটিল আকার ধারণ করে।

অর্থনৈতিক কারণ

ভারতের অভাব প্রাকৃতিক বা জনসম্পদ নয়। অভাব এসব সম্পদের উপযুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবহারের। যে উদ্‌যোগ, মূলধন, উন্নত মানের প্রযুক্তি—

বিদ্যা, উন্নত ব্যাঙ্কিং ও ক্রেডিট ব্যবস্থা, সুদক্ষ শ্রমিক, শ্রমের গতিশীলতা, শ্রমিক-মালিকের যৌথ প্রচেষ্টা, কর্মের প্রতি অকৃত্রিম আগ্রহ, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, সুসংগঠিত দেশীয় বাজার, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও তা রূপায়িত করার মত রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক ক্ষেত্রের সুযোগ নেয়ার মত আর্থিক ও রাজনৈতিক বনিয়াদ প্রয়োজন ভারতে তার অভাব। অভাবের সঙ্গে অপচয়ও জড়িত। একথা সত্য যে, ভারতে প্রকৃত মূলধনের (যন্ত্রপাতি প্রভৃতি) অভাব রয়েছে, তেমনি এও সত্য যে, আর্থিক মূলধনের এক উল্লেখ্য অংশ নিম্নমানের উৎপাদন কাজে বিনিয়োগ করা হয়। যথা, প্রাসাদোপম গৃহনির্মাণ ও স্বর্ণ ক্রয়। মজুতদারীর জন্য, এমনকি নগদ অর্থেও, টাকা ধরে রাখা হয়। যন্ত্রপাতির যথোপযুক্ত ব্যবহার না হবার দরুন একদিকে মূলধনের অপচয় ঘটছে, অপরদিকে মূলধনের অভাবে শিল্প গড়ে তোলার প্রতিবন্ধকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ বিপরীত ধারা ভারতের বর্তমান যুগপৎ আর্থিক অচলায়তন ও মুদ্রাস্ফীতি অবস্থা সৃষ্টির অন্যতম প্রধান কারণ।

উন্নতমানের প্রযুক্তিবিদ্যার উপরও উৎপাদনের পরিমাণ ও গুণাগুণ অনেকটা নির্ভর করে। আর এরই উপর নির্ভর করে আন্তর্জাতিক আর্থিক ক্ষেত্রের সুযোগ নেয়ার সামর্থ্য। ভারতীয় শিল্পে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার অভাব অথবা ভুল বা অতিমাত্র তার প্রয়োগ ভারতীয় শিল্পের উৎপাদন-শীলতাকে যথেষ্ট ব্যাহত করছে। এর ফলে রপ্তানি বাণিজ্যে ভারত এখনও প্রধানত কতিপয় গতানুগতিক পণ্যদ্রব্যের, যেমন, চা, পাট, পাটজাতীয় দ্রব্য ও বস্ত্র, উপর নির্ভরশীল। সীমিত রপ্তানির ফলে আমদানিও সীমিত হয়ে পড়েছে। যার ফলে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলি সুরুতেই বিপাকে পড়ে বলিষ্টভাবে আর এগোতে সমর্থ হয় না।

সামাজিক কারণ

অনেকে ভারতকে কিছুটা সামন্ততান্ত্রিক কিছুটা পুঁজিতান্ত্রিক দেশ বলে চিহ্নিত করেন। এ বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ থাকলেও মোটামুটিভাবে বলা চলে যে, ভারতে দ্বৈত সমাজ ও দ্বৈত আর্থিক ব্যবস্থা রয়েছে। একদিকে সামন্ত প্রথা বা প্রাচীনতার প্রভাব, অপরদিকে পুঁজিতন্ত্র বা পশ্চিমী আধুনিকতার বিকাশ। প্রথমটির পরিচয় ধর্মীয় কুসংস্কার, জাতিভেদ প্রথা, সাম্প্রদায়িকতা, জমিদারী প্রথা, প্রাচীন প্রথায় চাষ-আবাদ, শিল্প-বাণিজ্য গড়ে তোলার প্রতি অনীহা, গ্রামাঞ্চলের সঙ্কীর্ণ স্বয়ম্ভরতার দিকে আগ্রহ, জাতীয় উন্নয়নে

সাধারণ মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণে বাধা প্রভৃতি। পুঁজির বিকাশের পরিচয় আধুনিক শিল্প প্রচেষ্টা, মুনাফার প্রতি অতিমাত্র আগ্রহ, শ্রমিক অসন্তোষ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও উৎপাদনের উপকরণের উপর কতিপয় ব্যক্তি ও সংস্থার একচেটিয়া মালিকানা অর্জনের চেষ্টা প্রভৃতি। অন্য কথায়, একদিকে সামন্ত প্রথার পিছুটান অপরদিকে পুঁজিবাদের মুনাফা-আগ্রাসী কার্যকলাপ ভারতের দ্রুত উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করে চলেছে।

উপসংহার

প্রায় দু'শ বছর ভারতীয়রা ইংরেজের অভিভাবকত্বে নাবালক হয়েছিল। এ সময়কালীন ইংরেজ শাসকরা স্বভাবতই ভারতীয় মূলধন, উদ্‌যোগ ও প্রযুক্তিবিদ্যা সৃষ্টি করার কোন চেষ্টা করেনি। ব্রিটিশ মূলধন, পরিচালন ও উদ্‌যোগ ভারতভূমি ত্যাগ করে যাবার ফলে ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল ভারতের তৎকালীন জাতীয় নেতাগণ দৃঢ়তার সঙ্গে সে সঙ্কটের মোকাবিলা করার দায়িত্ব এড়িয়ে দেশকে "শিশুরাষ্ট্র" আখ্যা দিয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করার চেষ্টা করেন। এ আত্মতৃপ্তির ভ্রান্তি আজও দূর হয়েছে বলা চলে না। বরঞ্চ বর্তমানে যে ভ্রান্তি রয়েছে তা আরও জটিল। দেশ আজ মূলত বিদেশী ভাবধারা ও পথের অন্ধ অনুসরণে প্রতিষ্ঠিত। ইংল্যাণ্ডের সংসদীয় গণতন্ত্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের যোজনা-মডেল যে ভারতীয় গণতন্ত্র ও জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে কত বড় বিঘ্নস্বরূপ তা অব্যক্ত থাকলেও সুপ্রতিষ্ঠিত। সংসদীয় গণতন্ত্র না রাষ্ট্রপতি শাসিত গণতন্ত্র বা বৃহৎ শিল্প-ভিত্তিক পরিকল্পনা না কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্প-ভিত্তিক যোজনা—ভারতীয় স্বার্থে কোনটি অধিকতর বাঞ্ছনীয়, স্বাধীনতার সাঁইত্রিশ বছর কেটে যাবার পরে সে প্রশ্ন আজ উঠেছে। বস্তুত ভারতের অনুন্নতির কারণ ভারতভূমির সঙ্গে সম্পর্কবিহীন, সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যোগসূত্রবিহীন, কঠিন বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিহীন, বর্তমান সমস্যা ও প্রয়োজনের সঙ্গে সম্বন্ধবিহীন রাষ্ট্র ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও চিন্তাধারা।

4

পরিকল্পনা ও উন্নয়ন

ভূমিকা

1947, 15 আগষ্ট। ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করে ইংরেজ শাসকরা ভারত-ভূমি ত্যাগ করে গেলেন। ভারত স্বাধীন হল। পৃথিবীর রাজনৈতিক মান-চিত্রে জন্ম নিল পাকিস্তান।

পূর্ব বাংলা, পূর্ব পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মানুষ, শত শত বছর ধরে যারা ছিল ভারতবাসী তারা রাতারাতি পরদেশী হয়ে গেল। পূর্ব বাংলার পাট ও পূর্ব পাঞ্জাবের তুলা যা ছিল ভারতবর্ষের অমূল্য সম্পদ, ভারতীয় সম্পদ, ভারতের অর্থনীতির বনিয়াদ তা নিমেষে পরদেশের সম্পদ হয়ে গেল। এর ফলে ভারতের অর্থনৈতিক ভারসাম্য ভেঙে পড়ার উপক্রম হল। জাতির এ সন্ধিক্ষণে ভারত অর্থনৈতিক পরিকল্পনার পথ নিল। বস্তুত ভারতের নতুন অর্থনৈতিক ও সার্বিক বিকাশের ইতিহাস সুরু হয় 1951 সনে —প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণের কাল থেকে।

পটভূমি

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বা পরিকল্পিত রূপে ভারতবর্ষের অর্থনীতিকে ও তার সামাজিক ধ্যান-ধারণাকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত করে নেয়ার বাসনা জাতীয় নেতাদের মনে স্বাধীনতার পরে হঠাৎ উদিত হয়েছিল, তা নয়। পরিকল্পনা-ভিত্তিক অর্থনীতির পথিকৃৎ সোভিয়েত ইউনিয়ন। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা যে কেবল 'অবাধ নীতির' (laissez faire) মূলেই আঘাত করে, তা নয়। অনুন্নত দেশ যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার পথে সার্বিক ভারসাম্য-রক্ষা করে দ্রুত সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লব ঘটাতে পারে সোভিয়েত ইউনিয়ন তার বাস্তব পরিচয়। তৎকালীন ভারতের জাতীয়তাবাদী প্রগতি-শীল নেতৃবৃন্দ সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপ্লবের এ দিকটিতে বিশেষ আকৃষ্ট হন। 1931 সনে করাচীতে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের প্রকাশ্য সম্মেলনে অর্থনৈতিক অবস্থার উপর যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাতে সোভিয়েত ইউনিয়নের পরিকল্পনার প্রচেষ্টার সার্থকতা প্রতিফলিত হয়। 1934 সনে এম. বিশ্বেশ্বরায় তার প্ল্যাণ্ড ইকোনমি ফর ইণ্ডিয়া প্রকাশ করেন। তিনি পঞ্চবার্ষিক বা দশ-

বার্ষিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন ও তা রচনা এবং দেশের অর্থনৈতিক কাজকর্ম ও সমস্যার সমাধানের দায়িত্ব নেয়ার জন্য একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব রাখেন।

1938 সনে সুভাষচন্দ্র বসু জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। সভাপতি রূপে তিনি প্রাদেশিক শিল্প মন্ত্রীদের এক সম্মেলন আহ্বান করেন। সে সম্মেলনে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, ভারতবর্ষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে একটি সার্বিক পরিকল্পনা গ্রহণের প্রস্তাব তলিয়ে দেখার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হবে। সে অনুযায়ী সে বছরই জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি গঠিত হয়। কমিটির মতে, পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হবে ভোগ, উৎপাদন, বিনিয়োগ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে কারিগরি সমন্বয় সাধন এবং জাতির প্রতিনিধিস্থচক সংস্থাগুলি কর্তৃক গৃহীত সামাজিক উদ্দেশ্যক্রমে আয় বণ্টন। এরূপ পরিকল্পনা কেবল অর্থনীতি ও দেশবাসীর জীবনযাপনের মান উন্নয়নের দৃষ্টিকোণ থেকেই বিবেচনা করা হবে না; জাতির সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্য এবং জীবনের মানবিক দিকও পরিকল্পনায় স্থান পাবে।

1939 সনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সুরু হওয়ার ফলে কমিটির কাজকর্ম স্থগিত রাখতে হয়। যুদ্ধশেষে এবং স্বাধীনতার প্রাক্কালে কমিটি সাব-কমিটিগুলির রিপোর্ট সহ, রিপোর্ট পেশ করে। স্বাধীনতার পর নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। জওহরলাল নেহরু স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন। প্ল্যানিং কমিটির সভাপতি রূপে ইতিমধ্যে তিনি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন তা পরবর্তী কালে ব্যর্থ হয়নি।

প্রসঙ্গক্রমে, তৎকালীন ইংরেজ শাসিত ভারত সরকার 1941 সনে যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন সম্পর্কিত পরিকল্পনা গ্রহণে উদ্যোগী হয়। 1944 সনে প্ল্যানিং এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ডিপার্টমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের একজন সদস্যের উপর এ ডিপার্টমেণ্টের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এর ফলে অবাধ নীতির পরিবর্তন সূচিত হয়। ঘোষণা করা হয়, ইহা সুস্পষ্ট যে শিল্পোন্নয়ন সরকারী পরিকল্পনা ছাড়া সম্ভব নয়। আরো ঘোষণা করা হয় যে, সংযোজিত উন্নয়নের স্বার্থে 20টি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হবে এবং কতিপয় অঞ্চলে যাতে শিল্প কেন্দ্রীভূত হতে না পারে ও

প্রকল্পের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে যাতে বেসরকারী পুঁজি বিনিয়োগ করা সম্ভব হয় সেজন্য শিল্প সংস্থাগুলিকে লাইসেন্স দেওয়ার ক্ষমতা রাষ্ট্র গ্রহণ করবে।

এর কিছুকাল পরেই রাজনৈতিক পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে। 1946 সনে কেন্দ্রে সাময়িকভাবে কংগ্রেস-মুসলীম লীগ মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এ সরকার প্ল্যানিং এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ডিপার্টমেণ্টকে বিলুপ্ত করে দেয়। এর পরিবর্তে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও অর্থ উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয়। তাছাড়া কতিপয় অর্থনীতিবিদ ও বিজ্ঞানীদের নিয়ে একটি এ্যাডভাইসরি প্ল্যানিং বোর্ডও গঠিত হয়। বোর্ডের উদ্দেশ্য ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটির কাজকর্ম ও অন্যান্য পরিকল্পনা গ্রহণের প্রস্তাবের পর্যালোচনা এবং পরিকল্পনার লক্ষ্য, অগ্রাধিকার ও পরিচালনা সম্পর্কিত সংস্থা গঠন সম্পর্কে সুপারিশ করা।

বেসরকারী শিল্পগোষ্ঠী ও অন্যান্য সংস্থাও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ব্যাপারে আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে বোম্বে প্ল্যান, পিপলস' প্ল্যান ও গান্ধীয়ান প্ল্যান উল্লেখ্য। 1944 সনে পুরুশোত্তমদাস ঠাকুরদাস ও জে. আর ডি টাটার নেতৃত্বে আটজন প্রথম সারির শিল্পপতি বোম্বে প্ল্যান (প্ল্যান ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া) রচনা করেন। এ পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল 1944 সনের জাতীয় আয়ের ভিত্তিতে 15 বছরে জাতীয় আয় তিনগুণ ও জনপ্রতি আয় দ্বিগুণ করা। এজন্য বিনিয়োগের পরিমাণ ধরা হয়েছিল 10,000 কোটি টাকা। এ পরিকল্পনা স্বভাবতই পুঁজিমুখী। জাতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর কোন মৌল পরিবর্তনের প্রচেষ্টা এতে ছিল না। পরিকল্পনাকে কার্যকর করার পদ্ধতি সম্পর্কেও কোন বিবরণ ছিল না।

পিপল'স প্ল্যানের রচয়িতাদের পুরোভাগে ছিলেন এম. এন. রায়। এ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য পুঁজিতন্ত্রের পরিবর্তে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এবং এ উদ্দেশ্যে সমস্ত শিল্প ও জমি রাষ্ট্রায়ত্তকরণ। এ পরিকল্পনার মতে প্রস্তাবিত কর্মসূচীতে 'সেলফ্ ফিনান্সিং' পদ্ধতিতে 15,000 কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হলে 10 বছরে জীবনযাত্রার মান চারগুণ বৃদ্ধি পাবে। মূলধন বণ্টন ব্যাপারে কৃষি ও ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পগুলিকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। এ পরিকল্পনার বিরোধীদের বক্তব্য, পরিকল্পনাটি সামগ্রিকতার দিক থেকে অবাস্তব, দীর্ঘকালীন উন্নয়নের সহায়ক নয় ও অর্থ বিনিয়োগের দিক থেকেও ত্রুটিপূর্ণ।

গান্ধীয়ান প্ল্যানের রচয়িতা শ্রীমান নারায়ণ। এ পরিকল্পনায় গ্রাম পুনর্গঠনের উপর জোর দেয়া হয়। সৎপথ ও অহিংসা এর ভিত। এ

পরিকল্পনা অনুযায়ী 1944 সনের দাম দস্তুরের ভিত্তিতে 15,000 কোটি টাকা বিনিয়োগ করা সম্ভব হলে দশ বছরে জনপ্রতি আয় চারগুণ বৃদ্ধি পাবে।

প্রস্তুতির মুখে পরিকল্পনা ঃ প্ল্যানিং কমিশন

1947 সনের 15 আগষ্ট। জাতীয় কংগ্রেস ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। 1948 সনে ভারত সরকারের শিল্প নীতি সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গড়ে তোলার সঙ্কল্প প্রকাশ পায়। এ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য জাতীয় পরিকল্পনার কথাও ঘোষণা করা হয়। এবং উন্নয়নমূলক কর্মসূচী প্রণয়ন ও রূপায়ণের উদ্দেশ্যে একটি ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিশন গঠন করার প্রস্তাব রাখা হয়।

1950 সনের মার্চে প্ল্যানিং কমিশন গঠিত হয়। কমিশন একটি স্বশাসিত, উপদেষ্টা ও বিশেষজ্ঞ সংস্থা রূপে কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রী কমিশনের চেয়ারম্যান। একজন পূর্ণ-সময়ের জন্য নিযুক্ত ডেপুটি চেয়ারম্যানের উপর কমিশনের যাবতীয় প্রশাসনিক ও কার্যনির্বাহের দায়িত্ব ন্যস্ত। কমিশনের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে আছেন অর্থমন্ত্রী, পরিকল্পনামন্ত্রী ও অন্যান্য কতিপয় ক্যাবিনেট মন্ত্রী এবং কতিপয় বিশেষজ্ঞ।

কাজকর্ম

প্ল্যানিং কমিশনের কাজকর্ম ঃ

(1) দেশের যাবতীয় বস্তু, পুঁজি ও জনসম্পদের পরিমাণ নির্ধারণ এবং জাতির প্রয়োজনের তুলনায় যে সব সম্পদের অভাব রয়েছে তাদের বৃদ্ধিসাধন সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা।

(2) জাতীয় সম্পদের পূর্ণ এবং ভারসাম্যমূলক ব্যবহারের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা রচনা করা।

(3) নির্ধারিত অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কিভাবে পরিকল্পনা কার্যকর করা হবে তা নির্ধারণ এবং প্রতি স্তরের কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ বণ্টনের প্রস্তাব রাখা।

(4) যেসব কারণে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিঘ্নিত হচ্ছে তাদের চিহ্নিত করা এবং বর্তমান প্রতিকূল সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনার সুষ্ঠু সার্বিক রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় উপযুক্ত পরিবেশ উদ্ভাবন করা।

(5) পরিকল্পনার প্রতিটি স্তরের কর্মসূচীর সার্বিক রূপায়ণের জন্য কি ধরনের সংস্কার প্রয়োজন তা নির্ধারণ করা।

(6) পরিকল্পনার প্রতি স্তরের কর্মসূচী রূপায়ণের অগ্রগতির মূল্যায়ন ও অগ্রগতি অব্যাহত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার সুপারিশ করা।

(7) কমিশনকে যেসব দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তা পালনের জন্য অথবা চলতি অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নীতি, উন্নয়নমূলক কর্মসূচী ও পন্থা গ্রহণের স্বার্থে অথবা কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রেরিত বিশেষ সমস্যাগুলির পরীক্ষার পর কমিশনের যে সব সুপারিশ করা সঙ্গত বলে মনে হবে সেসব সম্পর্কে সুপারিশ করা।

পরিকল্পনা কমিশন উপদেষ্টা সংস্থা মাত্র, তার কোন কার্যনির্বাহ করার ক্ষমতা নেই। তা সত্ত্বেও সে এমন একটি শক্তিশালী সংস্থার রূপ ধারণ করেছে যে জাতীর সমগ্র অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে তার প্রভাব স্বীকৃত।

প্রক্রিয়া

প্ল্যানিং কমিশন পরিকল্পনা রচনা করে। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার পরামর্শ নেয়া হয় এবং ন্যাশনাল ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিলের নির্দেশের দিকেও লক্ষ্য রাখা হয়। ন্যাশনাল ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল (এন. ডি. সি.) 1952 সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রী কাউন্সিলের চেয়ারম্যান। অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে আছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীগণ ও প্ল্যানিং কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান। এন. ডি. সির কাজকর্ম প্রধানত:

(1) পরিকল্পনা রচনা সম্পর্কিত প্রস্তাবসমূহ বিবেচনা করা।

(2) পরিকল্পনার কাজকর্ম পর্যালোচনা করা।

(3) জাতীয় উন্নয়নকে প্রভাবিত করতে পারে এরূপ গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক নীতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা।

(4) পরিকল্পনা যাতে উদ্দেশ্যসাধনে সমর্থ হয় ও লক্ষ্যে পৌছাতে পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ করা।

প্ল্যানিং কমিশন প্রারম্ভে একটি ড্রাফট মেমোরেণ্ডাম প্রস্তুত করে। ড্রাফটি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা কর্তৃক বিবেচিত হওয়ার পর ন্যাশনাল ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিলের কাছে তাদের মন্তব্যের জন্য পাঠানো হয়। বিভিন্ন প্রস্তাব ও মন্তব্যের ভিত্তিতে পরিকল্পনার খসড়া বা ড্রাফট প্ল্যান রচিত হয়। ড্রাফট প্ল্যান রচনা কালে কমিশনের চেয়ারম্যান বা ডেপুটি চেয়ারম্যান প্রধান প্রধান

রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেন। মন্তব্যের জন্য ড্রাফট প্ল্যানটিকে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়, রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায়ও পাঠিয়ে দেয়া হয়। পরে তা ন্যাশনাল ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিলের কাছে তাদের বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়। এন. ডি. সির অনুমোদনের পর একে জনমতের জন্য প্রকাশ ও প্রচার করা হয়। ড্রাফট প্ল্যানটিকে সংসদের উভয় কক্ষের আলোচনার জন্যও পাঠানো হয়।

এর পাশাপাশি কমিশন ও সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয় রাজ্য পরিকল্পনাগুলির চূড়ান্ত রূপ দেয়ার জন্য বিশেষজ্ঞ ও রাজনৈতিক স্তরে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যায়। রাজ্যের অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহের সম্ভাবনা ও তার বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিনিয়োগের পরিমাণ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির উপরই সাধারণত আলাপ-আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকে। এর পরিসমাপ্তি ঘটে কমিশন ও মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকের পর। কমিশন ও রাজ্যগুলির মধ্যে চূড়ান্ত পর্যায় যে সব বিষয় নির্ধারিত হয় তা পরিকল্পনার আয়তন ও বিন্যাস, প্রধান প্রধান লক্ষ্য ও কর্মসূচী, কেন্দ্র কর্তৃক রাজ্যগুলিকে আর্থিক সাহায্য দেয়ার পরিমাণ এবং পরিকল্পনার জন্য যে সম্পদ বিনিয়োগ করা হবে তাতে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের অংশ ও কর্মসূচীতে অগ্রাধিকার।

রাজ্যগুলির সঙ্গে চূড়ান্ত বোঝাপড়া ও ড্রাফট প্ল্যান সম্পর্কে বিভিন্ন মন্তব্য এবং ওয়ার্কিং গ্রুপ্স ও এক্সপার্ট প্যানেলগুলির সুপারিশের ভিত্তিতে কমিশন আবার এক নতুন মেমোরেণ্ডাম রচনা করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ও ন্যাশনাল ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিলের কাছে তা পেশ করে। এ মেমোরেণ্ডামে পরিকল্পনার প্রধান প্রধান বিষয়গুলি একসঙ্গে করে নেয়া হয়। তাছাড়া পরিকল্পনায় যেসব নীতির উপর গুরুত্ব দেয়া হবে ও যেসব বিষয় সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করা প্রয়োজন হতে পারে তার উপর জোর দেয়া হয়। মেমোরেণ্ডামটিকে, ন্যাশনাল ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিলের মন্তব্য সহ, আবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয় ও রাজ্য সরকারগুলির কাছে তাদের মন্তব্যের জন্য পাঠানো হয়। তারপর আবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ও ন্যাশনাল ডেভেলপমেণ্টের কাছে তাদের চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়। ন্যাশনাল ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিলের অনুমোদন পাবার পর পরিকল্পনাটিকে প্রকাশ করে সংসদের

আলোচনা ও অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়। সংসদ তা অনুমোদন করে পরিকল্পনার রূপায়ণের ছাড়পত্র দেয়।

উপসংহার

এভাবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দীর্ঘ প্রায় তিন বছর প্রস্তুতির পর পরবর্তী পরিকল্পনা চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে। তবে পরিকল্পনা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া কি, তাদের বক্তব্যই বা কি, কেনই বা তারা পরিকল্পনা রূপায়ণে উৎসাহের সঙ্গে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে না এসব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন পরিকল্পনা রচনার কোন স্তরেই গভীরভাবে আলোচিত হয় না। সম্ভবত এ কারণেই 'পরিকল্পনা' সম্পর্কে উৎসাহ বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ ও আমলা স্তরে সীমিত থেকে যায়। গণতান্ত্রিক পরিকল্পনা হলেও জনগণের সাড়া এতে পাওয়া যায় না।

এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস কমিশন, 1968 : সুপারিশ

ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস কমিশন প্ল্যানিং কমিশন সম্পর্কে নিম্নলিখিত সুপারিশ করেছে।

(i) কমিশনের দায়িত্ব হবে শুধু পরিকল্পনার উদ্দেশ্য নির্ধারণ, অগ্রাধিকার নির্ধারণ, মূল লক্ষ্য নির্দিষ্টকরণ ও প্রধান প্রধান কর্মসূচীর অনুমোদন।

(ii) কমিশনের পক্ষে নিজের কোন গবেষণার কাজের দায়িত্ব সাধারণত নেয়া সঙ্গত নয়। এ ব্যাপারে সে অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী এজেন্সি-গুলিকে ব্যবহার করতে পারে।

(iii) কমিশনের পক্ষে সাধারণত কোন বিচ্ছিন্ন পরিকল্পনা, কর্মসূচী বা স্কীম নিয়ে আলোচনা করা সমীচীন হবে না।

(iv) পরিকল্পনার নীতি রূপায়ণের জন্য যেসব কমিটি নিযুক্ত হবে তাতে কমিশনের কোন উচ্চ পর্যায়ের কর্মচারীকে যোগদান করতে দেয়া সঙ্গত নয়।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা : উদ্দেশ্য

প্রথম পরিকল্পনা (1951-56)

প্ল্যানিং কমিশন 1951 সনের জুলাই মাসে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খসড়া দাখিল করে। 1952 সনের ডিসেম্বরে চূড়ান্ত আকারে তা সংসদে উত্থাপন করা হয়। অর্থাৎ, পরিকল্পনা সুরু হবার পরে পরিকল্পনা চূড়ান্ত রূপ পায়।

প্রথম পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য জনগণের জীবনযাপনের মানের উন্নতি বিধান ও তাদের জীবন অধিকতর স্বাচ্ছন্দপূর্ণ ও বৈচিত্র্যময় করে তোলা। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজন জনসম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার এবং আয়, সম্পদ ও সুযোগের ক্ষেত্রে অসমতা হ্রাস করা। ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গণতান্ত্রিক পরিকল্পনা। সুতরাং এর সাফল্য জনগণের সক্রিয় সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল। পরিকল্পনায় একথা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

উদ্দেশ্য

(i) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ফলে ভারতীয় অর্থনীতিতে যে ভারসাম্যের অভাব ঘটেছে তা দূরীকরণ।

(ii) খাদ্যসমস্যার সমাধান এবং কাঁচামালের অভাব হ্রাস করা, বিশেষত পাট ও তুলার।

(iii) মুদ্রাস্ফীতির গতি রোধ করা।

(iv) অর্থনৈতিক ভিত-কাঠামো শক্তিশালী করে তোলা।

(v) এমন উন্নয়নমূলক কর্মসূচী প্রণয়ন ও রূপায়ণ যাতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়।

(vi) সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগ নেয়া।

(vii) উন্নয়নমূলক কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় সংস্থা গঠন করা।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা (1956-61)

ভারতের লক্ষ্য, সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ-ব্যবস্থা। 1954 সনে সংসদে এ প্রস্তাব গৃহীত হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এ লক্ষ্যে পৌঁছাবার উদ্যোগ নেয়া হয়। প্রথম পরিকল্পনার উদ্দেশ্যগুলি অব্যাহত রেখে দ্বিতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য রচিত হয়।

উদ্দেশ্য

(i) জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার বার্ষিক 5 শতাংশ করা।

(ii) দ্রুত শিল্পোন্নয়ন এবং ভিত ও ভারী শিল্পের উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব স্থাপন।

(iii) কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা।

(iv) আয় ও সম্পদ বণ্টনে অসমতা হ্রাস এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার অধিকতর সুষম বণ্টনের ব্যবস্থা করা।

তৃতীয় পরিকল্পনা (1961-66)

উদ্দেশ্য

(i) জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার বার্ষিক 5 থেকে 6 শতাংশ করা।

(ii) কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং খাদ্যশস্যে স্বয়ম্ভরতা।

(iii) ভিত ও ভারী শিল্পের প্রসার সাধন যাতে আগামী 10-12 বছরে দেশের নিজস্ব সম্পদ থেকে শিল্পোন্নয়নের উপকরণ সরবরাহ করা সহজ হয়।

(iv) যতদূর সম্ভব জনসম্পদের উপযুক্ত পূর্ণ ব্যবহার ও কর্মসংস্থানের সবিশেষ প্রসার সাধন।

(v) কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ক্রমশ আরো গুণগত সুযোগ বৃদ্ধি করা এবং আয় ও সম্পদ বণ্টনে অসমতা হ্রাস করা ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার সুষম বণ্টন।

চতুর্থ পরিকল্পনা (1969-74)

তৃতীয় পরিকল্পনার পর পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ক্রমাগত তিন বছর (1966-69) বিরতি ঘটে। এর কারণ প্রধানত চীন (1962) ও পাকিস্তানের (1965) সঙ্গে যুদ্ধ, খরা (1966) এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনার ব্যর্থতা। এ সময়কালীন বার্ষিক পরিকল্পনার আশ্রয় নেয়া হয়। উদ্দেশ্য, তৃতীয় পরিকল্পনাকালে যেসব জরুরী প্রকল্প বা কর্মসূচী অসমাপ্ত ছিল অথবা যা অসমাপ্ত রাখলে প্রচুর আর্থিক ক্ষতি অনিবার্য সেসব প্রকল্প বা কর্মসূচী সমাপ্ত করা; অর্থনীতির উপর যে চাপ সৃষ্টি হয়েছে তা লাঘব করা; এবং মুদ্রাস্ফীতির পথে না গিয়ে যতদূর সম্ভব উন্নয়ন সাধন।

1967 সনের সেপ্টেম্বরে প্ল্যানিং কমিশন পুনর্গঠিত হয়। নতুন প্ল্যানিং কমিশন চতুর্থ পরিকল্পনা (1969-74) রচনা করে।

উদ্দেশ্য

(i) অর্থনৈতিক ভারসাম্য বিঘ্নিত না করে ও স্বয়ম্ভরতা নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উন্নয়নের হার বৃদ্ধি করা। বার্ষিক গড় জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার 5·5 শতাংশ নির্ধারিত হয়।

(ii) কৃষি ও সংশ্লিষ্ট শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির উপর অধিকতর গুরুত্ব দেয়া।

(iii) বার্ষিক 7 শতাংশ হারে রপ্তানি বৃদ্ধি করা যাতে বৈদেশিক

বাণিজ্যের খাতে ঘাটতি দেখা না দেয় ও দ্রুত স্বয়ম্ভরতার লক্ষ্যে পৌঁছান সম্ভব হয়।

(iv) সামাজিক ন্যায় ও সমতা স্থাপন। বৃহৎ শিল্প গৃহগুলির হাতে যাতে অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত না হয় সেজন্য অন্যান্য শিল্প গৃহগুলিকেও উৎসাহ দেয়া। বৃহৎ শিল্প গৃহগুলি যাতে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা-ভিত্তিক শিল্প স্থাপন বা প্রসারে উদ্যোগ নিতে পারে সেজন্য তাদের উপযুক্ত সুযোগসুবিধা দেয়া।

(v) আয়ের অসমতা লাঘব করা। সিদ্ধান্ত হয় রাজস্ব সম্পর্কিত পন্থা গ্রহণের মাধ্যমে ধনী শ্রেণীর আয় কিছুটা কমানো সম্ভব হলেও ভারতের মত বিশাল ও বিকাশকামী দেশের পক্ষে এ উপায়ে আয়ের অসমতা লাঘব করার সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। এ অবস্থায় শিল্প-বাণিজ্যের দ্রুত উন্নয়ন, উদ্যোগ বিকেন্দ্রীকরণ, দুর্বল শিল্প এককগুলির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি, উৎপাদনশীল কর্মক্ষেত্রের প্রসার সাধন, বিশেষত দুর্বল শ্রেণীভুক্ত মানুষদের জন্য, প্রভৃতি বিষয়ে কার্যকর কর্মসূচী গ্রহণ করা ছাড়া আয়ের অসমতা লাঘব করা সম্ভব নয়। অবশ্য সম্পদ বণ্টনের বনিয়াদ হবে ন্যায় ও সাম্য।

(vi) আঞ্চলিক অসমতা। আঞ্চলিক অসমতা হ্রাস করা প্রধানত রাজ্যগুলির শিল্প প্রসারের আঞ্চলিক নীতির উপর নির্ভরশীল। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের আঞ্চলিক প্রসার সাধনের বিষয়ও এ নীতির অন্তর্ভুক্ত হওয়া সঙ্গত। এ ব্যাপারে বিভিন্ন রাজ্যে কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির সুষম বণ্টনের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। চতুর্থ পরিকল্পনায় আঞ্চলিক অসমতা হ্রাস করার জন্য রাজ্যগুলিকে উপযুক্ত সাহায্য দান, অনুন্নত অঞ্চলে কেন্দ্রীয় প্রকল্প স্থাপন এবং জাতীয় আর্থিক সংস্থা ও অন্যান্য অনুরূপ সংস্থাগুলির নীতি ও কর্মপদ্ধতির প্রয়োজনীয় পরিবর্ধন সাধনের প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

(vii) কর্মসংস্থান। কর্মসংস্থান বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। গ্রামীণ ক্ষেত্রে শ্রম-নিবিড় স্কীমের—ক্ষুদ্র সেচ, ভূমি সংরক্ষণ, বেসরকারী গৃহনির্মাণ প্রভৃতি—মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করার কথা বলা হয়েছে। শহরাঞ্চলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের প্রসার সাধনের উপর নির্ভরশীল এবং তা প্রধানত পাবলিক সেক্টরের শিল্প, যানবাহন ও সংযোগ এবং শক্তি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও তার ফলপ্রসূতার উপর নির্ভর করে।

(viii) পঞ্চায়েত রাজ ও পরিকল্পনা। গ্রামাঞ্চলে সামাজিক ও অর্থ-

নৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে স্থানীয় পরিকল্পনায় পঞ্চায়েত রাজকে মর্যাদার সঙ্গে স্বীকার করে নিতে হবে। কালক্রমে সংযোজিত সমবায় কাঠামো গড়ে তোলার উপযোগিতার প্রসঙ্গও চতুর্থ পরিকল্পনায় উল্লেখ করা হয়েছে।

পঞ্চম পরিকল্পনা (1974-79)

পঞ্চম পরিকল্পনার খসড়া 1973 সনের জানুয়ারীতে ন্যাশনাল ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত হলেও এর চূড়ান্ত রূপ প্রকাশ স্থগিত থাকে। এর প্রধান কারণ রাজনৈতিক অস্থিরতা। 1975 সনের 26 জুন অভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়। পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনার পরিবর্তে 1974-75, 1975-76 ও 1976-77 সনের জন্য বার্ষিক পরিকল্পনা রচিত হয়। 1976 সনের সেপ্টেম্বরে পরিবর্তিত চূড়ান্ত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ন্যাশনাল ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিলের অনুমোদন লাভ করে। 1977 সনের মার্চে জনতা সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। জনতা সরকার কর্তৃক পুনর্গঠিত প্ল্যানিং কমিশন কংগ্রেস সরকার রচিত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (1974-79) বাতিল করে দিয়ে 1978-83 সনের জন্য নতুন পঞ্চম পরিকল্পনা রচনা করে।

উদ্দেশ্য

জনতা সরকারের পঞ্চম পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পূর্ববতী পরিকল্পনাগুলির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মূল উদ্দেশ্য, দারিদ্র্য দূরীকরণ ও স্বয়ন্তরতা অর্জন। উন্নয়নের হার বার্ষিক 5·5 শতাংশ রাখা হয়। 1985 সনের মধ্যে বৈদেশিক সাহায্যের মুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্ত হবার কথা ঘোষণা করা হয়।

পিপল'স প্ল্যান—II

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পাশাপাশি পিপল'স প্ল্যানের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক নয়।

জনতা ক্ষমতায় আসে 1977 সনের মার্চে। প্ল্যানিং কমিশন পুনর্গঠিত হয়। এর চেয়ারম্যান হন প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই; ডেপুটি চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডি. টি. লাকদাওয়ালা। 1944 সনে এম. এন. রায়ের নেতৃত্বে Indian Renaissance Institute-এর কর্মশালায় পিপল'সপ্ল্যান—I রচিত হয়েছিল। পিপল'স প্ল্যান—II সেই একই কর্মশালায় রচিত হয়, তবে তা

জনতার নেতৃত্বে। প্ল্যানটি একটি দশ বছর বার্ষিক পরিকল্পনা। 20 বছরের উন্নয়ন পরিকল্পনা সুমুখে রেখে এ পরিকল্পনা রচিত হয়।

ভারী ও মৌল শিল্পক্ষেত্রে এবং ভিত-কাঠামো নির্মাণে পূর্ববর্তী পরিকল্পনাগুলি মোটামুটি সাফল্য লাভ করলেও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে, জনগণের ন্যূনতম অভাব মিটাবার প্রচেষ্টায়, আয় ও সম্পদ বণ্টনে অসমতা হ্রাস করার উদ্যোগে এবং দেশের দারিদ্র্য দূর করার পরিকল্পনায় যথেষ্ট ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হয়। পিপল'স প্ল্যান—II এ ব্যর্থতা দূর করার প্রতিশ্রুতি দেয়। এ উদ্দেশ্যে কৃষি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, গ্রামীণ অর্থসংস্থান, গ্রামীণ মানুষদের নানাবিধ অভাব, বিশেষত পানীয় জল, মিটাবার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়ার কথা বলা হয়।

আগামী 20 বছরের উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য রেখে পিপল'স প্ল্যান—II-র উদ্দেশ্য হবে দেশের ক্রমবর্ধমান লোকসংখ্যার ন্যূনতম আবশ্যিক দ্রব্যের অভাব মিটানো, জনগণকে উন্নয়নমূলক কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা, অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি বণ্টন প্রথায় সামাজিক ন্যায় সুনিশ্চিত করা ও দারিদ্র্যরেখার নীচে যে 40 শতাংশ মানুষ রয়েছে তাদের দারিদ্র্যমুক্ত করা।

ঘাটতি ব্যয় সম্পর্কেও পিপল'স প্ল্যান—II-র সঙ্গে পূর্ববর্তী পরিকল্পনাগুলির পার্থক্য রয়েছে। এ পরিকল্পনায় বলা হয়, ঘাটতি ব্যয়ের সাহায্য নেয়া হবে না।

এসব উদ্দেশ্য সফল করার জন্য পিপল'স প্ল্যান—II নিম্নলিখিত কর্মসূচী গ্রহণ করে।

(i) শ্রম-নিবিড় পদ্ধতি ও গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের সহযোগিতায় জল সংরক্ষণ ও পরিচালন এবং কৃষি-পরিবেশের সংস্কার-সাধন।

(ii) জমি বণ্টন ও জমি কর্ষণ পদ্ধতির পরিবর্তন সাধন। এজন্য জমি একীকরণ, জমির উচ্চতম সীমা সম্পর্কিত আইন শক্ত হাতে কার্যকর করা ও কম্যুনিটি জমির যথোপযুক্ত ব্যবহারের প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

(iii) নিরক্ষরতা দূরীকরণ।

(iv) আবশ্যিক দ্রব্যাদি ভরতুকি দিয়ে দরিদ্র পরিবারদের মধ্যে বণ্টন।

(v) একটি উন্নয়নশীল ক্ষুদ্রায়তন ও গৃহস্থ (household) শিল্প সেক্টর গড়ে তোলা।

(vi) শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস যাতে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা হ্রাস পায়।

(vii) শিক্ষা ও প্রচারের মারফত জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী রূপায়ণ।

বিনিয়োগ ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে যে কৃষি ও কৃষি-ভিত্তিক এবং কুটির শিল্প উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ তৈরি করার ক্ষেত্রে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দিতে হবে। এর পর অগ্রাধিকার দেয়া হবে সেসব শিল্পক্ষেত্রে যেসব ক্ষেত্রে কৃষি ও অ-কৃষি উভয়ের প্রয়োজনীয় প্রাথমিক দ্রব্যাদি তৈরি সম্ভব হবে। পিপল'স প্ল্যান—II-এর মতে ভারতের বর্তমান অর্থনৈতিক সঙ্কটের মূল কারণ অতীতে ভারী শিল্প ও মূলধন দ্রব্য উৎপাদন ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সম্পদ বিনিয়োগ ও পাশাপাশি কৃষি ও সাধারণ মানুষের আবশ্যিক দ্রব্যাদি উৎপাদনের উপর গুরুত্ব না দেয়া। পিপল'স প্ল্যান—II এ কাঠামোতে ভারসাম্য সমস্যা দূর করতে উৎসাহী।

1980 সনের জানুয়ারীতে কংগ্রেস (ই) ক্ষমতায় আসাতে রাজনৈতিক পটভূমি আবার পরিবর্তিত হয়। নতুন পরিপ্রেক্ষিতে ষষ্ঠ পরিকল্পনা রূপ নেয়।

ষষ্ঠ পরিকল্পনা (1980-85)

উদ্দেশ্য

(i) উন্নয়নের হার বৃদ্ধি করা। জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার বার্ষিক গড়ে 5·2 শতাংশ ধরা হয়। এ প্রসঙ্গে সম্পদ ব্যবহারে দক্ষতা ও উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির কথাও বলা হয়।

(ii) আধুনিকীকরণ; যাতে উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যায় ভারত স্বয়ম্ভর হয়ে উঠতে পারে।

(iii) স্বয়ম্ভরতা; যাতে ভারতকে আর বিদেশের সাহায্যের উপর নির্ভর করতে না হয়।

(iv) দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও অর্ধবেকারত্বের দ্রুত অবসান। গ্রামীণ ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব দেয়া হয়।

(v) সামাজিক ন্যায় ও সাম্য প্রতিষ্ঠা।

(vi) মিনিমাম নিডস প্রোগ্রামকে অগ্রাধিকার দেয়া যাতে উন্নয়ন প্রক্রিয়া শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে এবং জনসাধারণ তাদের দৈনন্দিন অভাব-অনটন মিটাতে সক্ষম হয়।

(vii) আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস।

(viii) দেশীয় শক্তির (এনার্জি) দ্রুত উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও ব্যবহারে উৎকর্ষ সাধন।

(ix) স্বেচ্ছামূলক জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নীতি গ্রহণ।

(x) স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন উন্নয়নের লক্ষ্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন।

(xi) উন্নয়নমূলক কাজে সর্বস্তরের মানুষকে সক্রিয় অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল্যায়ন

প্রথম পরিকল্পনা (1951-56)

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পরিকল্পিত অর্থনীতির পথের সূচনা বলা যেতে পারে। পরিকল্পনাটির চূড়ান্ত রূপ সংসদে উত্থাপিত হয় 1952 সনের ডিসেম্বরে। অর্থাৎ, পরিকল্পনা মাফিক কাজ শুরু হওয়ার সুদীর্ঘ 20 মাস পরে। পরিকল্পনাটির খসড়াও তৈরি হয়েছিল পরিকল্পনার কার্যকাল শুরু হওয়ার তিন মাস পরে।

প্রথম পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার পায় কৃষি ও কম্যুনিটি উন্নয়ন (15%), বৃহৎ ও মধ্য সেচ (16%) এবং শক্তি প্রকল্প (13%)। অন্যভাবে, কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ মোট বিনিয়োগের 44%। যানবাহন ও সংযোগ এবং সমাজসেবার অংশ যথাক্রমে 27% ও 23%। শিল্প ও খনি উন্নয়নের উপর অতিসামান্য গুরুত্ব দেয়া হয় (4%)। গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রাধান্য মাত্র 2%।

পাবলিক সেক্টরে বিনিয়োগের জন্য বরাদ্দ হয়েছিল 2356 কোটি টাকা। ব্যয়ের পরিমাণ মাত্র 1960 কোটি টাকা।

প্রথম পরিকল্পনা সাফল্যের দাবি করতে পারে। জাতীয় আয় 18% বৃদ্ধি পায়। জাতীর আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যের পরিমাণ ছিল 12%। জনপ্রতি আয় বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় 11%; জনপ্রতি ভোগ বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় 8% ও বিনিয়োগের হার প্রায় 2·3%। খাদ্যশস্যের উৎপাদন 1950-51 সনের 54 মিলিয়ন এমটি* থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 1955-56 সনে 65·8 মিলিয়ন এমটি হয়।

* এমটি বলতে মেট্রিকটন ধরা হয়েছে।

তুলা, পাট, ইক্ষু ও চা উৎপাদনেও উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটে। কৃষি উৎপাদনের বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় 17%। তবে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। পরিকল্পনার শুরুতে বেকারের সংখ্যা ছিল 50 লক্ষ ও নতুন কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা প্রায় 90 লক্ষ। কিন্তু প্রথম পরিকল্পনায় মাত্র 45 লক্ষ বেকারের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা (1956-61)

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ভিত মহলানবীশ মডেল। এ পরিকল্পনায় শিল্প ও খনিজ ক্ষেত্রকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। শিল্প ও খনিতে বিনিয়োগের পরিমাণ মোট বিনিয়োগের 20 শতাংশ ধরা হয়। পরিবহন ও সংযোগ এবং সমাজ-সেবার জন্য ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ যথাক্রমে 28 শতাংশ ও 18 শতাংশ। শিল্পের প্রতি এরূপ আগ্রহের কারণ দেশকে দ্রুত ভারী ও মৌল শিল্পে উন্নত করে তোলা, গড়ে তোলা সোভিয়েত ইউনিয়নের অনুসারী রূপে শক্ত শিল্প ভিত। এর ফলে ভবিষ্যতে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, উৎপাদন বহুমুখী হবে, সার্বিক উন্নতি তরান্বিত হবে। ফলে অবশ্য সমূহ মুদ্রাস্ফীতি ঘটবে, এবং ভোগ্যদ্রব্যের অভাবের কারণে কিছু সমস্যা দেখা দেবে। ভোগ্যদ্রব্যের উপর চাপ ও বেকারত্ব কিছুটা লাঘব করার জন্য গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার ও উন্নয়নের জন্য 200 কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়।

প্রথম পরিকল্পনায় চিত্রটি ছিল এর বিপরীত। প্রথম পরিকল্পনায় প্রাধান্য পেয়েছিল 'কৃষি ও সেচ' ; দ্বিতীয় পরিকল্পনায় 'শিল্প ও পরিবহন'। দ্বিতীয় পরিকল্পনা অবশ্য দ্রুত উন্নয়নের পথিকৃৎ। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় পাবলিক সেক্টরে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল 4600 কোটি টাকা ; বরাদ্দের পরিমাণ 4800 কোটি টাকা। প্রাইভেট সেক্টরে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল 2150 কোটি টাকা ; বরাদ্দের পরিমাণ 2400 কোটি টাকা।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্প ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটে। লৌহ আকরিক ও এলুমিনিয়ামের উৎপাদন 150 শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ইস্পাত পিণ্ড, ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি ও শক্তি সরবরাহের ক্ষমতা বৃদ্ধির পরিমাণ যথাক্রমে 100%, 500% 68%। দুর্গাপুর, ভিলাই ও রাউরকেলায় একটি করে নতুন ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হয়। কৃষি উৎপাদন প্রায় 16 শতাংশ বৃদ্ধি পায়। জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার 4 শতাংশ ; লক্ষ্য ছিল 5 শতাংশ।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালীন যেসব সমস্যার সৃষ্টি হয় তার মধ্যে প্রধান

(vii) আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস।

(viii) দেশীয় শক্তির (এনার্জি) দ্রুত উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও ব্যবহারে উৎকর্ষ সাধন।

(ix) স্বেচ্ছামূলক জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নীতি গ্রহণ।

(x) স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন উন্নয়নের লক্ষ্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন।

(xi) উন্নয়নমূলক কাজে সর্বস্তরের মানুষকে সক্রিয় অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল্যায়ন

প্রথম পরিকল্পনা (1951-56)

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পরিকল্পিত অর্থনীতির পথের সূচনা বলা যেতে পারে। পরিকল্পনাটির চূড়ান্ত রূপ সংসদে উত্থাপিত হয় 1952 সনের ডিসেম্বরে। অর্থাৎ, পরিকল্পনা মাফিক কাজ শুরু হওয়ার সুদীর্ঘ 20 মাস পরে। পরিকল্পনাটির খসড়াও তৈরি হয়েছিল পরিকল্পনার কার্যকাল শুরু হওয়ার তিন মাস পরে।

প্রথম পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার পায় কৃষি ও কম্যুনিটি উন্নয়ন (15%), বৃহৎ ও মধ্য সেচ (16%) এবং শক্তি প্রকল্প (13%)। অন্যভাবে, কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ মোট বিনিয়োগের 44%। যানবাহন ও সংযোগ এবং সমাজসেবার অংশ যথাক্রমে 27% ও 23%। শিল্প ও খনি উন্নয়নের উপর অতিসামান্য গুরুত্ব দেয়া হয় (4%)। গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রাধান্য মাত্র 2%।

পাবলিক সেক্টরে বিনিয়োগের জন্য বরাদ্দ হয়েছিল 2356 কোটি টাকা। ব্যয়ের পরিমাণ মাত্র 1960 কোটি টাকা।

প্রথম পরিকল্পনা সাফল্যের দাবি করতে পারে। জাতীয় আয় 18% বৃদ্ধি পায়। জাতীর আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যের পরিমাণ ছিল 12%। জনপ্রতি আয় বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় 11%; জনপ্রতি ভোগ বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় 8% ও বিনিয়োগের হার প্রায় 2·3%। খাদ্যশস্যের উৎপাদন 1950-51 সনের 54 মিলিয়ন এমটি* থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 1955-56 সনে 65·8 মিলিয়ন এমটি হয়।

* এমটি বলতে মেট্রিকটন ধরা হয়েছে।

তুলা, পাট, ইক্ষু ও চা উৎপাদনেও উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটে। কৃষি উৎপাদনের বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় 17%। তবে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। পরিকল্পনার শুরুতে বেকারের সংখ্যা ছিল 50 লক্ষ ও নতুন কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা প্রায় 90 লক্ষ। কিন্তু প্রথম পরিকল্পনায় মাত্র 45 লক্ষ বেকারের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা (1956-61)

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ভিত মহলানবীশ মডেল। এ পরিকল্পনায় শিল্প ও খনিজ ক্ষেত্রকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। শিল্প ও খনিতে বিনিয়োগের পরিমাণ মোট বিনিয়োগের 20 শতাংশ ধরা হয়। পরিবহন ও সংযোগ এবং সমাজ-সেবার জন্য ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ যথাক্রমে 28 শতাংশ ও 18 শতাংশ। শিল্পের প্রতি এরূপ আগ্রহের কারণ দেশকে দ্রুত ভারী ও মৌল শিল্পে উন্নত করে তোলা, গড়ে তোলা সোভিয়েত ইউনিয়নের অনুসারী রূপে শক্ত শিল্প ভিত। এর ফলে ভবিষ্যতে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, উৎপাদন বহুমুখী হবে, সার্বিক উন্নতি তরান্বিত হবে। ফলে অবশ্য সমূহ মুদ্রাস্ফীতি ঘটবে, এবং ভোগ্যদ্রব্যের অভাবের কারণে কিছু সমস্যা দেখা দেবে। ভোগ্যদ্রব্যের উপর চাপ ও বেকারত্ব কিছুটা লাঘব করার জন্য গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার ও উন্নয়নের জন্য 200 কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়।

প্রথম পরিকল্পনায় চিত্রটি ছিল এর বিপরীত। প্রথম পরিকল্পনায় প্রাধান্য পেয়েছিল 'কৃষি ও সেচ' ; দ্বিতীয় পরিকল্পনায় 'শিল্প ও পরিবহন'। দ্বিতীয় পরিকল্পনা অবশ্য দ্রুত উন্নয়নের পথিকৃৎ। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় পাবলিক সেক্টরে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল 4600 কোটি টাকা ; বরাদ্দের পরিমাণ 4800 কোটি টাকা। প্রাইভেট সেক্টরে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল 2150 কোটি টাকা ; বরাদ্দের পরিমাণ 2400 কোটি টাকা।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্প ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটে। লৌহ আকরিক ও এলুমিনিয়ামের উৎপাদন 150 শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ইস্পাত পিণ্ড, ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি ও শক্তি সরবরাহের ক্ষমতা বৃদ্ধির পরিমাণ যথাক্রমে 100%, 500% 68%। দুর্গাপুর, ভিলাই ও রাউরকেলায় একটি করে নতুন ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হয়। কৃষি উৎপাদন প্রায় 16 শতাংশ বৃদ্ধি পায়। জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার 4 শতাংশ ; লক্ষ্য ছিল 5 শতাংশ।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালীন যেসব সমস্যার সৃষ্টি হয় তার মধ্যে প্রধান

মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব, ভোগ্যদ্রব্যের অভাব, বৈদেশিক বিনিময়ে অবনতি এবং সম্পদ ও আয় বণ্টনে অসমতা বৃদ্ধি। দ্বিতীয় পরিকল্পনা শেষে বেকারের সংখ্যা দাঁড়ায় 90 লক্ষ। জাতীয় উৎপাদন লক্ষ্যস্তরে পৌছাতে ব্যর্থ হয়। এর অন্যতম কারণ মূলধন উৎপাদনের অনুপাত যেখানে ধরা হয়েছিল 2·3 : 1 বাস্তবে সে অনুপাত হয়ে দাঁড়ায় 3·86 : 1 ; জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ধরা হয়েছিল 1·5 শতাংশ, বৃদ্ধির হার হয় 2·2 শতাংশ। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে দামস্তর 35 শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

তৃতীয় পরিকল্পনা (1961-66)

তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষি ও শিল্পের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়। এ সময়কালীন স্বয়ম্ভরতা ও পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনার (পারস্পেকটিভ প্ল্যানিং) ধারণা দেখা দেয়। 15 বছর মেয়াদী পরিকল্পনার (1961-76) প্রক্ষেপণ রচিত হয়। অবশ্য দ্বিতীয় পরিকল্পনায়ও অনুরূপ প্রক্ষেপণ করা হয়েছিল। এটিকে তার সংশোধিত রূপ বলা যেতে পারে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় পাবলিক সেক্টরে সম্পদ বণ্টনের চিত্রটি এরূপ : কৃষি, সেচ ও শক্তি 36 শতাংশ, গ্রাম ও ক্ষুদ্রশিল্প 4 শতাংশ, শিল্প ও খনি 20 শতাংশ, পরিবহন ও সংযোগ 20 শতাংশ, সমাজসেবা ও বিবিধ 20 শতাংশ।

পাবলিক সেক্টরে ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হয়েছিল 7500 কোটি টাকা ; ব্যয় হয় 8577 কোটি টাকা। এ ব্যয়ের 28·2 শতাংশ সংগৃহীত হয় বৈদেশিক সাহায্যের মারফত, 58·6 শতাংশ বাজেট সূত্র থেকে ও বাকী 13·2 শতাংশ ঘাটতি ব্যয় দ্বারা পূরণ করা হয়। ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ প্রস্তাবিত 550 কোটি টাকার পরিবর্তে 1133 কোটি টাকা দাঁড়ায়। প্রাইভেট সেক্টরে বিনিয়োগের পরিমাণ 4100 কোটি টাকা।

ভারত-চীন যুদ্ধ (1962), ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ (1965) ও পরপর দু'বছর (1964-65, 1965-66) খরা তৃতীয় পরিকল্পনার অসাফল্যের প্রধান কারণ-গুলির মধ্যে অন্যতম। এ পরিকল্পনাকালীন জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার ধরা হয়েছিল বার্ষিক 5 শতাংশ। বর্ষ অনুযায়ী জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার যথাক্রমে 2·5%, 1·7%, 4·9%, 7·6% ও −4·2%। খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্য ছিল 100 মিলিয়ন এমটি। 1964-65 সনে সর্বোচ্চ পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদন হয়, পরিমাণ 89 মিলিয়ন এমটি। 1965-66 সনে এর পরিমাণ ছিল 72·3 মিলিয়ন

এমটি। শিল্প ক্ষেত্রেও ব্যর্থতা দেখা দেয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইস্পাত শিল্পের উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল 9·2 মিলিয়ন এমটি ; উৎপাদনের পরিমাণ মাত্র 6·5 মিলিয়ন এমটি। সম্পদ ও আয় বণ্টনে অসমতা হ্রাস পায়নি। জাতীয় আয়ে 1 শতাংশ পরিবারের অংশ ছিল 10 শতাংশ। দাম বৃদ্ধিও অব্যাহত থাকে। জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার 3·4 শতাংশ, লক্ষ্য ছিল 5 শতাংশ। শিল্প উৎপাদনের বৃদ্ধির হার ধরা হয়েছিল বার্ষিক গড়ে 11 শতাংশ, বৃদ্ধির হার 7-8 শতাংশ। 1965-66 সনে ব্যালেন্স অব ট্রেডে ঘাটতির পরিমাণ 525 কোটি টাকা।

চতুর্থ পরিকল্পনা (1966-71)

যুদ্ধ, খরা, মুদ্রাস্ফীতি, টাকার মূল্য হ্রাস (জুন 6, 1966) প্রভৃতি কারণে অর্থনীতি বিধ্বস্ত হয়ে পড়ায় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা স্থগিত রেখে তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনার আশ্রয় নেয়া হয়। বার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য উন্নয়ন নয় ; জরুরী অসমাপ্ত প্রকল্পগুলির কাজ সমাপ্ত করা।

তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনায় 6756 কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়। বার্ষিক পরিকল্পনাকে দুভাগে ভাগ করা হয়ঃ কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ও রাজ্য পরিকল্পনা। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার দায়িত্বে থাকে শিল্প, পরিবহন ও সংযোগ ক্ষেত্রের গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলি। রাজ্য পরিকল্পনার দায়িত্বে রাখা হয় কৃষি, সেচ ও শক্তি। রাজ্যগুলি নিজেরাই নিজেদের সম্পদ সংগ্রহ করবে, কেন্দ্র তাদের ঋণ ও গ্র্যান্টস দিয়ে সাহায্য করবে। [বার্ষিক পরিকল্পনায় ব্যয় বণ্টনের পরিমাণ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখান হল]।

1967-68 সনে 'সবুজ বিপ্লব' সুরু হওয়ার ফলে খাদ্যশস্য উৎপাদনে উন্নতি দেখা দেয়। জাতীয় আয় 1967-68 সনে প্রকৃত দামে 8·9 শতাংশ বৃদ্ধি পায়। 1965-66 সনে জাতীয় আয় 4·2 শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। 1966-67 সনে পাইকারী দাম সূচক 16 শতাংশ বৃদ্ধি পায় ; 1967-68 সনে বৃদ্ধির পরিমাণ 11 শতাংশ। 1967-68 সনে ভোগকারীদের দাম সূচক 213 শতাংশ বৃদ্ধি পায়। শিল্প উৎপাদন 1966-67 ও 1967-68 সনে যথাক্রমে 0·2 শতাংশ ও 0·5 শতাংশ হ্রাস পায়। 1968-69 সনে অবস্থার উন্নতি ঘটে। উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ 6·2 শতাংশ।

চতুর্থ পরিকল্পনা (1969-74)

1967 সনের সেপ্টেম্বরে প্ল্যানিং কমিশন পুনর্গঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রী

বার্ষিক পরিকল্পনার ব্যয় বণ্টন

(কোটি টাকা)

বিষয়	প্রথম বার্ষিক পরিকল্পনা (1966-67)	দ্বিতীয় বার্ষিক পরিকল্পনা (1967-68)	তৃতীয় বার্ষিক পরিকল্পনা (1968-69)	মোট
1. কৃষি, কম্যুনিটি উন্নয়ন ও সমবায়	334 (15·6)	314 (15·0)	319 (13·4)	967 (14·6)
2. সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ	150 (6·9)	145 (7·0)	176 (7·4)	471 (7·1)
3. শক্তি	404 (18·7)	396 (19·0)	413 (17·4)	1213 (18·3)
4. সংগঠিত শিল্প	514 (23·7)	471 (22·6)	526 (22·1)	1511 (22·8)
5. গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্প	43 (2·0)	42 (2·0)	41 (1·7)	126 (1·9)
6. যানবাহন ও সংযোগ	424 (19·6)	398 (19·1)	400 (16·1)	1222 (18·4)
7. সমাজসেবা ও বিবিধ	296 (13·5)	319 (15·3)	361 (15·2)	976 (14·7)
8. খাদ্যশস্যের মজুত ভাণ্ডার (বাফার স্টক)	—	—	140 (5·9)	140 (2·1)
মোট	2165 (100)	2085 (100)	2376 (100)	6626 (100)

দ্রষ্টব্য : বন্ধনী দেয়া সংখ্যা মোট ব্যয়ের শতাংশ।

ইন্দিরা গান্ধী এর চেয়ারম্যান হন। ডেপুটি চেয়ারম্যান হন ডি. আর. গ্যাডগিল। পরিকল্পনায় নতুন কৃষি রণকৌশল স্থান পায়। শিল্প সম্পর্কে ইণ্ডিকেটিভ প্ল্যানিং টেকনিক গৃহীত হয় এবং শিল্পের উৎপাদনের লক্ষ্য সম্বন্ধে নমনীয় নীতি গ্রহণ করা হয়।

পরিকল্পনায় কৃষি ও সেচ ক্ষেত্রে মোট বিনিয়োগের 23·9 শতাংশ ব্যয়

বরাদ্দ হয়। শিল্প ও খনি এবং পরিবহন ও সংযোগ ক্ষেত্রে বরাদ্দের পরিমাণ যথাক্রমে 21 শতাংশ ও 20·3 শতাংশ। মোট বিনিয়োগের পরিমাণ 24,882 কোটি টাকা। পাবলিক সেক্টর ও প্রাইভেট সেক্টরে বিনিয়োগের পরিমাণ যথাক্রমে 15,902 কোটি টাকা ও 8980 কোটি টাকা। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পাবলিক সেক্টরে ব্যয়ের পরিমাণ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনায় যথাক্রমে 1960 কোটি টাকা, 4600 কোটি টাকা ও 8557 কোটি টাকা।

চতুর্থ পরিকল্পনায় জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার ধরা হয়েছিল 5·7 শতাংশ; বৃদ্ধির হার দাঁড়ায় 3 শতাংশ। রপ্তানি ক্ষেত্রের সাফল্য উল্লেখ্য। রপ্তানির হার ধরা হয়েছিল 7শতাংশ; বৃদ্ধির হার 13·6 শতাংশ। শিল্প ক্ষেত্রে সাফল্যের অভাব লক্ষণীয়। শিল্প উন্নয়নের হার ধরা হয়েছিল বার্ষিক 8 থেকে 12 শতাংশ; প্রকৃত উন্নয়নের হার প্রায় 4 শতাংশ। দামস্তর বৃদ্ধি পায়। 1973-74 সনে পাইকারী দাম (1961-62 = 100) 22·7 শতাংশ বৃদ্ধি পায়। 1969-70 ও 1972-73 সনে এ বৃদ্ধির পরিমাণ যথাক্রমে 3·7 শতাংশ ও 9·5 শতাংশ। ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় 1203 কোটি টাকা; ধরা হয়েছিল 850 কোটি টাকা। 1971 সনের আগস্ট থেকে 1973 সনের আগস্ট পর্যন্ত টাকা সরবরাহ বৃদ্ধি রেকর্ড সৃষ্টি করে; বৃদ্ধির পরিমাণ 32-33 শতাংশ। 1971-72 সনে পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) মুক্তিযুদ্ধ ও পাকিস্তানের ভারত আক্রমণ আমাদের দেশের অর্থনৈতিক সঙ্কট বৃদ্ধি করতে যথেষ্ট সাহায্য করে।

পরিকল্পনার প্রথম ২০ বছরের কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত আলোচনা
(প্রথম পরিকল্পনা থেকে চতুর্থ পরিকল্পনা পর্যন্ত)

পরিকল্পনার প্রথম 20 বছরের কার্যক্রমের পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার বার্ষিক গড়ে 3·6 শতাংশ। জনপ্রতি আয় বৃদ্ধির হার বার্ষিক গড়ে 1·5 শতাংশ। সঞ্চয় আয় অনুপাত 5·7 শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 10·1 শতাংশ হয়। 1963-64 সনে এ বৃদ্ধির হার সর্বোচ্চ, 12 শতাংশ। বিনিয়োগ আয় অনুপাতও দ্বিগুণ হয়, 5·6 শতাংশ থেকে 11·1 শতাংশ। 1963-64 সনে এর অনুপাত সর্বাধিক, 14·9 শতাংশ। কৃষি ও শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধির বার্ষিক গড় হার যথাক্রমে 3·2 শতাংশ ও 6·4 শতাংশ। আমদানি পরিবর্ত (import substitution) নীতি বেশ কিছুটা সাফল্য

লাভ করে। নীট বিনিয়োগে আমদানিকৃত মূলধন দ্রব্যের অনুপাত 30 শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে 16 শতাংশ হয়। মৌল শিল্প ও মূলধন দ্রব্য ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ বার্ষিক গড়ে যথাক্রমে 8-9 শতাংশ ও 10-11 শতাংশ। পরিবহন ও সংযোগ ক্ষেত্রে স্বয়ম্ভরতা লক্ষ্য করা যায়।

অপর দিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার 1961 সনে 2·1 শতাংশ, 1971 সনে 2·5 শতাংশ। জনসাধারণের দারিদ্র্যের মাত্রা সঙ্কটজনক অবস্থায় এসে পৌছায়। 1971-72 সনে পূর্ণ বেকারের সংখ্যা 2 কোটি 90 লক্ষেরও বেশি। দান্দেকার ও রথ (Dandekar and Rath)-এর বিশ্লেষণে প্রকাশ 1968-69 সন থেকে 1980-81 সন পর্যন্ত (বারো বছর) জাতীয় আয় যদি 53 শতাংশ বৃদ্ধি পায় তাহলে আশঙ্কা করা যায় গ্রামীণ জনসংখ্যার 35 শতাংশ ও শহরাঞ্চলের জনসংখ্যার প্রায় 50 শতাংশ, অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার প্রায় 38 শতাংশ, দারিদ্র্য-রেখার নিচে বসবাস করবে। অন্য কথায়, ভারতে পরিকল্পনা ও দারিদ্র্যের দ্বন্দ্বমূলক সহাবস্থান।

পঞ্চম পরিকল্পনা (1974-79)

1974 সনের সুরুতে প্ল্যানিং কমিশন পঞ্চম পরিকল্পনার খসড়া প্রকাশ করে। মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ধরা হয় 53,250 কোটি টাকা। 1976 সনের শেষাশেষি পরিবর্তিত পঞ্চম পরিকল্পনা ন্যাশনাল ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল দ্বারা অনুমোদিত হয়। মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ধরা হয় 69,303 কোটি টাকা। এর মধ্যে পাবলিক সেক্টর ও প্রাইভেট সেক্টরের অংশ যথাক্রমে 42,303 কোটি টাকা (ইনভেনটরি বাবদ 3,000 কোটি টাকা সহ) ও 27,000 কোটি টাকা।

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতার দরুন পঞ্চম পরিকল্পনা (1974-79) বাস্তবের স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হয়। পরিবর্তে তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনা (1974-75, 1975-76 ও 1976-77) রচিত হয়। 1975 সনের 25 জুন অভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা ঘোষিত হয় এবং পরের মাসে (1975, জুলাই) প্রধানমন্ত্রীর 20-দফা অর্থনৈতিক কর্মসূচীকে শক্তিশালী ও রূপায়িত করা লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। এ কর্মসূচীর লক্ষ্য দারিদ্র্য দূরীকরণ ও স্বয়ম্ভরতা অর্জন। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উৎপাদন কাঠামোর পুনর্বিন্যাসের উদ্যোগ নেয়া হয় যাতে বিনিয়োগ, রপ্তানি এবং সরকার ও বেসরকারের ভোগ্যদ্রব্যের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয়। সরকারী বণ্টন ব্যবস্থা কার্যকর

করে তোলার উপরও গুরুত্ব দেয়া হয় যাতে দুর্বলশ্রেণী ও ছাত্রসমাজ উপকৃত হতে পারে।

রাজনৈতিক পটভূমি দ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকে। 1977 সনের মার্চে জনতা সরকার কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্ল্যানিং কমিশন পুনর্গঠিত হয়। 1977-78 সনের জন্য বার্ষিক পরিকল্পনা রচিত হয়। পুনর্গঠিত প্ল্যানিং কমিশন গান্ধীজীর নির্দেশিত পথে অর্থনীতি ও সমাজকে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে কর্মসূচী গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়। ঘোষণা করা হয় কৃষিকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে, গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নতিসাধন করতে হবে, কাজের অধিকার দিতে হবে, স্বয়ম্ভরতা অর্জনের জন্য দেশীয় প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্য নিতে হবে, ও সাধারণ মানুষের আবশ্যিক দ্রব্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে গুরুত্ব দিতে হবে। 1977-78 সনের জন্য কেন্দ্র, রাজ্য ও ইউনিয়ন টেরিটোরিগুলির মোট ব্যয়ের পরিমাণ বরাদ্দ হয় 9,960 কোটি টাকা। পরিকল্পনার মোট বিনিয়োগে কৃষি ও সংশ্লিষ্ট খাতে 30·04 শতাংশ ব্যয় বরাদ্দ হয়। খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্য 128 মিলিয়ন এমটি করা হয়। 1975-76 সনে এ লক্ষ্যের পরিমাণ ছিল 121 মিলিয়ন এমটি।

1978-79 সনের বার্ষিক পরিকল্পনায় কেন্দ্র, রাজ্য ও ইউনিয়ন টেরিটোরিগুলির ক্ষেত্রে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ 11,649 কোটি টাকা। ঘাটতি দেখানো হয় 1050 কোটি টাকা। এ সময় জনতা সরকার স্বর্ণ বিক্রয় নীতি ঘোষণা করে। উদ্দেশ্য সোনার চোরা কারবার রোধ করা ও সোনা বিক্রয় করে বাজেটের ঘাটতি মেটানো। বলা বাহুল্য, উভয় উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয় এবং জনতা সরকারের ভুল ধারণাপ্রসূত নীতির ফলে কোটি কোটি টাকার মূল্যের সোনা দেশের বাইরে চলে যায়।

1979-80 সনের বার্ষিক পরিকল্পনার মুখবন্ধে প্ল্যানিং কমিশন স্বীকার করে, মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাচ্ছে, পরিকল্পনা বহির্ভূত ও অ-উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে ; ফলে উন্নয়নমূলক কাজে বিনিয়োগ ব্যাহত হচ্ছে, পাবলিক সেক্টরের আয় হ্রাস পাচ্ছে এবং জ্বালানি ও গৃহ নির্মাণের উপকরণের অভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে। 1979-80 সনের বার্ষিক পরিকল্পনার জন্য 12,467·63 কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ হয়। এর মধ্যে গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য বরাদ্দের পরিমাণ 40·1 শতাংশ। কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য বেশ কিছু সংখ্যক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। যথা, ইনটিগ্রেটেড রুরাল ডেভেলপমেণ্ট প্রোগ্রাম,

স্মল ফার্মাস ডেভেলপমেণ্ট এজেন্সি প্রোগ্রাম, ড্রাউট প্রোণ এরিয়াস ডেভেলপমেণ্ট প্রোগ্রাম, অপারেশন ফ্লাড ফর ডেয়ারী ফার্মিং, এগ্রিকাল-চারেল এক্সটেনসন এণ্ড ট্রেনিং প্রোগ্রাম প্রভৃতি।

পরিকল্পনাটি মুখ্যত গ্রামীণ উন্নয়নমুখী হওয়ার ফলে অর্থনীতি ক্ষেত্রে সামগ্রিক ভারসাম্যের অভাব ঘটে। তাছাড়া এর ফলে গ্রামীণ ধনী সম্প্রদায় বিশেষ লাভবান হয়। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির (কেরোসিন, জ্বালানি, তেল, বনস্পতি, বিড়ি, তামাক প্রভৃতি) দাম বৃদ্ধির ফলে সাধারণ লোকের আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটে।

ষষ্ঠ পরিকল্পনা (1980-85)

ষষ্ঠ পরিকল্পনার প্রাক্কালে ভারতের অর্থনীতির রূপ সংক্ষেপে এরূপ ঃ 1950-51 সন থেকে 1978-79 সন পর্যন্ত জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার 3·5%, জনপ্রতি আয় বৃদ্ধির হার 1·3%, জনপ্রতি ভোগ বৃদ্ধির হার 1·1%, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির হার 2·7%, শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধির হার 6·1%। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে উৎপাদনের লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব হয়নি। যথা, ইস্পাত, কয়লা, খাদ্যশস্য ও সিমেণ্ট। মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধির বার্ষিক গড় হার ছিল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় 6%, তৃতীয় পরিকল্পনায় 7·2%, চতুর্থ পরিকল্পনায় 9% ও পঞ্চম পরিকল্পনায় 6·6%। এ সময়কালীন জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে 4%, 2·6%, 3·5% ও 3·8%। 1980 সনে পূর্ণ-বেকার ও অর্ধ-বেকারের মোট সংখ্যা 4 কোটি 32 লক্ষ। 1971 সনে এদের মোট সংখ্যা ছিল 1 কোটি 87 লক্ষ। বহির্বাণিজ্যের সমস্যা উল্লেখযোগ্য। 1979-80 সনে ব্যালেন্স অব পেমেণ্টস-এ ঘাটতির পরিমাণ 2370 কোটি টাকা। 1984-85 সনে অনুমিত ঘাটতির পরিমাণ 3972 কোটি টাকা (রপ্তানি 9878 কোটি টাকা, আমদানি 13850 কোটি টাকা)।

ষষ্ঠ পরিকল্পনায় মোট বিনিয়োগের পরিমাণ 172210 কোটি টাকা। এর মধ্যে পাবলিক সেক্টরে বিনিয়োগের পরিমাণ 97500 কোটি টাকা*, প্রাইভেট সেক্টরে 74710 কোটি টাকা। পাবলিক সেক্টরের প্রয়োজনে বিদেশের সাহায্যের পরিমাণ ধরা হয়েছে 9929 কোটি টাকা। ঘাটতি ব্যয় অনুমিত 5000 কোটি টাকা। 1979-80 সনের শেষাশষি ফরিণ এক্সচেঞ্জ রিজার্ভের

* পাবলিক সেক্টরে বিনিয়োগের পরিমাণ 110000 কোটি টাকা দাঁড়াবে বলে অর্থমন্ত্রী 1985-86 কেন্দ্রীয় বাজেটে বক্তব্য রাখেন।

পরিমাণ 5164 কোটি টাকা (স্বর্ণ ও এস-ডি-আর ছাড়া)। এ রিজার্ভ থেকে 1000 কোটি টাকা ষষ্ঠ পরিকল্পনায় ব্যয় করা হবে বলে ধরা হয়।

ষষ্ঠ পরিকল্পনায় উন্নয়নের হার ধরা হয়েছে 5·2 শতাংশ। উন্নয়ন ব্যাপারে শক্তির উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে (26535 কোটি টাকা)। এর পর প্রাধান্য পেয়েছে শিল্প ও খনিজ (15017) কোটি টাকা। সেচ ও বন্যা এবং কৃষিক্ষেত্রে ব্যয়ের পরিমাণ যথাক্রমে 12160 কোটি টাকা ও 5363 কোটি টাকা। পরিবহন, রেলপথ ও সড়ক খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হয়েছে 12412 কোটি টাকা এবং সামাজসেবা খাতে 14035 কোটি টাকা (শিক্ষা খাতে 2524 কোটি টাকা এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ খাতে 2831 কোটি টাকা)।

ষষ্ঠ পরিকল্পনার মধ্যবর্তীকালের মূল্যায়নে প্রকাশ 1979-80 সনের খরার ফলে খাদ্যশস্য উৎপাদন 16·8 শতাংশ হ্রাস পায়। সে বছর স্থূল দেশজ উৎপাদনের হ্রাসের পরিমাণ প্রায় 5 শতাংশ। ফলে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের অবনতি ঘটে ; ষষ্ঠ পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ সংগ্রহ ব্যাহত হয়।

1980-81 সনে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। জিডিপি 7·9 শতাংশ বৃদ্ধি পায়। 1981-82 সনে এ বৃদ্ধির পরিমাণ 5·2 শতাংশ। 1982-83 সনে খরা, বন্যা ও ঘূর্ণিবায়ুতে উৎপাদন দারুণ ব্যাহত হয়। উন্নয়নের হার 2 শতাংশেরও কম হয়। উন্নয়নের হার 5·2 শতাংশ নির্দিষ্ট হয়েছিল। প্রথম তিন বছর উন্নয়নের হার ছিল 5·0 শতাংশ।

ম্যানুফ্যাকচারিং, নির্মাণ, খনি ও সংযোগ ক্ষেত্রে উন্নয়ন আশানুরূপ নয়। অশোধিত তেল ও পেট্রোলিয়ামের উৎপাদনের পরিমাণ বার্ষিক প্রায় 17 শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা ছিল গড়ে 13 শতাংশ। বিদ্যুৎ সরবরাহ ক্ষেত্রে উন্নয়নের হারে অবনতি দেখা যায়। 1981-82 সনে এক্ষেত্রে উন্নয়নের হার ছিল 10%, 1982-83 সনে 7%। 1983-84 সনে খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ 142 মিলিয়ন টন। এটি একটি নতুন রেকর্ড।

প্রথম দু'বছর দেশজ সঞ্চয় বৃদ্ধির হার চলতি দামে প্রায় 18·7 শতাংশ। প্রথম তিন বছর রপ্তানি বৃদ্ধির হার চলতি দামে 7·6 শতাংশ। 1979-80 সনের দামের ভিত্তিতে এ বৃদ্ধির হার বার্ষিক গড়ে মাত্র 1·4 শতাংশ। আমদানি বৃদ্ধির হার চলতি দামে ও 1979-80 সনের দামের ভিত্তিতে যথাক্রমে 14·6 শতাংশ ও 4·5 শতাংশ। প্রথম তিন বছর পাইকারী দাম

হ্রাস পরিলক্ষিত হয়। 1980-81 সনে পাইকারী দাম বৃদ্ধির পরিমাণ 18·2 শতাংশ, 1982-83 সনে এ দাম বৃদ্ধির পরিমাণ মাত্র 2·5 শতাংশ।

1979-80 সনে মোট জনসংখ্যার 51·1 শতাংশ বা প্রায় 33 কোটি 90 লক্ষ লোক দারিদ্র্য-রেখার নীচে ছিল। 1981-82 সনে এর পরিমাণ ছিল 41·5 শতাংশ বা মোট জনসংখ্যার প্রায় 28 কোটি 20 লক্ষ। পরিকল্পনার প্রথম দু'বছরে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যের 34 শতাংশে পৌছানো সম্ভব হয়েছে বলে অনুমিত হয়।

উপসংহার

আমাদের দেশে পরিকল্পিত অর্থনীতির ইতিহাস সুদীর্ঘ প্রায় তেত্রিশ বছর। এ ইতিহাস সবদিক দিয়েই বিচিত্র। প্রথম পরিকল্পনা সুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরিবেশিত ও দ্বিখণ্ডিত ভারতের অজস্র বিরূপ সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের মধ্যে। মুদ্রাস্ফীতি ও খাদ্যসঙ্কট ছিল প্রধানতম সমস্যা। এ সঙ্কট থেকে দেশকে মুক্ত করে সঠিক পথে ভারতের অর্থনীতি ও সমাজকে চালনা করার উদ্দেশ্য সুমুখে রেখে প্রথম পরিকল্পনা রচিত হয়। এরই সঙ্গে সুরু হয় পরিকল্পনার মডেলের বিবিধ অনুশীলন। প্রথম পরিকল্পনার রচয়িতাগণ হ্যারল্ড-ডোমার মডেলের অনুসারী হয়ে পরিকল্পনা রচনা করেন।

প্রথম পরিকল্পনা সাফল্যের কৃতিত্ব দাবি করতে পারে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার রচয়িতাগণ সোভিয়েত মডেলের অনুসারী হয়ে যে পরিকল্পনা রচনা করেন তা সমাজতান্ত্রিক আশাআকাঙ্ক্ষার দিক থেকে যতই সম্ভাবনাপূর্ণ হোক না কেন তা ছিল মূলত ভারতের মাটি, মানুষ ও মানবতার সঙ্গে সম্পর্কবিহীন, সুতরাং ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়। এরপর সুরু হয় ভারী ও মৌল শিল্প গড়ে তোলার পাশাপাশি কৃষি ভিত স্থাপন এবং সহসা ন্যায় ও সাম্য প্রতিষ্ঠার উগ্র প্রচেষ্টা। ফলে ক্রমে মূলধন শিল্পের উন্নয়ন উপেক্ষিত হতে থাকে। অপরদিকে অগ্রাধিকার পেতে থাকে দুর্বল শ্রেণীদের জন্য প্রয়োজনীয় হাল্কা ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্প; পাশে থাকে কৃষি উন্নয়নের প্রচেষ্টা। ভিতকাঠামোর (পরিবহন, সেচ, শক্তি প্রভৃতি) গুরুত্ব উপেক্ষিত না হলেও অগ্রাধিকারের প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে। বর্তমানে পরিকল্পনার ধ্বনি : উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায়, স্বয়ম্ভরতা।

বাস্তব রূপটি হচ্ছে, ভারতীয় অবস্থা ও সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা উপেক্ষা করে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অস্থির পরিবেশের মধ্যে কখনবা মডেল অনুসারী, কখনবা স্বয়ম্ভরতার আত্মম্ভরী, কখনবা সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য দুর্বল শ্রেণী বা সমাজতন্ত্র প্রীতি, কখনবা আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা ও আধুনিক শিল্প প্রশিক্ষণের নামে মালটিন্যাশনাল কর্পোরেশনের আশ্রয় গ্রহণ, কখনবা আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থাগুলির উপর একান্ত নির্ভরশীলতা। তাছাড়া রয়েছে খরা, বন্যা, অন্তঃযুদ্ধ, বহিঃযুদ্ধ, ক্ষমতা বদল ও গণতন্ত্রের উল্লম্ফন। সব মিলেমিশে মিশ্র অর্থনীতির উপর দাঁড়ানো ভারতীয় পরিকল্পিত অর্থনীতির মূলে আঘাত হানতে সুরু করে এবং ক্রমে এ আঘাত চরম হয়ে উঠতে থাকে। বলতে গেলে, তৃতীয় পরিকল্পনার পর থেকে ষষ্ঠ পরিকল্পনার সুরু পর্যন্ত ভারতীয় পরিকল্পিত অর্থনীতির ইতিহাস পরিকল্পিত অর্থনৈতিক নৈরাজ্যের ইতিহাস।

একথা ঠিক নয় যে, পরিকল্পনার ফলে ভারতের শিল্প, পরিবহন, কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতি ঘটেনি বা তাদের কাঠামোতে পরিবর্তন সাধিত হয়নি। নিঃসন্দেহে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে ভারত আজ উন্নতিশীল দেশগুলির পুরোভাগে। ভারতই একমাত্র উন্নতিশীল দেশ যার পশ্চিমী গণতান্ত্রিক কাঠামো শত বিপর্যয়েও ভেঙে পড়েনি।

তবে এও ঠিক যে ভারত বর্তমানে দরিদ্রতম ও সমস্যাসঙ্কুল দেশগুলির একটি। আজকের ভারতের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ঃ জনসংখ্যা (1982) 71 কোটি 70 লক্ষ* ; জনসংখ্যা বৃদ্ধির বার্ষিক গড় হার (1970-82) 2·3 শতাংশ; জনপ্রতি জিএনপি 260 ডলার; জিএনপি-র বার্ষিক গড় বৃদ্ধির হার (1960-82) 1·3 শতাংশ; বার্ষিক গড় মুদ্রাস্ফীতির হার (1970-82) 8·4 শতাংশ; কৃষির বার্ষিক গড় বৃদ্ধির হার (1970-82) 1·8 শতাংশ, শিল্পের 1970-82) 4·3 শতাংশ, ম্যানুফ্যাকচারিং-এর (1970-82) 4·5 শতাংশ, ও সেবার (1970-82) 5·5 শতাংশ; স্থূল দেশজ উৎপাদনে (1982) কৃষির ভাগ 33 শতাংশ, শিল্পের 26 শতাংশ, ম্যানুফ্যাকচারিং-এর 16 শতাংশ, ও সেবার 41 শতাংশ; স্থূল দেশজ বিনিয়োগের বার্ষিক গড় হার (1970-82)

---

* ভারতের মোট জনসংখ্যা 1983 সনে 733,248,000। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (1973-82) 2.3 শতাংশ। জনপ্রতি জিএনপি বৃদ্ধির হার (1973-82) 1·8 শতাংশ।

সূত্রঃ দ্য ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক এটলাস 1985।

5·3 শতাংশ ; খাদ্য উৎপাদনের জনপ্রতি গড় সূচক (1969-71 = 100) (1980-82) 101 ; কৃষি, শিল্প, ও সেবাতে (1980) শ্রমশক্তির পরিমাণ যথাক্রমে 71 শতাংশ, 13 শতাংশ, ও 16 শতাংশ ; শ্রমশক্তির বার্ষিক গড় বৃদ্ধি হার (1970-82) 2·1 শতাংশ ; প্রতি 3690 জনের জন্য একজন চিকিৎসক ; দৈনিক জনপ্রতি ক্যালোরি সরবরাহ প্রয়োজনের তুলনায় 86 শতাংশ ; এবং 10 শতাংশ পরিবার ভোগ করে থাকে গৃহস্থ আয়ের 36 শতাংশ (1975-76)। বেকারত্ব, দারিদ্র্য ও শিক্ষার অভাবের দিকটি নিম্নরূপ :

এমপ্লোয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ সূত্রে, বেকারের সংখ্যা : 1951 সনে 329 হাজার, 1961 সনে 1,833 হাজার, 1971 সনে 5,100 হাজার, 1981 সনে 16,584 হাজার, 1983 সনে 21,953 হাজার এবং 1984 সনের জুলাইতে 23195 হাজার। খাদ্যদ্রব্যের পাইকারী দাম সূচক (1970-71 = 100) 1972 সনে 107·9, 1982 সনে 244·4, 1984 সনের মে-তে 327·5 এবং 1984 সনের জুলাইতে (অনুমিত) 333·6। দেশের দশটি মানুষের মধ্যে চারটি মানুষ খেতে-পরতে পায় না ; প্রতি দশ জনের মধ্যে তিন জন মাত্র পানীয় জলের সুযোগ পায়। 231000 গ্রামে (1980) মোটেও পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। 2 কোটি 87 লক্ষ লোক বস্তিতে বাস করে (43 লক্ষ বোম্বে, 30 লক্ষ কলকাতা, 18 লক্ষ দিল্লি ও প্রায় 14 লক্ষ মাদ্রাজে)। দেশে গৃহহীনের সংখ্যা 23 লক্ষ 38 হাজার (1981 সেনসাস)। এদের মধ্যে 17 লক্ষ 20 হাজার বসবাস করে শহরাঞ্চলে ও 6 লক্ষ 18 হাজার গ্রামাঞ্চলে। প্রতি একশ ছেলে মেয়েদের (6-11 বয়স) মধ্যে 21 ছেলেমেয়ে প্রাথমিক শিক্ষাটুকু থেকেও বঞ্চিত (1981)। 20-24 বয়স গোষ্ঠীর (1981) 8 শতাংশ মাত্র উচ্চশিক্ষার জন্য ভর্তি হয়েছিল। সংক্ষেপে, চক্রটি এরূপ : পরিকল্পনা, অধিকতর দারিদ্র্য, অধিকতর বেকারত্ব, অধিকতর অসমতা, পরিকল্পনা।

এ দুষ্টচক্র থেকে মুক্তি পেতে হলে প্রয়োজন নতুন ভাবনা-চিন্তা, নতুন আদর্শ, নতুন কাঠামোতে পরিকল্পনা, নতুন মানুষ সৃষ্টি ; কিন্তু এ মৌলিক দিক আজও উপেক্ষিত।

মূল্যায়ন : ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক

ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের 1984 সনের বার্ষিক রিপোর্টে ভারতের সাম্প্রতিক অর্থ-নৈতিক অবস্থা সম্পর্কে যে প্রতিবেদন রাখা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে 1984 সনে ভারত 1983 সনের খরাজনিত আর্থিক বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে

পেরেছে। চলতি বছর স্থূল দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) বৃদ্ধির হার 7 শতাংশের বেশি হবে বলে আশা করা যায়। 1982-83 ও 1983-84 সনে এ বৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে 2·6 ও 5·9 শতাংশ। খাদ্যশস্য উৎপাদন ক্ষেত্রেও উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। 1983-84 সনে খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ 128 মিলিয়ন এমটি। 1984-85 সনে খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় 150 মিলিয়ন এমটি হবে বলে অনুমান করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে কৃষি ও শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ যথাক্রমে 9 শতাংশ ও 5·5 শতাংশ হবে বলে অনুমিত হয়। শিল্প উৎপাদন ব্যাহত হবার কারণ শিল্পদ্রব্যের চাহিদার অবনতি, ক্রমাগত বিদ্যুৎ ও অন্যান্য আবশ্যিক উপকরণের অভাব।

মুদ্রাস্ফীতি আবার সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাইকারী দাম সূচক অনুযায়ী 1984 সনের এপ্রিল পর্যন্ত মুদ্রাস্ফীতির বার্ষিক হার 8·8 শতাংশ। পাইকারী দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির প্রধান কারণ কৃষি ও কৃষি-ভিত্তিক দ্রব্যাদির দাম বৃদ্ধি। এসব দ্রব্যের এরূপ দাম বৃদ্ধির কারণ প্রধানত 1982 সনের খরাজনিত উৎপাদন হ্রাস।

আহার্য তেল ও সার উৎপাদন বৃদ্ধি পাবার ফলে এ দুটো অতি-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য পরদেশের উপর আর বিশেষ নির্ভর করতে হচ্ছে না। 1983-84 সনের দামের অঙ্কে লোহা ও ইস্পাত এবং অপরিশোধিত তেল ও পেট্রোলিয়াম জাত দ্রব্যাদির আমদানি প্রায় এক-চতুর্থাংশ হ্রাস পেয়েছে। মূল্যের দিক দিয়ে মোট আমদানি বিশেষ বৃদ্ধি পায়নি। রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে, বিশেষত বস্ত্র, ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদি, হস্তশিল্পজাত দ্রব্যাদি ও মণিমুক্তার। ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যে উন্নতি ঘটেছে।

ষষ্ঠ পরিকল্পনার ফলাফল সম্পর্কিত মধ্যবর্তীকালীন প্রতিবেদন সম্পর্কে ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, পরিকল্পনার প্রথম চার বছর উন্নয়নের বার্ষিক গড় হার 5·5 শতাংশ ; লক্ষ্য ছিল 5·2 শতাংশ। কৃষি ও শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধির বার্ষিক গড় হার যথাক্রমে 5·1 শতাংশ ও 5·5 শতাংশ। বিদ্যুৎ, সেচ, রেল পরিবহন প্রভৃতি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে পরিকল্পনাতে যে ব্যয় বরাদ্দ হয়েছিল তা অপেক্ষা অনেক কম ব্যয় করা হয়েছে এবং পরিমাণ-গতের দিক থেকেও লক্ষ্যস্তরে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি।

ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের অভিমত, অর্থনীতি ক্ষেত্রে কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস অনেক ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করলেও এখনও অনেক সামঞ্জস্য সাধনের প্রয়োজন

রয়েছে। বিদ্যুৎ, কয়লাখনি, রেল পরিবহন ও সার ক্ষেত্রে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি ও উন্নতমানের পরিচালনার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া সত্বর প্রয়োজন। শক্তির (এনার্জি) জন্য বিদেশের উপর নির্ভরশীলতা আরো হ্রাস পাওয়া বাঞ্ছনীয়। শিল্প ক্ষেত্রে উন্নয়নের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। শিল্প, আমদানি ও দাম ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ শিথিল করাকে ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক স্বাগত জানিয়েছে। পাবলিক সেক্টরের ব্যর্থতা এবং এর ফলে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার বৃদ্ধি যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে চলেছে তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক বর্তমানে যে সম্পদ পাওয়া যাচ্ছে তার আরো কার্যকর ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বৈদেশিক মূলধন সম্পর্কে বলা হয়েছে যে যদিও ভারত 1983-84 সনে মোট বিনিয়োগের 7·5 শতাংশের জন্য বৈদেশিক মূলধনের শরণাপন্ন হয়েছিল তবু একথা স্মরণ রাখা দরকার যে ভারতের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ অত্যধিক যার ফলে জাতীয় উন্নয়নের প্রচেষ্টা ব্যাহত হচ্ছে।

20 দফা অর্থনৈতিক কর্মসূচী

1975 সনের 1 জুলাই প্রধানমন্ত্রী একটি জাতীয় 20 দফা অর্থনৈতিক কর্মসূচী প্রকাশ করেন। সামাজিক ন্যায় ও 'গরীবী হটাও' কর্মপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পাশাপাশি পরিকল্পনার মূল নীতিকে জরুরী অবস্থার ভিত্তিতে দ্রুত রূপায়ণের এটি একটি অভিনব প্রচেষ্টা।

এ প্রচেষ্টা অসমাপ্ত থেকে যায়। কারণ রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। জনতা সরকার গঠিত হয়। 1977-79 সন পর্যন্ত জনতা সরকার ক্ষমতায় থাকে। 1980 সনের জানুয়ারীতে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস (ই) সরকার আবার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। 1982 সনের 14 জানুয়ারী নতুন 20 দফা অর্থনৈতিক কর্মসূচী ঘোষিত হয়।

20 দফা, যথা:

(1) সেচের উন্নয়ন সাধনের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করা ও শুষ্ক কৃষি জমির চাষের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের ব্যবস্থা করা।

(2) ডাল ও উদ্ভিজ্জ তৈলবীজের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিশেষ চেষ্টা করা।

(3) সংযোজিত গ্রামীণ উন্নয়ন ও জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান কর্মসূচীকে শক্তিশালী করে তোলা ও উভয়ের কর্মক্ষেত্রের প্রসার সাধন।

(4) কৃষি জমির উচ্চতম সীমা বিধি কঠোরভাবে কার্যকর করা ও উদ্বৃত্ত জমির বণ্টন।

(4) কৃষি শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরী দেয়া।

(6) দায়বদ্ধ শ্রমিকদের মুক্ত করা ও তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

(7) তপশীলী জাতি ও তপশীলী উপজাতিদের উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে অবিলম্বে কর্মসূচী গ্রহণ করা।

(8) যেসব গ্রামে পানীয় জলের অভাব সেসব গ্রামে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

(9) বাসগৃহ নির্মাণের জন্য গ্রামীণ পরিবারদের জমি ও আর্থিক সাহায্য দেয়া।

(10) বস্তি অঞ্চলে দুর্বল শ্রেণীর জন্য বাসগৃহ নির্মাণের স্কীমের উন্নতি সাধন এবং অযৌক্তিকভাবে জমির দাম বৃদ্ধিকরণ রোধ করা।

(11) যতদূর সম্ভব গ্রামে শক্তি সরবরাহ ও গ্রামগুলিকে বিদ্যুৎশক্তি-যুক্ত করা।

(12) বৃক্ষ রোপন এবং বায়োগ্যাস ও অন্যান্য শক্তির উৎসগুলির উন্নতি সাধন।

(13) গণআন্দোলনের সাহায্যে স্বেচ্ছামূলক পরিবার পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত করে তোলা।

(14) সর্বজনীন প্রাথমিক আরোগ্য নিকেতনগুলির উন্নতি সাধন এবং কুষ্ট, যক্ষা ও অন্ধত্ব নিয়ন্ত্রণ করা।

(15) স্ত্রীলোক ও শিশুদের জন্য কল্যাণমূলক কর্মসূচী দ্রুত রূপায়ণ করা। অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের জন্য পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্যাদি পরিবেশনের উদ্দেশ্যে কর্মসূচী গ্রহণ করা এবং প্রসূতি ও তার নবজাত সন্তানের সেবাযত্নের ব্যবস্থা করা। এ ব্যাপারে উপজাতি, পাহাড়ী ও অনুন্নত অঞ্চলকে অগ্রাধিকার দেয়া।

(16) 6 থেকে 14 বছরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার সাধন। নারী-শিক্ষার উপর অধিকতর গুরুত্ব দেয়া এবং বয়স্কদের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য ছাত্র ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির সহযোগিতা কামনা করা।

(17) সরকারী বণ্টন ব্যবস্থার প্রসার সাধন, অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে

ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তক ও খাতাপত্র সরবরাহ এবং ভোগকারীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সুসংগঠিত আন্দোলন গড়ে তোলা।

(18) বিনিয়োগ পদ্ধতি সহজ করা ও শিল্পনীতি সামঞ্জস্যপূর্ণ করা যাতে প্রকল্পগুলির কাজ যথাসময় সম্পন্ন হতে পারে। তাছাড়া হস্তশিল্প, হস্তচালিত তাঁত এবং ক্ষুদ্র ও গ্রাম শিল্পের প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়ন সাধনের জন্য সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(19) চোরাকারবারী, মজুতদার ও কর ফাঁকিদারদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার কাজ চালিয়ে যাওয়া এবং কালো টাকার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা।

(20) পাবলিক সেক্টরভুক্ত উদ্যোগগুলির কাজকর্মের উন্নতি সাধন করা।

ফলাফল

1983 সনের নভেম্বরে প্ল্যানিং কমিশন নতুন 20 দফা কর্মসূচীর কাজ-কর্মের পর্যালোচনা করে যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছে তাতে দেখা যায় দুটো দফা ছাড়া বাকী আঠারোটি দফা দারুণ অসাফল্যের পরিচয় দিয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে 20 শতাংশ সাফল্য লাভ করাও সম্ভব হয়নি। আলোচ্য বছরের এপ্রিল থেকে নভেম্বরের মধ্যে 2 কোটি 88 লক্ষ দায়বদ্ধ শ্রমিককে উদ্ধার করার কথা ছিল, কিন্তু উদ্ধারের সংখ্যা মাত্র 77 লক্ষ 50 হাজার বা 26·9 শতাংশ। দুর্বল শ্রেণীদের জন্য বাসগৃহ নির্মাণ সম্পর্কে দেখা যায় এ সময়কালীন 400500 গৃহ নির্মাণের কথা ছিল, নির্মিত হয়েছে মাত্র 55000 বা 13·6 শতাংশ। দুর্বল শ্রেণীদের গৃহ নির্মাণের জন্য আর্থিক সাহায্য দেয়ার ক্ষেত্রেও ব্যর্থতা.দেখা যায়। 556000 গৃহ নির্মাণের জন্য সাহায্য দেয়ার পরিবর্তে মাত্র 161000 বা 29 শতাংশ ক্ষেত্রে সাহায্য দেয়া হয়েছে। বাসগৃহ নির্মাণের জন্য জমি বণ্টনের ক্ষেত্রেও ব্যর্থতা দেখা যায়। 874000 গৃহ নির্মাণের জন্য জমি বণ্টন করা নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু এর মধ্যে 637000 বা 71·7 শতাংশ গৃহ নির্মাণের জন্য জমি বণ্টন করা হয়েছে। 1983 সনের এপ্রিল-নভেম্বরের মধ্যে 23631 গ্রামে বিদ্যুতের সুবিধা দেয়ার মধ্যে মাত্র 6491 বা 27·5 শতাংশ এর সুবিধা পেয়েছে। নির্বীর্যকরণের লক্ষ্য ধার্য করা হয়েছিল 58 লক্ষ 1 হাজার; নির্বীর্য করা হয়েছে 19 লক্ষ 50 হাজার ব্যক্তিকে, অর্থাৎ 33·6 শতাংশ।

যেসব ক্ষেত্রে 50 শতাংশ লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে সংযোজিত গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসংস্থান, উদ্বৃত্ত জমি বণ্টন, তপশীলী জাতি ও উপজাতিদের সাহায্য দান, বস্তিবাসীদের সাহায্য দান ও পাম্পসেটে শক্তি সরবরাহ। পানীয় জল সরবরাহ ও স্বাস্থ্য সাব-কেন্দ্র গঠনের কাজে 50 শতাংশের বেশি লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব হয়েছে। বৃক্ষ রোপন ক্ষেত্রে 100 শতাংশের বেশি সাফল্য লাভ করা সম্ভব হয়েছে। বৃক্ষ রোপনের লক্ষ্য ছিল 2·25 বিলিয়ন, রোপিত বৃক্ষের সংখ্যা 2·26 বিলিয়ন।

উপসংহার

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পাশাপাশি 20 দফা কর্মসূচী চালু করার কোন প্রয়োজন আছে কিনা, এ প্রশ্ন অযৌক্তিক নয়। এর ফলে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সামগ্রিকতার ও সামগ্রিক সাফল্যের গুরুত্ব হ্রাস পাবার আশঙ্কা উপেক্ষা করা যায় না। বস্তুত 20 দফা কর্মসূচীর সাফল্য চলতি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কর্মসূচী ও তা রূপায়ণের সাফল্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। 20 দফা কর্মসূচীর অসাফল্যের অন্যতম কারণ এ বাস্তবতাকে উপেক্ষা করা।

পরিশিষ্ট

পরিকল্পনার মডেল

প্রথম পরিকল্পনা হ্যারোড়-ডোমার মডেলের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়। ডোমারের মডেলটি নিম্নরূপ।

I মোট মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ; σ উৎপাদন মূলধন অনুপাত (অর্থাৎ, এক একক মূলধন বিনিয়োগে উৎপাদনের পরিমাণ)। $I\sigma$ হচ্ছে সমাজের সম্ভবনীয় উৎপাদন ক্ষমতা বা মোট সরবরাহ বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

যদি অতিরিক্ত মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ ΔI হয় ও প্রান্তিক সঞ্চয়ের প্রবণতা (mps) α; অর্থাৎ, গুণক (Multiplier) $= \frac{1}{\alpha}$ তাহলে অতিরিক্ত বিনিয়োগের ফলে আয় বৃদ্ধির পরিমাণ বা মোট চাহিদা বৃদ্ধি, $\Delta Y = \frac{\Delta I}{\alpha}$ [Y = আয়]। স্থিতিপূর্ণ উন্নয়নের জন্য আয় ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির হার সমান হওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ, উৎপাদনের চাহিদা $\left(\frac{\Delta I}{\alpha}\right)$ ও উৎপাদনের যোগানকে (σI) সমান হতেই হবে। মৌল সমীকরণটি হবে

$$\frac{\Delta I}{\alpha} = \sigma I$$

$$\text{অথবা, } \frac{\Delta I}{I} = \alpha\sigma$$

প্রথম পরিকল্পনায় (1950-51) বিনিয়োগের হার জাতীয় আয়ের 5 শতাংশ ধরা হয়। উৎপাদনের হার ধরা হয় 3:1 বা 33·3 শতাংশ। প্রান্তিক সঞ্চয়ের প্রবণতার (mps) উচ্চতম সীমা ধরা হয় 0·20 বা 20 শতাংশ। পরবর্তী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য প্রান্তিক সঞ্চয়ের প্রবণতা ধরা হয় 0·50 বা 50 শতাংশ। এ ধারণার ভিত্তিতে প্রথম পরিকল্পনার শেষাশেষি বিনিয়োগের হার 5 শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 7 শতাংশ হবে বলে অনুমান করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষাশেষি বিনিয়োগের হার 11 শতাংশ ও 1967-68 সনের মধ্যে তা প্রায় 20 শতাংশ দাঁড়াবে। জন-সংখ্যা বৃদ্ধির হার বার্ষিক গড়ে 1·25 শতাংশ হলে প্রস্তাবিত প্রান্তিক সঞ্চয়ের

হার জনপ্রতি ভোগের পরিমাণ হ্রাস করবে না, বরঞ্চ ক্রমশ ভোগ বৃদ্ধির সুযোগ ঘটবে। ভোগের পরিমাণ 1950-51 সনের তুলনায় 1977 সনের মধ্যে দ্বিগুণ হবে। প্রথম পরিকল্পনায় সম্ভাব্য বার্ষিক গড় আয় বৃদ্ধির হার প্রায় 3 শতাংশ। পরবর্তী কালে আয়ে সঞ্চয়ের অনুপাত বৃদ্ধি পেতে থাকার ফলে জাতীয় আয়ের হার বৃদ্ধি পেতে থাকবে। পরে তা বার্ষিক গড়ে 5 থেকে 6 শতাংশ বৃদ্ধিতে স্থিতিলাভ করবে।

মহলানবীশ মডেল

দ্বিতীয় পরিকল্পনা মহলানবীশ মডেলের উপর রচিত বলা যায়। অধ্যাপক পি. সি. মহলানবীশ ছিলেন প্ল্যানিং কমিশনের অন্যতম সদস্য। তিনি দ্বিতীয় পরিকল্পনার জন্য একটি চার সেক্টর বিশিষ্ট ইকোনোমেট্রিক মডেল রচনা করেন। সে সময় দেশের অনুমিত সম্পদের পরিমাণ 5,600 কোটি টাকা ধরা হয়েছিল। নতুন কর্মসংস্থানের সংখ্যা ধরা হয়েছিল 1 কোটি থেকে 1 কোটি 20 লক্ষ। জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার ধরা হয়েছিল বার্ষিক 5 শতাংশ। যে চারটি সেক্টরে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রকে ভাগ করা হয়েছিল সেগুলি হচ্ছেঃ (1) বিনিয়োগ দ্রব্য সেক্টর (K), (2) কারখানায় প্রস্তুত ভোগ্যদ্রব্য সেক্টর (C_1), (3) ক্ষুদ্র একক উৎপাদন সেক্টর বা কৃষি সহ গৃহস্থ (household) শিল্প সেক্টর (C_2) ও (4) সেবা (স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি) উৎপাদক সেক্টর (C_3)।

প্রত্যেকটি সেক্টরের জন্য তিনি তিন প্রস্ত parameter-এর আশ্রয় নেন। যথা,

উৎপাদন মূলধন অনুপাত (অর্থাৎ, বিনিয়োগের দরুন নীট আয় বৃদ্ধির অনুপাত)

$$\beta'_s : \beta_k, \beta_1, \beta_2, \beta_3$$

মূলধন শ্রমিক অনুপাত (অর্থাৎ, শ্রমিক প্রতি নীট বিনিয়োগ)

$$\theta'_s : \theta_k, \theta_1, \theta_2, \theta_3$$

বণ্টন অনুপাত (অর্থাৎ, প্রতি সেক্টরের জন্য বন্টিত বিনিয়োগের অনুপাত)

$$\lambda'_s : \lambda_k, \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$$

I = পরিকল্পনার পাঁচ বছরে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ

Y = মোট আয় বৃদ্ধির পরিমাণ

N = কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পরিমাণ

এর ফলে আমরা নিম্নলিখিত সমীকরণ পাই।

(1) $Y = Y_k + Y_1 + Y_2 + Y_3$

(2) $N = N_k + N_1 + N_2 + N_3$

(3) $I = \lambda_k I + \lambda_1 I + \lambda_2 I + \lambda_3 I$

(4) $N_k = \lambda_k I/\theta_k$

(5) $N_1 = \lambda_1 I/\theta_1$

(6) $N_2 = \lambda_2 I/\theta_2$

(7) $N_3 = \lambda_3 I/\theta_3$

(8) $Y_k = \lambda_k I\beta_k$

(9) $Y_1 = \lambda_1 I\beta_1$

(10) $Y_2 = \lambda_2 I\beta_2$

(11) $Y_3 = \lambda_3 I\beta_3$

β's θ's প্রযুক্তিবিদ্যা দ্বারা নির্ধারিত কাঠামোগত parameters, সুতরাং দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালীন তাদের কোন পরিবর্তন ঘটবে না ধরে নেয়া যেতে পারে।

মূল্য ধরা হয়েছে :

$I = 5600$ কোটি টাকা

$N = 1$ কোটি 10 লক্ষ

$Y = 5$ শতাংশ

$\beta_k = 0.20$

$\beta_1 = 0{\cdot}35$

$\beta_2 = 1{\cdot}25$

$\beta_3 = 0{\cdot}45$

$\theta_k = 20{,}000$ টাকা

$\theta_1 = 8{,}750$ টাকা

$\theta_2 = 2{,}500$ টাকা

$\theta_3 = 3{,}750$ টাকা

$\lambda_k = \frac{1}{3}$

মূল্য বসিয়ে ও সহসমীকরণগুলি (Simultaneous equations) সমাধান করে নিম্নলিখিত ফল পাওয়া যায়।

বিনিয়োগের পরিমাণ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি

সেক্টর	বিনিয়োগ (I) (কোটি টাকা)	আয় (Y) (কোটি টাকা)	কর্মসংস্থান (N) (কোটি)
K	1,850	370	0·9
C_1	980	340	1·1
C_2	1,180	1,470	4·7
C_3	1,600	720	4·3

দ্রষ্টব্য : $\lambda_K = 0.33$; K সেক্টরে বিনিয়োগ $= 0.33 \times 5600$ টাকা $= 1850$ কোটি টাকা (প্রায়)।
আয় বৃদ্ধি : $\lambda_K\ I\beta_K = 1850$ টাকা $\times\ 0{\cdot}20 = 370$ কোটি টাকা।
কর্মসংস্থান বৃদ্ধি : $\lambda_K\ I/\theta_K = 1850/20000 = 0{\cdot}9$ কোটি (প্রায়)।

মহলানবীশ মডেল বিনিয়োগের জন্য যে সম্পদ পাওয়া যেতে পারে তা বিভিন্ন সেক্টরে সুপরিকল্পিতভাবে বণ্টন করে কিভাবে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছান যায় তার অর্থনৈতিক সমাধান করতে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু মডেলটি ত্রুটিমুক্ত নয়। Ryutaro Komiya মহলানবীশ মডেলের সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে বলেন, মডেলটিতে চাহিদার দিক উপেক্ষিত হয়েছে এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধির যে পরিমাণ দেখানো হয়েছে তা এ মডেল অনুযায়ীও তার চেয়ে বেশি দেখানো সম্ভব। সুতরাং কাম্যস্তরে সম্পদ বন্টিত হয়েছে বলা চলে না। তাছাড়া উৎপাদন মূলধন অনুপাত, মূলধন শ্রম অনুপাত, বিশেষত বণ্টন অনুপাত সেক্টরে যে মূল্য ধরা হয়েছে সে সম্বন্ধেও প্রশ্ন রয়েছে। জাতীয় অর্থনীতিতে বৈদেশিক বাণিজ্য ও বহিরাগত সাহায্যের যে একটি সেক্টর আছে মহলানবীশ মডেলে তার স্বীকৃতি নেই।

মহলানবীশ মডেলটি ভারতীয় অর্থনীতির পরিবেশের দিক থেকেও বিতর্কের সূচনা করে। মডেলটির সমর্থকদের মতে, শিল্প ভিত গঠনের জন্য সম্পদ বণ্টনে ভারী শিল্প সেক্টরে যে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে ভবিষ্যতে তা দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করে তুলবে। ভারত শিল্পে সমৃদ্ধ দেশরূপে পরিগণিত হতে সমর্থ হবে। বর্তমানে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সুযোগ সীমিত। এর প্রধান কারণ দেশে যন্ত্রপাতি ও কারখানার অভাব। ভারী

ও ভিত শিল্পের উন্নয়নের ফলে সে অভাব দূরীকরণ সম্ভব হবে, উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে ও উৎপাদন বহুমুখী হয়ে উঠবে। ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থাতে ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন বৃদ্ধি প্রধানত মূলধন দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে।

মহলানবীশ মডেলে রচিত দ্বিতীয় পরিকল্পনা সাফল্য লাভ করেছে বলা চলে না। তৃতীয় পরিকল্পনার ব্যর্থতা, পরবর্তী পরিকল্পনায় বিরাম, সামাজিক ন্যায়সহ উন্নয়ন বা সম্পদ ও আয়ের পুনর্বণ্টনে অসাফল্য, মডেল-ভিত্তিক পরিকল্পনায় আগ্রহ হ্রাস প্রভৃতি মহলানবীশ মডেলের পথ থেকে সরে আসারই পরিচয়। মহলানবীশ মডেলের ব্যর্থতার প্রধান কারণ ভারতীয় সমাজ যে বহু মত ও পথের সমন্বয়ে গঠিত এ বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে চলা, উপেক্ষা করে চলা সাধারণ মানুষের বর্তমান ভোগের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে এবং ভারতীয় অর্থনীতিকে আন্তর্জাতিক রাজনীতি-আশ্রিত অর্থনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা।

রোলিং প্ল্যান

রোলিং প্ল্যান বলতে বুঝায় পরিকল্পনার কার্যক্রমের ক্রমাগত মূল্যায়ন। রোলিং প্ল্যানের উদ্দেশ্য পরিকল্পনার অগ্রগতি সম্পর্কে ক্রমাগত যাবতীয় তথ্যাদি সংগ্রহ ও সরবরাহ করা এবং এ সমস্ত নতুন তথ্যের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে পরিকল্পনার লক্ষ্য ও সম্পদ বণ্টনের ক্রমাগত পরিবর্তন সাধন করা। কৌশলটি এরূপ: ধরা যাক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা 1985-1990। 1985 সনের শেষে নতুন তথ্যাদির ভিত্তিতে পরিকল্পনাটিকে সংশোধন করে নিতে হবে। 1985 সন শেষ হয়ে যাবার পর পরিকল্পনার সঙ্গে আরেকটি বছর যোগ করে নিতে হবে। 1985-90-এর জায়গায় পরিকল্পনার সময়কাল হবে 1986-91। নতুন করে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রচনা করার আর দরকার হচ্ছে না। এক বছর কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন এক বছর যোগ করা হচ্ছে। যদিও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাঠামোটি থাকছে, তবে তার সময়-কালের ক্রমাগত পরিবর্তন ঘটছে।

জনতা সরকার রোলিং প্ল্যান চালু করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ফিলি-পাইনস্, ভেনিজুয়েলা, দক্ষিণ আফ্রিকা, মেক্সিকো প্রভৃতি দেশও রোলিং প্ল্যানে উৎসাহী।

বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা

(i) পরিকল্পনার কাজকর্মের ক্রমাগত মূল্যায়ন ও প্রয়োজনীয়রূপ সংশোধন সম্ভব হবে।

(ii) পরিকল্পনা সব সময় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সমতা রেখে চলতে সমর্থ হবে। অর্থাৎ, পরিকল্পনা নমনীয় হবে।

(iii) বার্ষিক বাজেট ও পরিকল্পনার মধ্যে সংযোগ সাধন সম্ভব হবে।

(iv) সিদ্ধান্ত বিকেন্দ্রীকরণ ও পরিকল্পনা রূপায়ণে জনগণের অংশগ্রহণ করা সহজ হবে।

(v) পরিকল্পনার সুফল দুর্বল শ্রেণীদের স্তরে পৌছাচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা সহজ হবে।

(vi) অর্থনৈতিক উন্নয়ন একটি চলমান ক্রিয়া। রোলিং প্ল্যান পরিকল্পনার ক্রমাগত সংশোধন ও নবীকরণের এক চলমান অনুশীলন। সুতরাং পরিকল্পনা গতিশীল ও উন্নয়নমূলক রাখার জন্য রোলিং প্ল্যানের উপযোগিতা অস্বীকার করা চলে না।

(vii) অনমনীয় পরিকল্পনা পরিবর্তনকে অস্বীকার করে। এ অর্থে অনমনীয় পরিকল্পনা অবাস্তবসূচক। নমনীয় পরিকল্পনা পরিবর্তনকে, অর্থাৎ বাস্তবকে, স্বীকার করে চলে এবং ক্রমাগত সংশোধন ও পরিবর্ধনের মধ্য দিয়ে নতুন বাস্তব রূপ পরিগ্রহণ করে। ফলে তার চলার পথে জটিলতা কম। বলা বাহুল্য, রোলিং প্ল্যান নমনীয় পরিকল্পনা।

(viii) ভারতীয় পরিকল্পনাগুলির কাঠামোগত নমনীয়তার অভাবের কারণে একাধিকবার পরিকল্পনায় বিরতি ঘোষণা করতে হয়েছে। রোলিং প্ল্যানের ফলে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পাঁচটি বার্ষিক সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও উৎপাদন লক্ষ্যে বিভক্ত হয়ে যাবে। এর ফলে প্রতি বছরের অগ্রগতির মূল্যায়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য ও প্রত্যাশার পরিপ্রেক্ষিতে করা সম্ভব হবে। অগ্রগমনে যদি কোন বাধা বা বিরতি দেখা দেয় তবে তা দূর করার জন্য দ্রুত উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়াও সম্ভব হবে। অগ্রগতি অব্যাহত থাকবে। সুতরাং ভারতীয় প্রসঙ্গে রোলিং প্ল্যানের প্রাসঙ্গিকতার বিশেষ মূল্য আছে।

অসুবিধা

রোলিং প্ল্যান তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়।

(i) পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উন্নয়নের লক্ষ্য নির্দিষ্ট থাকে। পাঁচ

বছরের শেষে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তার মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। ব্যর্থতার জন্য প্ল্যানিং কমিশন দায়ী থাকে। সুতরাং পরিকল্পনাকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য কমিশন সর্বশক্তি নিয়োগ করবে, আশা করা যায়। রোলিং প্ল্যানে উন্নয়নের লক্ষ্য নির্দিষ্ট নয়, প্রতিনিয়ত পরিবর্তনীয়। নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রার অভাবের কারণে প্ল্যানিং কমিশনের সম্মুখে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব থাকছে না। অনির্দিষ্ট দায়িত্ব কাজে অনুৎসাহ সৃষ্টি করে।

(ii) রোলিং প্ল্যানের ফলে প্রক্ষেপণ ও লক্ষ্য অনবরত পরিবর্তিত হতে থাকবে। ফলে পরিকল্পনা অস্থিতি ও অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হবে যা পরিকল্পনার সাফল্যের বিরোধী। তাছাড়া প্রাইভেট সেক্টর রোলিং প্ল্যানের সংশোধন ও পরিবর্ধনের সঙ্গে সমতা রক্ষা করে চলতে পারবে কিনা, সাধারণ মানুষের কাছ থেকেই বা এ ব্যাপারে কতটা সাড়া পাওয়া যাবে এসব মৌলিক প্রশ্নও জড়িত রয়েছে।

(iii) রোলিং প্ল্যানে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাবার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। ফলে সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও উৎপাদনের লক্ষ্য নিম্নাভিমুখী সংশোধন করার প্রবণতা প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব নয়।

(iv) বার্ষিক তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, পরিবেশন ও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এসব তথ্যের সংযোজন দ্বারা লক্ষ্য পুনঃনির্ধারণ সহজসাধ্য নয়।

(v) রোলিং প্ল্যান কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির সম্পর্কে অবনতি ঘটাতে পারে। কারণ রোলিং প্ল্যানে কেন্দ্রের পক্ষে রাজ্যগুলিকে দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক সাহায্য দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া বা পালন করা সম্ভব নয়। এর ফলে রাজ্য পরিকল্পনাগুলিতে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হতে পারে।

উপসংহার

রোলিং প্ল্যানের উদ্দেশ্য অযৌক্তিক বলা চলে না। পরিকল্পনা নমনীয় হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ, বিশেষত বর্তমানে, আর্থিক ও রাজনৈতিক ঘটনার দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। বর্তমানে যা বাস্তব ঘটনা তার ভিত্তিতে পরিকল্পনাকে সংশোধন করে চলমান রাখা বাস্তব বুদ্ধির পরিচয়। তবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে রোলিং প্ল্যান যেসব জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে সে পরিপ্রেক্ষিতে রোলিং প্ল্যানের টেকনিককে সংশোধন করে নেয়া প্রয়োজন।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

সম্প্রতি সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (1985-90) প্রস্তুতি রূপে 'দ্য এপ্রোচ পেপার টু দ্য সেভেনথ-প্ল্যান' প্রকাশিত হয়েছে।

পূর্ববর্তী পরিকল্পনাগুলির মত সপ্তম পরিকল্পনার উদ্দেশ্যও উন্নয়ন, অধিকতর নৈপুণ্য, সাম্য ও সামাজিক ন্যায় এবং স্বয়ম্ভরতা ও উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। অবশ্য দ্রুত সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য দূরীকরণের উপর অধিকতর গুরুত্ব দেয়ার প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য

সপ্তম পরিকল্পনার উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ।

(i) পরিকল্পনা বিকেন্দ্রীকরণ এবং উন্নয়নের কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করা।

(ii) যতদূর সম্ভব উৎপাদনশীল কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা। গ্রামীণ কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য একই জমিতে একাধিক শস্য উৎপাদন, নতুন কৃষি প্রযুক্তিবিদ্যার প্রচলন ও শ্রম-নিবিড় নির্মাণ কাজের প্রসার সাধন করা। তাছাড়া শিল্প উন্নয়নের স্তর ও পদ্ধতির পরিবর্তনসাধন এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সহায়ক কর্মসূচীগুলির উপর বিনিয়োগ বৃদ্ধি।

(iii) দারিদ্র্য, শ্রেণী বৈষম্য, আঞ্চলিক বৈষম্য এবং গ্রাম ও শহরাঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণ।

(iv) পুষ্টি সংস্থানের দিকে দৃষ্টি রেখে খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জন।

(v) শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, আবাসন ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রের উন্নতি সাধন।

(vi) রপ্তানি বৃদ্ধি ও আমদানি হ্রাস করে বৈদেশিক সম্পদে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের জন্য চেষ্টা করা।

(vii) ভিত-কাঠামোর উন্নতি সাধন ও কলকারখানার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা।

(viii) সাধারণ মানুষকে স্বেচ্ছায় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে উদ্বুদ্ধ করা।

(ix) শিল্প আধুনিকীকরণ ও শিল্পক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি করা।

(x) শক্তি সংরক্ষণ ও শক্তির নতুন নতুন উৎসের (বায়ো-গ্যাস, সৌর-শক্তি, নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্রভৃতি) উন্নয়ন সাধন।

(xi) প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ।

আয়তন ও বৃদ্ধির হার

সপ্তম পরিকল্পনায় মোট বিনিয়োগের পরিমাণ (1984-85 সনের দামে) ধরা হয়েছে 320000 কোটি টাকা। এর মধ্যে পাবলিক বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় 150000 কোটি টাকা। পাবলিক সেক্টরে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ধরা হয়েছে 180000 কোটি টাকা। পরিকল্পনাটি বার্ষিক 26 শতাংশ সঞ্চয়ের হারের ভিত্তিতে রচিত হয়েছে।

পরিকল্পনায় জাতীয় আয় বৃদ্ধির বার্ষিক গড় হার ধরা হয়েছে 5 শতাংশের সামান্য বেশি। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় এ বৃদ্ধির হার 5 শতাংশ হবে বলে অনুমান করা হয়।

কৃষির বার্ষিক গড় বৃদ্ধির হার 4 শতাংশ ধরা হয়েছে। শিল্পের জন্য ধরা হয়েছে 7 শতাংশ। খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্য 170 মিলিয়ন টন। 1984-85 সনে (ষষ্ঠ পরিকল্পনার শেষ বছর) খাদ্যশস্য উৎপাদনের অনুমিত পরিমাণ 156 মিলিয়ন টন। 1983-84 সনে খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ 151·5 মিলিয়ন টন। সপ্তম পরিকল্পনায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ধরা হয়েছে 1·83 শতাংশ। বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার 2·3 শতাংশ। শিক্ষার প্রসার, বিবাহের ন্যূনতম বয়স বৃদ্ধি ও জন্মনিয়ন্ত্রণ পন্থার সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার 1·83 শতাংশ ধরা হয়েছে।

সম্পদ সংগ্রহ ব্যাপারে বিদেশের উপর নির্ভরশীলতা যাতে ন্যূনতম হয় এবং ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণও যাতে সর্বনিম্ন হয় সেদিকে সবিশেষ লক্ষ্য রাখার কথা বলা হয়েছে। সেজন্য পাবলিক সেক্টরে অধিকতর উদ্বৃত্ত সৃষ্টির উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কর খাতে আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করার জন্য প্রশাসনিক দক্ষতার উন্নতিসাধন ও অধিকতর সংখ্যক লোককে করের আওতায় আনার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। সরকারী ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, বিলাস দ্রব্যের ভোগ নিয়ন্ত্রণ, গ্রামীণ সম্পদ সংগ্রহ ও সঞ্চয়ে উৎসাহ দিয়ে সম্পদ বৃদ্ধি করার কথা বলা হয়েছে। যে জনসম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদ সুযোগের অভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না সেসব সম্পদ মূলধন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে।

সম্পদ ঘাটতির পরিমাণ ধরা হয়েছে 36000 কোটি টাকা। পরিকল্পনা কমিশন মতে এ ঘাটতির পরিমাণ হ্রাস করে 10000 কোটি টাকা করা সম্ভব হবে। শিল্প বৃদ্ধির হারও 7 শতাংশের বেশি হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

সাম্প্রতিক বিশ্ব অর্থনীতির পরিবর্তিত অনুকূল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ষষ্ঠ পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়নের গড় হার প্রায় 6 শতাংশের মত হবে।

সমালোচনা

(i) পরিকল্পনা কমিশন যেসব সূত্র থেকে সম্পদ সংগ্রহ ব্যাপারে উচ্চ আশা পোষণ করেছে যথা, পাবলিক সেক্টর, বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ, এবং কর, তা কতটা বাস্তবসম্মত তাতে সন্দেহ আছে। পাবলিক সেক্টরের ক্রমাগত ব্যর্থতা, কর প্রশাসনের অযোগ্যতা ও বৈদেশিক বাণিজ্য ও সাহায্যের পেছনে জটিল বিশ্ব রাজনীতির বাস্তবতা কোন মন্তব্যের অপেক্ষা রাখে না।

(ii) জনসংখ্যা বৃদ্ধির বর্তমান হার 2·3 শতাংশ। আগামী পাঁচ বছরে সাধারণ মানুষ এতটা শিক্ষিত হয়ে উঠবে ও স্বেচ্ছায় জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রতি এতটা আগ্রহান্বিত হয়ে উঠবে যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার 2·3 শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে 1·83 শতাংশ হবে, এরূপ ধারণার সঙ্গে একমত হবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নেই।

(iii) প্রান্তিক মূলধন উৎপাদনের অনুপাত 6 থেকে হ্রাস পেয়ে 4·99 হবে এ ধারণা একান্তই প্রাকৃতিক অনুগ্রহের (খরা-বন্যা বিমুক্তি) উপর নির্ভরশীল।

উপসংহারে বলা যেতে পারে আমাদের দেশের পরিকল্পনার ইতিহাস সাফল্যমণ্ডিত নয়। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি থেকে মিশ্র অর্থনীতির প্রতি পদক্ষেপ, সম্প্রতি আবার মিশ্র অর্থনীতি থেকে পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতির (প্রাইভেট সেক্টর ও জয়েন্ট সেক্টর) দিকে আগ্রহ প্রকাশ, কালোবাজারকে অর্থনীতি ও সমাজে স্বীকৃতি দেয়া, গ্রামীণ উন্নয়নের নামে গ্রামাঞ্চলে অর্থ-বৈষম্য বৃদ্ধি করা, গ্রাম ও শহরের মধ্যে ব্যবধান বৃদ্ধি অব্যাহত রাখা, শ্রমিক অসন্তোষের কাছে আত্মসমর্পণ করা, বেকার সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ হওয়া, দেশব্যাপী বিচ্ছিন্নতাবাদের পরিবেশ সৃষ্টি করা, ধনী-দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান বৃদ্ধি করে উগ্র শ্রেণী-চেতনাবোধ জাগ্রত করা এই ঐতিহাসিক অসাফল্যের মূল কারণসমূহ। ধারকরা নৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক চিন্তা এবং সে পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনা রচনা ও জনগণের সমর্থন ছাড়া তা রূপায়ণ প্রচেষ্টা এবং অতিমাত্রায় দ্রুততার সঙ্গে বিশ্বের প্রথম সারির দেশের মর্যাদা লাভের

উচ্চাভিলাষ উল্লিখিত মূল কারণগুলির পেছনে ক্রিয়াশীল। রূঢ় বাস্তবকে স্বীকার করে নিয়ে নতুন দৃষ্টিদীপে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে একাত্মা হয়ে পরিকল্পনার নতুন কাঠামোর পথিকৃৎ রূপে সপ্তম পরিকল্পনা প্রকাশিত হলে ভারত সম্ভবত উন্নয়নের সত্যিকার পথ খুঁজে পেত। সপ্তম পরিকল্পনায় তার আভাস মাত্র নেই। পরিকল্পনাটি পূর্ববর্তী পরিকল্পনাগুলির বিস্তৃত রূপ মাত্র।

ভারতীয় অর্থনীতির বিশ্লেষণ ও সমস্যা

5

জাতীয় আয়

জাতীয় আয় কাহাকে বলে

জাতীয় আয় বলতে কোন নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক বছর) কোন দেশের মোট উৎপাদন ও সেবার পরিমাণকে বোঝায়।

জাতীয় আয় দ্বারা সংশ্লিষ্ট দেশের বিভিন্ন অর্থনৈতিক সেক্টর ও উৎপাদনে অংশগ্রহণকারী জনসাধারণের আয় ও ব্যয় সহ জাতীয় অর্থনীতির সামগ্রিক চিত্রটি প্রকাশ পায়। তাছাড়া বিভিন্ন বছরের জাতীয় আয়ের তুলনাগত বিশ্লেষণ দ্বারা সে দেশের অর্থনীতির মৌল পরিবর্তন ও জাতীয় অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি নির্ণয় করা চলে।

জাতীয় আয় নির্ধারণে অসুবিধা

জাতীয় আয় গণনা পদ্ধতিতে ধারণাগত মতানৈক্য থাকার ফলে এক দেশের জাতীয় আয়ের সঙ্গে অপর দেশের জাতীয় আয়ের তুলনা নিখুঁত হতে পারে না। এ মৌলিক দিকের আলোচনা ছেড়ে দিলেও ভারতীয় জাতীয় আয় গণনায় এমন কতগুলি বিশেষ অসুবিধা রয়েছে যে, ভারতের জাতীয় আয় দ্বারা দেশের আয়ের মোটামুটি ধারণা পাওয়া যায় মাত্র। এসব অসুবিধার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঃ

1. ভারতের এখনও এমন অনেক অঞ্চল রয়েছে যেসব অঞ্চলে বাজার সুসংগঠিত নয় ; বিনিময় টাকার মাধ্যমে না হয়ে দ্রব্যের মাধ্যমে হয়। অনেক ক্ষেত্রে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য বাজারে আনা হয় না। উৎপাদনকারীরা নিজেরাই তা ভোগ করে। এর ফলে জাতীয় আয় সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। অন্য কথায়, যে পরিমাণ জাতীয় আয় দেখানো হয় তা প্রকৃত পরিমাণের থেকে কম।

2. পরিসংখ্যানের অভাবও বিশেষভাবে অনুভূত হয়। কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প ভারতের অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার একটি বিশেষ অঙ্গ। কিন্তু নানারকম

অসুবিধা ও অজ্ঞতাবশতঃ এ জাতীয় শিল্পগুলি* সবক্ষেত্রে যথাযথ পরিসংখ্যান সরবরাহ করতে সমর্থ হয় না। কালোবাজারকে কেন্দ্র করে দেশে যে বিরাট "দ্বিতীয় অর্থনীতি" গড়ে উঠেছে তারও কোনপ্রকার নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান নেই। এসব কারণে বেশ কিছু অনুমিত ও অর্ধসত্য বা অসত্য পরিসংখ্যানের উপর ভিত্তি করে ভারতের জাতীয় আয় নির্ধারিত হয়।

3. কর্ম-ভিত্তিক আয় নির্ধারণ ত্রুটিমুক্ত নয়। ভারতে কর্মের ভিত্তিতে জাতীয় আয়ের জন্য তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু এমন অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যে, একই ব্যক্তি একাধিক কর্মে নিযুক্ত। যেমন, কৃষকদের অনেকেই কৃষি মরসুমে ক্ষেতখামারে, বছরের বাকি সময় শহরাঞ্চলের শিল্প-বাণিজ্যে বা অপরের গৃহকর্মে নিযুক্ত থাকে। এ অবস্থায় তাদের আয় সঠিক-ভাবে নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

4. পরিসংখ্যানের নির্ভুলতা সম্পর্কেও প্রশ্ন রয়েছে। যেসব সূত্র থেকে ও যেসব সূত্রের মারফত জাতীয় আয় সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয় তা নানাপ্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতিতে ভরা। এর কারণ একদিকে যেমন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিসংখ্যান তৈরি করার প্রশ্ন রয়েছে অন্যদিকে তেমনই তথ্যাদি সংগ্রহ করার মত প্রয়োজনীয় যোগ্য ব্যক্তি ও কাঠামোর অভাবও রয়েছে।

বৈশিষ্ট্য

1. ভারতের জনপ্রতি আয় উন্নত ও অনেক উন্নয়নশীল দেশের জনপ্রতি আয় অপেক্ষা কম।

জনপ্রতি স্থূল জাতীয় উৎপাদন (ডলার)

	1981	1982		1981	1982
ভারত	260	260	সুইজারল্যাণ্ড	17,430	17,010
চীন	300	310	যুক্তরাষ্ট্র	12,820	13,160
জাপান	10,080	10,080	যুক্তরাজ্য	9,110	9,660
কুয়েট	20,900	19,870	সোভিয়েত ইউনিয়ন (1979)	4,110	…
শ্রীলঙ্কা	300	320			

সূত্র: ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট 1984.

* এমনকি বৃহৎ শিল্পগুলিও সবক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যান রাখে না।

2. ভারতের জনপ্রতি স্থূল জাতীয় উৎপাদনের গড় বার্ষিক বৃদ্ধির হারও কম।

জনপ্রতি স্থূল জাতীয় গড় বার্ষিক উৎপাদন বৃদ্ধির হার

	1960-81 শতাংশ	1960-82 শতাংশ		1960-81 শতাংশ	1960-82 শতাংশ
ভারত	1·4	1·3	যুক্তরাষ্ট্র	2·3	2·2
চীন	5·0	5·0	যুক্তরাজ্য	2·1	2·0
জাপান	6·3	6·1	সোভিয়েত ইউনিয়ন	4·1	...

সূত্র: ওয়াল্ড´ ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট 1984

3. ভারতের জাতীয় আয় বণ্টন যথেষ্ট বৈষম্যমূলক।

ইউনাইটেড নেশনসের 1981 সনের এক সমীক্ষায় প্রকাশ ভারতের মোট জাতীয় আয়ের 49 শতাংশের অধিকারী ধনীতম 20 শতাংশ। দরিদ্রতম 20 শতাংশের অধিকারে মাত্র 16·17 শতাংশ। অন্যান্য দেশের তুলনায় বৈষম্যের চিত্রটি নিম্নরূপ।

আয় বণ্টন (শতাংশ)

দেশ (1)	বছর (2)	নিম্নতম 20 শতাংশ পরিবার (3)	উচ্চতম 20 শতাংশ পরিবার (4)	উচ্চতম 10 শতাংশ পরিবার (5)
ভারত	1975-76	7·0	49·4	33·6
ইন্দোনেশিয়া	1976	6·6	49·4	34·0
শ্রীলঙ্কা	1969-70	7·5	43·4	28·2
জাপান	1969	7·9	41·0	27·2
যুক্তরাজ্য	1979	7·0	39·7	23·4
যুক্তরাষ্ট্র	1972	4·6	50·3	33·4

সূত্র: ওয়াল্ড´ ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট´ 1983 ও 1984.

4. গ্রামে ধনবণ্টনে বৈষম্য।

অল ইণ্ডিয়া এগ্রিকালচারেল সেনসাস 1976-77 সনের রিপোর্টে প্রকাশ আয়তনের ভিত্তিতে মোট জমাই জমির প্রায় 55 শতাংশের আয়তন 1 হেক্টরের কম। এদের অধীনে রয়েছে দেশের মোট জমির 11 শতাংশ। অপরদিকে মোট জমাই জমির 3 শতাংশের আয়তন 10 হেক্টরের বেশি। এদের অধীনে রয়েছে দেশের মোট জমির প্রায় 27 শতাংশ। বলা বাহুল্য, এ সমস্ত বৃহৎ আয়তন বিশিষ্ট জমির মালিক গ্রামীণ ধনী সম্প্রদায়, সংখ্যায় যারা মুষ্টিমেয়।

5. শহরে ধনবণ্টনে বৈষম্য।

1980 সনের এক সমীক্ষায়* প্রকাশ 100 কোটি টাকার বেশি সম্পদের অধিকারী 20 শিল্পগৃহ দেশের 6619 কোটি টাকার সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এ ব্যাপারে বিড়লাদের স্থান প্রথম। তাদের সম্পদের পরিমাণ 1309·99 কোটি টাকা। টাটাদের স্থান দ্বিতীয়—1309·38 কোটি টাকা। তৃতীয় স্থান অধিকারী মফৎলাল—317 কোটি টাকা। 20 প্রথম সারির শিল্পগৃহের মোট সম্পদের মধ্যে এই প্রথম তিনটির সম্পদের মোট পরিমাণ 45 শতাংশ। এ দ্বারা অর্থনৈতিক ক্ষমতা যে মুষ্টিমেয়র হাতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে তা বোঝা যায়।

6. ভোগ্যদ্রব্যে ব্যয়িত অর্থের আধিক্য।

ন্যাশনাল ইনকাম কমিটির প্রথম রিপোর্টে (1954) প্রকাশ যে, ভারতের মোট জাতীয় আয়ের 50 শতাংশের কিছু বেশি ভোগকারীদের খাদ্য খাতে ব্যয়িত হয়। ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভের (1955) রিপোর্টে প্রকাশ যে, ভারতের গ্রামাঞ্চলে মোট আয়ের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ খাদ্যে ও প্রায় এক-দশমাংশ বস্ত্র খাতে ব্যয়িত হয়। অর্থাৎ, ভারতের অধিকাংশ লোকের আয়ের অধিকাংশই খাদ্য ও বস্ত্রে ব্যয়িত হয়।

7. জাতীয় আয় সঞ্চয়ের অনুপাতে কম।

ভারতে সঞ্চয়ের হার জাতীয় আয়ের 20 শতাংশের সীমায় পৌঁছালেও জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার বার্ষিক গড়ে 4 শতাংশেরও কম। এর কারণ প্রধানত:

(a) ভারতের বেশকিছু পরিমাণ সঞ্চয়ের উৎস কমপালসারি ডিপোজিট স্কীম** ও বিদেশ থেকে প্রাপ্ত সঞ্চয়। উভয়ই অস্থিতিশীল।

---

* ইকনমিক টাইমস, আগষ্ট 25, 1981. ** 1985-86 সালের বাজেটে রদ করা হয়েছে।

(b) দাম বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন প্রকল্পগুলির রূপায়ণের আর্থিক ব্যয়ভার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে যার ফলে সঞ্চয় বৃদ্ধির পূর্ণ সুযোগ নেয়া সম্ভব হচ্ছে না।

(c) বিগত কয়েক বছর যাবৎ দেশীয় মূলধন বৃদ্ধির বেশকিছু অংশ স্টক বৃদ্ধির আকার নিয়েছে। স্টকের উপর বিনিয়োগ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে না।

(d) বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম সাধারণ দাম স্তরের তুলনায় অধিকতর দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে প্রকৃত বিনিয়োগের পরিমাণ সামান্য পরিবর্তিত হচ্ছে মাত্র। অর্থাৎ, বিনিয়োগ দ্রব্যাদির দাম বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে সঞ্চয় বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও আশানুরূপ সুফল পাওয়া যাচ্ছে না।

(e) বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাবের ফলেও বিনিয়োগ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

8. মূলধন উৎপাদন অনুপাত বৃদ্ধি।

মূলধন উৎপাদন অনুপাত ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। 1950-51 সন থেকে 1960-61 সন পর্যন্ত মূলধন উৎপাদন অনুপাত (স্থির দামে) ছিল 2·39, 1960-61 সন থেকে 1970-71 সন পর্যন্ত 4·63 ও 1970-71 সন থেকে 1980-81 সন পর্যন্ত 4·87। মূলধন উৎপাদন অনুপাত বৃদ্ধি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব ও বর্ধিত মূলধনের উৎপাদনশীলতা হ্রাসের পরিচায়ক। গড় মূলধন উৎপাদন অনুপাতও ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। 1976-77 সনে এ অনুপাত ছিল 3·44 ; 1980 সনে 5·00।

9. জাতীয় বিনিয়োগে ভারসাম্যের অভাব।

ভারতের জাতীয় আয়ে কৃষির প্রাধান্য হ্রাস পেয়ে খনি, ম্যানুফ্যাকচারিং, নির্মাণ ও উৎপাদনশীল ভিত-কাঠামোর অংশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। 1950-51 সনে জাতীয় আয়ে এদের মোট অংশ ছিল 18·8 শতাংশ। 1978-79 সনে তা বৃদ্ধি পেয়ে 29·9 শতাংশ হয়। জাতীয় আয়ে ক্রমশ প্রাথমিক সেক্টরের অংশ হ্রাস এবং মধ্য ও তৃতীয় সেক্টরের অংশ বৃদ্ধি জাতীয় অর্থনীতির ক্রমোন্নতির পরিচায়ক।

10. অ-পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের আধিক্য।

1950-51 সন থেকে 1959-60 সন পর্যন্ত (ভিত্তি বছর 1970-71) নীট দেশীয় উৎপাদনে পণ্যদ্রব্য সেক্টরের অংশ ছিল 3·2 শতাংশ ; অ-পণ্য-দ্রব্যের অংশ 4·40 শতাংশ। 1960-61 সন থেকে 1969-70 সন পর্যন্ত এদের

পরিমাণ যথাক্রমে 2·30 শতাংশ ও 4·80 শতাংশ এবং 1970-71 সন থেকে 1976-77 সন পর্যন্ত যথাক্রমে 2·10 শতাংশ ও 4·40 শতাংশ।

11. অসংগঠিত সেক্টরের প্রাধান্য।

1950-51 সনে নীট দেশীয় উৎপাদনে (স্থির দামে) সংগঠিত সেক্টরের অংশ ছিল 25·60 শতাংশ ও অসংগঠিত সেক্টরের 74·40 শতাংশ। 1975-76 সনে তা যথাক্রমে 31·56 শতাংশ ও 68·44 শতাংশ এবং 1979-80 সনে যথাক্রমে 35·19 শতাংশ ও 64·81 শতাংশ হয়। দেখা যাচ্ছে, নীট জাতীয় উৎপাদনে সংগঠিত সেক্টরের অংশ বৃদ্ধি পেলেও অসংগঠিত অংশের পরিমাণ এখনও প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ।

12. পাবলিক সেক্টরের অগ্রগতি।

নীট দেশীয় উৎপাদনে (স্থির দামে) 1960-61 সনে পাবলিক সেক্টরের অংশ ছিল 10·66 শতাংশ, যেখানে প্রাইভেট সেক্টরের অংশ 89·34 শতাংশ। 1979-80 সনে উভয়ের অংশ যথাক্রমে 20·70 শতাংশ ও 79·30 শতাংশ। 1960-61 সন থেকে 1979-80 সনের মধ্যে পাবলিক সেক্টরের অংশ প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে।

ভারতের জাতীয় আয়ের গতি ও প্রকৃতি

বৃদ্ধির হার

1950-51 সন থেকে 1978-79 সন পর্যন্ত ভারতের জাতীয় গড় বার্ষিক আয় বৃদ্ধির হার 3·5 শতাংশ। এ সময়কালীন কৃষি উৎপাদন ও শিল্প উৎপাদন ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার যথাক্রমে 2·7 শতাংশ ও 6·1 শতাংশ। জনপ্রতি আয় বৃদ্ধির হার 1·3 শতাংশ। জনপ্রতি ভোগ বৃদ্ধির পরিমাণ মাত্র 1·1 শতাংশ।

দেখা যাচ্ছে, প্রথম ও পঞ্চম পরিকল্পনায় জাতীয় আয় নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাতে পেরেছিল। তৃতীয় পরিকল্পনা দারুণ ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়। যেখানে জাতীয় আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল 5·6 শতাংশ সেখানে বৃদ্ধির সীমা মাত্র 2·2 শতাংশ। এর কারণ বিনিয়োগ বৃদ্ধির হারের সঙ্গে সমতা রেখে উৎপাদন বৃদ্ধি না পাওয়া। তৃতীয় ও চতুর্থ পরিকল্পনাকালে মূলধন উৎপাদন অনুপাত যা আশা করা হয়েছিল তা অপেক্ষা অনেক বেশি হয়েছিল। বিপরীত দিকে, আয় বৃদ্ধি হ্রাস পাওয়ার ফলে সঞ্চয় হ্রাস পেয়েছে। ফলে

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালীন জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার (শতাংশ)

ক্রমিক নং	বিষয়	প্রথম পরিকল্পনা 1951-52 থেকে 1955-56	দ্বিতীয় পরিকল্পনা 1956-57 থেকে 1960-61	তৃতীয় পরিকল্পনা 1961-62 থেকে 1965-66	বার্ষিক পরিকল্পনা 1966-67 থেকে 1968-69	চতুর্থ পরিকল্পনা 1969-70 থেকে 1973-74	পঞ্চম পরিকল্পনা 1974-75 থেকে 1978-79	1950-51 থেকে 1978-79
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	বার্ষিক বৃদ্ধির হার							
1.	জাতীয় আয়	3·6 (2·1)	4·0 (4·5)	2·2 (5·6)	4·0	3·3 (5·7)	5·4* (4·4)	3·5
2.	কৃষি উৎপাদন	4·1	4·0	(−)1·4	6·2	2·9	4·2	2·7
3.	শিল্প উৎপাদন	7·3	6·6	9·0	2·0	4·7	5·9	6·1
4.	জনপ্রতি ভোগ	1·7	1·8	0·1	2·0	0·4	2·3	1·1
5.	স্থূল স্থির বিনিয়োগ	3·0	5·8	8·7	1·5	3·1	6·6	5·5

দ্রষ্টব্য : বন্ধনীতে লক্ষ্যমাত্রা দেখানো হয়েছে।

৪নং কলমে গতির হার দেখানো হয়েছে। অন্যান্য কলমে পরিকল্পনার পূর্বের ভিত্তি বছর ও পরিকল্পনার শেষ বছরের মধ্যকালীন সময়ের চক্রবৃদ্ধিক্রমে বৃদ্ধির হার দেখানো হয়েছে।

* নীট জাতীয় উৎপাদন (জাতীয় আয়) বৃদ্ধির হার। স্থূল দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধির হার 5·2 শতাংশ।

সূত্র : ষষ্ঠ পরিকল্পনা।

বিনিয়োগের হ্রাস পেয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদনের লক্ষ্য নির্ধারণেও বাস্তবতার পরিচয় দেয়া হয়নি। ব্যর্থতার মূল কারণ অবশ্য পরিকল্পনাগুলির সঠিক রূপায়ণে অসমর্থতা। পঞ্চম পরিকল্পনায় জাতীয় আয়ের লক্ষ্যমাত্রা লক্ষণীয়ভাবে অতিক্রান্ত হওয়ার কারণ প্রধানত প্রাইভেট সেক্টরে বিনিয়োগ ও পাবলিক সেক্টরে স্টক মজুত বৃদ্ধি।

স্থূল বিনিয়োগ বৃদ্ধির সময়কালকে তিন ভাগে ভাগ করা চলে। যথা, 1951-52 থেকে 1960-61 (প্রথম পরিকল্পনা থেকে দ্বিতীয় পরিকল্পনা) সন পর্যন্ত। এ সময়কালীন বিনিয়োগের হার 16·9 শতাংশ বৃদ্ধি পায়। 1960-61 থেকে 1972-73 (দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষ বছর থেকে চতুর্থ পরিকল্পনার চতুর্থ বছর) সন পর্যন্ত। এ সময়কালীন বিনিয়োগ বৃদ্ধির হার প্রায় 1·7 শতাংশ। পঞ্চম পরিকল্পনাকালে বিনিয়োগ বৃদ্ধির হার 23·7 শতাংশ নির্ধারিত হয়।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

বিনিয়োগের উপকরণ প্রধানত দেশীয় সঞ্চয় থেকে সংগৃহীত হয়। দেশীয় সঞ্চয়ে গৃহস্থ সেক্টরের দানই সর্বাধিক। পাবলিক সেক্টর ও কর্পোরেট সেক্টরের সঞ্চয় বৃদ্ধির পরিমাণ আশানুরূপ নয়।

মিশ্র অর্থনীতিতে বিনিয়োগ ক্ষেত্রে সরকারের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা স্বভাবতই সীমিত। সরকার একমাত্র পাবলিক সেক্টরের বিনিয়োগই কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ। পাবলিক সেক্টরে স্থূল স্থির বিনিয়োগ স্থূল দেশীয় উৎপাদনের শতাংশরূপে 1950-51 সনের তুলনায় 1965-66 সনে (তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে) বৃদ্ধি পেয়ে 8·5 শতাংশ হয়। এর পর বহু বছর এ বৃদ্ধির হার হ্রাস পেতে থাকে। এ হার সম্প্রতিকালে আবার বৃদ্ধি পেয়ে 1978-79 সনে 9·2 শতাংশে পৌছায়। টাকার অঙ্কে পাবলিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে বটে, তবে প্রকৃত মূল্যে নয়। এর কারণ পাবলিক সেক্টরভুক্ত সম্পদ ও বিনিয়োগের উপর মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব। বার্ষিক পরিকল্পনা ও চতুর্থ পরিকল্পনাকালীন পাবলিক সেক্টরে বিনিয়োগের হার কম হওয়ার কারণ দারুণ মুদ্রাস্ফীতির চাপে স্বল্পকালীন স্থিতি-স্থাপনের প্রতি সরকারী নীতির প্রবণতা, বৈদেশিক অর্থ পরিশোধ সম্পর্কে সরকারের অনিশ্চিত মনোভাব ও পাবলিক সেক্টরে সঞ্চয় বৃদ্ধির হারের অবনতি।

স্থূল সঞ্চয় ও বিনিয়োগের গতি (শতাংশ)

ক্রমিক নং	বিষয়	প্রাক পরিকল্পনা 1950-51	প্রথম পরিকল্পনা শেষে 55-56	দ্বিতীয় পরিকল্পনা শেষে 60-61	তৃতীয় পরিকল্পা শেষে 65-66	বার্ষিক পরিকল্পনা শেষে 68-69	চতুর্থ পরিকল্পনা শেষে 73-74	পঞ্চম পরিকল্পনা শেষে 78-79*
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	চলতি বাজার দামে স্থূল দেশীয় উৎপাদনের শতাংশ	10·0	14·3	16·9	18·2	15·4	20·0	23·7
	স্থূল মূলধন গঠন :							
2	স্থূল দেশীয় সঞ্চয়	10·2	13·9	13·5	15·6	14·1	19·3	23·9
	নীট দেশীয় সঞ্চয়ে অংশ (শতাংশ)							
3	পরিবার ক্ষেত্রে সঞ্চয় আর্থিক সম্পদে, কারেন্সি ও সরকারের উপর দাবি ছাড়া	10·0	15·5	19·1	31·1	20·5	28·3	32·9
4	পাবলিক সেক্টরে সঞ্চয়	18·9	10·6	23·3	23·1	17·3	12·9	19·0
5	প্রাইভেট কর্পোরেট সমবায় সেক্টরে সঞ্চয়	6·8	6·2	8·8	3·9	2·6	5·7	2·8

সূত্র : ষষ্ঠ পরিকল্পনা।

* পঞ্চম পরিকল্পনার শেষ বছরের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্য।

মূলধন উৎপাদন অনুপাত

প্রান্তিক স্থূল মূলধন উৎপাদন অনুপাত

(1970-71 দামে)

ক্রমিক নং (0)	পরিকল্পনা (1)	কাল (2)	মূলধন উৎপাদন অনুপাত (3)
1	প্রথম পরিকল্পনা	51-52—55-56	3·2
2	দ্বিতীয় পরিকল্পনা	56-57—60-61	4·1
3	তৃতীয় পরিকল্পনা	61-62—65-66	5·4
4	বার্ষিক পরিকল্পনা	66-67—68-69	4·9
5	চতুর্থ পরিকল্পনা	69-70—73-74	5·7
6	পঞ্চম পরিকল্পনা	74-75—78-79	3·9

সূত্র : ষষ্ঠ পরিকল্পনা।

মূলধন উৎপাদন অনুপাত প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পরিকল্পনায় যথাক্রমে 3·2, 4·1, 5·4, 4·9, 5·7 ও 3·9। অনুপাতের ক্রম-অবনতি লক্ষণীয়। পঞ্চম পরিকল্পনায় এর কিছুটা উন্নতি ঘটে। এর কারণ প্রধানত উন্নয়ন পদ্ধতির পরিবর্তন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের তুলনায় রসায়ন শিল্পের উপর অধিকতর গুরুত্ব স্থাপন। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে (যেমন, সেচ ও খনিজ) প্রকৃত ব্যয় বৃদ্ধি। অবশ্য এ অবনতির পেছনে অন্যান্য কারণের গুরুত্বও কম নয়। যথা, বিনিয়োগ সম্পদের যথাযোগ্য ব্যবহারে দক্ষতার অভাব। এজন্য শক্তি সরবরাহ ও রেলপথের কাজকর্মের অবনতি যথেষ্ট পরিমাণে দায়ী। শিল্প ক্ষেত্রেও উৎপাদন ক্ষমতার ব্যবহারের হারের অবনতি দেখা যায়। এর অন্যতম কারণ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত প্রকল্পগুলির কাজকর্ম যে পদ্ধতিতে সমাধান করা সঙ্গত তা উপেক্ষা করে চলা।

জাতীয় আয় বৃদ্ধি প্রধানত কৃষি ও শিল্প উৎপাদনের হারের উপর নির্ভর করে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালীন কৃষি উৎপাদন বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষি উৎপাদন ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা দেখা দিয়েছে তার মধ্যে রয়েছে :

(1) বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষি উৎপাদনের হারের মধ্যে সমতার অভাব। ফলে উন্নয়নের গতি ও স্তরে যথেষ্ট আঞ্চলিক বৈষম্যের সৃষ্টি।

(2) বিভিন্ন বছরে কৃষি উৎপাদনের পরিমাণে যথেষ্ট পার্থক্য। অর্থাৎ, কৃষি উৎপাদনে স্থিতিশীলতার অভাব।

(3) অনেক গুরুত্বপূর্ণ ফসল উৎপাদন ক্ষেত্রে অচল অবস্থার সৃষ্টি। যথা, ডাল ও তৈলবীজ।

(4) প্রাকৃতিক পরিবেশের দিক থেকে অসুবিধাগ্রস্ত অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত প্রযুক্তিবিদ্যা, সেবা ও বলিষ্ঠ সরকারী নীতির অভাব।

(5) ক্ষুদ্র কৃষকদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি ও উৎপাদকদের অনুকূলে কৃষি বাজারের বিন্যাসের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানগত কাঠামোর অভাব।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালীন শিল্প উৎপাদন পাঁচগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য, তৃতীয় পরিকল্পনার সুরু থেকে শিল্প উৎপাদনের অবনতি ঘটতে থাকে। এর প্রধান কারণ ভারতের শিল্পোন্নয়ন প্রধানত দেশীয় বাজারের চাহিদার উপর নির্ভরশীল। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ইতিহাসের প্রথমার্ধে আমদানির পরিবর্ত দ্রব্যাদি উৎপাদন করার বহু সুযোগ ও সরকারী সমর্থন ছিল। যার ফলে চাহিদা বৃদ্ধির তুলনায় শিল্প উৎপাদন অধিকতর বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয়ার্ধে এ সুযোগ ও সমর্থন ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। দেশের আয় বণ্টনে বৈষম্য বৃদ্ধি ও সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন হারের অবনতির ফলে শিল্প দ্রব্যের দেশীয় চাহিদা নিম্ন হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে শিল্প দ্রব্যের বিক্রয়ের জন্য ভারতকে প্রধানত বিদেশী বাজারের উপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু বিদেশী বাজারের পূর্ণ সুযোগ নেয়ার মত সামর্থ্য না থাকার ফলে শিল্প উৎপাদন আরো হ্রাস পায়। শক্তি ও যানবাহন ক্ষেত্রে চরম সঙ্কট সৃষ্টি হওয়ার ফলেও শিল্প উৎপাদন ব্যাহত হয়।

বার্ষিক জাতীয় আয়

কৃষি ও শিল্প উৎপাদন ক্ষেত্রে যে লক্ষণীয় বৈষম্য দেখা যায় তার প্রধান কারণ খরা, শক্তি ও পরিবহনে দুরবস্থা। ফলে মুদ্রাস্ফীতি ও প্রকৃত জাতীয় আয়ের অবনতি ঘটে। উন্নয়নের হার স্থিতিবিহীন হওয়ার দরুন আয় বণ্টনে অসমতা, দামের অনিশ্চয়তা, বিনিয়োগে ইতস্ততা, প্রযুক্তিবিদ্যার প্রতি আগ্রহের অভাব, সর্বস্তরে সঞ্চয় হ্রাস প্রভৃতি দেখা দেয়। এর ফলে সমগ্র অর্থনীতি এক দুষ্টচক্রের জালে জড়িয়ে পড়ে।

সংক্ষেপে, জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলি সাধারণত তাদের নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি। অর্থনৈতিক উন্নয়নও বাঞ্ছিতরূপে স্থিতিসাম্য রক্ষা করে চলতে পারেনি। এজন্য একমাত্র খরা বা অন্য কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগকে দায়ী করা সঙ্গত হবে না। নির্ধারিত স্তরে বিনিয়োগে অক্ষমতা, পরিচালনাগত ত্রুটি, শ্রমিক-মালিক বিরোধ, জাতীয় অর্থনীতির উপর রাজনীতির অতিশয় চাপ, আন্তর্জাতিক অর্থনীতি ও রাজনীতির উপর নির্ভরতা ও সম্পদের পূর্ণ ব্যবহারের অসমর্থতা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলির প্রতিশ্রুতি ও ফলশ্রুতির মধ্যে লক্ষণীয় ব্যবধানের কারণ।

জনপ্রতি আয়

জনপ্রতি আয় বৃদ্ধি উৎসাহজনক বলা চলে না। 1970-71 সনের দামে 1976-77 সনে জনপ্রতি আয় 0·6 শতাংশ হ্রাস পায়। 1977-78 সনে তা 5·9 শতাংশ বৃদ্ধি পায়। 1978-79 সনে জনপ্রতি আয় বৃদ্ধির পরিমাণ 2·2 শতাংশ। 1979-80 সনে জনপ্রতি আয় 4·8 শতাংশ হ্রাস পায়। পরবর্তী দু'বছর অবস্থার উন্নতি ঘটে। 1980-81 ও 1981-82 সনে জনপ্রতি আয় বৃদ্ধির পরিমাণ যথাক্রমে 3·0 ও 2·8 শতাংশ।

জনপ্রতি আয়

সন	1970-71 দামে	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা বৃদ্ধি	চলতি দামে	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা বৃদ্ধি
(1)	(2)	(3)	(3)	(5)
1975-76	662	7·5	1021	2·1
1976-77	658	-0·6	1086	6·4
1977-78	697	5·9	1189	9·5
1978-79	712	2·2	1250	5·0
1979-80	679	4·8	1349	8·0
1980-81	700	3·0	1571	11·3
1981-82*	720	2·8	1750	—

* অনুমিত। সূত্র: রিপোর্ট অন কারেন্সি এণ্ড ফিনান্স, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া।

জাতীয় আয়ের উপাদান

পরিকল্পনা সময়কালীন জাতীয় আয়ের উপাদানের আপেক্ষিক গুরুত্বের পরিবর্তন ঘটেছে। মাইনিং, ম্যানুফ্যাকচারিং, নির্মাণ ও উৎপাদনশীল ভিত-কাঠামোর অংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। 1950-51 সনে জাতীয় আয়ে এদের অংশ ছিল 18·8 শতাংশ, বৃদ্ধি পেয়ে 1978-79 সনে এর পরিমাণ দাঁড়ায় 29·9 শতাংশ। জাতীয় আয়ে এদের অংশ তৃতীয় পরিকল্পনা পর্যন্ত বেশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। পরবর্তীকালে সেবা সেক্টরের অংশ অধিকতর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।

আয় বণ্টনে বৈষম্যের কারণ

পৃথিবীতে এমন কোন দেশ নেই যেখানে আয় বণ্টনে বৈষম্য নেই। কারণ কমবেশী সব দেশেই কাজের ভিত্তিতে আয় বন্টিত হয়। যেসব দেশে প্রাইভেট সেক্টরের প্রভাব বেশি, সরকার ও জনগণের সতর্কতার অভাবের দরুন কালোবাজারের প্রভাবও কম নয়, সেসব দেশে আয় ও সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য অপেক্ষাকৃত বেশি। উন্নয়নশীল দেশে, বিশেষত যেখানে পশ্চিমী উন্নত গণতন্ত্রের প্রচেষ্টা চলছে, আয় বণ্টনে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে এও উল্লেখ্য যে, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে উন্নয়নের প্রথম অবস্থাতে আয় বণ্টনে অসমতা বৃদ্ধি পায়। কারণ উন্নয়ন হারের বৃদ্ধির সঙ্গে সমতা রেখে উৎপাদনের সব উপকরণ সমহারে বৃদ্ধি পায় না। যেসব উপকরণ দুষ্প্রাপ্য হয়ে ওঠে তাদের মূল্য বৃদ্ধি পায়। পরবর্তী অবস্থায় বণ্টনের অসমতা স্থিতিশীল হয়ে আসে। পরম্পরাগত বা প্রাচীন সেক্টরের তুলনায় আধুনিক সেক্টরের উন্নয়নের হার অধিক ও দ্রুত। ফলে এ দু' সেক্টরের মধ্যে বণ্টনের ব্যবধান বৃদ্ধি পেতে থাকে।

উন্নয়ন ও সুষম বণ্টন যুগপৎ সম্ভব ও বাঞ্ছনীয় কিনা এটা একটি অর্থনৈতিক প্রশ্ন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যুক্তরাষ্ট্র উন্নয়নের হার সর্বোচ্চ করার নীতি গ্রহণ করে। আয় বণ্টনের উপর কোন বাধা সৃষ্টি করা হয় না। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত কিছু লোক স্বল্প সময়ে কোটিপতি হয়ে ওঠে। ইউরোপের আর্থিক উন্নয়নের কাঠামো প্রায় একই রকম হলেও সেখানে সামাজিক ন্যায়নীতি সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হয়নি। এতে অবশ্য উন্নয়নের দ্রুততা ব্যাহত হয়েছিল। যে দেশগুলি পুঁজি বা গণতন্ত্রের কাঠামোতে দাঁড়িয়ে নেই সে দেশগুলিতে উন্নয়ন ও বণ্টন ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা

স্থূল দেশীয় উৎপাদনের উপাদান (.1970-71 দামে) (শতাংশ)

ক্রমিক নং	সেক্টর	প্রাক পরিকল্পনা 50-51	প্রথম পরিকল্পনার শেষে 55-56	দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে 60-61	তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে 65-66	বার্ষিক পরিকল্পনার শেষে 68-69	চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে 73-74	পঞ্চম পরিকল্পনার শেষে 78-79
(9)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	কৃষি ও সংশ্লিষ্ট সেক্টর	58·9	57.3	54·2	45·6 (49·9)	46·3	45·2	41·6
2	খনি, ম্যানুফ্যাকচারিং ও নির্মাণ	14·9	15·9	17·7	22·0 (20·0)	21·2	21·6	22·5
3	বিদ্যুৎ, গ্যাস, জলসরবরাহ, যানবাহন, স্টোরেজ ও সংযোগ	3·9	4·2	4·9	6·1 (5·4)	6·4	6·8	7·4
4	সেবা	22·3	22·6	23·2	26·3 (24·5)	26·1	26·4	28·5
	মোট	100·0	100·0	100·0	100·0	100·0	100·0	100·0

দ্রষ্টব্য ; বন্ধনীতে প্রদত্ত সংখ্যা 1964-65 সম্পর্কিত। 1965-66 সন দারুণ খরা বছর।

হয়েছে রাষ্ট্রের কঠিন নির্দেশে। এসব সাধারণ কারণ উন্নয়নশীল গণতান্ত্রিক ভারতের উপরও প্রযোজ্য।

এসব সাধারণ কারণ ছাড়াও যেসব বিশেষ কারণে ভারতে আয় বণ্টনে বৈষম্য ঘটেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য :

(i) গ্রামীণ ক্ষেত্রে আয় সৃষ্টিকারী সম্পদ কতিপয় ধনী ব্যক্তিদের মালিকানায় রয়েছে। ফলে কৃষি ক্ষেত্রে যে "সবুজ বিপ্লব" ঘটেছে তার সুফল প্রধানত ধনী কৃষকেরাই গ্রহণ করে থাকে। গ্রামীণ ভিত-কাঠামোর অনুন্নত অবস্থা এবং ক্ষুদ্র শিল্প, ক্ষুদ্র কৃষি, কারুশিল্পী ও দুর্বল শ্রেণীভুক্ত মানুষদের আর্থিক দুর্গতি দূর করার জন্য ব্যাপক ও দৃঢ় কর্মপ্রচেষ্টার অভাবও গ্রামীণ ক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধানকে আরো বড় করে তুলেছে।

(ii) শহরাঞ্চলে আয় বণ্টনে বিরাট অসমতার কারণ পাবলিক সেক্টরের দায়িত্ব পালনে অসমর্থতা ও সরকারের মিশ্র অর্থনীতির নামে অনেক ক্ষেত্রে প্রাইভেট সেক্টরের প্রতি অহেতুক দুর্বলতা প্রদর্শন। যথা, প্রাইভেট সেক্টরের রুগ্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি অধিগ্রহণ, সুস্থকরণ ও আবার প্রাইভেট সেক্টরের হাতে তা তুলে দেয়া। বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ধনী ব্যক্তিদের কর ফাঁকি দেয়া ও কালোবাজার তোষণ নীতিও শহরাঞ্চলের আয় বণ্টনের অসমতার অপর কারণ।

(iii) দীর্ঘকালব্যাপী দেশময় বেকারত্ব, ছদ্মবেশী বেকারত্ব সহ আমাদের দেশে এমপ্লোয়মেণ্ট একচেঞ্জ-এর সঙ্গে রেজিষ্ট্রীকৃত বেকারের সংখ্যা (ডিসেম্বর 1984) 2 কোটি 35 লক্ষ 47 হাজার।

(iv) গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলের মধ্যে উন্নয়নের হারের তারতম্য।

(v) সবকিছুর মূলে অবশ্য দেশের সামাজিক কাঠামোর সঙ্গে সঙ্গতি না রেখে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা। ততোধিক ত্রুটি তা রূপায়ণে।

সরকারী নীতি

1. ধনসম্পদ ও উৎপাদনশীল সম্পদ বণ্টন সম্পর্কিত নীতি। গ্রামীণ ক্ষেত্রে জমির বেসরকারী মালিকানার আধিক্য রোধ করার জন্য আইনের সাহায্যে ভূমি সংস্কার সাধন। এ সম্পর্কে জমিদারী উচ্ছেদ আইন, জমির মালিকানার উচ্চতম সীমা নির্ধারণ প্রভৃতি উল্লেখ্য। তাছাড়া সম্পত্তি কর, আবকারী শুল্ক, সম্পদ রাষ্ট্রায়ত্তকরণ প্রভৃতি ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছে।

2. শিল্প প্রতিষ্ঠা ও বাণিজ্যিক মূলধনের উপর বেসরকারী মালিকানার নিয়ন্ত্রণ। এজন্য সরকার শিল্প লাইসেন্স নীতি চালু করেছে। কুড়িটি ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানিগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছে। অপর দিকে পাবলিক সেক্টরের প্রসার সাধন নীতি কার্যকর করা হচ্ছে। তাছাড়া ক্ষুদ্র ও গ্রাম শিল্পগুলির উন্নয়নের জন্যও নীতি গ্রহণ করা হয়েছে।

3. বেকারত্ব দারিদ্র্য বৃদ্ধি করে। বেকারত্ব হ্রাস করার জন্য সরকার নানাপ্রকার বিশেষ স্কীম গ্রহণ করেছে। যথা, ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লোয়মেণ্ট প্রোগ্রাম, ইনটিগ্রেটেড রুরাল ডেভেলপমেণ্ট প্রোগ্রাম প্রভৃতি।

4. দাম নির্ধারণ ও বণ্টন নিয়ন্ত্রণ দ্বারা দুর্বল শ্রেণীদের কাছে নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সহজলভ্য করা।

5. কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারী মালিকানায় পরিচালিত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি কোনপ্রকার লাভ না রেখে তাদের উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করে। যেমন, সেচের জল, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য সেবা, শহরাঞ্চলে পরিবহন, দুগ্ধ, বাসস্থান, শিক্ষা, ঋণদান প্রভৃতি। তাছাড়া তপশীলী জাতি, তপশীলী উপজাতি ও অন্যান্য দুর্বল শ্রেণীভুক্ত সম্প্রদায়ের জন্য বেশকিছু বিশেষ কল্যাণমূলক স্কীমও গ্রহণ করা হয়েছে।

6. প্রত্যক্ষ করের হার বৃদ্ধি ও বিভিন্ন করলব্ধ অর্থ প্রধানত দরিদ্রদের কল্যাণের জন্য পুনর্বণ্টন নীতি গ্রহণ করা হয়েছে।

উপসংহারে, আয় ও সম্পদ বণ্টন সম্পর্কে সরকার যে সমস্ত নীতি গ্রহণ করেছে তা সমর্থনীয়। কিন্তু এর রূপায়ণ এমন ত্রুটিপূর্ণ যে, বণ্টন বৈষম্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর প্রধান কারণ নীতি রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় ভিত-কাঠামো ও দৃঢ়তার অভাব ; দ্বিতীয়ত রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ; তৃতীয়ত, আমলাদের জনকল্যাণমূলক কাজে সাধারণত নিঃস্পৃহতা ও চতুর্থত, জনগণের গঠনমুখী সামাজিক চেতনার অভাব।

তথ্য

মোট জনসংখ্যা

বছর	জনসংখ্যা	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বৃদ্ধির পরিমাণ (শতাংশ)
1951	36,10,88,090	—
1961	43,92,34,771	21·64
1971	54,81,59,652	24·80
1981 (1 মার্চ)	68,39,97,512	24·78

দ্রষ্টব্য : 1981 সনে পুরুষের সংখ্যা 35,35,02,987 ও
স্ত্রীলোকের সংখ্যা 33,04,94,525 ।

সূত্র : সেনসাস রিপোর্টস।

জনসংখ্যা 1982 : 71,69,85,000 ; 1983 (প্রাথমিক) 73,32,48,000।

সূত্র : ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক।

বিভিন্ন রাজ্যের জনসংখ্যা (কোটি)

রাজ্য	1971	1981
অন্ধ্রপ্রদেশ	4·35	5·34
আসাম	1·46	1·99
বিহার	5·64	6·98
গুজরাট	2·67	3·40
হরিয়ানা	1·00	1·29
হিমাচল প্রদেশ	0·35	0·42
জম্মু ও কাশ্মীর	0·46	0·60
কর্ণাটক	2·93	3·70

রাজ্য	1971	1981
কেরল	2·13	2·54
মধ্যপ্রদেশ	4·17	5·21
মহারাষ্ট্র	5·04	6·27
মনিপুর	0·11	0·14
মেঘালয়	0·11	0·13
নাগাল্যাণ্ড	0·05	0·08
ওড়িষ্যা	2·19	2·63
পাঞ্জাব	1·36	1·67
রাজস্থান	2·58	3·41
সিকিম	0·09	0·03
তামিলনাড়ু	4·12	4·83
ত্রিপুরা	0·16	0·21
উত্তরপ্রদেশ	8·83	11·09
পশ্চিম বাংলা	4·43	5·45

সূত্র : সেনসাস রিপোর্টস।

কেন্দ্রীয় অঞ্চলের জনসংখ্যা (কোটি)

অঞ্চল	1971	1981
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	0·01	0·02
অরুণাচল প্রদেশ	0·05	0·06
চণ্ডীগড়	0·03	0.04
গোয়া, দমন, দিউ	0·09	0·11
লাক্ষা দ্বীপ	0·003	0·004
দিল্লী	0·41	0·62
দাদরা ও নগর হাভেলী	0·007	0·01
মিজোরাম	0·03	0·05
পণ্ডিচেরী	0·05	0·06

সূত্র : সেনসাস রিপোর্টস।

রাজ্যগুলির মধ্যে উত্তরপ্রদেশের জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি (11,08,58, 019)। জনসংখ্যা সবচেয়ে কম সিকিমে (3,15,682)। কেন্দ্রীয় অঞ্চলে জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি দিল্লীতে (0·62 কোটি), সবচেয়ে কম লাক্ষা দ্বীপে (0·004 কোটি)।

জনসংখ্যার ঘনবসতি

1981 সনের সেনসাস অনুযায়ী ভারতে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে গড়ে 221 লোকের বাস। সবচেয়ে বেশি ঘনবসতির দিক থেকে রাজ্যগুলির মধ্যে প্রথম কেরল, দ্বিতীয় পশ্চিমবঙ্গ। কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলির মধ্যে প্রথম দিল্লী, দ্বিতীয় চণ্ডীগড়।

রাজ্য ও কেন্দ্রীয় অঞ্চলে ঘনবসতি (প্রতি বর্গ কিমি)

রাজ্য	1971	1981
কেরল	549	654
পশ্চিমবঙ্গ	504	614
দিল্লী	2758	4178
চণ্ডীগড়	2257	3948

সূত্র : সেনসাস 1981।

সবচেয়ে কম ঘনবসতি রাজ্য সিকিম, দ্বিতীয় নাগাল্যাণ্ড। কেন্দ্রীয় অঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে কম ঘনবসতি হচ্ছে অরুণাচল প্রদেশ।

সবচেয়ে কম ঘনবসতিপূর্ণ কেন্দ্রীয় অঞ্চল ও রাজ্য

(প্রতি বর্গ কিমি)

কেন্দ্রীয় অঞ্চল	1971	1981
অরুণাচল প্রদেশ	6	7
মিজোরাম	16	23
রাজ্য		
সিকিম	29	44
নাগাল্যাণ্ড	31	47

সূত্র : সেনসাস 1981।

জন্ম ও মৃত্যুর হার এবং সম্ভাব্য আয়ুষ্কাল

কাল	প্রতি হাজার জন্ম*	মৃত্যু	স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার	সম্ভাব্য আয়ুষ্কাল (বছর) পুরুষ	স্ত্রী
1951-61	41·7	22·8	18·9	41·90	40·60
1961-71	41·1	18·9	22·2	47·10	45·60
1971-81	36·0	14·8	21·2	—	—

* মৃত সন্তানের জন্ম ধরা হয়নি। সূত্র : সেনসাস 1981।

দ্রষ্টব্য : জন্মহার ও মৃত্যুহার উভয়ই হ্রাস পাচ্ছে। 1961-71 সনের তুলনায় 1971-81 সনে স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার মাত্র 1 শতাংশ।

সম্ভাব্য আয়ুষ্কাল (বছর)

কাল	পুরুষ	স্ত্রী
1976-81	52·6	51·6
1981-86	55·1	54·3
1986-91	57·6	57·1
1991-96	60·1	59·8

সূত্র : ষষ্ঠ পরিকল্পনা।

ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক সূত্রে সম্ভাব্য আয়ুষ্কাল 1970 ও 1982 সনে যথাক্রমে 48 ও 55 বছর। প্রসঙ্গক্রমে সুইজারল্যাণ্ডে সর্বাধিক, 79 বছর। তারপর জাপান, সুইডেন ও আইসল্যাণ্ড—প্রতিক্ষেত্রে 77 বছর।

বিবাহিত ও অবিবাহিতের ভিত্তিতে জনসংখ্যা, 1971

	পুরুষ	স্ত্রী
1. কখনও বিবাহ করেননি	15,67,268	11,92,695
2. বিবাহ করেছেন	11,79,059	12,05,244
3. বিপত্নীক/বিধবা	83,937	2,32,233
4. বিবাহ বিচ্ছেদ বা পৃথক থাকছেন	5,370	8,738
5. অন্যান্য	3,732	1,222

* সিকিমকে ধরা হয়নি। সূত্র : সেনসাস 1971।

ধর্মের ভিত্তিতে জনসংখ্যা

	1971 (শতাংশ)	1961-71 (শতকরা বৃদ্ধি)
হিন্দু	82·70	23·69
মুসলমান	11·20	30·84
খ্রীষ্টান	2·60	32·58
শিখ	1·89	32·28
বৌদ্ধ	0·71	17·33
জৈন	0·48	28·49
অন্যান্য	0·40	19·62

সূত্র : সেনসাস 1971।

ভারতে 100 জনের মধ্যে প্রায় 83 জন হিন্দু। লক্ষণীয়, হিন্দু-ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা বৃদ্ধির হারের তুলনায় খ্রীষ্টান, শিখ ও মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি।

গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলে জনসংখ্যা

(মোট জনসংখ্যার শতাংশ)

বছর	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল
1951	82·7	17·3
1961	82·0	18·0
1971	80·1	19·9
1981	—	—

সূত্র : সেনসাস রিপোর্ট'স।

ভারতে দশজনের মধ্যে আটজন গ্রামে বাস করে। লক্ষণীয়, শহরের অধিবাসীর সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

গ্রাম ও শহরের সংখ্যা

1971	
গ্রাম	শহর
5,75,936	2,643

সূত্র : সেনসাস 1971।

শ্রমিক ও অ-শ্রমিক ভিত্তিতে জনসংখ্যা (কোটি)

1981 জনগণনাক্রমে	গ্রামীণ	শহরাঞ্চল	মোট
মোট জনসংখ্যা	50·20	15·62	65·82
প্রধান শ্রমিকশ্রেণী	17·45	4·56	22·01
প্রান্তিক শ্রমিকশ্রেণী	2·36	0·35	2·71
অ-শ্রমিক	30·39	10·71	41·10

সূত্র : সেনসাস 1981।

বয়স গোষ্ঠীর ভিত্তিতে জনসংখ্যা

বয়স গোষ্ঠী	মোট জনসংখ্যার শতাংশ (1971)
0—14	42·0
15—19	8·7
20—24	7·9
25—29	7·4
30—39	12·6
40—49	9·3
50—59	6·1
60—	6·0

সূত্র : সেনসাস 1971।

ভারতে 20 বছরের নিম্নবয়স্ক জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার পঞ্চাশ শতাংশেরও অধিক। 1971 সনে কর্মক্ষম জনসংখ্যা (15-59 বয়স্ক ব্যক্তি) মোট জনসংখ্যার 53 শতাংশ ছিল।

পুরুষ ও স্ত্রীভেদে জনসংখ্যা

1981 সনের জনগণনায় দেখা যায় পুরুষের সংখ্যা 35·4 কোটি ও স্ত্রীলোকের সংখ্যা 33·0 কোটি। প্রতি 1000 পুরুষে স্ত্রীলোকের সংখ্যা 935। 1971 সনে প্রতি 1000 পুরুষে স্ত্রীলোকের সংখ্যা ছিল 930। একমাত্র কেরলেই স্ত্রীলোকের সংখ্যা (1034) পুরুষের সংখ্যা থেকে বেশি। রাজ্যগুলির মধ্যে সিকিমে স্ত্রীলোকের সংখ্যা (836) সর্বাপেক্ষা কম।

কেন্দ্রীয় অঞ্চলের মধ্যে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের স্ত্রীলোকের সংখ্যা (761) পুরুষের সংখ্যা থেকে কম।

শিক্ষিতের হার (শতাংশ)

বছর	মোট শিক্ষিত	পুরুষ	স্ত্রী
1951	16·67	24·95	7·93
1961	24·02	34·44	12·95
1971	29·45	39·45	18·69
1981	36·77	46·76	24·88

দ্রষ্টব্য: আসাম এবং জম্মু ও কাশ্মীর বাদে। সূত্র: সেনসাস 1981।

উল্লেখ্য, পৃথিবীর মোট অশিক্ষিত লোকসংখ্যার 45 শতাংশ ভারতে বাস করে।

ভারতের জনসংখ্যার কতিপয় বৈশিষ্ট্য

(1) ভারত বহুল জনসংখ্যাবিশিষ্ট ঘনবসতিসম্পন্ন দেশ। জনসংখ্যায় চীনের পরেই ভারতের স্থান*। পৃথিবীর প্রায় 15 শতাংশ লোক ভারতে

* 2050 সনের মধ্যে ভারতের জনসংখ্যা চীনকে ছাড়িয়ে যাবে।

বাস করে। 1981 সনে ভারতের প্রতি বর্গ কিলোমিটারে গড়ে 221 লোক বাস করত। দিল্লীতে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে গড়ে 4178 লোকের বাস।

(2) ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার উন্নত দেশগুলির তুলনায় বেশি। 1973-82 সনে ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বার্ষিক গড়ে 2·3 শতাংশ, যুক্তরাজ্যে 0·0, সুইজারল্যাণ্ড ও পশ্চিম জার্মানীতে 0·1, যুক্তরাষ্ট্রে 1·3, সোভিয়েত ইউনিয়নে 0·9 ও চীনে 1·2 শতাংশ।

(3) জন্মহার বেশি ও মৃত্যুহার অপেক্ষাকৃত কম হওয়ার ফলে কর্মক্ষম নয় এমন জনসংখ্যার আধিক্য। 1971 সনে 48 শতাংশ লোক কর্মক্ষমতার বাইরে ছিল।

(4) পুরুষের সংখ্যা স্ত্রীলোকের সংখ্যা থেকে বেশি। 1981 সনে (1 মার্চ) প্রতি হাজার পুরুষে স্ত্রীলোকের সংখ্যা ছিল 935।

(5) ভারত গ্রাম প্রধান দেশ। প্রায় 80 শতাংশ লোক গ্রামে বাস করে।

(6) ভারতে দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি লোক অশিক্ষিত।

দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলাফল

জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকলে তার প্রতিক্রিয়া জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় স্তরেই প্রতিফলিত হয়। জাতীয় স্তরে কর্মসংস্থানের সুযোগের অবনতি ঘটে, শহরের সংখ্যা অবাঞ্ছিতরূপে বৃদ্ধি পেতে থাকে, খাদ্য

জনসংখ্যা প্রক্ষেপণ : 1980-2100 (মিলিয়ন)

	1950	1980	2000	2025	2050	2100	মোট প্রজনন হার 1982	বছর NRR*=1
চীন	603	980	1,196	1,408	1450	1,462	2·3	2000
ভারত	362	687	994	1;309	1,513	1,632	4·8	2013

* NRR (Net Reproduction Rate)=নীট পুনঃপ্রজনন হার।**

সূত্র : রবার্ট এস. ম্যাকনামারা, "দ্য পপুলেশন প্রোবলেম : টাইম বোম অর মিথ"।

** নীট পুনঃপ্রজনন হার বলতে স্থিতিশীল জনসংখ্যাকে বুঝায়। অর্থাৎ, যে অবস্থায় বয়স ও স্ত্রী-পুরুষ নির্দিষ্ট মৃত্যুহারের বহু বছর ধরে কোন পরিবর্তন ঘটেনি। অন্যদিকে বয়স-নির্দিষ্ট প্রজনন হার পুনর্ন্যস্ত স্তরে (NRR=1) স্থির রয়েছে। এরূপ জনসংখ্যায় জন্মহার স্থির এবং তা মৃত্যুহারের সমান থাকে। বয়স-কাঠামোও স্থির থাকে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শূন্য হয়।

সরবরাহের উপর চাপ বৃদ্ধি পায়, সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ দূষিত হয়ে ওঠে, দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে, সরকার স্বৈরতান্ত্রিক হয়ে ওঠার সুযোগ পায়, ব্যক্তিস্বাধীনতা সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে এবং পরিবার পরিকল্পনার উপর নির্মম চাপ সৃষ্টি হয়।

কর্মসংস্থানের সম্ভাব্য সুযোগের কথা ধরা যাক। আধুনিক সেক্টর উৎপাদনশীল বটে, তবে এ সেক্টরে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা কম। তাই উন্নতিশীল দেশগুলিতে দ্বৈত অর্থনীতি স্থান পেয়েছে। অর্থাৎ, মূলধন-নিবিড় সেক্টরের পাশাপাশি শ্রম নিবিড় সেক্টরও বিস্তার লাভ করছে।

কৃষিক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ আরো সীমিত। জমি ও জনসংখ্যার অনুপাত আশানুরূপ নয়। আমাদের দেশে 1953 সন থেকে 1971 সনের মধ্যে গ্রামীণ গৃহস্থ ঘরের সংখ্যা 66 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু কৃষি অঞ্চলের বৃদ্ধির পরিমাণ মাত্র 2 শতাংশ। এক বা তার কম একর কৃষি জমির সংখ্যা দ্বিগুণের বেশি হয়ে 3 কোটি 50 লক্ষ হয়েছে। কৃষি জমির গড় আয়তন হ্রাস পেয়ে হয়েছে ·14 একর। জমি খণ্ডীকরণ বৃদ্ধি পাবার ফলে কৃষি জমির আয়তন ক্রমশ এত ক্ষুদ্র হয়ে আসছে যে এরূপ ক্ষুদ্রায়তন জমিতে চাষআবাদ করে কৃষকদের পক্ষে জীবনধারণ করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। বলা বাহুল্য, এ অবস্থায় কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা অতি সীমিত।

শ্রম-নিবিড় ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রেও কর্মসংস্থানের সুযোগ আশানুরূপ নয়। সেবা সেক্টর, ক্ষুদ্রায়তন ব্যবসা-বাণিজ্য ও অসংগঠিত সেবা ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে বটে, তবে তা সাধারণত জীবনধারণের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়।

গ্রামীণ ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের অভাবের দরুন শহরের লোকসংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। শহরের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। 1970-80 সনের মধ্যে উন্নতিশীল দেশগুলির গ্রামীণ অঞ্চলের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ 34 কোটি ও শহরাঞ্চলের 32 কোটি 10 লক্ষ। ইউনাইটেড নেশনস-এর সূত্রে প্রকাশ 1980-90 সনের মধ্যে উন্নতিশীল দেশগুলিতে গ্রামীণ অঞ্চলে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ হবে 32 কোটি, শহরে এর পরিমাণ হবে 48 কোটি 10 লক্ষ। শহরাঞ্চলের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির আধিক্যের ফলে শহরের ভারসাম্য বিঘ্নিত হবে।

লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে খাদ্য সরবরাহের প্রশ্নও জড়িত। 1960 ও 1970

দশকে জনপ্রতি খাদ্য সরবরাহের যে পরিসংখ্যান ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক দিচ্ছে তা নিম্নরূপ।

(শতাংশ প্রতিবছর)

	1960-70	1970-80
নিম্নআয়বিশিষ্ট দেশগুলি	0·2	—0·3
মধ্যআয়বিশিষ্ট দেশগুলি	0·7	0·9
সমস্ত উন্নতিশীল দেশগুলি	0·4	0·4

আফ্রিকা সবচেয়ে বেশি দুর্দশাগ্রস্ত। সেদেশে সত্তর দশকে জনপ্রতি উৎপাদন বার্ষিক 1·1 শতাংশ হ্রাস পায়। এ দশকে দক্ষিণ এশিয়ায় জনপ্রতি উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ শূন্য। নিম্নআয়বিশিষ্ট দেশগুলিতে 225 কোটি লোকের বাস। গত 20 বছরের মধ্যে উৎপাদন বৃদ্ধি কখনও জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সমতা রেখে চলতে সমর্থ হয়নি। [ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক, 1982]

উৎপাদন বৃদ্ধির অসাফল্যের কারণ প্রধানত প্রতিকূল সামাজিক কৃষি সংস্থা, ভূমিস্বত্ব প্রথার পীড়ন, অর্থাভাব, স্টোরেজ ও বাজার প্রথার অব্যবস্থা, নানাপ্রকার সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি। তাছাড়া রয়েছে কৃষি পণ্যদ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ নীতি এবং শহরাঞ্চলের ভোগকারীদের জরুরী চাহিদার মধ্যে মৌল বিরোধ।

জনসংখ্যা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পেলে প্রাকৃতিক পরিবেশ ক্ষুণ্ণ হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, জ্বালানি কাঠের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। বস্তুত সাধারণত এ কারণেই উন্নতিশীল দেশগুলিতে অরণ্যসম্পদ দ্রুত ধ্বংস পাচ্ছে। এ সমস্ত দেশে 130 কোটি মানুষ জ্বালানির জন্য কাঠের উপর নির্ভরশীল। তারা তাদের প্রয়োজন মিটাবার জন্য যত দ্রুত অরণ্য ধ্বংস করে কাঠ সংগ্রহ করে চলেছে তত দ্রুত অরণ্যসম্পদ আবার সৃষ্টি হয় না। ফলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জমির উৎপাদন ক্ষমতা ও গ্রামীণ লোকের আর্থিক অবস্থা ব্যাহত হচ্ছে। তানজানিয়াতে জ্বালানি কাঠ এত দুষ্প্রাপ্য যে প্রত্যেক গৃহস্থের বছরের মধ্যে 250-300 কাজের দিন শুধু জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতেই কেটে যায়। চীনে 17 কোটি গৃহস্থ ঘরের মধ্যে 7 কোটি ঘরের, অর্থাৎ, 30 কোটি লোকের বছরে ছ'মাস জ্বালানি কাঠের জন্য দারুণ দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

উন্নতিশীল দেশগুলিতে (চীনকে বাদ দিয়ে) 78 কোটি মানুষ (ওয়ার্ল্ড

ব্যাঙ্ক, 1980) দারিদ্র্য ও অশিক্ষায় এমন জর্জরিত যে তাদের মানুষের কোন সংজ্ঞাতেই ফেলা যায় না। জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাবার ফলে উন্নয়ন পরিকল্পনা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি প্রয়োজন, কিন্তু সীমিত আয়ের কারণে তা সম্ভব হয় না। অর্থাৎ, দরিদ্রশ্রেণীর উপর দারিদ্র্যের চাপ লাঘব করা কঠিন হয়ে ওঠে। এর ফলে দরিদ্র পরিবারের সন্তান-সন্ততিদের দৈহিক ও মানসিক বিকাশ সম্ভব হয় না। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কলোম্বিয়া ও মালয়সিয়ায় দরিদ্রতম 20 শতাংশ গৃহস্থঘরের শিশুদের সংখ্যা ধনীতম 20 শতাংশ গৃহস্থঘরের শিশুদের সংখ্যার তুলনায় তিনগুণ বেশি। দরিদ্রশ্রেণীর মধ্যে শিশুমৃত্যুর হারও বেশি। সামাজিক দিক থেকে ধনীতম ঘরের শিশুরা সামাজিক প্রথার কারণে সুস্বাস্থ্য ও উচ্চশিক্ষার যে সুযোগ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে দরিদ্র ঘরের শিশুরা সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত। ফলে একান্ত জন্মগত কারণেই এ দু'শ্রেণীর মধ্যে সামাজিক ব্যবধান বৃদ্ধি পেতে থাকে। এরূপ সমাজে সরকারের স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাব প্রকাশ পায়।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করার জন্য উন্নতিশীল দেশগুলিকে পরিবার পরিকল্পনার আশ্রয় নিতে হয়। পরিবার পরিকল্পনা যে সবক্ষেত্রে জনগণের সামাজিক দায়িত্ব জাগ্রত করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তা নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারকে জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও নির্বীর্যকরণের ব্যবস্থা নিতে হয়। তাছাড়া সন্তান উৎপাদন হ্রাস করার জন্য স্ত্রীজাতিকে যে পারিবারিক পীড়ন, যেমন গর্ভপাত ঘটানো, অন্তঃসত্ত্বাকালীন শিশুটি স্ত্রী না পুরুষ তা নির্ণয় প্রভৃতি সহ্য করতে হয় তাও উপেক্ষণীয় নয়।

আন্তর্জাতিক প্রথার উপর প্রতিক্রিয়া

জনসংখ্যা বৃদ্ধি আন্তর্জাতিক প্রথার উপরও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। উন্নতিশীল, বিশেষত এদের মধ্যে সবচেয়ে দরিদ্রতম, দেশগুলিতে পৃথিবীর জনসংখ্যা কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। যার ফলে এসমস্ত দেশে নানাপ্রকার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে এবং তা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হচ্ছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের তারতম্যের ফলে আন্তর্জাতিক স্তরে ধনী ও দরিদ্র দেশগুলির মধ্যে আয়ের যে বৈষম্য বৃদ্ধি পায় তা যে কিরূপ আকার ধারণ করতে পারে তার একটি দৃষ্টান্ত আমেরিকা ও ভারত। 1955 সন থেকে 1980 সনের মধ্যে আমেরিকার জনপ্রতি আয় (1980 সনের স্থির ডলার

দামে) 7,000 ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 11,500 ডলার হয়। এ সময়কালীন ভারতে জনপ্রতি আয় বৃদ্ধির পরিমাণ 170 ডলার থেকে 260 ডলার। অন্য কথায়, 1955 সনে এ দু'দেশের মধ্যে জনপ্রতি আয়ের ব্যবধান ছিল 6,830 ডলার, 25 বছরের মধ্যে (1980) এ ব্যবধান বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে 11,240 ডলার। 1980 সনে উন্নত দেশগুলিতে পৃথিবীর 25 শতাংশ লোক বাস করত ও তাদের মোট উৎপাদনের পরিমাণ ছিল পৃথিবীর মোট উৎপাদনের 77 শতাংশ। অর্থাৎ, পৃথিবীর 25 শতাংশ লোক ভোগ করত পৃথিবীর 77 শতাংশ উৎপাদন। তুলনাগতভাবে মধ্যআয়বিশিষ্ট উন্নতিশীল দেশগুলির (ব্রেজিল, তুরস্ক প্রভৃতি) 28 শতাংশ লোক ভোগ করত পৃথিবীর মোট উৎপাদনের 18 শতাংশ আর নিম্নআয়বিশিষ্ট দেশগুলি (ভারত, চীন, আফ্রিকা প্রভৃতি) যেখানে বসবাস করছে পৃথিবীর 47 শতাংশ লোক, তারা ভোগ করত পৃথিবীর মোট উৎপাদনের 5 শতাংশ মাত্র।

1980 সন থেকে 2000 সনের মধ্যে উন্নতিশীল দেশগুলিতে 20-40 বয়স গোষ্ঠীর সংখ্যা 63 কোটিরও বেশি বৃদ্ধি পাবে ; উন্নত দেশগুলিতে বৃদ্ধি পাবে মাত্র 2 কোটি। এর ফলে উন্নতিশীল দেশগুলির সস্তা শ্রমিকের সুযোগ নেয়ার জন্য এ সমস্ত দেশে উন্নত দেশের শিল্পপতিদের ও আন্তর্জাতিক রাজ-নীতির অনুপ্রবেশ বৃদ্ধি পাবে। পৃথিবীর বিনিয়োগযোগ্য সম্পদের পুনর্বণ্টনেও পরিবর্তন দেখা দেবে।

পরিশেষে, দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে জড়িত পৃথিবীর নানারকম জটিল সমস্যা। জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাস না পেলে 'এক পৃথিবী' বা 'ওয়ান ওয়ার্ল্ড'-এর ধারণা নিছক ধারণাতেই ধরা থাকবে, বাস্তবে রূপ নেয়ার সুযোগ পাবে না।*

ভারতে জনসংখ্যাধিক্যের পরিচিতি ও ফলাফল

ভারতে জনসংখ্যার চাপ যে অত্যধিক তুলনামূলকভাবে তা তুলে ধরা যেতে পারে। শতকরা জনসংখ্যার গড় বার্ষিক বৃদ্ধি 1960-70 সনে ভারতের ক্ষেত্রে 2·3 ; 1970-81 সনে 2·1। যেখানে চীনে যথাক্রমে 2·3 ও 1·5 ; জাপানে 1·0 ও 1·1 ; যুক্তরাজ্যে 0·6 ও 0·1 ; যুক্তরাষ্ট্রে 1·3 ও 1·0, পশ্চিম জার্মানীতে 0·9 ও 0·0 এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে 1·2 ও 0·9।

* রবার্ট এম. ম্যাকনামারা, "দ্য পপুলেশন প্রোবলেম : টাইম বোম অর মিথ" দ্রষ্টব্য।

ভারতের (1977-78) গ্রামাঞ্চলের 50·82 শতাংশ ও শহরাঞ্চলের 38·19 শতাংশ লোক "দারিদ্র্য রেখা"-র নিম্নে জীবনযাপন করে। অন্যভাবে, ভারতের জনসংখ্যার প্রায় 50 শতাংশ দারিদ্র্য রেখার নিম্নে। অর্থাৎ, দেশের দশজনের মধ্যে প্রায় পাঁচজনই দারুণ দারিদ্র্য-পীড়িত। ভারত গ্রামপ্রধান। অন্ধকারাচ্ছন্ন সে জগৎ আর তারই বিপরীত জগৎ শিল্পে, বাণিজ্যে, শিক্ষায় ও সভ্যতায় সমৃদ্ধ শহর—পাশাপাশি এ দু'য়ের অবস্থান জনসংখ্যার আধিক্যের এক সুন্দর বহিঃপ্রকাশ।

ভারতীয় অর্থনীতিতে প্রধানত খাদ্যের অভাবকে কেন্দ্র করেই জনসংখ্যা সমস্যা প্রকট হয়েছে। ভারত পৃথিবীর মোট জমির 2·4 শতাংশের অধিকারী। কিন্তু তাকে প্রতি বছর পৃথিবীর প্রায় 15 শতাংশ লোকের খাদ্যের সংস্থান করতে হচ্ছে। চীনে পৃথিবীর 20 শতাংশ লোকের বসবাস হলেও সে পৃথিবীর 7 শতাংশ জমির অধিকারী। সেদিক দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাগ্যবান। এ দেশ দুটোতে যথাক্রমে পৃথিবীর 6 ও 7 শতাংশ লোকের বসবাস, কিন্তু তারা যথাক্রমে পৃথিবীর 7 ও 16 শতাংশ জমির মালিক।

ভারতে খাদ্যের চাহিদার গড় আয় স্থিতিস্থাপকতা 0·71। আয় বৃদ্ধির ফলে বা খাদ্যশস্যের উৎপাদন বা যোগান হ্রাস পাবার দরুন খাদ্যশস্যের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে যে ব্যবধান সৃষ্টি হয় তার অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী। অতিরিক্ত জনসংখ্যার খাদ্যের অভাব মিটাবার জন্য জাতীয় সম্পদের এক বৃহৎ অংশ খাদ্যশস্য, সার ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপাদন ও আমদানি করার জন্য ব্যয়িত হয়। এর ফলে শিল্প ও ভিত-কাঠামোর উন্নয়ন ব্যাহত হয় ও ব্যালেন্স অব ট্রেডে ঘাটতি দেখা দেয়।

জনসংখ্যার আধিক্যের ফলে ভারতের অর্থনীতি কৃষি-ভিত্তিক হয়ে রয়েছে—এরকম মন্তব্য অসঙ্গত নয়। জনসংখ্যার চাপ স্বভাবতই কৃষির উপর বিশেষভাবে অনুভূত হয়। ছদ্মবেশী বেকার ও গ্রামাঞ্চলের ঘরে ঘরে দারিদ্র্যের জন্য সরাসরি জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে দায়ী করা চলে।

কর্মক্ষম জনগণকে উৎপাদনমূলক কাজে নিয়োগ করার মত মূলধন ও আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োজনীয় সুযোগ ভারতে নেই বললেই হয়। এক অর্থে, সীমিত মূলধন, প্রযুক্তিবিদ্যার অভাব এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতার প্রধান কারণ জনসংখ্যার আধিক্য। কারণ অতিরিক্ত জনসংখ্যার

ভরণপোষণের ব্যয়ভার বহনের ফলে সঞ্চয় তথা মূলধন গঠন ব্যাহত হয়। মূলধনের অভাবে বিনিয়োগ ব্যাহত হয়। প্রযুক্তিবিদ্যা সম্পর্কে গবেষণা সম্ভব হয় না। এমনকি শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে জনপ্রতি ব্যয় নগণ্য হয়ে দাঁড়ায়। অন্য কথায়, অতিরিক্ত জনসংখ্যা দারিদ্র্যের কারণ আবার দারিদ্র্য অতিরিক্ত জনসংখ্যার কারণ। এভাবে জনসংখ্যাকে কেন্দ্র করে "দুষ্টচক্র" আবর্তিত হচ্ছে।

সংক্ষেপে, জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাবার ফলে ভারতের উন্নয়ন প্রচেষ্টা নিম্নলিখিতরূপে ব্যাহত হচ্ছে।

(i) জাতীয় আয় বৃদ্ধির তুলনায় জনপ্রতি আয় কম। 1950-51 সন থেকে 1982-83 সন পর্যন্ত (1970-71 দামে) জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার 3·6 শতাংশ। অপরদিকে জনপ্রতি আয় বৃদ্ধির হার 1·3 শতাংশ মাত্র। ফলে সঞ্চয় ব্যাহত হয়।

(ii) দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারে মন্থরতার ফলে জমির উপর অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। 1982 সনে জনপ্রতি জমির পরিমাণ মাত্র 0·36 একর। ফলে জমির উৎপাদনশীলতা ব্যাহত হচ্ছে; ছদ্মবেশী বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(iii) জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাবার ফলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গৃহসংস্থান, পরিবহন প্রভৃতির জন্য সরকারের ব্যয়ের উপর চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। দুর্বল শ্রেণীর লোকেরা সরকার কর্তৃক প্রদত্ত এ সমস্ত সুযোগসুবিধা থেকে ক্রমাগত বঞ্চিত হচ্ছে। এ সমস্ত খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পাবার ফলে সমূহ প্রয়োজন উৎপাদনমূলক প্রকল্পে সরকারী বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব ঘটছে।

(iv) বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য বেকারদের কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের উপর নির্ভর করতে হয়। ফলে কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের উপর আর্থিক ও সামাজিক চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাদের ব্যক্তিগত সঞ্চয় হ্রাস পাচ্ছে। সামাজিক অসন্তোষ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(v) দেশে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবের প্রধান কারণ জনসংখ্যার আধিক্য। ভারতে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক পুষ্টিকর খাদ্য থেকে বঞ্চিত।

(vi) ভারতের 63 শতাংশ লোক বর্ণজ্ঞানশূন্য। জনসংখ্যার আধিক্য তথা দারিদ্র্য এর বিশেষ কারণ। শিক্ষার অভাব শ্রম দক্ষতা বৃদ্ধির অন্তরায়।

(vii) জনসংখ্যার আধিক্যের ফলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে।

(viii) গ্রামীণ জনসংখ্যার আধিক্য ও দারিদ্র্য গ্রাম ও শহরের মধ্যে ভারসাম্য ব্যাহত করছে। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান বৃদ্ধি করে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা জটিল করে তুলছে।

ভারতে কি যথার্থই জনসংখ্যার আধিক্য ?

অর্থনীতিবিদ্ ম্যালথাসের মতে জনাধিক্য সমস্যা তখনই দেখা দেয় যখন খাদ্যসামগ্রীর তুলনায় জনসংখ্যা অতি দ্রুত বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ, জনসংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পায় খাদ্যসামগ্রী সে অনুপাতে বৃদ্ধি পায় না। ফলে অতিরিক্ত জনসংখ্যার উদ্ভব হয়। এ প্রয়োজনাতিরিক্ত জনসংখ্যার হাত থেকে রেহাই পাবার পরিচ্ছন্ন পথ প্রতিষেধকমূলক পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করা। অন্যথায় প্রকৃতি দুর্ভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনবে। ম্যালথাসের মতবাদ উন্নত বা উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে প্রযোজ্য নয় বলে বর্তমানে স্বীকৃত। তবে তাঁর মতবাদের মূল তত্ত্বটুকু অসত্য বলা চলে না। অনুন্নত অর্থনীতির বিভিন্ন সমস্যার মূলে অতিরিক্ত জনসংখ্যার প্রভাবের বাস্তবতা কেহই অস্বীকার করেন না। ম্যালথাসকে স্মরণ রেখে বলা যায় যে, ভারতের প্রায় 50 শতাংশ মানুষ "দারিদ্র রেখা"-র নিম্নে। অর্থাৎ, জীবনধারণের নিম্নমানের নিম্নে তারা দৈনন্দিন জীবনযাপন করছে। ভোগের দিক থেকে দেখতে গেলেও দেখা যায় ভারতে জনপ্রতি ভোগের মান নিম্ন ও স্থিরতাহীন। জনাধিক্যের তা সুনিশ্চিত প্রমাণ।

স্তরভেদে দারিদ্র্যের পরিচিতি (1971/শতাংশ)

অঞ্চল	প্রচণ্ড নিঃস্ব	নিঃস্ব	দরিদ্র
গ্রামীণ	21·8	31·1	43·2
শহরাঞ্চল	22·6	36·3	52·6
সর্বভারত	22·0	32·2	45·0

দ্রষ্টব্য : * প্রচণ্ড নিঃস্ব বলতে তাদের বুঝায় যাদের ভোগ্যদ্রব্যের উপর দৈনিক জনপ্রতি ব্যয় গ্রামীণ

ক্ষেত্রে 70 পয়সা ও শহরাঞ্চলে 93 পয়সার কম। তেমনি নিঃস্ব ও দরিদ্র বলতে বুঝায় গ্রামীণ ক্ষেত্রে ভোগ্যদ্রব্যের উপর দৈনিক জনপ্রতি ব্যয় যথাক্রমে 80 পয়সা ও 93 পয়সার কম আর শহরাঞ্চলে যথাক্রমে 1·13 টাকা ও 1·43 টাকার কম।

সূত্র: ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভে রিপোর্ট।

জনপ্রতি ভোগ (শতাংশ)

বার্ষিক বৃদ্ধির হার						
1951-52 -55-56	56-57 -60-61	61-62 -65-66	66-67 -68-69	69-70 -73-74	74-75 -78-79	50-51 -78-79
1·7	1·8	0·1	2·0	0·4	2·3	1·1

সূত্র: ষষ্ঠ পরিকল্পনা।

আধুনিক মতবাদ অনুসারে কোন দেশের জনসংখ্যা পরিমেয় কিনা তা নির্ভর করে সে দেশের জনসংখ্যার কাম্যস্তরে অবস্থানের উপর। কাম্যস্তরে অবস্থিত জনসংখ্যা বলতে এমন জনসংখ্যাকে বুঝায় যে জনসংখ্যার দরুন নির্দিষ্ট স্থান ও অবস্থাতে জনপ্রতি আয় সর্বোচ্চ হয়। বর্তমান জনসংখ্যা যদি সে সংখ্যার কম বা বেশি হয় তাহলে জনপ্রতি আয় হ্রাস পাবে। অর্থাৎ, জনসংখ্যা কাম্য অপেক্ষা কম বা বেশি হয়েছে বুঝতে হবে।

এ মতবাদ অনুযায়ী বিচার করতে গেলেও দেখা যায় যে, ভারতে অতিরিক্ত জনসংখ্যা রয়েছে। কারণ ভারতে "ছদ্মবেশী" বেকারের প্রাধান্য অস্বীকার করা যায় না। বিশেষত কৃষিক্ষেত্রে। জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির দ্রুততার ফলে জনপ্রতি আয় আনুপাতিক রূপে বৃদ্ধি পাচ্ছে না।

(বৃদ্ধি গড় বার্ষিক/শতাংশ)

স্থূলদেশীয় উৎপাদন		জনসংখ্যা		জনপ্রতি আয়
1960-70	1970-82	1960-70	1970-81	1960-81
3·4	3·6	2·3	2·3	1·3

সূত্র: ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট, 1984।

এ সমস্ত প্রামাণ্য তথ্য থাকা সত্ত্বেও কারো কারো মতে ভারতে জনসংখ্যার আধিক্য নেই, যা দৃশ্য হয় তা আর্থিক অব্যবস্থা। ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ অনেক দেশেরই ঈর্ষার বস্তু। শ্রম সম্পদেও ভারত উন্নত। শিল্পকলা ও বিজ্ঞানেও ভারত অনুন্নত নয়। তা সত্ত্বেও ভারত অনুন্নত। জনসংখ্যা বৃদ্ধি একটি সমস্যা। তার কারণ দুর্বল উৎপাদনশীলতা। সুপরিকল্পন ও সুদৃঢ়তার সঙ্গে প্রাকৃতিক ও জনসম্পদের সুব্যবহার ও সুষম বণ্টন দ্বারা উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা কোন অসম্ভব কাজ নয়। এ দুষ্টচক্রের বাঁধনের জন্য অতিরিক্ত জনসংখ্যা কারণ নয়, ফল মাত্র।

যুক্তিটি উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন ত্রুটিটিও উপেক্ষণীয় নয়। জনসংখ্যার আধিক্য প্রশ্নটির সঙ্গে 'সময়'-এর প্রভাব যুক্ত। বর্তমানে দেশে যে সম্পদ, যে শ্রম ও শিল্প দক্ষতা, প্রযুক্তিবিদ্যা, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ রয়েছে তা স্বীকার করে নিয়ে চলতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে, কর্মপ্রার্থীদের একটা বিরাট অংশ কর্মসংস্থানের আশায় বছরের পর বছর বেকার হয়ে বসে আছে। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় প্রকাশ 1980-85 সনে মোট বেকারের সংখ্যা দাঁড়াবে 42·58 মিলিয়ন। অথচ শ্রমশক্তি বৃদ্ধির বিরতি নেই। শ্রমশক্তির গড় বার্ষিক বৃদ্ধির পরিমাণ 1960-70 সনে 1·7 শতাংশ, 1970-80 সনে 1·9 শতাংশ ও 1980-2000 সনে ধরা হয়েছে 2·2 শতাংশ। এ অসহনীয় অবস্থায় সান্ত্বনা দেবার জন্য কোন কোন রাজ্য 'ডোল' প্রথা চালু করে প্রকারান্তরে নিজেদের প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার অসমর্থতার কথাই স্বীকার করে নিয়েছে। দেশের কর্মক্ষম (15-64 বয়স) সমস্ত মানুষেরও যদি কর্মসংস্থান ঘটে তবু 43 শতাংশ মানুষ তাদের জীবিকার জন্য বাকী 57 শতাংশ মানুষের উপার্জনের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকছে। জীবন দীর্ঘায়ু ও বিবাহ বিলম্বিত হওয়ার ফলে বসে থাওয়া লোকের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ কম উৎপাদনশীলতার মধ্য দিয়ে যে উৎপাদনটুকু হচ্ছে তার ও সমগ্র ভিত-কাঠামোর উপর "কর্মহীন" শ্রেণীর দাবি রয়েছে। তার ফলে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ব্যাহত হচ্ছে। উৎপাদনশীলতার দুর্বলতা এ দুষ্টচক্রের আবর্তের প্রতিফলন মাত্র। এ অবস্থায় অতিরিক্ত জনসংখ্যার প্রশ্নটি এসে যায় ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এককে আবদ্ধ করার আগ্রহ জন্মে। জনসংখ্যার আধিক্য তাই বর্তমান সমস্যা।

ভবিষ্যতে দুষ্টচক্রের বাঁধন ভেঙে গেলে জনসংখ্যা সমস্যাটির কাঠামোও

ভেঙে পড়বে হয়ত। উন্নত দেশগুলিতে জনসংখ্যা সম্পর্কিত যে সমস্যা জড়িত তা জন্মনিয়ন্ত্রণের আধিক্য, জনসংখ্যার আধিক্য নয়। যার ফলে সে সমস্ত দেশে যে সমস্যা প্রকাশ পায় তা জনসংখ্যার অভাবজনিত সমস্যা। যে সমস্যার সম্মুখীন হয়ে ফ্রান্সের সরকার সম্প্রতি তৃতীয় সন্তানের জন্ম দেয়ার কৃতিত্বের মূল্যস্বরূপ দম্পতিকে নগদ পুরস্কার সহ অন্যান্য সুবিধা দেয়ার কথা ঘোষণা করেছে। পশ্চিম জার্মানীতে জনসংখ্যা গড় বার্ষিক বৃদ্ধির হার 1970-80 সনে "শূন্য", যুক্তরাজ্যে 0·1, যুক্তরাষ্ট্রে 1·0। অপর দেশ থেকে শ্রমশক্তি আমদানি করাতে তাই তাদের অনিচ্ছা প্রকাশ পায় না।

জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের পথ

জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের দুটো দিক। একটি, জন্মহার ও মৃত্যুহার হ্রাস করে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার হ্রাস করা। অপরটি, পূর্ণ দক্ষতার সঙ্গে প্রাকৃতিক ও জনসম্পদের সমাজকল্যাণমুখী ব্যবহার। বলিষ্ঠ ও কার্যকর কাম্য জনসংখ্যা, প্রকৃতির ভাণ্ডার থেকে বিনা অপচয়ে প্রয়োজনীয় উপকরণ আহরণ ও সব স্তরের মানুষের কল্যাণে তা উৎপাদন কাজে প্রয়োগ, সর্বোপরি উৎপন্ন দ্রব্যের সঙ্গত স্থিতিমূলক বণ্টন সুস্থ, সবল উন্নত অর্থনীতি ও সামাজিক পরিবেশের পরিচয়।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ দ্রুত কার্যকর করার একমাত্র পথ কৃত্রিম জন্মনিয়ন্ত্রণ পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করা। দারিদ্র্য, সামাজিক প্রথা ও শিশু-মৃত্যু জন্মহার নিয়ন্ত্রণ করে বটে, কিন্তু তা দুর্বল অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর প্রতি-ফলন মাত্র। অল্প বয়সে বিবাহ করার প্রতি যে অনিচ্ছা দেখা যায় তা শুভ লক্ষণ সন্দেহ নেই। দুর্বল শ্রেণীদের মধ্যেও এ অনিচ্ছার চেতনা আনা দরকার। কৃত্রিম উপায়ে জন্মনিরোধ যে অসামাজিক বা ধর্মবিরোধী নয় তা প্রচারের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা ও সুযোগের ব্যবস্থা করারও প্রয়োজন রয়েছে। স্বাস্থ্য ও সামর্থ্য নির্বিশেষে বিবাহ করার যে সামাজিক ছাড়পত্র রয়েছে তা রোধ করা দরকার। যারা আর্থিক, নৈতিক ও দৈহিক দিক থেকে পরিবার প্রতিপালনে সম্পূর্ণ সক্ষম একমাত্র তারাই বিবাহ করার যোগ্য বলে বিবেচিত হওয়া উচিত। এভাবেই শুধু সুস্থ, সবল নাগরিক সৃষ্টি করা সম্ভব। অন্যদিকে মৃত্যুহার যাতে হ্রাস পায় তার প্রতিও দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। অত্যধিক মৃত্যু-হার যেমনি দারিদ্র্যের লক্ষণ তেমনি দারিদ্র্যই অত্যধিক মৃত্যুহারের কারণ।

মৃত্যুহার হ্রাস করতে হলে দারিদ্র্য দূর করতে হবে ও জনসাধারণের স্বাস্থ্য রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।

কাম্য জনসংখ্যা অতিরিক্ত জনসংখ্যা সমস্যার পূর্ণ সমাধানের পথ নয়। এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে আয় ও সম্পদের বণ্টন সমস্যা। মুষ্টিমেয়র জন্য উৎপন্ন ধনসম্পদ মুষ্টিমেয়র কাছে যতই যুক্তিযুক্ত হউক না কেন জাতির অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে তা এক প্রচণ্ড সমস্যা রূপেই থেকে যাবে। জনসংখ্যা সমস্যার প্রকারভেদ হবে না। অন্য কথায়, জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান শুধু জনসংখ্যার কাম্যস্তরের উপরই নির্ভর করে না, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও উৎপাদনের সুষম বণ্টন প্রশ্নটিও এর সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত।

জনসংখ্যা নীতি

জনসংখ্যা নীতির উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে গিয়ে জি. মিরডাল বলেন, জনসংখ্য নীতি সামাজিক নীতির অঙ্গস্বরূপ। সামাজিক নীতির পরিবর্তন সাধনই এর উদ্দেশ্য।

বি. বারেলসন মনে করেন, জনসংখ্যা নীতির মাধ্যমে সরকার জনসংখ্যা সম্পর্কিত ঘটনার পরিবর্তন সাধন বা পরিবর্তন ঘটাবার মত অবস্থা সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। ইউনেসকোর পোপুলেশন কমিশন কর্তৃক নিযুক্ত কনসালটেটিভ গ্রুপ অব এক্সপারটস পূর্বোক্ত মতই পোষণ করেন। এঁদের মতে জনসংখ্যা নীতি জনসংখ্যা সম্পর্কিত পন্থা ও কর্মসূচীর ভিত্তিতে রচিত হবে। উদ্দেশ্য হবে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং জনসংখ্যা ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত লক্ষ্যে উপনীত হওয়া।

জনসংখ্যা নীতির উদ্দেশ্য পরোক্ষে জনপ্রতি আয়, বাসগৃহ ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থানের প্রসার সাধন, জনগণের পুষ্টি বৃদ্ধি এবং শিক্ষা, জাতীয় উৎপাদন ও উৎপাদন ক্ষমতার উন্নতিসাধন। এ সমস্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংশ্লিষ্ট দেশটিকে প্রজনন সীমা নির্ধারণ, মৃত্যুর হার হ্রাস, দেশান্তরে গমন নীতি রচনা ও জনসংখ্যার সুষম ভৌগোলিক বা আঞ্চলিক বণ্টন প্রভৃতি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সমগ্র বিষয়টির কার্যকারিতা নির্ভর করে স্বল্প সময়ে রূপায়ণ সম্ভব এমন সুপরিকল্পন ও তা কার্যকর করার উপর।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জনসংখ্যা নীতির উদ্দেশ্য ন্যায়, স্বাধীনতা, শান্তি ও সর্বস্তরে ক্ষমতার সুষম বণ্টন সুনিশ্চিত করা। সেজন্য প্রয়োজন গণতান্ত্রিক

সরকার, শিক্ষিত জনসমাজ, দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন এবং জনসংখ্যার যথাযথ আঞ্চলিক বণ্টন।

জনসংখ্যা নীতির অপর একটি উদ্দেশ্য প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সমতা রেখে জনবসতির উন্নতিসাধন। ঘনবসতিপূর্ণ শিল্পাঞ্চলে জনসংখ্যার চাপ হ্রাস করতে পারলে নানাপ্রকার দৈহিক ও মানসিক ব্যাধি হ্রাস পাবে। প্রাকৃতিক পরিবেশ ক্ষুণ্ণ না করে জনবসতি বণ্টন করা হলে স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পরিবেশের আনন্দ থেকে মানুষ বঞ্চিত হবে না। বৃষ্টিপাত ব্যাহত হবে না। পশুপাখীর জীবনযাপন নিরাপদ ও সমগ্র পরিবেশ গুঞ্জরণ মুখর হয়ে উঠবে।

বলিষ্ঠ জনসংখ্যা নীতি এবং তার সুষ্ঠ রূপায়ণ সামাজিক ক্ষেত্রে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সৌন্দর্যবোধের মান বৃদ্ধি করে দেশবাসীদের সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করে তুলবে।

জনসংখ্যা নীতি কার্যকর করার উপায়

(1) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপযোগিতা ও সুস্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক শিক্ষার ব্যাপক প্রচার।

(2) জনগণ যাতে স্বেচ্ছায় জন্মনিয়ন্ত্রণে উৎসাহী হয় সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া। যথা, পরিবার পরিকল্পনার কর্মসূচী সম্পর্কে আইন প্রণয়নের আশ্রয় নেয়া ও রাজ্যস্তরে স্বাস্থ্য সম্পর্কে কর্মসূচী গ্রহণ।

(3) স্ত্রীলোকদের শিক্ষা ও যথাযথ সামাজিক মর্যাদা দেয়া। তাদের জন্ম-নিয়ন্ত্রণে উৎসাহিত করা।

(4) জন্মনিয়ন্ত্রণে উৎসাহ দেয়ার জন্য পুরস্কার দানের ব্যবস্থা করা। যেমন, আর্থিক পুরস্কার, পারিবারিক ভাতা, চাকরির ক্ষেত্রে পদোন্নোতি ব্যাপারে অগ্রাধিকার, বেতন বৃদ্ধি, চাকরিতে পদ সংরক্ষণ, একটি বা দুটি সন্তানের অধিকারী স্বামী-স্ত্রীর শিশু সন্তানদের শিক্ষার বিশেষ সুযোগ দেয়া প্রভৃতি।

ব্যাধিগ্রস্ত ও অসমর্থ ব্যক্তিদের আইনের সাহায্যে বিবাহ নিষিদ্ধ করা। প্রয়োজন হলে জন্মনিয়ন্ত্রণ কার্যকর করার জন্য আইনের সাহায্য নেয়া। বিবাহের ন্যূনতম বয়স নির্ধারণ, গর্ভপাত বাধ্যতামূলক ও সন্তানের সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেয়া।

ভারতের জনসংখ্যা নীতি

স্বাধীনতার পূর্বে ভারতে জনসংখ্যা সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট নীতি ছিল না। সে সময় জনসংখ্যা সমস্যা তেমন বিরাট ও জটিল আকারও ধারণ করেনি। তাছাড়া তখন ভারতীয়দের ধর্ম, আচার ও অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করে বৈরী প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হওয়ার ইচ্ছাও ব্রিটিশ শাসকদের ছিল না। 1935 সনে সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিশন জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলাফল সম্পর্কে জগতকে সচেতন করে দেয়। কমিশনের মতে সামাজিক, পারিবারিক ও জাতীয় অর্থনীতির স্বার্থে পরিবার পরিকল্পনা ও সন্তানের সংখ্যা সীমিত করা অপরিহার্য। এ প্রসঙ্গে সুষ্ঠু জনসংখ্যা নীতি রচনার জন্য তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারকে উদ্যোগী হতে বলা হয়।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও জনসংখ্যা নীতি ঃ পরিবার পরিকল্পনা

প্রথম পরিকল্পনা (1951-56)

প্রথম পরিকল্পনায় জনসংখ্যা সমস্যার গুরুত্ব সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক করে দেয়া হয়। এ সময় যে জনসংখ্যা নীতি রচনা করা হয়েছিল তার ভিত্তি ছিল পরিবারের আয়তন অপেক্ষা পরিবারের স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দের প্রতি জনগণের অধিকতর স্বেচ্ছামূলক আগ্রহ সৃষ্টি করা। তাছাড়া দ্রুত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ নির্ণয়, প্রজনন সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ, প্রজনন নিয়ন্ত্রণ, গণশিক্ষা বিস্তারের উপায় নির্ধারণ ও হাসপাতালগুলিতে পরিবার পরিকল্পনার উপদেষ্টা কেন্দ্র স্থাপন প্রভৃতির উপর গুরুত্ব দেয়া হয়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা (1956-61)

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় জনসংখ্যা সমস্যাকে অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হয়। প্রধানত নিম্নলিখিত কর্মপন্থা গ্রহণ করা হয়।

(i) পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক পরামর্শ ও উপদেষ্টাদের সাহায্য যাতে সহজে পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা।

(ii) পরিবার পরিকল্পনার কর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা।

(iii) প্রজনন শিক্ষা, জনসংখ্যা সম্পর্কিত শিক্ষা, বিবাহ ও সন্তানধারণ ও পালন সম্পর্কে শিক্ষার বিস্তার।

(iv) জনসংখ্যা ও প্রজনন সম্পর্কিত সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলির কাজকর্মের মূল্যায়ন ও সমীক্ষণ।

তৃতীয় পরিকল্পনা (1961-66)

তৃতীয় পরিকল্পনায় প্রধান লক্ষ্য ছিল :

1. পরিবার পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য উপযুক্ত সামাজিক পরিবেশ গড়ে তোলা ও সেজন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষার প্রসার সাধন।

2. জনস্বাস্থ্যের সাধারণ সেবামূলক ব্যবস্থার সঙ্গে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর সমন্বয় সাধন।

3. চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্যমূলক কাজকর্মের মধ্য দিয়ে নির্বীর্যতা দূরীকরণ ও জন্মনিরোধের উপকরণ বণ্টনের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ।

4. ডাক্তারী ও অন্যান্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যসূচীতে পরিবার পরিকল্পনা যুক্ত করা।

5. পরিবার পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য স্বেচ্ছামূলক সংস্থাগুলির ও স্থানীয় জননেতাদের সহযোগিতা নেয়া।

বার্ষিক পরিকল্পনা (1966-69)

তৃতীয় পরিকল্পনাকালীন পরিবার পরিকল্পনা জনগণের মধ্যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে চেতনা সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল। পরবর্তী তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনায় এ চেতনা অধিকতর কার্যকর হয়। এ সময়কালীন পরিবার পরিকল্পনা খাতে 82 কোটি 93 লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ হয়। এর মধ্যে 70 কোটি 46 লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। 74 লক্ষ লোককে নির্বীর্য করা হয় এবং প্রায় 2·1 লক্ষ ব্যক্তি লুপের সাহায্য নেয়। 1956-66 সনে, অর্থাৎ, দশবছর পূর্বে এদের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে 18 লক্ষ ও 9 লক্ষ।

চতুর্থ পরিকল্পনা (1969-74)

চতুর্থ পরিকল্পনায় পরিবার পরিকল্পনার সমর্থনে বলা হয়, জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজন একদিকে বর্ধিত হারে অর্থনৈতিক উন্নয়ন অপরদিকে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার হ্রাস। এ উদ্দেশ্যে প্রজনন ক্ষমতা 1969 সনে প্রতি হাজারে 39 থেকে কমিয়ে 1978 সনে প্রতি হাজারে 32 ও 1979 সনে 25 করার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়। পরিবার পরিকল্পনা খাতে ব্যয় বরাদ্দ 330 কোটি টাকা ধরা হয়। এর মধ্যে 284 কোটি 43 লক্ষ টাকা বিনামূল্যে জন্মনিয়ন্ত্রণের উপকরণ সরবরাহ ও জন্মনিরোধে উৎসাহিত করার জন্য ব্যয় করার

প্রস্তাব করা হয়। বাকী 46 কোটি টাকা গবেষণা, প্রশিক্ষণ, মূল্যায়ন প্রভৃতি কাজের জন্য বরাদ্দ হয়।

পঞ্চম পরিকল্পনা (1974-79)

পঞ্চম পরিকল্পনায় পরিবার পরিকল্পনার উপর আরো গুরুত্ব দেয়া হয়। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য যে সমস্ত পন্থা গ্রহণের প্রস্তাব করা হয় তার মধ্যে রয়েছে বিবাহের ন্যূনতম বয়স বৃদ্ধি, স্ত্রীশিক্ষার প্রসার, প্রজনন সম্পর্কে গবেষণা ও নির্বীর্যকরণ বাধ্যতামূলক করার জন্য আইন প্রণয়ন। তাছাড়া জন্মহার প্রতি হাজারে 25 ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার পরিকল্পনার শেষাশেষি 1·4 শতাংশে নিয়ে আসা। পঞ্চম পরিকল্পনায় পরিবার পরিকল্পনা খাতে 497 কোটি 36 লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়। এর মধ্যে 237 কোটি 65 লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

ষষ্ঠ পরিকল্পনা (1980-85)

ষষ্ঠ পরিকল্পনায় জনসংখ্যা নীতির প্রধান উদ্দেশ্য 1995 সনের মধ্যে নীট পুনঃপ্রজননের হার জাতীয় স্তরে বর্তমান 1·67 শতাংশ থেকে এককে নাবিয়ে আনা। 2001 সনের মধ্যে সমস্ত রাজ্যেও পুনঃপ্রজননের হার এককে নাবিয়ে আনার প্রস্তাব রাখা হয়। এ প্রস্তাব কার্যকর করতে হলে জন্মহার প্রতি হাজারে 21 ও মৃত্যুহার 9 এবং পরিবার পরিকল্পনাভুক্ত দম্পতির সংখ্যা 60 শতাংশ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

সন্তান ধারণে সমর্থ স্ত্রীলোকের সংখ্যা বৃদ্ধি লক্ষণীয়।

সন্তান ধারণে সমর্থ স্ত্রীলোক (বয়স 15-44)

বছর	মোট স্ত্রীলোকের সংখ্যার শতাংশ
1980	44·74
1985	46·44
1990	47·96
1996	49·19

সূত্র : ষষ্ঠ পরিকল্পনা।

বর্তমানে প্রায় 46 শতাংশ স্ত্রীলোক সন্তান ধারণের উপযোগী। 1996 সনে প্রায় 50 শতাংশ স্ত্রীলোক মাতৃত্বের জন্য প্রস্তুত হবে। এ অবস্থায় সন্তান

ধারণ করার প্রতি অনাগ্রহ সৃষ্টি করার মত পরিবেশ গড়ে তোলা ছাড়া উপায়ান্তর নেই। অর্থাৎ, শিক্ষা বিস্তার, দারিদ্র্য দূরীকরণ, স্ত্রীলোকদের অধিকতর সামাজিক মর্যাদা ও চাকরির সুযোগ দেয়া প্রভৃতি পন্থার শরণাপন্ন হতে হবে। পরিবার পরিকল্পনার কর্মসূচীও এ দৃষ্টিভঙ্গীতে ঢেলে সাজাতে হবে। জন্মনিয়ন্ত্রণ যে জুলুম নয়, এক মহান পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য এ শিক্ষায় জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে।

কর্মসূচী

নীট পুনঃপ্রজননের হার 1995 সনের মধ্যে এককে নাবিয়ে আনার জন্য ষষ্ঠ পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত কর্মসূচী রূপায়ণের কথা বলা হয়েছে ঃ

(1) পরিবারের আয়তন 4·2 সন্তানবিশিষ্ট থেকে হ্রাস করে 2·3 সন্তান-বিশিষ্ট করা।

(2) জন্মহার প্রতি হাজারে (1978 সনে) 33 থেকে হ্রাস করে 21 করা।

(3) মৃত্যুহার* প্রতি হাজারে (1978 সনে) 14 থেকে হ্রাস করে 9 করা।

(4) জন্মকালীন গড় আয়ুষ্কাল 1976-81 সনে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে যথাক্রমে 52·6 ও 51·6। 1991-96 সনে তা বৃদ্ধি করে যথাক্রমে 60·1 ও 59·8 করা।

(5) বর্তমানে সন্তান ধারণে সমর্থ 22 শতাংশ দম্পতি পরিবার পরিকল্পনা দ্বারা সংরক্ষিত। এদের সংখ্যা 60 শতাংশে নিয়ে আসা।

বিংশ শতাব্দীর শেষাশেষি ভারতের জনসংখ্যা প্রায় 99 কোটি ও 2100 সনে তা 163 কোটি হবে। 2010 সনে জনসংখ্যা বৃদ্ধি স্থিতিশীল হবে বলে ধরা হয়েছে।

কতিপয় বিষয়ের উপর গুরুত্ব স্থাপন

ষষ্ঠ পরিকল্পনায় পরিবার পরিকল্পনা রূপায়ণে নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

1. পরিবার পরিকল্পনায় সমস্ত মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে যুক্ত করতে হবে।

2. জনস্বাস্থ্য সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য 'ইনটিগ্রেটেড এপ্রোচ' গ্রহণ করতে হবে। পরিবার পরিকল্পনার সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিভাগের

---

* মৃত সন্তানের জন্ম ধরা হয়নি।

মধ্যে—যেমন, প্রস্থতি ও শিশুদের প্রতি যত্নবিধান—যথোপযুক্ত সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা করতে হবে।

3. শিক্ষার, বিশেষত স্ত্রীশিক্ষা, প্রসার সাধন করতে হবে। উচ্চ-শিক্ষার পাঠ্যস্থচীতে স্বাস্থ্য ও প্রজনন বিষয়টি যুক্ত করতে হবে।

4. পরিবার পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য সরকারী প্রচেষ্টার সঙ্গে যুব সংস্থা, মহিলামণ্ডল, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, পঞ্চায়েত রাজ সংস্থা ও অন্যান্য স্থানীয় সংস্থা এবং সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে যুক্ত করতে হবে। এর ফলে জনসাধারণ পরিবার পরিকল্পনার কার্যকারিতা সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞান অর্জন করতে পারবে। তাছাড়া, রেডিও, টি-ভি, সিনেমা ও সংবাদপত্রের সহযোগিতার স্থযোগও নিতে হবে।

5. যারা নির্বীর্যকরণে মত দেবেন তাদের মজুরীর ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

6. শিশু বা প্রস্থতির মৃত্যু বা মৃত্যু আশঙ্কা অধিক সংখ্যক সন্তান কামনার অন্যতম কারণ। তাই স্বাস্থ্য, পুষ্টিকর খাদ্য ও জনস্বাস্থ্যের স্থব্যবস্থা করতে হবে।

7. বিভিন্ন প্রকার জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির উদ্ভাবন ও স্বল্প মূল্যে ও সহজে তা যাতে স্বামী-স্ত্রীরা পেতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। কৃত্রিম উপায়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ যে শারীরিক বা মানসিক ক্ষতিকর নয় তা তথ্যযুক্ত প্রচারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। যারা কৃত্রিম জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অবলম্বন করেছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে হবে। এর ফলে একদিকে জন্মনিয়ন্ত্রণের কার্যকারিতা সম্পর্কে নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করার যেমন স্থযোগ ঘটবে অন্যদিকে সরকারের বিশেষ যত্ন ও সতর্কতার কারণে পরিবার পরি-কল্পনা কর্মস্থচী আরো জনপ্রিয় হয়ে উঠবে।

8. জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে গভীর ও ব্যাপক গবেষণা চালাতে হবে। এ সম্পর্কিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক গবেষণা কাজেও উদ্যোগী হতে হবে।

9. পরিবার পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত কর্মীরা যে এক মহান ও বিশেষ সামাজিক ও জাতীয় অর্থনৈতিক কাজের সঙ্গে জড়িত এ মনোভাব তাদের মধ্যে জাগ্রত করতে হবে। তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ও চাকরির ক্ষেত্রে উন্নতির ব্যবস্থা করতে হবে।

10. স্বাস্থ্যের কারণে মেডিক্যাল টার্মিনেসন্ অব প্রেগন্যানসি এ্যাক্টের

বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। কৃত্রিম পদ্ধতিতে জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যর্থতার ফলস্বরূপ অন্তঃসত্ত্বা ক্ষেত্রেও এ আইনের সুবিধা দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

11. বিবাহ করার ন্যূনতম বয়স বৃদ্ধি করে জনসংখ্যা হ্রাস করা একটি সহজ পন্থা। অল্প বয়সে বিবাহের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে হবে।

ষষ্ঠ পরিকল্পনায় পরিবার পরিকল্পনার জন্য ব্যয় বাবদ মোট 1010 কোটি টাকা ধরা হয়েছে। এর মধ্যে সেবা ও সরবরাহ খাতে ব্যয় ধরা হয়েছে 687 কোটি টাকা। 1974-75 সন থেকে 1978-79 সন পর্যন্ত পরিবার পরিকল্পনা খাতে মোট ব্যয় হয়েছে 516·53 কোটি টাকা।

ষষ্ঠ পরিকল্পনায় রুরাল ফ্যামিলি প্ল্যানিং সেণ্টারগুলির অসমাপ্ত গৃহনির্মাণ কার্য সমাপ্ত করা হবে। 1100 নতুন গৃহও নির্মাণ করা হবে। তাছাড়া 51 রুরাল ফ্যামিলি প্ল্যানিং সেণ্টার, 44000 নতুন সাব-সেণ্টার ও শহরাঞ্চলে 800 ফ্যামিলি প্ল্যানিং সেণ্টার স্থাপন করা হবে। যে সমস্ত অঞ্চল পরিবার পরিকল্পনায় অনগ্রসর সে সমস্ত অঞ্চলে অঞ্চল প্রকল্পগুলির কর্তৃত্বে বিশেষ স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত উদ্যোগ নেয়ার উল্লেখ রয়েছে। 12 রাজ্য ও 46 জেলা এর ফলে উপকৃত হবে।

জরুরী অবস্থাকালীন (জুন 25, 1975—মার্চ 1977)

1976 সনের 16 এপ্রিল জাতীয় জনসংখ্যা নীতি ঘোষিত হয়। এ নীতি আইনের সাহায্যে বাধ্যতামূলকভাবে রূপায়ণের চেষ্টা করা হয়। এ নীতিতে যে সমস্ত পন্থা অবলম্বনের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখ্য ঃ

(1) রাজ্য সরকারগুলির তাদের বার্ষিক পরিকল্পনা রূপায়ণে কেন্দ্রীয় অর্থসাহায্যের 8 শতাংশ পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীতে ব্যয় করার জন্য নির্দিষ্ট রাখা।

(2) আইনের সাহায্যে স্ত্রীলোকদের বিবাহের ন্যূনতম বয়স 14 থেকে বৃদ্ধি করে 18 ও পুরুষদের ক্ষেত্রে 18 থেকে 21 করা।

(3) রাজ্যগুলিকে নিজ নিজ রাজ্যে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকদের বর্ণ ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে বাধ্যতামূলকভাবে নির্বীর্য করার জন্য প্রয়োজনীয় আইন করার অধিকার দেয়া। যারা তিন বা ততোধিক সন্তানের জননী কেবল তাদের ক্ষেত্রেই এ আইন প্রণয়নের কথা বলা হয়।

(4) পরিবার পরিকল্পনায় জনগণকে আকৃষ্ট করার জন্য রাজ্য সরকার-

গুলিকে গৃহবণ্টন, ঋণদান প্রভৃতি বিষয়ে পরিবার পরিকল্পনায় উৎসাহীদের অগ্রাধিকার দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় নীতি নির্ধারণের স্বাধীনতা দেয়া।

(5) পরিবার পরিকল্পনা জনপ্রিয় করার জন্য নানাপ্রকার আর্থিক প্রেরণা ও চাকরিতে সুযোগসুবিধা দেয়ার ব্যবস্থা করা। এমনকি যারা পরিবার পরিকল্পনার জন্য অর্থদান করবে তাদের আয়করের সুবিধা দেয়ার ব্যবস্থা করা।

(6) পরিবার পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপন।

(7) দীর্ঘকালীন নীতি রূপে তরুণ-তরুণীদের মধ্যে জনসংখ্যা সম্পর্কিত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা। তাছাড়া প্রজনন ও কৃত্রিম পদ্ধতিতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত কাজে রাজ্য সরকারগুলিকে উৎসাহিত করার জন্য কেন্দ্রীয় সমর্থন জ্ঞাপন করা।

ফলাফল

জরুরী অবস্থাকালীন পরিবার পরিকল্পনা অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে। কংগ্রেসের যুবসম্প্রদায়, সরকারী প্রশাসন ও জনগণের সমর্থন এ সাফল্যের মূলে। রাজ্য সরকারগুলির সমর্থন এবং উদ্যোগও উল্লেখযোগ্য। কোন কোন রাজ্যে এর বাড়াবাড়ি দেখা যায়। যেমন, সরকারী নির্দেশ সত্ত্বেও যারা নির্বীর্যকরণে অসম্মত ছিল বা পরিবার পরিকল্পনার কর্মসূচী রূপায়ণে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতায় ইচ্ছুক ছিল না তাদের সরকারী ব্যয়ে চিকিৎসার সুবিধা, ভ্রমণ বা স্থানান্তর ভাতা ও ঋণ পাওয়া থেকে বঞ্চিত করা হয়। বাসস্থান পাওয়া ব্যাপারেও তাদের অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করা হয়। দু'য়ের অধিক জননীদের সন্তান ধারণকালীন ছুটি থেকে বঞ্চিত করা হয়। ফলে অনেকেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও পরিবার পরিকল্পনায় সাড়া দিয়েছিল। অনেকের মতে প্রধানত এ কারণেই 1977 সনের লোকসভার সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস সরকারের পতন ঘটে। জনতা দল ক্ষমতায় আসে। জরুরী অবস্থার অবসান ঘটার সঙ্গে সঙ্গে পরিবার পরিকল্পনার অগ্রগতিও স্তিমিত হয়ে আসে। 1976-77 (এপ্রিল-জুলাই) থেকে 1977-78 (এপ্রিল-জুলাই) পর্যন্ত নির্বীর্যকরণ 80·2 শতাংশ হ্রাস পায়। আই-ইউ-ডি ও প্রচলতি জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির হ্রাসের পরিমাণ যথাক্রমে 58·0 ও 14·6 শতাংশ।

জনতা সরকার ও পরিবার পরিকল্পনা

1977 সনের মার্চে জরুরী অবস্থার অবসান ঘটে। সঙ্গে সঙ্গে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে সে সমস্ত জবরদস্তিমূলক বিধি-নিষেধ আরোপিত হয়েছিল তারও অবসান ঘটে। জনতা সরকার ক্ষমতায় এসে "পরিবার পরিকল্পনা"-র পরিবর্তে "পরিবার কল্যাণ" চালু করে। জরুরী অবস্থাকালীন একশ্রেণীর লোক অর্থোপার্জনের জন্য জোর করে দুর্বল শ্রেণীদের নির্বীর্যকরণের কাজে লিপ্ত ছিল। জনতা সরকার নির্বীর্যকরণ স্বেচ্ছামূলক ঘোষণা করে তা দূর করে। ব্রহ্মচর্য পালন ও ইন্দ্রিয় জয় করার জন্য জনগণের কাছে আবেদন রাখা হয়। জনগণের কল্যাণসাধনের দিকে লক্ষ্য রেখে—যেমন, পানীয় জলের ব্যবস্থা, গ্রামাঞ্চলের অস্বাস্থ্যকর অবস্থা দূর করা, স্বল্প মূল্যের ওষুধপত্র তৈরি, রোগ প্রতিষেধকমূলক ব্যবস্থা নেয়া প্রভৃতি—পরিবার পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণের দিকে গুরুত্ব দেয়া হয়। তাছাড়া পরিবার কল্যাণের কর্মসূচীর সঙ্গে অন্ন-বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চাকরি ও নারীকল্যাণ প্রভৃতি কল্যাণমূলক কর্মসূচী যুক্তকরণের প্রস্তাব রাখা হয়। নতুন স্বাস্থ্য পরিকল্পনায় গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক চিকিৎসার সুযোগ দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায় থেকে কর্মী নিয়োগ করে তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

যাদের নির্বীর্য করা হয়েছে তাদের ক্ষতিপূরণ বাবদ 70 টাকা করে দেয়া হয়। যদি কোন ব্যক্তি নির্বীর্যকরণের 10 দিনের মধ্যে যে কোন কারণেই হোক না কেন মারা যায় তবে তার স্ত্রী/স্বামীকে 5000 টাকা ক্ষতিপূরণ দেয়ার কথাও ঘোষণা করা হয়।*

---

* এ প্রসঙ্গে পৃথিবীর বৃহত্তম জনবহুল দেশ চীনের জনসংখ্যা সমস্যার কথা উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। জনসংখ্যার বৃদ্ধি হ্রাস করা সে দেশের একটি বিশেষ সমস্যা। এজন্য চীনসরকার 1971 সন থেকে যে সব পন্থা গ্রহণ করেছে তার মধ্যে রয়েছে একটি মাত্র সন্তান বিশিষ্ট পরিবারকে বার্ষিক 40 ডলার বোনাস দেয়ার ব্যবস্থা। বোনাস প্রাপ্ত পরিবারের শিশুটিকে কিণ্ডারগার্টেনে ভর্তি হওয়ার ব্যাপারে অগ্রাধিকার প্রদান। বিজিং ও সাংহাইয়ের মত মেট্রোপলিটন শহরে যেখানে দক্ষিণা দিয়ে বাসস্থান সংগ্রহ করতে হয় সেখানে বসবাস করার জন্য তাদের হাউজিং কনসেসন দেয়া। দুই বা ততোধিক সন্তানের জননীদের উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থারূপে তাদের বেতনের 10 শতাংশ কর বাবদ কেটে রাখা। এ কর-লব্ধ অর্থ দিয়ে সরকার তাদের সন্তানদের লালনপালনের ব্যয়ভার লাঘব করার ব্যবস্থা করবে। পরিবার পরিকল্পনা সমিতি অস্ত্রোপচারের সাহায্যে জন্মনিয়ন্ত্রণে স্বামী-স্ত্রীদের উৎসাহিত করছে।

1980 সনে চীনের উপ-প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে শহরের 95 শতাংশ ও গ্রামাঞ্চলের 90

লক্ষণীয় যে 1971-72 সনে সর্বাপেক্ষা বেশি লোককে নির্বীর্য করা হয়। 1974-75 সনে তা হ্রাস পায়।

বিভিন্ন প্রকার জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি দ্বারা সুরক্ষিত স্বামী-স্ত্রীর সংখ্যা

বছর	শতাংশ
1966-67	4·5
1974-75	13·4
1975-76	16·4
1976-77	16·3

পরিবার পরিকল্পনায় সর্বাধিক সাড়া দিয়েছে হিন্দু সম্প্রদায়। অবশ্য এ কারণে হিন্দু সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা হ্রাসের হার অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের তুলনায় বেশি। এর ফলে ভবিষ্যতে ধর্ম সম্পর্কিত সামাজিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হবার আশঙ্কা অমূলক নয়।

সম্প্রদায়ভেদে পরিবার পরিকল্পনা (শতাংশ)

সম্প্রদায়	নির্বীর্যকরণ	আই-ইউ-ডি
হিন্দু	88·5	5·1
মুসলমান	6·0	6·9
খ্রীষ্টান	2·2	2·2
শিখ	2·7	5·5
অন্যান্য	0·6	0·3

যত লোক প্রজনন ক্ষমতা হারিয়েছে তার মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা 88·5 শতাংশ।

পরিবার পরিকল্পনায় গ্রামের লোকেরা সাড়া দিয়েছে বেশি। তাদের সন্তান-সন্ততির আধিক্য, অশিক্ষা ও দারিদ্র্য এর কারণ।

শতাংশ স্বামী-স্ত্রীর একটি মাত্র সন্তানের বেশি সন্তানের অধিকারী হওয়া চলবে না। 1982 সনের মধ্যে অধিকাংশ প্রদেশ ও পৌর সংস্থা এ উদ্দেশ্য কার্যকর করার জন্য বিবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

সূত্র : ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট, ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক 1984।

7 কৃষি

গুরুত্ব

ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। ভারতের প্রায় 80 শতাংশ লোক গ্রামে বাস করে। 1960 সনে কর্মরত ব্যক্তিদের 74 শতাংশ কৃষি থেকে জীবিকা অর্জন করত। 1979 সনে তা হ্রাস পেয়ে 71 শতাংশ হয়। যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে যথাক্রমে 3 শতাংশ ও 5 শতাংশ কর্মরত ব্যক্তি জীবিকার জন্য কৃষির সঙ্গে জড়িত। ভারতে জাতীয় আয়েও কৃষির প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। 1960 সনে স্থূল দেশীয় উৎপাদনে কৃষির অংশ ছিল 50 শতাংশ। 1979 সনে তা হ্রাস পেয়ে 38 শতাংশ হয়। এ শিল্পোন্নয়নের বলিষ্ঠ ইঙ্গিত হলেও কৃষির প্রাধান্য যে অক্ষুণ্ণ রয়েছে তা স্বীকার করতেই হবে।

অন্য দিক দিয়ে দেখতে গেলে কৃষি জাতির অমূল্য সম্পদ। কৃষি মাতৃসমা। কৃষিকার্যের ফলে খাদ্যশস্য ও বহুবিধ কাঁচামাল পাওয়া যায়। পর্যাপ্ত পরিমাণ পুষ্টিকর খাদ্যশস্য শ্রমিকদের সুস্থ ও কর্মরত এবং দেশকে দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ থেকে মুক্ত রাখতে পারে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ভারতের প্রায় 50 শতাংশ লোক দরিদ্র। কৃষিপ্রধান ভারতের গ্রামীণ বেকারত্ব ও দারিদ্র্য দূরীকরণের একমাত্র পথ কৃষিক্ষেত্রের আমূল পরিবর্তন ও উন্নয়ন সাধন। কৃষিকার্য থেকে প্রাপ্ত কাঁচামালের যোগান শিল্পোন্নয়নের প্রথম শর্ত। অবশ্য শিল্পের উন্নতির সঙ্গে কৃষির উন্নতিও জড়িত। কৃষি যন্ত্রপাতি, নদী উপত্যকা প্রকল্প, রাসায়নিক সার, কৃষি ভিত-কাঠামো প্রভৃতি শিল্পের অবদান। কৃষকদের গৃহ, বস্ত্র, আসবাবপত্র প্রভৃতিও শিল্প ক্ষেত্র থেকেই আসে। উভয়ের সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। খাদ্যশস্য ও কাঁচামালের অভাবের দরুনই প্রধানত জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি পায়; শ্রমিক বিক্ষোভ ও সামাজিক অশান্তির সৃষ্টি হয়। প্রসঙ্গক্রমে, ভোগ্য দ্রব্যাদির উপর মোট জাতীয় ব্যয়ের 80 শতাংশ ব্যয়িত হয় কৃষিদ্রব্যে। খাদ্যের জন্য ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ মোট ব্যয়ের প্রায় 63 শতাংশ। এর মধ্যে খাদ্যশস্যের উপর ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ প্রায় 37 শতাংশ। খাদ্যশস্য বা কাঁচামাল আমদানি করে এ অসমতা মিটাতে গেলে

দেশের বহির্বাণিজ্যে ভারসাম্যের অভাব ঘটার আশঙ্কা রয়েছে। খাদ্যশস্য আমদানি বৃদ্ধি করার অর্থ জাতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোকে উন্নয়নমুখী করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, প্রযুক্তিবিদ্যা প্রভৃতি আমদানি ব্যাহত করা।

বৈজ্ঞানিক যুগে কৃষি-ভিত্তিক কাঁচামাল ছাড়াই নানাপ্রকার শিল্প গড়ে উঠেছে। যেমন, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প। কিন্তু তা দ্বারা এ বুঝায় না যে, শিল্পে কৃষিজাত কাঁচামালের গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে। পাট ও বস্ত্র শিল্পের মত বৃহদায়তন শিল্পগুলির কথা ছেড়ে দিলেও ভারতে বহু ক্ষুদ্র শিল্প রয়েছে, যেমন, তাঁতশিল্প ও চালতুষস্খলন শিল্প, যা কৃষি-ভিত্তিক কাঁচামালের উপর নির্ভরশীল। বস্তুত যে দেশ কৃষিতে সমৃদ্ধ, যে দেশ পর্যাপ্ত উর্বর জমি ও খনিজ সম্পদের অধিকারী সে দেশ নিঃসন্দেহে সৌভাগ্যশালী। এরূপ দেশের পক্ষে অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করে দ্রুত উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এর প্রকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত।

কৃষিদ্রব্য ভারতে রপ্তানি বাণিজ্যের একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। চা, চিনি, তামাক, তৈলবীজ প্রভৃতি ভারতের অন্যতম প্রধান কৃষিজাত রপ্তানি দ্রব্য। 1960 সনে কৃষি-ভিত্তিক প্রাথমিক পণ্যদ্রব্য রপ্তানির অংশ ছিল মোট রপ্তানির 45 শতাংশ। 1978-79, 1979-80 ও 1980-81 সনে এর অংশ ছিল যথাক্রমে 27·5,28·9 ও 30·4 শতাংশ।

অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্য ও রেলের আয়ের প্রধান সূত্র কৃষিদ্রব্য বিনিময় ও পরিবহন। আবার এই কৃষির উপরই দেশের দশ জনের সাতজনের জীবিকা নির্ভর করছে। কৃষির উন্নতি অবনতির সঙ্গে তাদের আর্থিক ভাগ্য জড়িত। কেবল তাই নয় সমগ্র লোকসংখ্যার 80 শতাংশ লোকের আয়, ব্যয় ও সঞ্চয়ের উন্নতি অবনতির উপরই ভারতের শিল্প ও বাণিজ্য তথা অর্থ-নীতির গতি প্রকৃতি প্রায় সর্বাংশে নির্ভর করছে। সংক্ষেপে, জাতীয় আয়ের প্রায় 40 শতাংশ আসে কৃষিক্ষেত্র থেকে। দেশের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ লোক তাদের জীবিকা অর্জন করে কৃষিক্ষেত্র থেকে। অ-কৃষিক্ষেত্রের অধিকাংশ খাদ্য যোগান দেয় কৃষিক্ষেত্র ও অধিকাংশ শিল্পের কাঁচামালের সংস্থান হয় কৃষিক্ষেত্র থেকে।

উপসংহার

যে দিক দিয়েই দেখা যাক না কেন, ভারতে কৃষিকে উপেক্ষা করে শিল্পোন্নয়নের চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। ভারতীয় অর্থনীতিতে কৃষি ও শিল্প উভয়েরই পাশাপাশি গড়ে ওঠার পূর্ণ সুযোগও রয়েছে। উভয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিকল্পন সমস্যাই দেশের যথার্থ সমস্যা।

তবে কৃষির উপর অতিশয় নির্ভরশীলতা জাতির অর্থনীতির পক্ষে বিপজ্জনক। কারণ কৃষি উৎপাদন অনিশ্চিত। ভারতে কৃষি খেয়ালী মৌসুমী বায়ুর উপর নির্ভরশীল। খরা ও বন্যা কৃষির সর্বনাশা দু' সহচর। দু'এক বছর পর পরই জাতীয় অর্থনীতিকে এর মাসুল দিতে হয় প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতি স্বীকার করে।

বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কৃষিদ্রব্যের বিনিময় হার সাধারণত দেশের প্রতিকূলে যায়। তদুপরি কৃষি উন্নয়নের সম্ভাবনা শিল্পোন্নয়নের তুলনায় সীমিত। তাই কৃষির প্রাধান্য অনুন্নত অর্থনীতির স্বীকৃতি। তাছাড়া শিল্প বিশ্বমন্দার হাত থেকে যে দ্রুততার সঙ্গে মুক্ত হতে পারে কৃষির পক্ষে তা সম্ভব নয়। উল্লেখযোগ্য যে, ভারত কৃষিপ্রধান দেশ হলেও এবং কৃষি উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, উচ্চফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার, আধুনিক কৃষিপদ্ধতি প্রভৃতির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কৃষিক্ষেত্রে অনুন্নত।

ভারতীয় কৃষির বৈশিষ্ট্য

1. জনপ্রতি খাদ্য উৎপাদন কম

উন্নত দেশগুলির তুলনায় ভারতে প্রায় সমস্ত প্রকার কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদনশীলতা কম। কম উৎপাদনশীলতা ও জনসংখ্যার আধিক্যের কারণে ভারতে জনপ্রতি খাদ্য উৎপাদন কম।

জনপ্রতি খাদ্য উৎপাদনের গড় সূচক (1969-71 = 100)

দেশ	1980-82
যুক্তরাজ্য	126
যুক্তরাষ্ট্র	119
সোভিয়েত ইউনিয়ন	101

দেশ	1980-82
দক্ষিণ আফ্রিকা	193
চীন	124
জাপান	91
ভারত	101

সূত্র : ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট 1984।

2. জমির অপ্রতুলতা

পরিবার প্রতি জমির পরিমাণ

দেশ	পরিমাণ (হেক্টর)
নিউজিল্যাণ্ড	196
যুক্তরাষ্ট্র	86
যুক্তরাজ্য	26
ডেনমার্ক	15
ভারত	2·06

সূত্র : ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট 1983।

3. খণ্ডীকৃত ও বিক্ষিপ্ত জমি

খণ্ডীকৃত ও বিক্ষিপ্ত জমির মালিকানা ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ফলে দেখা যায়, ভারতে যে সমস্ত ক্ষেতে চাষ-আবাদ হয় তার 50 শতাংশের আয়তন 1 হেক্টরের কম, 19 শতাংশের আয়তন 1-2 হেক্টর, 15 শতাংশের আয়তন 2-4 হেক্টর ও 11 শতাংশের আয়তন 4-10 হেক্টরের মধ্যে। 10 হেক্টর ও ততোধিক জমির পরিমাণ মাত্র 4 শতাংশ।

4. ভূমিক্ষয়

বন সংরক্ষণ ও বন প্রসারের অভাবে ভূমিক্ষয় ভারতীয় কৃষিক্ষেত্রের অপর এক বৈশিষ্ট্য। 1972-73, 1973-74 ও 1974-75 সনে ভারতের অনুমিত বনাঞ্চলের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 6·54, 6·57 এবং 6·56 কোটি হেক্টর।

5. ভরণপোষণের উপযোগী কৃষিকার্য

সাধারণত কৃষকেরা তাদের নিজেদের পরিবারের ভরণপোষণের জন্য যে

পরিমাণ ফসল দরকার সে পরিমাণ ফসলই উৎপাদন করে। ফলে বাজারের জন্য উদ্বৃত্তের পরিমাণ আশানুরূপ হয় না। অন্য কথায়, পরিবহন ও সংগঠন ব্যবস্থার উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় কৃষি বাণিজ্যিক রূপ ধারণ করতে সমর্থ হয়নি। উন্নতমানের জীবনযাপনের প্রতি কৃষকদের আগ্রহের অভাব এর প্রধান কারণ।

6. অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিকার্য

আমাদের দেশে সাধারণত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষেতখামারে ব্যক্তিগত মালিকানায় ও সামর্থ্যে প্রাচীন পদ্ধতিতে কৃষিকার্য হয়ে থাকে। এর কারণ আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তিবিদ্যার অভাব এবং সমবায়-ভিত্তিক কৃষিকার্য ভারতে অপরিচিত বললেই চলে।

7. জলবায়ুর অনিশ্চয়তা

ভারতে কৃষি মৌসুমী বায়ুর খেয়ালের উপর নির্ভরশীল। কৃষি উৎপাদন তাই অনিশ্চিত। সেচ ব্যবস্থাও তেমন উন্নত নয়। যে সমস্ত জমিতে চাষ-আবাদ হচ্ছে তার মাত্র 24·3 শতাংশ জমিতে সেচের সুবিধা আছে।

8. অনাবাদী জমি

1978-79 সনে ভারতে মোট অনুমিত ভৌগোলিক অঞ্চলের পরিমাণ ছিল 32·88 কোটি হেক্টর। এর মধ্যে কর্ষণোপযোগী জমির পরিমাণ 30·47 কোটি হেক্টর। আবাদ অযোগ্য জমির পরিমাণ 6·74 কোটি হেক্টর। আবাদের জন্য পাওয়া যায় না এমন জমির পরিমাণ 3·93 কোটি হেক্টর। আবাদ যোগ্য অথচ আবাদ করা হয় না এমন জমির পরিমাণ 1·70 কোটি হেক্টর। ফসল উৎপাদন করা হয়েছে 17·51 হেক্টর জমিতে।

আবাদী জমির এ অপচয় খাদ্য সমস্যাকে আরো সঙ্কটময় করে তুলেছে। এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, আমাদের দেশে নীট সেচের সুবিধাপ্রাপ্ত অঞ্চলের পরিমাণ মাত্র 3·80 কোটি হেক্টর।

কম উৎপাদনশীলতার কারণ

ভারতীয় কৃষির উৎপাদনশীলতা কম। এর প্রধান কারণগুলির মধ্যে রয়েছে :

1. জমির উপর জনসংখ্যার অত্যধিক চাপ। ফলে জমি খণ্ডীকরণ ও জমির মালিকানার বিক্ষিপ্ততা সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। অতি ক্ষুদ্রাকায় ক্ষেত-

খামার, জমির সুনির্দিষ্ট মালিকানার অভাব, জমির মালিক ও বর্গাদারদের মধ্যে সংঘর্ষ, ছদ্মবেশী বেকার, দারিদ্র্য ও কৃষি উপকরণের অভাব প্রভৃতি কারণে উৎপাদনশীলতা ব্যাহত হয়ে থাকে।

2. শিক্ষা ও আগ্রহের অভাব। কৃষকদের সাধারণ ও কৃষি সম্পর্কিত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাবের ফলে তারা সাধারণত নতুন কর্মসূচী বা নতুন কৃষি পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত হতে চায় না। তাছাড়া জমির উপর নিজস্ব মালিকানা, উচ্চফলনশীল বীজ ও উন্নতমানের সারের অভাব এবং বাজারের অসুবিধা, গুদাম ঘরের অভাব, স্বল্প সুদে ও সুবিধাজনক শর্তে ঋণ পাওয়ার অসুবিধা প্রভৃতি কারণেও কৃষকেরা জমির উন্নতিসাধনের প্রতি বিশেষ আগ্রহ বোধ করে না।

3. প্রাচীন পদ্ধতিতে চাষ-আবাদ। যে সমস্ত দেশ কৃষিক্ষেত্রে বিপ্লব এনেছে তার পেছনে রয়েছে উন্নতমানের বীজ ও সারের প্রয়োগ এবং আধুনিক পদ্ধতিতে চাষ-আবাদ। সেজন্য যে পরিবেশ সৃষ্টি করা দরকার, যেমন, কৃষি সম্পর্কিত সুপরিকল্পিত সরকারী নীতি, উন্নত কৃষি প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের ব্যবস্থা, বিস্তৃত বাজার, উন্নত পরিবহন, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা প্রভৃতি, সাধারণভাবে বলতে গেলে ভারতে তার অভাব রয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে যে "সবুজ-বিপ্লব" ঘটেছে তার সুফল মুষ্টিমেয় ধনী জমির মালিকদের মধ্যে আবদ্ধ থাকাতে যে সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হয়েছে তাতে এ জাতীয় কৃষি বিপ্লবের উপযোগিতা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে। সবুজ বিপ্লবের উপযোগিতা সম্বন্ধে প্রতিটি কৃষককে অবহিতকরণ ও তার সুযোগসুবিধা যাতে প্রতিটি কৃষক পরিবার গ্রহণ করতে পারে তার ব্যবস্থার উপর কৃষি উৎপাদনশীলতায় বিপ্লব সংগঠন অনেকাংশে নির্ভর করে।

4. সেচের অভাব। বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তা ও অতিবৃষ্টি উভয়ই ভারতের কৃষিকার্যকে মৌসুমী বায়ুর উপর নির্ভরশীল করে রেখেছে বলা চলে। এর বিকল্প সেচ ব্যবস্থার উন্নতিসাধন। অথচ দেশের মোট কর্ষিত জমির মাত্র 28 শতাংশ সেচের সুবিধা পেয়ে থাকে।

5. সারের অভাব। জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করার জন্য দরকার প্রয়োজনীয় পরিমাণে রাসায়নিক সার। ভারতে প্রতি হেক্টর কর্ষণযোগ্য জমিতে সারের ব্যবহার যেখানে 30·9, সেখানে চীনে 1546, জাপানে 3721, যুক্তরাজ্যে

2936, যুক্তরাষ্ট্রে 1116 ও সিঙ্গাপুরে 5500। এর কারণ দেশে সারের উৎপাদন কম ও সারের জন্য বিদেশের উপর নির্ভরশীলতা।

6. অন্যান্য। তাছাড়া উচ্চফলনশীল বীজের অভাব এবং সরকার, সমবায় সমিতি ও ব্যাঙ্কগুলির আর্থিক সাহায্য দানের সীমাবদ্ধতা, পরিবহন ক্ষেত্রের অব্যবস্থা, সীমিত বাজার, গুদাম ঘরের অভাব, বাজারে মধ্যজীবীদের উপস্থিতি, কৃষি বীমার অভাব প্রভৃতিও পরোক্ষে বা অপরোক্ষে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির অন্তরায়। একই জমিতে একাধিক ফসল উৎপাদন ও কম জমিতে বেশি উৎপাদন করার শিক্ষা বা দৃষ্টিভঙ্গী ভারতের কৃষকদের নেই বললেই চলে। একই জমিতে একাধিক ফসল উৎপাদন করে বা ঘুরে-ফিরে একই ফসলের চাষ করলে যে জমির উর্বরতা শক্তি কম হ্রাস পায় ও হেক্টর প্রতি জমির উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে পারে সে সম্পর্কে সাধারণ কৃষকদের সচেতনতার অভাব।

7. ভূমি সংস্কার। অপরের জমি চাষ আর নিজের জমি নিজে চাষ—এ দুয়ের মধ্যে প্রথমটিতে শ্রম বিনিয়োগের আগ্রহ, নিবিড়তা ও দক্ষতার অভাব ঘটে। অর্থাৎ, উৎপাদনশীলতা ব্যাহত হয়। আমাদের দেশে আমূল ও ব্যাপক ভূমি সংস্কারের অভাবের ফলে জমির উপর মধ্যজীবীদের প্রভাব বর্তমান। এর ফলে উৎপাদনশীলতা ব্যাহত হচ্ছে।

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির উপায়

আমাদের দেশে জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করার বিশেষ কোন কারণ নেই। কারণ উৎপাদন বৃদ্ধির প্রায় যাবতীয় উপকরণ দেশ বা অল্প আয়াসে বিদেশ থেকে সংগ্রহ করার সুযোগ রয়েছে। অভাব মূলত কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ ও আমূল ভূমি সংস্কার এবং পরিবহন ও কৃষকদের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রেখে বাজার ব্যবস্থার উন্নতিসাধন। কৃষিকার্যকে একটি শিল্পরূপে গণ্য করারও প্রয়োজন রয়েছে। শিল্পক্ষেত্রে যেমন সুদক্ষ একশ্রেণী উদ্‌যোগী রয়েছে কৃষিক্ষেত্রেও তেমনি একশ্রেণী উদ্‌যোগী গড়ে তোলা সঙ্গত। চেম্বার অব কমার্সের মত চেম্বার অব এগ্রিকালচার সংস্থা গঠন ও কৃষি শ্রমিকদের শিল্প শ্রমিকদের মত সুসংবদ্ধ করার উপযোগিতা অস্বীকার করা যায় না। এর ফলে শিল্পক্ষেত্রের ন্যায় কৃষিক্ষেত্রেও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবার পথ সহজ ও প্রশস্ত হবে।

এ প্রসঙ্গে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারেল রিসার্চ (আই. সি.

এ. আর)-এর প্রস্তাব উল্লেখ করা যেতে পারে। আই. সি. এ. আর. কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য প্রযুক্তিবিদ্যা, সেবা ও সরকারী নীতির উপর গুরুত্ব দিয়েছে। তাঁদের মতে কৃষি গবেষণাগার ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি শস্য উৎপাদনের জন্য কেবল যাবতীয় উন্নত পদ্ধতি উদ্ভাবন করেই ক্ষান্ত না হয়ে কৃষিকার্যে তা হাতেকলমে প্রয়োগ করে এর উপযোগিতা কৃষকদের বুঝিয়ে দেয়ার দায়িত্বও তাদের নিতে হবে।

কৃষি সেবা বলতে কৃষিকার্যের জন্য যে সমস্ত উপকরণ প্রয়োজন তা সমষ্টি-গতভাবে সহজলভ্য করে দেয়া। সংক্ষেপে, কৃষকদের প্রয়োজন কৃষি সেবা, সম্পদ ও সংগঠন। তাদের চাহিদা ও তারা যথার্থ যা পাচ্ছে তার মধ্যে ব্যবধান রয়েছে অনেকটা। এ ব্যবধান দূর করা প্রয়োজন। কোন কোন ক্ষেত্রে, যেমন, জল পরিচালন ও কীট নিয়ন্ত্রণ, সমবায় সংগঠনের উপযোগিতা অস্বীকার করা যায় না।

সরকারী নীতির উপর কৃষকদের আধুনিক কৃষি প্রযুক্তিবিদ্যার সুযোগ নেয়া অনেকাংশে নির্ভর করে। যেমন, ভূমিস্বত্ব প্রথা, জমি একীকরণ, কৃষি উপকরণ ও কৃষি পণ্যদ্রব্যের দাম নির্ধারণ, বাজারকরণ ও স্টোরেজের সুব্যবস্থা প্রভৃতি। বস্তুত একীভূত প্রযুক্তিবিদ্যা, সেবা ও সরকারী নীতি নিবিড় সম্বন্ধযুক্ত এবং তাদের পারস্পরিক উন্নয়ন ছাড়া কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি সম্ভব নয়।

কৃষি উৎপাদন: পর্যালোচনা

1949-50 সন থেকে 1978-79 সন পর্যন্ত খাদ্যশস্যের উৎপাদন, অঞ্চল ও উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধির ঘোষিত হার যথাক্রমে 2·66, 0·84 ও 1·52 শতাংশ। 1967-79 সনে এই বৃদ্ধির হার যথাক্রমে 2·77, 0·44 ও 1·84 শতাংশ। পঞ্চম পরিকল্পনার শেষে খাদ্যশস্য উৎপাদনে বিশেষ সাফল্য লক্ষ্য করা যায়।

কৃষি উৎপাদন

বছর	উৎপাদন (মিলিয়ন টন)
1969-70	99·5
1970-71	108·4
1975-76	121·0

বছর	উৎপাদন (মিলিয়ন টন)
1977-78	126·4
1978-79	131·9
1979-80	109·0

সূত্র : ষষ্ঠ পরিকল্পনা।

1979-80 সনে খাদ্যশস্য উৎপাদনে অবনতি লক্ষণীয়। এর কারণ সে বছর খারিফ মরসুমে খরাতে বিভিন্ন অঞ্চলের খাদ্যশস্য নষ্ট হয়ে যায়। 1978-79 সনে সর্বোচ্চ পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদন হওয়ার কারণ সেচ, সার ও উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে চাষআবাদ করা। ফলে প্রতিকূল আবহাওয়ার প্রকোপ সত্ত্বেও খাদ্যশস্য রক্ষা করা সম্ভব হয়। যে কোন অনিশ্চিত অবস্থার মোকাবিলা করার ও খাদ্যশস্যের সরকারী বণ্টন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার জন্য 15 মিলিয়ন টনের একটি খাদ্য মজুত ভাণ্ডার গঠন করা হয়। ষষ্ঠ পরিকল্পনার শেষ বছর (1984-85) খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা 153·6 মিলিয়ন টন ধরা হয়েছে।

1978-79 সনে সর্বোচ্চ পরিমাণ চাল উৎপাদন হয়। এর পরিমাণ 53·8 মিলিয়ন টন। 1979-80 সনে দেশের বহুস্থানে খরা দেখা দেয়াতে সে বছর চালের উৎপাদন মাত্র 42·2 মিলিয়ন টন। চাল উৎপাদন বৃদ্ধির প্রধান কারণ চালের উচ্চফলনশীল (এইচ-ওয়াই-ভি) বীজ বপনের অঞ্চলের প্রসার সাধন। তাছাড়া সময় মত ধান রোপন, উপযুক্ত পরিমাণে সার প্রয়োগ ও উন্নত পদ্ধতিতে শস্য পরিচালন প্রভৃতি কারণও রয়েছে।

ষষ্ঠ পরিকল্পনার শেষ বছর (1984-85) চাল উৎপাদনের লক্ষ্যসীমা ধরা হয়েছে 63 মিলিয়ন টন। এ লক্ষ্যে পৌছাবার সম্ভাবনার পেছনে যে যুক্তি রয়েছে তা (i) 13·6 মিলিয়ন হেক্টর জমির পরিবর্তে 25 মিলিয়ন হেক্টর জমিতে এইচ-ওয়াই-ভি প্রয়োগ, (ii) অতিরিক্ত 2·5 মিলিয়ন হেক্টর জমিতে সেচের সুবিধা দান, (iii) চলতি কমিউনিটিজ নার্সারীজ অব রাইস, মিনিকিট ডেমনষ্ট্রেসনস ও ট্রেনিঙের ব্যবস্থা দৃঢ় করে তোলা এবং (iv) সর্বাধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে উচ্চভূমিতে আবাদ করা চালের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করা।

1978-79 সনে গমের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল 35·5 মিলিয়ন টন। 1979-80 সনে তা হ্রাস পেয়ে 31·6 মিলিয়ন টন হয়। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় গম উৎপাদনের পরিমাণ 44 মিলিয়ন টন ধরা হয়েছে। গমের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যে সমস্ত পন্থা অবলম্বন করার প্রস্তাব করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে :

(i) 13·5 মিলিয়ন হেক্টর জমির পরিবর্তে 19 মিলিয়ন হেক্টর জমিতে উচ্চফলনশীল বীজের সাহায্যে চাষের প্রসার সাধন ;

(ii) অধিকতর রাসায়নিক সারের ব্যবহার ;

(iii) বৈজ্ঞানিক উপায়ে জমির ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস ;

(iv) কৃষকদের উন্নত পদ্ধতিতে জমি চাষ করার কৌশলে দক্ষ করে তুলে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উৎসাহিত করা ;

(v) অধিকতর ক্ষেতখামারে প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগের জন্য সর্ববিধ সাহায্য করা।

ডালের উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ অতিশয় কম। 1949-50 সন থেকে 1978-79 সন পর্যন্ত ডালের উৎপাদন, অঞ্চল ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পরিমাণ বার্ষিক 1 শতাংশেরও কম। ভারতের মত দরিদ্র দেশের আহার্যে ডাল অতি প্রয়োজনীয় প্রোটিনপ্রধান খাদ্য। যেহেতু ডাল আমদানি করার সুযোগ কম তাই ষষ্ঠ পরিকল্পনায় ডাল উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ডালের উৎপাদন লক্ষ্যের পরিমাণ 14·5 মিলিয়ন টন ধরা হয়েছে। এজন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে।

(i) সেচের সাহায্যে ডাল উৎপন্ন করার পদ্ধতি অবলম্বন করা।

(ii) (a) রবি মরসুমে চালের উৎপাদনের পর অরহড়, মুগ প্রভৃতি যে সমস্ত ডাল স্বল্প সময়ে উৎপন্ন হয় সে সমস্ত ডালের চাষ করা ; (b) গ্রীষ্ম মরসুমে তৈলবীজ, ইক্ষু, আলু ও গমের চাষের পর সেচের সাহায্যে ডালের চাষ করা।

(iii) সোয়াবিন, বজরা, তুলা, ইক্ষু ও চীনাবাদামের সঙ্গে ডালের চাষ করা। সেচের সাহায্যে বা সাহায্য ছাড়াই এ চাষ সম্ভব।

(iv) উন্নতমানের ডালের বীজের যোগান বৃদ্ধি ও তা ব্যবহার করা।

(v) ডালের চারার সংরক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা।

(vi) ডাল চাষ করার পর উন্নত ধরনের প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে তার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা।

(vii) ডালের দাম, বাজার প্রভৃতি সম্পর্কে সরকারের সুস্পষ্ট নীতি থাকা প্রয়োজন।

(viii) বিভিন্ন ব্লকে 'ডালশস্য গ্রাম' সংগঠন করা। সেচ অঞ্চল ও বৃষ্টিপ্রাপ্ত অঞ্চল উভয় ক্ষেত্রেই এরূপ গ্রাম সংগঠন করা প্রয়োজন।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও কৃষি

প্রথম পরিকল্পনা (1951-56) : প্রথম পরিকল্পনায় কৃষির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। ফলে রাজ্য সরকারগুলি সেচ ও শক্তি প্রকল্পগুলির উন্নয়নের জন্য উদ্যোগী হয়। কেন্দ্রীয় সরকার এ সমস্ত কাজের সংযোজনার দায়িত্ব নেয় ও রাজ্য সরকারগুলিকে কৃষি প্রকল্প রূপায়ণে সাধারণভাবে সাহায্য করে। পরিকল্পনা কমিশন দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পগুলির রূপায়ণের উপর বিশেষ জোর দেয় যাতে শক্ত কৃষি কাঠামো গঠিত হতে পারে। সামগ্রিক গ্রামীণ উন্নয়নের জন্যও নানাবিধ প্রস্তাব করা হয়। প্রথম পরিকল্পনায় মোট ব্যয়ের পরিমাণ 1960 কোটি টাকা। এর মধ্যে 46·7 শতাংশ ব্যয়িত হয় কৃষি ও সংশ্লিষ্ট সেক্টরে, সার, শক্তি, গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্প সহ।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা (1956-61) : প্রথম পরিকল্পনায় কৃষি সেক্টরের সাফল্য সন্তোষজনক হওয়ার ফলে পরিকল্পনা কমিশন শিল্প কাঠামো গঠনের প্রতি উৎসাহী হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মোট ব্যয়ের 34·6 শতাংশ কৃষি ও সংশ্লিষ্ট সেক্টরে, সার, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, শক্তি, গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্প সহ, ব্যয়িত হয়। খাদ্যশস্য ও কাঁচামাল উৎপাদনের উপর অধিক গুরুত্ব দেয়া হয় যাতে খাদ্যশস্যের অভাব অনুভূত না হয় ও শিল্পগুলি কাঁচামালের সুবিধা পেতে পারে।

তৃতীয় পরিকল্পনা (1961-66) : তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষির উপর আবার বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। সেচ, জমি সংরক্ষণ, সার, বীজ, চারাগাছ সংরক্ষণ, উন্নত মানের কৃষি সরঞ্জাম, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিকার্য ও স্থানীয় লোকদের কৃষি উন্নয়নের কাজে সক্রিয় সহযোগিতা প্রভৃতি বিষয়গুলি অগ্রাধিকার পায়। তৃতীয় পরিকল্পনাকালীনই সর্বপ্রথম কৃষি সম্পর্কিত নতুন ষ্ট্র্যাটিজি গ্রহণ করা হয়। ইনটেনসিভ এগ্রিকালচারেল ডিস্ট্রিক্ট প্রোগ্রাম, ইনটেনসিভ এগ্রিকালচারেল এরিয়া প্রোগ্রাম, উচ্চফলনশীল (এচই-

ওয়াই-ভি) বীজ, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তিবিদ্যার পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রভৃতি তৃতীয় পরিকল্পনাকালীন ঘটনা। তাছাড়া কৃষি ক্রেডিট সহজলভ্য ও ব্যাপক করার জন্য ন্যাশনাল কোঅপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন, এগ্রিকালচারেল রিফিনান্স এণ্ড ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন, এগ্রিকালচারেল প্রাইসেস কমিশন, ফুড কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া প্রভৃতি উন্নয়নমূলক সংস্থাগুলি এ সময়কালীন গঠিত হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় মোট ব্যয়ের 38·1 শতাংশ কৃষি উন্নয়নের জন্য ব্যয়িত হয়।

চতুর্থ পরিকল্পনা (1969-74) : চতুর্থ পরিকল্পনায় প্রস্তাব করা হয় যে, প্রতি বছর প্রায় 5 শতাংশ হারে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে গ্রামীণ জনগণকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণে ও তার ফলপ্রসূতার অংশীদার হতে উৎসাহিত করার প্রস্তাবও রাখা হয়। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি জন্য সেচ, সার ও চারাগাছ সংরক্ষণ এবং কৃষি যন্ত্রপাতি, কৃষি ক্রেডিট ও উচ্চফলনশীল বীজেরব্যবহার প্রয়োজন। তাছাড়া কতিপয় নির্বাচিত অঞ্চলে প্রয়োজনীয় বাণিজ্যিক শস্য উৎপাদনের জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা, কৃষিদ্রব্য বাজারকরণ প্রথার উন্নয়ন প্রভৃতির উপরও গুরুত্ব দেয়া হয়। গ্রামীণ দুর্বল শ্রেণীদের পক্ষে কল্যাণজনক উন্নয়নমূলক কাজকর্মের উপরও প্রস্তাব রাখা হয়। যেমন, ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প রূপায়ণ এবং ক্ষুদ্র কৃষক, ক্ষুদ্র শিল্প ও গ্রামীণ শিল্পীদের প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ ও তাদের সহজ শর্তে ক্রেডিট দেয়া, তাদের সমস্যা বোঝা ও পরামর্শ দেয়া।

পঞ্চম পরিকল্পনা (1974-79) : পঞ্চম পরিকল্পনায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির বার্ষিক হার 4·4 শতাংশ ধরা হয়। এজন্য যেসব পন্থার সুপারিশ করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখ্য, সমস্যা-ভিত্তিক গবেষণা কাজে গুরুত্ব দেয়া, সার্টিফাইড বীজের উৎপাদন বৃদ্ধি ও বণ্টন সম্পর্কিত কর্মসূচীর বিস্তার সাধন, রাসায়নিক সার ব্যবহার বৃদ্ধি ও তার অপচয় হ্রাস, জল পরিচালন, আর্থিক সংস্থাগুলির ক্রেডিট সম্প্রসারণ, বাজারকরণের উন্নয়ন ও ভূমি সংস্কার।

ষষ্ঠ পরিকল্পনায় কৃষি-নীতি

ষষ্ঠ পরিকল্পনায় কৃষি ইতিহাসকে সময়ের ভিত্তিতে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে : (i) 1900-1947, (ii) 1950-1980 ও (iii) 1980—।

1900-1947 সন প্রাক্ স্বাধীনতা কাল। এ সময়কালীন কৃষি উন্নয়ন অচলায়তন অবস্থায় ছিল। 1900-1947 সনে কৃষিক্ষেত্রের বার্ষিক উৎপাদনের হার ছিল মাত্র 0·3 শতাংশ। 1950-1980 সনে, অর্থাৎ, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালীন, কৃষির উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। এর কারণ প্রধানত কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ, ভূমি সংস্কার, শস্য সংগ্রহ ও বণ্টন ক্ষেত্রে সরকারী নীতি গ্রহণ ও রূপায়ণ। 1967-68 সন থেকে 1978-79 সন পর্যন্ত কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির বার্ষিক চক্রবৃদ্ধির হার 2·8 শতাংশ। তৃতীয় পর্যায়, অর্থাৎ, বর্তমানে কৃষি উন্নয়নের প্রচেষ্টা প্রধানত বাজার, বাণিজ্য ও কাঠামোগত পরিবর্তনের দিকে চালিত হচ্ছে যাতে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের অসুবিধা লাঘব হতে ও ক্ষুদ্রায়তন ক্ষেতগুলি নিবিড়ভাবে জমি চাষ করার সুযোগ পুরাপুরি গ্রহণ করতে পারে।

পন্থা

ষষ্ঠ পরিকল্পনায় কৃষি সম্পর্কে নিম্নলিখিত পন্থা অবলম্বনের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

(1) কৃষিক্ষেত্রে এ পর্যন্ত যে সুফল অর্জন করা গেছে তা একীভূত করা।

(2) ভূমি সংস্কার নীতি দ্রুত কার্যকর করা।

(3) আধুনিক পদ্ধতিতে চাষআবাদ যোগ্য অঞ্চলের প্রসার সাধন। ক্রেডিট, বীজ, সার, সেচ প্রভৃতি উপকরণের উপর যথোচিত গুরুত্ব দিয়ে কৃষি পরিচালনার দক্ষতা বৃদ্ধি।

(4) কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য দেশকে কেবল খাদ্যে স্বয়ম্ভর করে তোলাই নয়; গ্রামীণ আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিও।

(5) প্রাকৃতিক পরিবেশ, সামগ্রিক অর্থনৈতিক স্বার্থ, শক্তি, সংরক্ষণ ও কর্মসংস্থানের প্রসারের দিকে লক্ষ্য রেখে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে জমিতে জল ব্যবহারের পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন।

(6) উৎপাদন, সংরক্ষণ, বাজারকরণ ও সংযোজিত বণ্টনের দিকে দৃষ্টি রেখে উৎপাদক ও ভোগকারী উভয়ের স্বার্থ রক্ষা।

ভারতের কৃষি কাঠামোটি এমনভাবে গড়ে উঠেছে যে, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকেরা কর্ষিত জমির প্রায় 73 শতাংশে চাষআবাদ করে। কিন্তু এর পরিমাণ

চাষের উপযুক্ত জমির মাত্র 23 শতাংশ। অর্থাৎ, মাত্র 23 শতাংশ চাষের উপযুক্ত জমি তাদের অধীনে। ফলে কৃষিকার্য থেকে তাদের অর্জিত মোট আয় নগণ্য বললেই চলে। যে সমস্ত অঞ্চলে সেচের সুযোগ নেই সে সমস্ত অঞ্চলে এ সামান্য আয়টুকুও অনিশ্চিত। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় তাই ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও আর্থিক উন্নতির জন্য নিম্নলিখিত তিনটি পন্থা গ্রহণের প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

(1) উৎপাদনশীলতা ও আয় বৃদ্ধি

(a) প্রাকৃতিক পরিবেশ। জমি ব্যবহারের ব্যাপারে প্রাকৃতিক পরিবেশ বিষয়ক উপকরণগুলির সংযোজন সাধন। এর ফলে সেচ অঞ্চলে জল আবদ্ধ হয়ে থাকা, জল লবণাক্ত হওয়া, জমিক্ষরণ প্রভৃতি সমস্যাগুলি এড়ানো সম্ভব হবে। তাছাড়া সেচ বহির্ভূত অঞ্চলগুলিতে জল সংরক্ষণ ও পরিচালন দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধি ও স্থিতিশীল করাও সম্ভব হবে।

(b) আর্থিক নীতি। অধিকাংশ কৃষকদেরই উৎপাদনের উপকরণ ক্রয় করার ও ঝুঁকি নেয়ার ক্ষমতা কম। এ চক্র থেকে মুক্ত করার জন্য তাদের সহজ শর্তে পর্যাপ্ত আর্থিক সাহায্য দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। বাজারের সুযোগসুবিধা সম্পর্কেও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে হবে ও পরামর্শাদি দিতে হবে যাতে তারা তাদের উৎপন্ন দ্রব্যের যথাযথ মূল্য পেতে পারে।

(c) শক্তি। জমি ও জলের ব্যবহার পদ্ধতি এমনভাবে পরিকল্পনা করতে হবে যাতে সবরকম সম্ভাব্য শক্তির কাম্য ব্যবহার সম্ভব হয়।

(d) কর্মসংস্থান। জমি ব্যবহারের লক্ষ্য হবে লাভজনক। কর্মসংস্থানের সুযোগ কাম্য স্তরে নিয়ে আসা। তাছাড়া শ্রমিক বিকেন্দ্রীকরণ ও ভূমিহীন শ্রমিক পরিবারদের জন্য সহায়ক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

(2) মজুতকরণ ও বাজারকরণের জন্য কৃষকদের নিজস্ব সংস্থা

মজুতকরণ ও বাজারকরণের উদ্দেশ্যে, বিশেষত পচনশীল পণ্যদ্রব্যের, কৃষকদের নিজস্ব সংস্থা গঠন ব্যাপারে সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে।

(3) ইনটিগ্রেটেড রুরাল ডেভেলপমেণ্ট প্রোগ্রাম (আই-আর-ডি-পি)

আই-আর-ডি-পির অধীনে সহায়ক কর্মসংস্থানের সম্প্রসারণ দ্বারা আয়ের পথ প্রসারিত করার ব্যবস্থা করতে হবে।

সাংবিধানিক দিক থেকে "কৃষিকার্য" রাজ্য তালিকাভুক্ত। অতএব এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারদের বিশেষ দায়িত্বের কথাও স্মরণ করে দেয়া হয়েছে।

ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক এবং বর্গাদাররা যাতে উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যার সুবিধা পেতে পারে সেজন্য ষষ্ঠ পরিকল্পনায় প্রধানত নিম্নলিখিত পন্থা অবলম্বনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

(i) আই-আর-ডি-পি থেকে কৃষক সম্প্রদায় যে সমস্ত সুযোগসুবিধা পাবে বলে ধরা হয়েছে তা দেশের সমস্ত ব্লকে ছড়িয়ে দিতে হবে।

(ii) কৃষকদের কৃষি-সেবা কেন্দ্র গঠন করার জন্য সাহায্য করা। এসব সংগঠনগুলি কৃষি অঞ্চলে ও ক্ষেতে কৃষি সম্পর্কিত কাজকর্মে সাহায্য করতে পারবে। তাছাড়া জল সংরক্ষণ ও পরিচালন, চারাগাছ সংরক্ষণ, প্রোসেসিং ও বাজারকরণ ব্যাপারেও এরা সাহায্যে আসবে।

(iii) ক্ষেতের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রেখে সম্প্রদায়-ভিত্তিক পরিচালনায় জমি, চারাগাছ ও পশু স্বাস্থ্যের উন্নতিসাধন করা।

(iv) ঋণদান সহ উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণ সরবরাহ সংস্থা গঠন করা।

(v) ফসল উৎপাদনের পর বাজারকরণ যাতে কোন সমস্যা হয়ে না দাঁড়ায় সেজন্য প্রয়োজনীয় সাহায্যের, বিশেষত গ্রামীণ গুদাম প্রকল্পের মারফত বাজারকরণ, ব্যবস্থা করতে হবে।

(vi) কৃষকদের পক্ষে নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয় এমন কোন কারণে যাতে তাদের ক্ষতি স্বীকার ক'তে না হয় সেজন্য চলতি ফসল ও পশুঋণ বীমা স্কীমের আরো উন্নতিসাধন করা।

আঞ্চলিক বৈষম্য

কৃষি উন্নয়নে আঞ্চলিক সমতা লাভ করার জন্য ষষ্ঠ পরিকল্পনা নিম্নলিখিত পন্থা অবলম্বনের জন্য প্রস্তাব করেছে।

(1) অপেক্ষাকৃত অনুন্নত অঞ্চলের কৃষি। সমস্যার কারণ নির্ণয় সম্পর্কে গবেষণার কাজ জোরদার করা। বর্তমানে দেশে একুশটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। জম্মু ও কাশ্মীরে একটি এবং দক্ষিণ বিহারে একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। কৃষি সম্পর্কিত শিক্ষা ও গবেষণার জন্য সমস্ত উপজাতি ও অপেক্ষাকৃত অনুন্নত অঞ্চলগুলিকে নিয়ে একটি সংযোজিত জাতীয় প্রকল্প সংগঠন করা।

(2) অপেক্ষাকৃত অনুন্নত অঞ্চলে 'প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন স্কীম' চালু

করতে হবে যাতে কৃষক পরিবারগুলি পর্যাপ্ত কৃষি সেবার সুযোগ পেতে পারে। প্রয়োজনমত ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ দল গড়ে তুলতে হবে। উপজাতি, পার্বত্য ও অনুন্নত অঞ্চলে অতিরিক্ত কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।

(3) মরু, খরাপ্রবণ, বন্যাপ্রবণ প্রভৃতি অঞ্চলের জন্য যথোপযুক্ত কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে যাতে খরা ও বন্যার প্রকোপ লাঘব করা যায়।

(4) উপেক্ষিত অঞ্চলে বাজারকরণের উন্নতিসাধন করতে হবে যাতে উৎপাদক ও ভোগকারী উভয়ই উপকৃত হতে পারে। উদ্যানজাত ও অন্যান্য পচনশীল দ্রব্যাদির মজুতকরণ, প্রোসেসিং ও বাজারকরণের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

ষষ্ঠ পরিকল্পনা ও শস্য উৎপাদন নীতি

ষষ্ঠ পরিকল্পনায় শস্য উৎপাদন সম্পর্কে নিম্নলিখিত পন্থা গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে।

1. শস্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটাবার জন্য উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে হবে। ডাল উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে যাতে স্বল্প আয় বিশিষ্ট লোকদের আহার্যে পুষ্টি বৃদ্ধি পেতে পারে।

2. তৈলবীজ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে হবে যাতে আহার্য তেল আমদানি বন্ধ করা সম্ভব হয়।

3. রপ্তানি-ভিত্তিক ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা। যথা, চা, কফি, তামাক, কাজুবাদাম, মসলা, পাট, তুলা, ইক্ষু, ফল ও শাকসব্জি।

1967-68 সন থেকে 1978-79 সন পর্যন্ত কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির বার্ষিক চক্রবৃদ্ধি হার 2·8 শতাংশ। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় এ বৃদ্ধির হার প্রায় 5 2 শতাংশ ধরা হয়েছে। ষষ্ঠ পরিকল্পনার মতে এ লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব না হওয়ার কোন সঙ্গত কারণ নেই। কারণ বিভিন্ন শস্যের প্রকৃত উৎপাদন ও উৎপাদন ক্ষমতার মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান রয়েছে।

ষষ্ঠ পরিকল্পনায় পাবলিক সেক্টরে কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের জন্য 12,539 কোটি টাকা এবং সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য 12,160 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। অর্থাৎ, পাবলিক সেক্টরে এ দু'ক্ষেত্রে মোট বরাদ্দের পরিমাণ 24,699 কোটি টাকা। পঞ্চম পরিকল্পনায় এর পরিমাণ ছিল 8,650 কোটি টাকা। অন্য কথায়, ষষ্ঠ পরিকল্পনায় এ দু'ক্ষেত্রে অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ 186 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

কার্যক্রম

1. গবেষণা ও শিক্ষা

কৃষি সম্পর্কিত গবেষণা ও শিক্ষার জন্য আমাদের দেশে 34 সেণ্ট্রাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউসন, ন্যাশনাল একাডেমি অব এগ্রিকালচারেল রিচার্স ম্যানেজমেণ্ট, 5 প্রজেক্ট ডাইরেকটোরেট, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারেল রিসার্চের অধীনে 54 অল ইণ্ডিয়া কোঅরডিনেটেড রিচার্স প্রজেক্টস ও 21 কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। গবেষণার ক্ষেত্র আরো শক্তিশালী করে তোলার জন্য ষষ্ঠ পরিকল্পনায় বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকদের নিয়ে ন্যাশনাল রিচার্স সেণ্টারস স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। ইতিমধ্যে ন্যাশনাল এগ্রিকালচারেল রিসার্স প্রজেক্ট স্থাপিত হয়েছে। এ প্রজেক্টের উদ্দেশ্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যাতে প্রত্যেক কৃষি জলবায়ু অঞ্চলে স্থানীয় সমস্যা-ভিত্তিক গবেষণা করতে পারে সেজন্য তাদের সাহায্য করা।

2. শুষ্ক জমি চাষ

আমাদের দেশে মোট শস্য ফলন অঞ্চলের প্রায় 25 শতাংশ নানান সূত্র থেকে সেচের সুবিধা পেয়ে থাকে। অবশিষ্ট 75 শতাংশ বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল। এ 75 শতাংশ অঞ্চলে মোট খাদ্যশস্য উৎপাদনের মাত্র প্রায় 42 শতাংশ খাদ্যশস্যের ফলন হয়। ডাল, জোয়ার, বজরা, ভুট্টা, তুলা ও তৈলবীজ প্রধানত বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল অঞ্চলে উৎপাদন করা হয়ে থাকে। বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তার দরুন এসব ফসলের উৎপাদনের পরিমাণও অনিশ্চিত। ফলে মোট ফসল উৎপাদনের পরিমাণের কোন স্থিরতা থাকে না। আর এর ফলে দেশের কৃষি অর্থনীতিও দারুণ ব্যাহত হয়।

এ অবস্থার প্রতিরোধের জন্য 1970-71 সনে কেন্দ্রীয় উদ্যোগে ইনটিগ্রেটেড ড্রাইল্যাণ্ড এগ্রিকালচারেল ডেভেলপমেণ্ট স্কীম প্রবর্তিত হয়। এ স্কীম পরে রাজ্যস্তরে স্থানান্তরিত করা হয়। এ স্কীম অনুযায়ী 12 রাজ্যে 24টি প্রকল্পের কাজ হচ্ছে। এগুলো রূপায়ণে যে প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগ করা হয়েছে তার সুফল সম্পর্কে বেশ সাড়া পাওয়া গেছে। এমনকি ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কও এ স্কীমে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এর সাহায্যে পাঞ্জাব কান্দী ওয়াটার শেড এণ্ড এরিয়া ডেভেলপমেণ্ট প্রজেক্ট রূপায়ণের পথে এগিয়ে গেছে।

3. মৃত্তিকা ও জল সংরক্ষণ

প্রথম পরিকল্পনায় মৃত্তিকা ও জল সংরক্ষণ কর্মসূচী গৃহীত হয়। 1980-81

সন পর্যন্ত 744 কোটি টাকা ব্যয়ে 24 মিলিয়ন হেক্টর জমিতে নানাপ্রকার মৃত্তিকা সংরক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। বর্তমানে অল ইণ্ডিয়া সয়েল এণ্ড ল্যাণ্ড ইউজ সার্ভে অরগানাইজেসন এবং ষ্টেট ল্যাণ্ড ইউজ বোর্ডস জমির ব্যবহার, সংরক্ষণ সমস্যা প্রভৃতি কাজকর্মের তত্ত্বাবধান করছে।

ষষ্ঠ পরিকল্পনায় আরো 7·1 মিলিয়ন হেক্টর জমি সংরক্ষণের আওতায় আনার প্রস্তাব করা হয়েছে।

4. উদ্ভিজ্জ পদার্থের পুনরাবর্তন

অনুমিত হয় যে আমাদের দেশে প্রতি বছর ফসলের অকেজো অংশরূপে প্রায় 1000 মিলিয়ন এমটি* উদ্ভিজ্জ পদার্থ এবং 300-400 মিলিয়ন এমটি গোবর ও অন্যান্য পশুর মল পাওয়া যায়। এ সমস্ত পদার্থে প্রায় 6 মিলিয়ন এমটি নাইট্রোজেন, 2·5 মিলিয়ন এমটি ফস্‌ফেট ও 4·5 মিলিয়ন এমটি পটাসিয়াম রয়েছে। গ্রামীণ ক্ষেত্রে এ অপচয় থেকে প্রায় 50 মিলিয়ন এমটি ও শহরাঞ্চল থেকে প্রায় 15 মিলিয়ন এমটি সংমিশ্রিত সার পাওয়া যেতে পারে। সংমিশ্রিত সাররূপে ব্যবহার করার আগে এ সমস্ত জৈব পদার্থকে যদি বায়ো-গ্যাস উৎপাদনে ব্যবহার করা যায় তবে গ্রামের গৃহস্থালি জ্বালানির প্রায় 50 শতাংশ প্রয়োজন মিটানো সম্ভব হবে। তাছাড়া গ্রাম ও শহর এ জাতীয় আবর্জনা থেকে মুক্ত থাকতে পারে। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় এ বিষয় নিয়ে গভীর গবেষণা করার উপযোগিতার কথা বলা হয়েছে।

বায়ো-গ্যাস উন্নয়নের জন্য একটি জাতীয় প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এজন্য 50 কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। এর ফলে ষষ্ঠ পরিকল্পনাকালীন 4 লক্ষ বায়ো-গ্যাস ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।

5. উপকরণ ও সেবা

কৃষি উৎপাদনের জন্য বিবিধ উপকরণ ও সেবা প্রয়োজন। যথা, সার, উন্নতমানের বীজ, চারাগাছ সংরক্ষণমূলক রাসায়নিক পদার্থ, আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় এ সমস্ত উপকরণের লক্ষ্যমাত্রা নিম্নরূপ।

---

* এমটি=মেট্রিক টন।

উপকরণের লক্ষ্যমাত্রা

ক্রমিক নং	বিষয়	একক	অনুমিত ভিত্তি 1979-80	পরিকল্পনার লক্ষ্য 1984-85
(0)	(1)	(1)	(3)	(4)
I.	বীজ	লক্ষ কুইণ্টাল	14·69	57·12
II.	সার ব্যবহার			
	(1) নাইট্রোজেনাস	লক্ষ এমটি	35·00	60·00
	(2) ফসফ্যাটিক	”	11·50	23·40
	(3) পোটাসিক	”	6·10	13·10
		মোট	52·60	96·50
III.	কীটনাশক	হাজার এমটি	60·00	80·00
IV.	এইচ-ওয়াই-ভি প্রোগ্রাম	মিলিয়ন হেক্টর		
	(1) ধান		13·60	25·00
	(2) গম		13·50	19·00
	(3) ভুট্টা		2·00	2·00
	(4) জোয়ার		3·00	5·00
	(5) বজরা		3·10	5·00
		মোট	35·20	56·00
V.	সেচ			
	(1) ক্ষুদ্র		30·00	38·00
	(2) বৃহৎ ও মধ্য		22·60	28·20
		মোট	52·60	66·20

সূত্র : ষষ্ঠ পরিকল্পনা।

কৃষিকার্যে সার এক অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য। এক এমটি সার প্রয়োগ দ্বারা উৎপাদন 10 এমটি বৃদ্ধি করা যেতে পারে। পৃথিবীতে সারের ব্যবস্থায়

ভারতের স্থান উচ্চে। 1980-81 সনে আমাদের দেশে 55·16 লক্ষ এমটি সার ব্যবহার করা হয়। 1979 সনের তুলনায় তা 49 শতাংশ বেশি। 1980-81 সনে সার ব্যবহারের পরিমাণ অনুমিত 61 লক্ষ এমটি।

সার সম্পর্কে ষষ্ঠ পরিকল্পনায় গৃহীত নীতিঃ

(i) সঙ্গত ও কার্যকররূপে সারের বণ্টন ব্যবস্থা।

(ii) সার ব্যবহারে আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস।

(iii) সব ক্ষেতখামার যাতে সার ব্যবহারের সুবিধা পায়, বিশেষত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকেরা, তা সুনিশ্চিত করা।

উচ্চমানের সার সম্পর্কে পরিকল্পনায় প্রস্তাব রাখা হয়েছে যে, ন্যাশনাল সিডস কর্পোরেশনকে শক্তিশালী করে তুলতে হবে যাতে সে 'সার্টিফাইড' ও 'ফাউণ্ডেসন' বীজ উৎপাদনের সরাসরি দায়িত্ব নিতে সমর্থ হয়। এর ফলে অদূরে জাতীয় স্তরে 'সার্টিফাইড' বীজের অভাব দূর হবে।

চারাগাছ সংরক্ষণ সম্পর্কে নীতিঃ

(i) বীজনাশক কীটের আক্রমণ ও বীজের রোগ থেকে ফসলের ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস।

(ii) চারাগাছ সংরক্ষিত অঞ্চলের 80 মিলিয়ন হেক্টর থেকে 100 মিলিয়ন হেক্টর পর্যন্ত প্রসার সাধন।

(iii) কীটনাশক দ্রব্যের ব্যবহার 60,000 এমটি থেকে 80,000 এমটি করা।

(iv) কীটনাশক দ্রব্য ও বীজের রোগ সম্পর্কে আরো সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়া।

(v) সারের মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা ও কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক কীটনাশক পরীক্ষাগার স্থাপন।

(vi) সংযোজিত কীট নিয়ন্ত্রণ সংস্থার কাজকর্মের প্রসার সাধন ও জীববিদ্যা অনুযায়ী কীট নিয়ন্ত্রণ জোরদার করা।

6. যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম

কৃষি যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম সম্পর্কে যে সমস্যা বড় হয়ে দেখা দিয়েছে তা কৃষকদের হাতে যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম তুলে দেয়া ও তার ব্যবহার পদ্ধতি ও উপযোগিতা সম্বন্ধে তাদের অবহিত করা। সেদিকে দৃষ্টি রেখে ষষ্ঠ পরিকল্পনার লক্ষ্যঃ

(i) কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কৃষকদের মধ্যে চালু করা, বিশেষত সেসব যন্ত্রপাতি যা ব্যবহারে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা উপকৃত হবে। এ প্রসঙ্গে যেসব অঞ্চল প্রাকৃতিক সুযোগ থেকে অপেক্ষাকৃত বঞ্চিত কিন্তু কৃষিকার্যের দিক থেকে সম্ভাবনাপূর্ণ সেসব অঞ্চলের দিকে অধিকতর নজর দেয়া ;

(ii) যন্ত্রপাতির প্রয়োগ পদ্ধতি প্রদর্শন ও তার প্রচলন জনপ্রিয় করে তোলার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা ;

(iii) যন্ত্রপাতি ব্যবহারে পারদর্শিতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ;

(iv) কৃষি শিল্প ও কৃষি সেবার উন্নতিসাধন।

7. কৃষি প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ

কৃষি উৎপাদনের প্রচুর সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রকৃত উৎপাদন বাঞ্ছিত উৎপাদন অপেক্ষা অনেক কম। এর একটি কারণ কৃষি-ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগের অভাব। অথচ আমাদের দেশে গবেষণাগারে ও পরীক্ষামূলক কর্মশালায় পরীক্ষিত ও উপযুক্ত বলে বিবেচিত কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োগ করার মত প্রযুক্তিবিদ্যার অভাব নেই। প্রকৃত সমস্যা এসব প্রযুক্তিবিদ্যা কিভাবে সত্বর ও সুষ্ঠুভাবে কৃষকদের হাতে তুলে দেয়া যায়। দশটি রাজ্য (দৃষ্টান্তস্বরূপ, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থান) 'ট্রেনিং এণ্ড ভিজিট' প্রথা চালু করে কৃষি প্রসারণ সেবা অধিকতর কার্যকর করে তুলতে সক্ষম হয়েছে। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় ট্রেনিং এণ্ড ভিজিট প্রথা সমগ্র দেশে ছড়িয়ে দেয়ার কথা বলা হয়েছে।

কৃষিকার্যের নানাপ্রকার কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে 50 শতাংশ স্ত্রীলোক। তাদের কারিগরি জ্ঞান বৃদ্ধি করার জন্য প্রশিক্ষণের কথাও ষষ্ঠ পরিকল্পনায় বিশেষভাবে বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে অনুন্নত কৃষি সম্প্রদায়দের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এর ফলে তারা অধিকতর সময় কাজে নিযুক্ত থাকার সুযোগ পাবে। তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটবে।

8. ফসল বীমা

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে ফসল উৎপাদনে যে অনিশ্চয়তা দেখা দেয় তার হাত থেকে কৃষকদের রক্ষা করার জন্য ফসল বীমার প্রয়োজন স্বীকৃত হয়েছে।

1979 সন থেকে পশ্চিম বাংলা, গুজরাট ও তামিলনাড়ু ফসল বীমা স্কীম চালু করেছে। এ স্কীম যাতে অন্যান্য রাজ্যে গ্রহণ করে ষষ্ঠ পরিকল্পনায় সে প্রস্তাব করা হয়েছে।

9. ষ্টোরেজ ও গুদামঘর

ষষ্ঠ পরিকল্পনায় জোতের স্তর থেকে জাতীয় স্তর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত ষ্টোরেজ গ্রীড ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। এ সময়কালীন প্রতিটি ব্লকে যথোপযুক্ত আয়তনের 10 থেকে 15 গুদামঘর স্থাপন করার প্রস্তাব রয়েছে। এ সমস্ত গ্রামীণ গুদামঘরের অধিকাংশই হবে সমবায় ক্ষেত্রে। প্রতিটি গ্রাম সমবায় যাতে 100 এমটি পরিসর বিশিষ্ট একটি গুদামঘর স্থাপন করতে পারে সেজন্য তাদের আর্থিক সাহায্য দেয়া হবে। এ কর্মসূচী অনুযায়ী 1984-85 সনের মধ্যে 52,000 গ্রাম সমবায় এরূপ একটি করে গুদামঘরের অধিকারী হবে। কেন্দ্রের উদ্যোগে একটি গ্রামীণ গুদামঘর স্কীম চালু করা হয়েছে। এর মারফত বাজার সমিতিগুলিকে অথবা ষ্টেট ওয়েরহাউজিং কর্পোরেশনগুলিকে বা সমবায়গুলিকে গ্রামাঞ্চলে 200 থেকে 1000 এমটি পরিসর বিশিষ্ট গুদামঘর স্থাপনের জন্য আর্থিক সাহায্য দেয়া হবে। এ স্কীমে মোট 2 মিলিয়ন এমটি মাল রাখার মত গুদামঘর নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।

সেণ্ট্রাল ওয়েরহাউজিং কর্পোরেশন, ষ্টেট ওয়েরহাউজিং কর্পোরেশনগুলি, ফুড কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া ও ইণ্ডিয়ান গ্রেণ ষ্টোরেজ ইনষ্টিটিউট ও ফার্ম লেভেল ষ্টোরেজ যাতে ষ্টোরেজের সুবিধা পেতে পারে সেজন্য অতিরিক্ত 76·60 লক্ষ এমটি পরিমাণ ষ্টোরেজের ব্যবস্থা করার জন্য ষষ্ঠ পরিকল্পনায় 259 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। অপরদিকে ষষ্ঠ পরিকল্পনাকালীন গ্রামীণ গুদাম ঘর স্কীমের অধীনে সমবায়গুলি 55 লক্ষ এমটি পরিমাণ ষ্টোরেজের ব্যবস্থা করবে। এজন্য সমবায় ও গ্রামীণ উন্নয়নের খাতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। তাছাড়া বেসরকারী ক্ষেত্রে এ-আর-ডি-সি স্কীমের সাহায্যে 1 মিলিয়ন এমটি ষ্টোরেজ ক্ষমতা গড়ে তোলা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

অতিরিক্ত ষ্টোরেজ ক্ষমতা, 1980-85 (লক্ষ এমটি)

এজেন্সি (1)	পরিসর (2)
ফুড কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া	35 60
সেণ্ট্রাল ওয়েরহাউজিং কর্পোরেশন	16·00
ষ্টেট ওয়েরহাউজিং কর্পোরেশন	25·00
সমবায়	35·00
গ্রামীণ গুদামঘর স্কীম	20·00
মোট	131·60

সূত্র : ষষ্ঠ পরিকল্পনা।

সেণ্ট্রাল ওয়েরহাউজিং কর্পোরেশনগুলির উন্নতি লক্ষণীয়। 1979-80 সনে এদের সংখ্যা ছিল 292। নীট মুনাফার পরিমাণ ছিল 548·29 লক্ষ টাকা। 1980-81 সনে এদের সংখ্যা ও নীট মুনাফা যথাক্রমে 319 ও 609·53 লক্ষ টাকা। 1979-80 সনে ওয়েরহাউজগুলির মোট পরিসর ছিল 3,40,000 এমটি ; 1980-81 সনে এর পরিসর 3,60,000 এমটি। 1981 সনের সেপ্টেম্বরে ওয়েরহাউজগুলির সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে 332 ও পরিসর 3,90,000 এমটি।

কৃষি পণ্যদ্রব্যের দাম নির্ধারণ পদ্ধতি

কৃষি পণ্যদ্রব্যের দাম নির্ধারণের জন্য সাধারণত নিম্নলিখিত পদ্ধতির উল্লেখ করা হয়।

(1) সমতা দাম পদ্ধতি।

(2) আগাম দাম পদ্ধতি।

(3) সমর্থন দাম ও সংগ্রহ দাম পদ্ধতি।

(4) ব্যয় দাম পদ্ধতি।

(1) সমতা দাম পদ্ধতি :

সমতা দামের উদ্দেশ্য কৃষি পণ্যদ্রব্য ও শিল্প পণ্যদ্রব্যের মধ্যে সমতা স্থাপন। অর্থাৎ, কৃষকেরা পণ্যদ্রব্যের জন্য যে দাম পায় এবং তারা তাদের

ভোগদ্রব্য ও কৃষি উপকরণ কেনার জন্য যে দাম দেয় তার অনুপাতের মধ্যে সমতা। ভিত্তি বছরের পণ্যদ্রব্যগুলির দামকে যেসব পণ্যদ্রব্য ক্রয় করা হয়েছে তাদের দাম সূচক দিয়ে গুণ করে সমতা দাম নির্ণয় করা চলে।

(2) আগাম দাম পদ্ধতি :

আগাম দাম পদ্ধতি অনুযায়ী পণ্যদ্রব্যের দাম পূর্বেই ঘোষণা করে দেয়া হয় যাতে কৃষকেরা দামের গতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পণ্যবিশেষ উৎপাদনের জন্য কৃষি ক্ষেতের পরিমাণ যথাসময় ঠিক করে নিতে পারে। আগাম দাম ও সমতা দামের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ্য। আগাম দাম ক্ষেত্রে উৎপাদক কোন নির্দিষ্ট সময়ে বাজারের চাহিদা অনুসারে তার সম্পদ বণ্টন করে নিতে পারে। সমতা দাম পদ্ধতি ক্ষেত্রে উৎপাদক তার ইচ্ছা অনুযায়ী কৃষি ও শিল্পের মধ্যে তার সম্পদ বণ্টন করে নেয়। এক্ষেত্রে সম্পদের অপচয় হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

(3) সমর্থন দাম ও সংগ্রহ দাম পদ্ধতি :

সমর্থন দাম পদ্ধতির উদ্দেশ্য কৃষি পণ্যদ্রব্যের দাম যাতে ন্যূনতম স্তরের নিচে না চলে যায় তা সুনিশ্চিত করা। অর্থাৎ, ন্যূনতম দামে সরকার পণ্যদ্রব্য ক্রয় করার দায়িত্ব নেয়। ন্যূনতম দাম সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার ফলে কৃষকেরা উৎপাদনে বিশেষ উৎসাহিত হয়।

ফসল ওঠার পর সরকার বা তার এজেন্সিগুলি যে দামে সে ফসল ক্রয় করে তাকে সংগ্রহ দাম বলা হয়। সংগ্রহ দাম ও সমর্থন দাম যে সমান হবে তা নয়। তবে সংগ্রহ দাম নির্ধারণ ব্যাপারে সমর্থন দাম বিষয়টি বিবেচনা করা হয়। সংগ্রহ দাম সমর্থন দাম অপেক্ষা বেশি হবে এরূপ ভাবাই যুক্তিসঙ্গত।

(4) ব্যয় দাম পদ্ধতি :

কৃষি পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন ব্যয়ের ভিত্তিতে দাম নির্ণয় করা যুক্তিযুক্ত, তবে কৃষি পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণ করা সহজ নয়। গড় দাম নির্ধারণ করাও কঠিন। উৎপাদককারীদের সম্পদ ব্যবহারের পরিমাণ, প্রযুক্তিবিদ্যার প্রকৃতি প্রভৃতির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। সাধারণত অধিকাংশ কৃষি পণদ্রব্যের উৎপাদকদের মোট উৎপাদনের গড় ব্যয়কে দাম নির্ধারণের ভিত্তি রূপে ধরা হয়। এর ভিত্তিতে অধিকাংশ পণ্যদ্রব্যের যে দাম নির্ধারিত হয় তা বহু উৎপাদকদেরই মুনাফার সুযোগ করে দেয়। যেসব উৎপাদকদের

উৎপাদন ব্যয় এর বেশি তাদের দক্ষতার অভাব আছে বলে ধরা হয়। এদের সরকার থেকে বীজ, সার, সেচ, অর্থ প্রভৃতি উপকরণ দিয়ে বিশেষ-ভাবে সাহায্য করার কথা বলা হয়।

ভারতে কৃষি পণ্যদ্রব্যের দাম নির্ধারণ পদ্ধতি

তৃতীয় ও চতুর্থ পরিকল্পনায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নতুন রণকৌশল অবলম্বন করা হয়। এতে কৃষি পণ্যদ্রব্যের ন্যূনতম দাম সম্পর্কে কৃষকদের নিঃসন্দেহ হওয়ার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। 1964-65 সনে খাদ্যশস্য উৎপাদন ক্ষেত্রে সমর্থন দাম পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। কৃষি পণ্যদ্রব্য সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শ দেয়ার জন্য 1965 সনে এগ্রিকালচারেল প্রাইসেস কমিশন গঠন করা হয়। সে বছরই আবার ফুড কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া স্থাপিত হয়। বাজার থেকে খাদ্যশস্য ক্রয় করে বণ্টন করার এটিই সর্বপ্রথম সর্বভারতীয় সরকারী সংস্থা। এ প্রসঙ্গে কোঅপারেটিভ মার্কেটিং ফেডারেশন ও স্টেট সিভিল সাপ্লাইজ কর্পোরেশনের প্রসঙ্গও উল্লেখ্য।

ন্যূনতম সমর্থন দামস্তর নির্ণয় করা সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শ দেয়ার ব্যাপারে এগ্রিকালচারেল প্রাইসেস কমিশন যে সমস্ত বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকে তার মধ্যে উল্লেখ্য: উৎপাদন ব্যয় সম্পর্কিত পরিসংখ্যান; উৎপাদনের উপকরণের দামের পরিবর্তন; প্রতিযোগিতামূলক ফসলের প্রশাসন-নির্ধারিত দামের পরিবর্তন; এবং জাতীয় অর্থনীতিতে স্থিতি রক্ষার প্রয়োজনীয়তা। খাদ্যশস্যের সংগ্রহ-দাম নির্ধারণ সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শ দেয়ার ব্যাপারে এগ্রিকালচারেল প্রাইসেস কমিশন চলতি বাজার দাম, উৎপাদনের সম্ভাবনা, আগামী বছরে সম্ভাব্য দামস্তর ও সরকারী বণ্টন প্রথার প্রয়োজনীয়তা এসব বিষয়গুলি বিবেচনা করে থাকে।

উৎপাদন ব্যয় সম্পর্কে যেসব ধারণা জড়িত তার মধ্যে উল্লেখ্য: (i) উৎপাদকদের নগদ ব্যয়, (ii) নগদ ও উপকরণ ব্যয়, (iii) নগদ ও উপ-করণ ব্যয় এবং নিজস্ব জমির খাজনা ও নিজস্ব মূলধনের সুদ, এবং (iv) নগদ ও উপকরণ ব্যয়, নিজস্ব জমির খাজনা, নিজস্ব মূলধনের সুদ এবং পরিবার-বর্গের শ্রম-মূল্য। এগ্রিকালচারেল প্রাইসেস কমিশন বর্তমানে উল্লিখিত (iv) ব্যয়ের ধারণা অনুসরণ করে চলে। অবশ্য নিজস্ব জমির রাজস্ব ও মূলধনের সুদ উৎপাদকদের লাভ বলে বিবেচনা করা হয়। এগ্রিকালচারেল প্রাইসেস

কমিশন কৃষি পণ্যদ্রব্যের যে দাম নির্ধারণ করে দেয় কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলির সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে তা চূড়ান্ত করে নেয়।

আমাদের দেশে সমতা দাম পদ্ধতি বিশেষ সমর্থন পায়নি। এর কারণ আমাদের দেশের বিস্তৃত ও প্রসারমান বাজারের দামের উপর প্রভাব রয়েছে। উৎপাদন পদ্ধতিতে আঞ্চলিক বৈষম্য রয়েছে। এ অবস্থায় দামের উপর সরকারী হস্তক্ষেপ কতিপয় বিশেষ অঞ্চলে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য। তাছাড়া শিল্প পণ্যদ্রব্যের দাম কৃষি পণ্যদ্রব্যের দামের তুলনায় বেশি স্থিতিশীল। এ অবস্থায় শিল্প ও কৃষি পণ্যদ্রব্যের সংযোজিত প্রশাসনিক দাম নির্ধারণ সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। এসব ব্যবহারিক অসুবিধার কারণে ন্যাশনাল কমিশন অন এগ্রিকালচার কৃষি পণ্যদ্রব্যের দাম নির্ধারণ ব্যাপারে সমতা দাম পদ্ধতির অনুকূলে মত প্রকাশ করেনি।

নতুন প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাচ্ছে সত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন ব্যয়ও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে ন্যূনতম দাম সম্পর্কে সরকারী প্রতিশ্রুতির প্রশ্নটির গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। ন্যূনতম সমর্থন দাম সম্বন্ধে ফুডগ্রেনস পলিসি কমিটি (1966) যেসব সুপারিশ করেছে তা উল্লেখযোগ্য।

(i) শস্য বপন মরসুম সুরু হওয়ার অনেক আগেই সমর্থন দাম ঘোষণা করতে হবে।

(ii) সমর্থন দাম দীর্ঘকালের জন্য স্থিতিসম্পন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর ফলে কৃষকেরা দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ সম্পর্কে উৎসাহিত হবে।

(iii) সরকারের তরফ থেকে ন্যূনতম সমর্থন দামের বহুল প্রচার আবশ্যক। এ সম্পর্কে এও প্রচার প্রয়োজন যে, সরকার ন্যূনতম সমর্থন দামে যে কোন পরিমাণ কৃষি পণ্যদ্রব্য ক্রয় করতে প্রস্তুত।

(iv) ন্যূনতম সমর্থন দামে কৃষি পণ্যদ্রব্য ক্রয় করার জন্য উপযুক্ত বাজারের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

সরকার ন্যূনতম সমর্থন দামে বিবিধ কৃষি পণ্যদ্রব্য, যথা, খাদ্যশস্য, ইক্ষু, পাট, তুলা প্রভৃতি ক্রয় করে থাকে। এজন্য ফুড কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া, স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন প্রভৃতি সর্বভারতীয় এজেন্সি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সংগ্রহ দাম সমর্থন দামের পৃথক রূপ। সরকার বা তার এজেন্সিগুলি বাজার থেকে নির্দিষ্ট দামে কৃষি পণ্যদ্রব্য ক্রয় করে। কোন কোন ক্ষেত্রে কৃষককে

তার মোট উৎপাদনের একাংশ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত দামে সরকার বা তার এজেন্সির কাছে বিক্রয় করতে হয়।

উপসংহার

সঠিকভাবে বলতে গেলে আমাদের দেশে কৃষি পণ্যদ্রব্যের দাম নির্ধারণ সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট নীতি বা পদ্ধতি নেই। সরকার সময়বিশেষে প্রয়োজন অনুযায়ী কৃষি পণ্যদ্রব্যের দাম নির্ধারণ করে দেয় এবং তা সাধারণত 'কনট্রোল' ও 'কোটা'-র মধ্যেই আবদ্ধ; বাজারের চাহিদা বা যোগানের উপর তেমন গুরুত্ব দেয়া হয় না। ফুডগ্রেনস পলিসি কমিটি শস্য বপন করার বেশ কিছু পূর্বে ন্যূনতম সমর্থন দাম ঘোষণা করা সম্পর্কে যে সুপারিশ রেখেছে তা যথার্থই মূল্যবান, কিন্তু তাও কঠোরভাবে কার্যকর করা হয় না। এগ্রিকালচারেল প্রাইসেস কমিশন ন্যূনতম সমর্থন দাম পদ্ধতিই অবলম্বন করে চলেছে। এমনকি তেজী বাজারেও কমিশন সমর্থন দামের ঊর্ধ্ব'তম সীমা নির্দেশ করে দেয় না। সংগ্রহ দাম স্থির দাম না হয়ে ন্যূনতম দাম হওয়া সঙ্গত। সমর্থন বা সংগ্রহ দাম নির্ধারণ করা ব্যাপারে অধিকাংশ কৃষি পণ্যদ্রব্য উৎপাদনকারীদের মোট উৎপাদনের গড় ব্যয়কে (বাল্ক-লাইন গড় উৎপাদন ব্যয়) ন্যূনতম দাম নির্ধারণের ভিতরূপে গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত। কৃষকদের স্বার্থে শস্য বীমার উপযোগিতা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তা উপযুক্ত স্বীকৃতি পেয়েছে বলা চলে না। দাম নির্ধারণ প্রশ্নের সঙ্গে ভোগকারীদের স্বার্থও জড়িত। এবং জড়িত ভরতুকির প্রশ্ন। ভরতুকি জাতীয় অর্থনীতির দৃষ্টিকোন থেকে সমর্থনযোগ্য নয়। সরকারের বণ্টন প্রথা যেখানে দুর্বল ও উৎপাদন বা মোট সরবরাহ প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম সেক্ষেত্রে নির্ধারিত দামের সঙ্গে বাস্তবের বিশেষ সম্পর্ক থাকে না।

নতুন কৃষি রণকৌশল এবং সবুজ বিপ্লব

1961-69 এ ক'বছর ভারতে 'সবুজ বিপ্লব' ঘটে গেছে। এ দাবি একান্ত অসঙ্গত নয়। এ সময়কালীন কৃষি উৎপাদন বিস্ময়কর রূপে বৃদ্ধি পায়। দেশ খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতার পথে এগিয়ে চলে। এ অসামান্য সাফল্যের ফলে ভারত বিশ্বের কৃষি জগতেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। এ পরিবর্তনের জন্য যে রণকৌশল গ্রহণ করা হয়েছিল তা নতুন কৃষি রণকৌশল রূপে অভিহিত।

নতুন কৃষি রণকৌশলের বৈশিষ্ট্য ঃ

(i) কৃষি কাঠামোর সংস্কার। কাঠামোগত সংস্কার ছাড়া কোন বিপ্লবই সম্ভব নয়। সরকার তাই ভূমিস্বত্ব প্রথার সংস্কার সাধন নীতি গ্রহণ করে ও তা যথাযথ রূপায়ণের জন্য বদ্ধপরিকর হয়। এ নীতির মূল উদ্দেশ্য জমির মালিকানা থেকে মধ্যস্বত্বজীবীদের উচ্ছেদ সাধন করে যে জমি চাষ করে তাকে জমির মালিকানা দেয়া। তাছাড়া বর্গাদারদের স্বার্থ সুরক্ষিত করা, জমির উচ্চতম সীমা নির্ধারণ করা, উদ্বৃত্ত জমি জমিহীন ও ক্ষুদ্র চাষীদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া, কৃষি বাজার সুসংগঠিত করা প্রভৃতি কর্মসূচী গ্রহণ ও কার্যকর করাও ভূমি সংস্কার নীতির অঙ্গরূপে গৃহীত হয়। এর ফলে কৃষকদের মধ্যে ও সমগ্র গ্রামীণ পরিবেশে এক নতুন জাগরণের সৃষ্টি হয়।

(ii) কৃষিকার্যের বিস্তার। যেসব জমি আবাদযোগ্য অথচ অনাবাদী অবস্থায় পড়ে আছে সেসব জমি, এমনকি আবাদযোগ্য নয় বলে যেসব জমি পরিত্যক্ত হয়েছিল সেসব জমিও কৃষিকার্যের জন্য পুনরায় উদ্ধার করা হয়। দেখা যায়, 1950-51 সনের তুলনায় 1966-69 সনে কৃষিকার্যে রত জমির পরিমাণ 22·8 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। জমির যোগান প্রাকৃতিক কারণে নির্দিষ্ট। সুতরাং নিবিড়ভাবে জমি চাষ করার উপরই কৃষি উৎপাদনের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। তাই কৃষি জমির বিস্তার সাধনের পাশাপাশি নিবিড়ভাবে জমির চাষ ও প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিবিদ্যা সম্বন্ধে গবেষণা চলছে এবং এ গবেষণালব্ধ জ্ঞান প্রয়োগ দ্বারা সাফল্য অর্জন করাও সম্ভব হচ্ছে।

(iii) উপকরণ সরবরাহ। উচ্চফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার, জল, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তিবিদ্যা, কৃষি যন্ত্রপাতি প্রভৃতির সাহায্যে কৃষকেরা যাতে কৃষি উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে সমর্থ হয় সেজন্য সরকার এসব উপকরণ তাদের মধ্যে সহজ ও সুলভ শর্তে সরবরাহ করার জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা নিয়েছে। এ ব্যাপারে সমবায় সমিতিগুলিকে সক্রিয় করে তোলা হয়েছে।

(iv) কৃষকেরা যাতে বাজারের অনিশ্চয়তার হাত থেকে মুক্ত হতে পারে সেজন্য ফসল বীমা প্রথা প্রচলন করা হয়েছে এবং সমর্থন দাম বা ন্যূনতম দামে সরকার বা সরকারী এজেন্সিগুলি যাতে ফসল ক্রয় করতে পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ফুড কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া নামক সংস্থাটির প্রতিষ্ঠা এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

সবুজ বিপ্লব

1967-68 সনে উচ্চফলনশীল বীজের ব্যবহার সম্পর্কে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। সে বছর 14·8 মিলিয়ন একর জমিতে উচ্চফলনশীল বীজ ব্যবহার করা হয়। বস্তুত এরই ফলে কৃষি উৎপাদন ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন—'সবুজ বিপ্লব'—সূচিত হয়।

অর্থ নৈতিক ফলাফল

(i) খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রায় সুরু থেকেই ভারত এক দারুণ খাদ্যশস্য সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। স্বাধীনতার পরেও প্রায় কুড়ি বছর এ সঙ্কট কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয় না। প্রথম পরিকল্পনার পর থেকে অবস্থার অবশ্য পরিবর্তন হতে সুরু হয়, তবে তা অত্যন্ত মন্থর গতিতে। নিম্নের পরিসংখ্যান থেকে তা বোঝা যাবে।

খাদ্যশস্য উৎপাদন (মিলিয়ন এমটি)

সন	পরিমাণ
1950-51	55
1955-56	67
1960-61	82
1964-65	89
1967-68	95·6
1968-69	94·01
1969-70	99
1970-71	108

দেখা যাচ্ছে, 1970-71 সনে খাদ্যশস্যের পরিমাণ 1950-51 সনের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। কিন্তু 1951 সনের তুলনায় 1971 সনে ভারতের লোকসংখ্যা প্রায় দেড়গুণ বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ, লোকসংখ্যা 36 কোটি 10 লক্ষ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 54 কোটি 70 লক্ষ হয়। এ সময়কালীন জনপ্রতি খাদ্য-শস্যের দৈনিক সরবরাহ 395 গ্রাম থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 457 গ্রাম হয়। এজন্য ভারতকে আমেরিকা থেকে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয়।

বস্তুত, ভারতের অর্থনীতি তখন আমেরিকার খাদ্যশস্য দানের উপর একান্ত নির্ভরশীল ছিল।

খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি যে কেবল উচ্চফলনশীল বীজের ব্যবহারের জন্যই সম্ভব হয়েছিল, তা নয়। 1964-65 সন থেকে 1967-68 সনের মধ্যে খাদ্যশস্য 6·6 মিলিয়ন এমটি বৃদ্ধি পায়। এর মধ্যে 3·45 মিলিয়ন এমটি খাদ্যশস্য বৃদ্ধির কারণ কর্ষিত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি।

1974-75 সন পর্যন্ত কৃষি উৎপাদনে তেমন কোন পরিবর্তন ঘটেনি। 1975-76 সন থেকে কৃষি উৎপাদন লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। 1983-84 সনে কৃষি উৎপাদনের সূচক (1967-70 = 100) সংখ্যা 154। বলা বাহুল্য, কৃষি উৎপাদনশীলতা 1967-68 সন থেকে 1981-82 সনের মধ্যে 19 শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

(ii) সবুজ বিপ্লব প্রধানত গম বিপ্লবেই প্রকাশ পেয়েছিল। অন্যান্য খাদ্যশস্যে এর প্রভাব দেখা যায়নি।

খাদ্যশস্য উৎপাদন (মিলিয়ন এমটি)

খাদ্যশস্য	1964-65	1967-68	1968-69
গম	12·29	16·54	18·65
চাল	39·03	37·61	39·76
জোয়ার	9·75	10·05	9·80
বাজরা	4·45	5·18	3·80
ভুট্টা	4·66	6·27	5·70
ডাল	12·43	12·10	10·42
মোট	89·0	95·6	94·01

একমাত্র গম উৎপাদনই ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। 1967-68 সনে চালের উৎপাদনে অবনতি ঘটে। 1968-69 সনে উৎপাদন আবার 1964-65 সনের স্তরে ফিরে আসে।

(iii) ক্রমে সবুজ বিপ্লবের প্রভাব অন্যান্য শস্য উৎপাদনেও প্রতিফলিত হতে থাকে।

কৃষি উৎপাদনের সূচক সংখ্যা

(1970-71 সনের তুলনায় 1981-82 সনে পরিবর্তন (শতাংশ)
ভিত্তি : 1967-70 = 100)

চাল	গম	তুলা	পাট	ইক্ষু	তৈলবীজ
27·6	58·7	64·1	40·0	44·2	19·2

সূত্র : ইকোনোমিক সার্ভে, 1982-83।

লক্ষণীয়, গম উৎপাদন বৃদ্ধির হারের তুলনায় চাল উৎপাদন বৃদ্ধির হার অর্ধেকেরও কম।

(iv) কর্মসংস্থান। নতুন কৃষি রণকৌশল শ্রম-নিবিড় প্রযুক্তিবিদ্যা। এর সাফল্যের জন্য প্রয়োজন জলের সুব্যবস্থা, অধিকতর পরিমাণ উন্নতমানের সার, কীটনাশক দ্রব্যাদি, উন্নত পরিবহন, প্রোসেসিং ও বাজারকরণের উন্নয়ন। এর ফলে এসব ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে। নতুন কৃষি প্রযুক্তিবিদ্যার ফলে যন্ত্রপাতির প্রয়োগ বৃদ্ধি পাবে। ফলে শ্রমিকের চাহিদা হ্রাস পাবে। এ আশঙ্কা অমূলক নয়। তবে নতুন কৃষি প্রযুক্তিবিদ্যার ফলে কর্মসংস্থানের যে প্রসার সাধন সম্ভব হবে তা নীট কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করতে সমর্থ হবে বলে যুক্তিযুক্তভাবেই স্বীকার করে নেয়া যেতে পারে।

(v) শিল্পের সহযোগিতার উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি। নতুন কৃষি প্রযুক্তিবিদ্যার সঙ্গে জড়িত যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক সার, বিদ্যুৎ প্রভৃতি। ফলে কৃষিকার্য শিল্পের সহযোগিতা ও গবেষণার উপর ক্রমাগত নির্ভরশীল হয়ে উঠছে।

সামাজিক

(i) বৃহৎ ও ক্ষুদ্র কৃষিদের মধ্যে ব্যবধান বৃদ্ধি। উচ্চফলনশীল বীজের সুযোগ নেয়া ক্ষুদ্র ও মধ্য কৃষকদের আর্থিক সঙ্গতি ও সামাজিক প্রতিপত্তির সাধ্যের বাইরে। একমাত্র ধনী কৃষকেরাই এর সুযোগ নিতে পারে। ফলে ধনী কৃষকেরা আরো ধনী হয়ে উঠবে, গ্রামীণ আর্থিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হবে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসন্তোষ বৃদ্ধি পাবে।

(ii) ভূমিস্বত্ব প্রথার পরিবর্তন অবহেলিত। নতুন কৃষি প্রযুক্তিবিদ্যা এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে যার ফলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক

থেকে ভূমিস্বত্ব প্রথার আমূল ও ব্যাপক পরিবর্তনের গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে। এরূপ পরিবেশ সমাজতন্ত্রের সমর্থক নয়।

(iii) আঞ্চলিক বৈষম্য বৃদ্ধি। সবুজ বিপ্লবের প্রভাবের পরিধি অত্যন্ত সীমিত। প্রধানত পাঞ্জাব, হরিয়ানা, পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ ও কর্ণাটকে এর প্রভাব সীমাবদ্ধ। পাঞ্জাব ও হরিয়ানা এর বিশেষ সুযোগ নিতে পেরেছে। বস্তুত অন্যান্য রাজ্যগুলির কৃষিক্ষেত্রে এ বিপ্লবের প্রভাব অত্যন্ত সীমিত। ফলে আঞ্চলিক বৈষম্য ও অসন্তোষ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উপসংহার

উপসংহারে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখ করা যেতে পারে।

(i) সবুজ বিপ্লব প্রধানত গম বিপ্লব।

(ii) এ বিপ্লব গ্রামীণ ক্ষেত্রে বৃহৎ এবং মধ্য ও ক্ষুদ্র কৃষকদের মধ্যে আর্থিক ও সামাজিক বৈষম্য বৃদ্ধি করতে সাহায্য করছে।

(iii) সবুজ বিপ্লবের ফলে আঞ্চলিক বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(iv) সবুজ বিপ্লবের প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী নয়। কারণ তা সর্বাত্মক কৃষি বিপ্লব নয়; এর মূলে সামাজিক ন্যায় ও সাম্যের উৎসাহ বা আকাঙ্ক্ষা নেই।

তা সত্ত্বেও স্বীকার করতে হবে সবুজ বিপ্লব বা উচ্চফলনশীল বীজ অর্থাৎ, নতুন কৃষি রণকৌশল কৃষি উৎপাদন ক্ষেত্রে নতুন জাগরণ, নতুন চিন্তাভাবনা, নতুন গবেষণার ক্ষেত্র সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে। ভারত আজ খাদ্যশস্যে স্বয়ম্ভর, কাঁচামাল উৎপাদনে সমৃদ্ধ—প্রধানত সবুজ বিপ্লবের ফলেই তা সম্ভব হতে পেরেছে।

কৃষি বাজার: সমস্যা

ভারতীয় কৃষকেরা তাদের উৎপন্ন দ্রব্য সর্বোচ্চ দামে বিক্রয় করে পূর্ণ লভ্যাংশ ভোগ করতে অসমর্থ। এর কারণ:

(i) মধ্যজীবীদের উপস্থিতি। উৎপাদক ও ভোগকারীদের মধ্যে অনাবশ্যক রূপে মধ্যজীবীদের উপস্থিতি নানাভাবে দাম বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। কৃষকদের লভ্যাংশের পরিমাণও হ্রাস পায়।

(ii) উৎপাদকেরা জোটবদ্ধ নয়। উৎপাদনকারী কৃষিজীবীরা সাধারণত

অসংবদ্ধ। ক্রেতারা সুসংবদ্ধ ও সাধারণত ধনী। ফলে তারাই মূলত কৃষিদ্রব্যের দাম নির্ধারণ করে।

(iii) আগাম বিক্রয়। কৃষকরা সাধারণত লগ্নিকারবারীদের কাছে ঋণগ্রস্ত। এ ঋণের চাপে ও দৈনন্দিন জীবনযাপনের আর্থিক তাড়নায় তারা যেকোন দামে শস্য বিক্রয় করে দেয়। অনেক সময় লগ্নিকারবারীরা কৃষকদের এ চরম দারিদ্র্য ও অশিক্ষার সুযোগ নিয়ে ফসল না তোলার আগেই বাজার দামের অনেক কমে তাদের ফসল কিনে নেয়।

(iv) দায়মূল্য। কৃষিদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য কৃষকদের নানারকম দায়মূল্য বা বাজার দস্তুরি দিতে হয়। যেমন, আড়তদারকে তার কাজের জন্য "আড়ৎ" দিতে হয়। দালালরা যদি লেনদেনে অংশগ্রহণ করে তবে তাদের 'দালালি' দিতে হয়। তাছাড়া দ্রব্য ওজন করানো বাবদ 'তুলাই' দিতে হয়। মজুরদের দিতে হয় 'পালেদারী'। এর উপর রয়েছে পণ্যদ্রব্য অপরিচ্ছন্ন এ অজুহাতে দাবি 'করদা' ও ওজন কম হবার আশঙ্কা বাবদ 'দান' বা 'দালতা'র বরাদ্দ। স্থানীয় পৌর প্রতিষ্ঠানও শহর সুরক্ষণ বাবদ নানারকম কর আদায় করে থাকে। বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে এ সমস্ত দায় দস্তুরি মিটিয়ে কৃষকদের যা অবশিষ্ট থাকে তা তাদের উৎপন্ন দ্রব্যের সঙ্গত মূল্য বলা চলে না।

(v) প্রবঞ্চনা। ধূর্ত ক্রেতারা কৃষকদের অজ্ঞতার সুযোগও নিয়ে থাকে। যেমন, ওজনে কারচুপি, বিনামূল্যে নমুনা বাবদ অনেকটা শস্য তুলে নেয়া, কমিশন এজেন্টদের জাল-জুয়াচুরি ও প্রবঞ্চনা করে বিক্রেতাদের ঠকাবার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়া এবং মধ্যজীবী মুনাফাখোরদের অন্যায়ের আশ্রয় নিয়ে কৃষকদের কাছ থেকে দাবি-দাওয়ার অজুহাতে টাকা আদায় করা।

(vi) গ্রেডিং ও প্রামাণিককরণ ব্যবস্থার অভাব। দ্রব্যের গুণানুসারে গ্রেডিং ও প্রামাণিককরণ ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের পক্ষেই লাভজনক। ক্রেতারা দ্রব্যটির গুণ সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারে। বিক্রেতারাও বিস্তৃত বাজারের সুবিধা ও দ্রব্যের গুণানুসারে দাম পেতে সমর্থ হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ক্ষেত্রে 'প্রামাণিককরণ' অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উচ্চমানের দ্রব্যের পরিবর্তে নিম্নমানের দ্রব্য রপ্তানিতে গোটা বাজার হাতছাড়া হয়ে যাবার

আশঙ্কা অবাস্তব ঘটনা নয়। গ্রেডিং ও প্রামাণিককরণে ভারতীয় বাজার পিছিয়ে আছে।

(vii) ভেজাল। বিক্রয়ের জন্য বাজারে যে সমস্ত দ্রব্য আনা হয় তা প্রায়ই সুষ্ঠ প্রস্তুতির ভেতর দিয়ে আসে না। অসময়ে ফসল তোলার ফলে ফসলের গুণ নষ্ট হয়, ফলে তা উচ্চমূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। অপরিচ্ছন্ন ফসলের জন্য 'করদা' দিতে হয়। তাছাড়া একশ্রেণী বিক্রেতারা ভেজাল বিশারদ। এতে দ্রব্যের গুণ নষ্ট হয়, সুনাম ব্যাহত হয় ও মূল্য হ্রাস পায়।

(viii) প্রথম শ্রেণীর গুদামঘরের অভাব। গুদামঘরের অভাবের ফলে পণ্যদ্রব্যের যথেষ্ট অপচয় ঘটে। গুদামঘরের অভাবে কৃষকেরা ফসল তোলার সঙ্গে সঙ্গেই তা বিক্রয় করে ফেলে। গুদামঘরের অভাবে সমবায় বাজারকরণও ব্যাহত হয়।

(ix) দাম সম্বন্ধে সংবাদ প্রবাহের অভাব। বর্তমান বাজারের জটিলতা তদুপরি কৃষকদের দারিদ্র্য ও অজ্ঞতার জন্য তারা বাজারের দামের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ করতে সমর্থ হয় না। বাজারের অবস্থা সম্বন্ধে অজ্ঞতার ফলে তারা চাহিদার সম্ভাবনার ভিত্তিতে উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। ফলে বাজার দাম সাধারণত সঙ্গতিপন্ন মধ্যজীবীদের খেয়াল-খুশি মাফিক নির্ধারিত হয়। ভারতে কৃষিদ্রব্যের দামের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের অভিমত পাবার সুব্যবস্থা নেই বললেই হয়।

(x) পরিবহন। ভারতীয় পরিবহন প্রসার, মান বা মাসুলের পরিমাণ কোন দিক দিয়েই প্রশংসনীয় নয়। গ্রামীণ রাস্তাঘাটের অবস্থা আরো শোচনীয়। ভগ্ন, কর্দমাক্ত রাস্তাঘাট পরিবহনের পথে প্রচণ্ড বাধা সৃষ্টি করে। প্রতিটি গ্রামের প্রতিটি অংশকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাস্তার সাহায্যে প্রধান রাস্তার সঙ্গে যুক্ত করার ব্যবস্থা ব্যাপকতা ও সার্থকতার দিক দিয়ে যথেষ্ট ত্রুটিপূর্ণ। জলপথের উন্নয়নের যথেষ্ট সুযোগসুবিধা থাকা সত্ত্বেও আজও তা অনুন্নত বলা চলে। উন্নয়নের অভাবে পরিবহন কৃষকদের কাছে অত্যন্ত ব্যয়বহুল। পরিবহনের অসুবিধার দরুনও তাদের দ্রুত ফসল বিক্রয় করে ফেলতে হয়। বলা বাহুল্য, অনুন্নত পরিবহন ব্যবস্থার ফলে তাদের পক্ষে প্রতিযোগিতামূলক বাজারের সুযোগ নেয়া সম্ভব হয় না। ক্রেতারাও প্রতিযোগিতামূলক দামের সুযোগ পায় না।

(xi) আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা। ঋণে জর্জরিত কৃষকেরা অর্থের অভাবে

স্বল্প মূল্যে ফসল বিক্রয় করে ঋণের বোঝা লাঘব করতে গিয়ে আরো ঋণবদ্ধ হয়ে পড়ে। সরকার, ব্যাঙ্ক ও সমবায় সমিতিগুলি তাদের আর্থিক সাহায্যের সমর্থনে রয়েছে বটে, তবে তা প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত নয়।

প্রতিকারের উপায়

(i) নিয়ন্ত্রিত বাজার। নির্দিষ্ট আইনকানুন দ্বারা বাজার নিয়ন্ত্রিত হলে নানারকম অন্যায় দামমূল্য থেকে কৃষকেরা রেহাই পাবে। তদুপরি অন্যায়ভাবে মূল্য নির্ধারণ, কম ওজন, অসঙ্গত বাটা প্রভৃতি শোষণ থেকেও তারা মুক্ত হবে। নিরপেক্ষ সালিসের মাধ্যমে বিরোধ মিটাবার সুযোগ পাওয়াও সম্ভব হবে।

(ii) মাপ ও ওজন প্রামাণিককরণ। দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ওজনের পরিবর্তে নির্দিষ্ট ওজনের প্রচলন সর্বত্র কার্যকর করতে হবে। এর ফলে মাল ও ওজনে কৃষকদের প্রবঞ্চনা করা সহজ হবে না। তাছাড়া বিভিন্ন বাজার দামের সঙ্গে তুলনা করে অপেক্ষাকৃত উচ্চ বাজারে পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করা সম্ভব হবে।

(iii) গ্রেডিং, প্রামাণিককরণ ও চুক্তির শর্তে সমতা সাধন। গ্রেডিং ও প্রামাণিককরণের ফলে পণ্যদ্রব্যের মান বৃদ্ধি পাবে ও বাজারের বিস্তৃতি ঘটবে। ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে দ্রব্যের গুণাগুণ নিয়ে বিরোধ হ্রাস পাবে। পণ্যদ্রব্যের যথার্থ মানের ভিত্তিতে চুক্তির শর্তের সমতা সাধন বাজারকে সুনিয়ন্ত্রিত করতে ও ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তার সাধনে সাহায্য করবে।

(iv) প্রথম শ্রেণীর গুদামঘর। গুদামঘরের সুব্যবস্থা কৃষকদের উচ্চতম বাজারে পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করার সুযোগ দেবে। তাছাড়া এর ফলে বাজার দামে স্থিতিসাম্যও দেখা দেবে। তদুপরি গুদামজাত মালের বিরুদ্ধে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির কাছ থেকে ঋণ নেয়া সহজ হবে ও তা দিয়ে পণ্যদ্রব্য বাজার-করণ সম্পর্কিত ব্যয় বেশ কিছুটা মিটানোও সম্ভব হবে।

(v) বাজার সংবাদ সরবরাহ। প্রেস, রেডিও, টেলিভিসন প্রভৃতির মারফত বাজারের অবস্থা ও গতি ব্যাপকভাবে ও সহজ পদ্ধতিতে সরবরাহ করার ব্যবস্থা করতে হবে।

(vi) পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নের দিকে দৃষ্টি রেখে সুপরিকল্পিত উপায়ে রেলপথ, সড়ক ও জল পরিবহন ব্যবস্থার

প্রসার সাধন। মাল চলাচলের উপর মাস্থল নির্ধারণ ব্যাপারে দেশীয় ও বিদেশীয় বাজারের অবস্থা ও গতি এবং উৎপাদন ব্যয় বিষয়গুলি বিবেচনার মধ্যে আনতে হবে।

(vii) আর্থিক সাহায্যে ব্যবস্থা। উৎপাদন ও বাজারকরণের জন্য কৃষকদের নিম্নতম সুদ ও সহজ শর্তে ঋণ দিয়ে সাহায্য করার জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে উদারতা ও দক্ষতার সঙ্গে এগিয়ে আসতে হবে। ঋণ পরিশোধ ব্যাপারে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয় নয়।

ষষ্ঠ পরিকল্পনা ও কৃষি বাজার

1981 সনের 31 মার্চ আমাদের দেশে নিয়ন্ত্রিত বাজারের সংখ্যা ছিল 4,605। এর মধ্যে 2289 প্রধান বাজার ও 2316 সাব-মার্কেট। তাছাড়া 22000 'হাট' আছে। ক্ষুদ্র উৎপাদকেরা এসব স্থানেই তাদের উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করে। বাজার উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য অধিকাংশ রাজ্যে এগ্রিকালচারেল প্রোডিউস মার্কেটস এ্যাক্ট রয়েছে বটে, তবে এ আইন খুব কম রাজ্যেই শক্তভাবে কার্যকর করা হয়েছে। ফলে অসাধু ব্যবসায়ীরা নানাভাবে দরিদ্র কৃষক ও ক্রেতা-বিক্রেতাদের ঠকিয়ে যাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে ষষ্ঠ পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর জোর দেয়া হয়েছে।

(i) নিয়ন্ত্রিত বাজারের আরো প্রসার সাধন ও উন্নতি বিধানের জন্য বাজারের নিয়ন্ত্রণাধীন পণ্যদ্রব্যের সংখ্যা বৃদ্ধি।

(ii) নিয়ন্ত্রণ বিধিগুলি কার্যকর করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া। খোলা নিলাম প্রথা এবং কেনা-বেচার নিয়মকানুন ও কমিশন এজেণ্টদের কমিশন প্রথা নিয়ন্ত্রণ।

(iii) গ্রামীণ হাট ও বাজারের উন্নয়ন সাধন। যেখানে হাট বা বাজারের অভাব সেখানে হাট বা বাজার স্থাপন।

মফস্বলের বাজার, সেচ প্রকল্পের কমাণ্ড এরিয়ায় অবস্থিত বাজার ও গ্রামীণ বাজারগুলিকে একটি কেন্দ্রীয় সেক্টর স্কীমে সাহায্য দেয়া হবে। বাজারের ভিত-কাঠামোর উন্নয়নের জন্য এগ্রিকালচারেল রিফিনান্স এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন ও কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কগুলির কাছ থেকে অধিকতর পরিমাণে আর্থিক সাহায্য নেয়া হবে।

কৃষি বাজার পরিকল্পনার সঙ্গে আরো দুটি বিষয় জড়িত। (a) কৃষি দ্রব্যাদির ন্যূনতম দাম নির্ধারণ ; (b) নির্ধারিত ন্যূনতম দাম স্থিতিসম্পন্ন রাখার জন্য মন্দাকালীন বাজারে সরকারকে নির্ধারিত ন্যূনতম দামে কৃষিদ্রব্য ক্রয় করে নিতে বাধ্য থাকতে হবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে প্রধানত যে সমস্ত এজেন্সি কৃষিদ্রব্য সংগ্রহ করার কাজে যুক্ত তাদের মধ্যে আছে ফুড কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া, কটন কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া, জুট কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া, ন্যাশনাল এগ্রিকালচারেল কোঅপারেটিভ মার্কেটিং ফেডারেসন অব ইণ্ডিয়াভুক্ত সমবায়গুলি। কোন কোন রাজ্যেও সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ন্যূনতম দামে কৃষিদ্রব্য সংগ্রহের ব্যবস্থা রয়েছে। সিভিল সাপ্লাইজ কর্পোরেশন বা বিভাগীয় কর্তৃত্বে এ সংগ্রহের কাজ হয়ে থাকে। ষষ্ঠ পরিকল্পনাকালীন এ সমস্ত এজেন্সিদের প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য দেয়া হবে যাতে তারা সংগ্রহের কাজ আরো সুষ্ঠুভাবে করতে পারে। তাছাড়া এফ-সি-আই এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের কর্পোরেশনগুলির ষ্টোরেজের প্রসারের জন্যও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে। পচনশীল দ্রব্যাদির সংরক্ষণের জন্য 'ঠাণ্ডা-ঘর'-এর ব্যাপক ব্যবস্থা নেয়ার প্রস্তাবও রাখা হয়েছে। 1979-80 সন থেকে গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রণালয় গ্রামাঞ্চলে পাঁচ বছরে অতিরিক্ত 2 মিলিয়ন এমটি ষ্টোরেজ ক্যাপাসিটি স্কীম কার্যকর করেছে। এই স্কীম রূপায়ণে রয়েছে সমবায় সমিতি, বাজার কমিটি ও ষ্টেট ওয়েরহাউজিং কর্পোরেশনগুলি।

ডাইরেক্টোরেট অব মার্কেটিং এণ্ড ইনস্পেকসন কৃষি বাজার সম্পর্কিত সমস্যা সম্বন্ধে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলিকে পরামর্শ দিয়ে থাকে। ডাইরেক্টোরেটের কাজকর্মের মধ্যে রয়েছে : (1) কৃষি ও সম্পর্কিত দ্রব্যাদির গ্রেডিং ও মানের উন্নয়ন সাধন, (ii) আইনবিহিতভাবে বাজার নিয়ন্ত্রণ, (iii) বাজার সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, (iv) বাজার বিস্তৃতকরণ, (v) বাজার সম্পর্কিত গবেষণা, সমীক্ষণ ও পরিকল্পনা, ও (vi) কোল্ড ষ্টোরেজ অর্ডার 1980 ও সিড ফুড প্রডাকসন অর্ডার 1973 কার্যকর করা।

কৃষকদের অসমর্থতার কারণ

কৃষকেরা নিয়ন্ত্রিত বাজারের আশানুরূপ সুযোগ গ্রহণ করতে সমর্থ নয় তার কারণ :

(i) অজ্ঞতা ও সংযোগের অভাব বশতঃ তারা বাজারের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে অবহিত নয়।

(ii) তারা এত দরিদ্র যে ফসল তোলা মাত্রই যে কোন দামে তা বিক্রয় করে দিতে বাধ্য হয়। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে তারা ফসল না তোলার আগেই তা মহাজন বা দালালদের কাছে বন্ধক রেখে টাকা আগাম নিতে বাধ্য হয়।

(iii) গুদামঘরের সুযোগ থাকলেও টাকার অভাবে সে সুযোগ নেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া গুদামঘরের পরিসরও সীমিত।

(iv) পরিবহনের অসুবিধার জন্য অবস্থাপন্ন জোতদাররা পর্যন্ত লাভজনক বাজারে তাদের মাল বিক্রয়ের জন্য পাঠাতে আগ্রহান্বিত নয়।

(v) নিয়ন্ত্রিত বাজারেও কৃষকেরা নানাভাবে আড়তদার বা দালালদের দ্বারা প্রবঞ্চিত হয়। এর ফলে এসব বাজার সম্পর্কে তাদের আগ্রহ অপেক্ষা নৈরাশ্যই বেশি সৃষ্টি হয়েছে।

সমবায় বাজার

সমবায় বাজারের ফলে কৃষকেরা যে সমস্ত বিশেষ সুযোগ-সুবিধা পেতে পারে তার মধ্যে উল্লেখ্য :

(1) এককের পক্ষে মধ্যজীবীদের বা অন্যান্য বাজার প্রবঞ্চকদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া অসম্ভব বললেই চলে, কিন্তু সমবায়ের মারফত সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে এলে তা আদৌ অসম্ভব নয়। তাছাড়া যৌথভাবে দামদস্তুর করার ফলে যুক্তিযুক্ত শর্তে দ্রব্যের দাম আদায় করা সহজ।

(2) সমবায় বাজার সমিতিগুলি যদি কেবল বাজারকরণের দায়িত্বের মধ্যে তাদের কাজকর্ম সীমাবদ্ধ না রেখে ঋণদান, চাষআবাদ প্রোসেসিং প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত হতে পারে তবে তারা আরো বিস্তৃতভাবে তাদের সদস্যদের উপকারে আসতে পারে। ব্যক্তিগত স্তরে সর্বোচ্চ বাজারের

সুযোগ নেয়ার সঙ্গে যে আর্থিক সমস্যা জড়িত সমবায় বাজার সমিতিগুলি এ ব্যাপারে সদস্যদের অর্থ আগাম দিয়ে তা অনেকটা লাঘব করতে পারে।

(3) উৎসাহী সমবায় বাজার সমিতিগুলির পক্ষে নিজস্ব ষ্টোরেজ ও গুদামঘরের ব্যবস্থা করাও সম্ভব হবে। ফলে কৃষকদের পক্ষে উচ্চতম বাজারের সুযোগ নেয়া সম্ভব হবে। এজন্য প্রয়োজনীয় ক্রেডিটের ব্যবস্থা করা কঠিন হবে না। এর ফলে কৃষিদ্রব্যের দামও স্থিতিশীল হবে।

(4) কৃষিদ্রব্য পরিবহনের জন্য নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলাও সমবায় বাজার সমিতিগুলির পক্ষে সম্ভব হবে।

(5) সমবায় বাজার সমিতিগুলি গ্রেডেড ও নির্দিষ্ট মানের দ্রব্য উৎপাদন করার জন্য সদস্যদের উৎসাহিত করতে পারবে।

(6) সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে বাজারের দাম অনুকূলে আনার চেষ্টা একমাত্র সমবায় বাজার সমিতিগুলির পক্ষেই সম্ভব হবে।

(7) সমবায় বাজার সমিতিগুলির কাজকর্মের ফলে মধ্যজীবীদের সংখ্যা হ্রাস পাবে। ফলে কৃষকদের মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

(8) সমবায় বাজার সমিতিগুলি কৃষকদের বীজ, সার, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি দিয়েও সাহায্য করতে পারবে।

অসাফল্যের কারণ

আমাদের দেশে সমবায় বাজার সাফল্য অর্জন করেছে একথা বলা চলে না। এ অসাফল্যের কারণ ঃ

(i) অকর্মণ্যতা। তসিল স্তরে 3200 প্রাথমিক বাজার সমিতি রয়েছে। এর মধ্যে 1000 সমিতি নিষ্ক্রিয় বলা চলে। মাত্র 600 সমিতির বাজারকরণ সম্পর্কিত লেনদেনের বার্ষিক মূল্য 10 লক্ষ টাকার উপর।

(ii) সংযোজনের অভাব। তসিল, রাজ্য ও জাতীয় স্তরে অবস্থিত সমবায় বাজার সমিতিগুলির মধ্যে কর্ম-ভিত্তিক সংযোজনের অভাব রয়েছে। ফলে একই কাজ একাধিক স্তরে করা হচ্ছে। তাছাড়া বিভিন্ন বাজার সমবায়, উৎপাদক সমবায় ও ভোগকারী সমবায় সমিতিগুলির মধ্যেও সংযোজনের অভাব রয়েছে।

(iii) বাজার সমিতিগুলি কোন কোন ক্ষেত্রে কমিশন এজেন্টের কাজ করে যা সমবায় নীতিবিরোধী।

(iv) প্রাথমিক স্তরের বাজার সমবায়গুলির আর্থিক অনটনের প্রশ্নও উপেক্ষণীয় নয়।

সংক্ষেপে, বাজার সমবায় সমিতিগুলির প্রশাসনিক দুর্বলতা, নীতিবোধ ও কর্তব্যবোধের অভাব, উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে মধ্যজীবীদের পৃথক-করণের দৃঢ় প্রচেষ্টার অভাব, আর্থিক অনটন এবং দেশীয় ও বিদেশীয় কৃষি বাজার সম্পর্কে উপযুক্ত জ্ঞানের অভাব তাদের দ্রুত সাফল্যের পরিপন্থী হয়ে রয়েছে।

সমবায় বাজারের প্রসার

সমবায় বাজারের প্রসার সাধনের ধারা নিম্নরূপ :

(i) প্রধানত অল ইণ্ডিয়া রুরাল ক্রেডিট সার্ভের রিপোর্টে সর্বপ্রথম সমবায় বাজারকরণ বিষয়টি প্রাধান্য পায়।

(ii) ন্যাশনাল ওয়েরহাউজিং কর্পোরেশন এ রিপোর্টের সুপারিশক্রমেই স্থাপিত হয়।

(iii) 1956 সনে ভারত সরকার এক আইন দ্বারা ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ওয়েরহাউজিং বোর্ড প্রতিষ্ঠা করে। এ বোর্ড রাজ্যগুলিকে তাদের সমবায় আন্দোলন সার্থক করে তোলার জন্য সাহায্য করে থাকে। 1963 সনে এর পরিবর্তে এক কেন্দ্রীয় আইনে ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন স্থাপিত হয়। এর উপর অনেক বেশি কাজকর্মের দায়িত্ব দেয়া হয়।

(iv) কেন্দ্র, রাজ্য ও ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশনের উদ্যোগে সমবায় বাজারকরণ আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে ওঠে। 1975-76 সনে প্রাথমিক বাজারকরণ সমিতিগুলির সংখ্যা ছিল 3174। প্রাথমিক সমিতিগুলি 25 রাজ্যস্তরে যুক্ত হয়েছে। তাছাড়া উপজাতি সমবায়গুলি রাজ্যস্তরে 7 ফেডারেশনে যুক্ত হয়েছে। জাতীয় স্তরে গঠিত হয়েছে ন্যাশনাল এগ্রিকালচারেল কো-অপারেটিভ মার্কেটিং ফেডারেশন। কৃষি উৎপাদনের সাফল্য নির্ভর করে উৎপাদন ক্রেডিট ও উৎপাদনের উপকরণের যোগানের সঙ্গে উৎপন্ন কৃষি দ্রব্যের প্রোসেসিং ও বাজারকরণের যোগসূত্র স্থাপনের উপর। এ উপলব্ধির ফলে সমবায় বাজারকরণের ভিত-কাঠামো প্রায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ মধ্য ও অভ্যন্তরীণ বাজারে প্রসার লাভ

করেছে। এর মধ্যে রয়েছে মণ্ডিস্তরে 3370 প্রাথমিক বাজার, 193 কেন্দ্রীয়/জেলা কো-অপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটি, 27 রাজ্য/শীর্ষ সমবায় বাজারকরণ ফেডারেশন এবং ন্যাশনাল এগ্রিকালচারেল কো-অপারেটিভ মার্কেটিং ফেডারেশন ও তার 25 শাখা অফিস। সমবায় বাজারকরণ সমিতিগুলির সংখ্যা ও কাজকর্মের প্রসার সাধন হয়েছে বটে, তবে এখনও বাজারে লেনদেনে তাদের মোট অংশের পরিমাণ সামান্য। চতুর্থ পরিকল্পনার শেষ বছর অর্থাৎ, 1969-74 সনে, সমবায় সমিতিগুলি কর্তৃক কৃষিদ্রব্য বাজারকরণের মোট পরিমাণ ছিল 1100 কোটি টাকা। 1979-80 সনে তা বৃদ্ধি পেয়ে 1750 কোটি টাকা দাঁড়ায়। সমবায় বাজারকরণ সমিতি-গুলির মাধ্যমে প্রধানত ইক্ষু, খাদ্যশস্য ও তুলা বাজারকরণ করা হয়। এ ব্যাপারে পাঁচটি রাজ্যের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। রাজ্যগুলি—পাঞ্জাব, হরিয়ানা, কেরল, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশ। সমবায় কৃষি বাজারকরণ ক্ষেত্রে আশানুরূপ উন্নতি না হওয়ার একটি কারণ প্রাথমিক স্তরে অর্থাভাব। তাছাড়া বাজারকরণ জ্ঞানসম্পন্ন যোগ্য লোক ও বিভিন্ন সমবায় ক্ষেত্রের (যেমন, উৎপাদনকারী সমবায় ও ভোগকারী সমবায়) মধ্যে সংযোজন ও ব্যবসাগত সম্পর্কের অভাবও এদের উন্নতির অন্তরায়। এ সমস্ত সমস্যার ফলে সমবায়গুলির পক্ষে বাজারকরণের ক্ষেত্রে বড় রকমের উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব হয় না।

1980-81 সনে সমবায় বাজারকরণ সমিতিগুলি 1950 কোটি টাকা মূল্যের কৃষিদ্রব্য লেনদেন করে। সে বছরই ন্যাশনাল এগ্রিকালচারেল কো-অপারেটিভ মার্কেটিং ফেডারেশন 200 কোটি টাকার মাল লেনদেন করে। সমবায় ক্ষেত্রে 1981 সনের জুনের শেষাশেষি :মোট ষ্টোরেজের পরিসর ছিল 51·32 লক্ষ এমটি। এ সময় গুদামঘরের সংখ্যা ছিল 24,659 ও বাজারকরণ গুদামঘরের সংখ্যা 5,289। 1980-81 সনে ঠাণ্ডাঘরের সংখ্যা ছিল 137 ও পরিসর 2·51 এমটি। ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন ইউরোপিয়ান ইকোনমিক কমিউনিটি ও ইণ্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেণ্ট এসোসিয়েশনের সাহায্যে 10 রাজ্যে প্রায় 37 লক্ষ এমটি পরিসরের ব্যবস্থা করার জন্য 20,000 বেশি গুদামঘর তৈরি করার কর্মসূচী নিয়েছে। তাছাড়া আলু উৎপন্ন হয় এমন পাঁচটি রাজ্যে 127 ঠাণ্ডাঘরও তৈরি করা হবে।

1980-81 সনে সমবায় ক্ষেত্রে 2,352 প্রোসেসিং ইউনিট গঠন করার উদ্যোগ নেয়া হয়। 1929 ইউনিট স্থাপিত হয়। এর মধ্যে 403 বৃহৎ ও মধ্য আয়তনের শিল্পের (চিনির কল, স্পিনিং প্রভৃতি) জন্য। 177 সমবায় চিনির কারখানা 8 রাজ্যে ফেডারেশন ও একটি জাতীয় ফেডারেশন গঠন করে। এ সমস্ত কারণে সমবায় বাজারকরণের কাঠামো পরিবর্তিত হচ্ছে, উন্নয়নও ঘটছে।

৪ গ্রামীণ ঋণ

পরিমাণ

গ্রামীণ ঋণের যথার্থ পরিমাণ আজও সঠিকভাবে নির্ধারিত হয়নি। অল ইণ্ডিয়া রুরাল ক্রেডিট সার্ভে (1951-52) ও অল ইণ্ডিয়া ডেট এণ্ড ইনভেস্টমেণ্ট সার্ভে (1961-62) এ সম্পর্কে যে তথ্যাদি উদ্ঘাটন করেছে তাতে দেখা যায় যে, 1951-52 থেকে 1961-62 সনের মধ্যে ঋণগ্রস্ত কৃষক পরিবারদের ঋণের বোঝা গড়ে 526 টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 708 টাকা হয়েছে। অর্থাৎ, বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় 35 শতাংশ। 1961-62 সনের সার্ভেতে দেখা যায়, কৃষকদের ঋণের 47 শতাংশ গৃহস্থালী খাতে ব্যয়িত হয় বাকী 53 শতাংশ ব্যয়িত হয় উন্নয়নমূলক কাজকর্মে। 1951-52 সনের সার্ভেতে গৃহস্থালী খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল 52 শতাংশ। প্রসঙ্গক্রমে, প্রায় 70 শতাংশ কৃষক পরিবার ঋণগ্রস্ত। ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারদের ঋণের বোঝা বেশি। অধিকাংশই স্বল্পকালীন ঋণ। রুরাল লেবার এনকোয়ারী কমিটির রিপোর্ট (1974-75)-এ প্রকাশ গ্রামীণ ঋণগ্রস্ত শ্রমিক গৃহস্থ-ঘরের অনুপাত 1964-65 সনের 59 শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 1974-75 সনে 65·4 শতাংশ হয়েছে। এ সময়কালীন তাদের ঋণ গড়ে 251 টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 605 টাকা হয়েছে।

ঋণের কারণ

গ্রামীণ ঋণের কারণ প্রধানত :

(i) জমির উপর জনসংখ্যার অত্যধিক নির্ভরশীলতা। ফলে জনপ্রতি আয় হ্রাস বা দারিদ্র্য ও ঋণ বৃদ্ধি।

(ii) অত্যধিক জমি খণ্ডীকরণ ও বিক্ষিপ্ত মালিকানার ফলে প্রান্তিক কৃষি জমির সংখ্যা বৃদ্ধি। ফলে জমির উৎপাদনশীলতা কম। 1970-71 সনের তুলনায় 1976-77 সনে আধা-মধ্য (2-4 হেক্টর) ও ক্ষুদ্র (1-2 হেক্টর) 'অপারেশনাল হোল্ডিং'-এর বৃদ্ধির পরিমাণ 9 শতাংশ ও 9·4 শতাংশ,

যেখানে প্রান্তিক (1 হেক্টরের কম) অপারেশনাল হোল্ডিং-এর বৃদ্ধির পরিমাণ 23 শতাংশ।*

(iii) কুটির শিল্প প্রসারে শিথিলতা। ফলে কৃষকদের অবসরকালীন আয় বৃদ্ধির সুযোগ অতিশয় সীমাবদ্ধ।

(iv) কৃষকদের দারিদ্র্য, ভগ্নস্বাস্থ্য ও শিক্ষার অভাবের দরুন শ্রম দক্ষতা উন্নত নয়।

(v) দুর্ভিক্ষ ও পীড়ায় গোবাদি পশুর মৃত্যুর আধিক্য। এর ফলে কৃষকদের ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

(vi) কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ অনিশ্চিত। বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তা এর প্রধান কারণ। বলা বাহুল্য, দুর্বৎসরে কৃষকদের বাধ্য হয়ে অতি উচ্চ সুদে মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ নিতে হয়।

(vii) ক্ষয়জনিত ক্ষতি। গোসম্পদ ও যন্ত্রপাতির অবক্ষয়ের উপযুক্ত মূল্য সঞ্চয় করে রাখা হয় না। ফলে ভবিষ্যতে তা পূরণ করার মত সঙ্গতির অভাব ঘটে। অর্থের জন্য তাদের মহাজনদের দ্বারস্থ হতে হয়। কৃষকদের এ দুরবস্থার মূলে তাদের অজ্ঞতা ও আর্থিক অসামর্থ্য।

(viii) মামলা-মোকদ্দমার প্রতি অত্যধিক আগ্রহের জন্য কৃষকদের প্রায়ই অর্থক্ষতি স্বীকার করতে হয়।

(ix) অদূরদর্শিতা ও অমিতব্যয়িতা কৃষকদের ঋণের ভার বৃদ্ধি করে। এর কারণ তাদের অশিক্ষা, সামাজিক রীতিনীতি ও আয়ের অনিশ্চয়তা।

(x) পূর্বপুরুষদের ঋণ। কৃষকেরা ঋণ নিয়ে জন্মায়। চলতি আয় থেকে তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপন করাই দুরূহ ব্যাপার। এর উপর

---

* অপারেশনাল হোল্ডিং-এর বৃদ্ধি (1970-71 সনের তুলনায় 1976-77 সনে)

	শতাংশ	
	সংখ্যা	অঞ্চল
বৃহৎ (10 ও তদূর্ধ্ব হেক্টর)	-12·0	-14·5
মধ্য (4-10 হেক্টর)	1·3	2·8
আধা-মধ্য (2-4 হেক্টর)	9·0	7·9
ক্ষুদ্র (1-2 হেক্টর)	9·4	8·2
প্রান্তিক (1 হেক্টরের কম)	23·0	20·2

সূত্র: অল ইণ্ডিয়া এগ্রিকালচারাল সেনসাস 1976-77, ভারত সরকার।

কর্মজীবনের যাবতীয় উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। ফলে ঋণ ভারাক্রান্ত কৃষকদের দ্বারা উন্নত পদ্ধতিতে কৃষিকার্য করা সম্ভব হয় না। ঋণের ভারে তাদের পক্ষে সুসংবদ্ধভাবে উৎপাদন করা বা লাভজনকভাবে উৎপন্ন দ্রব্য বাজারকরণ সম্ভব হয় না। ঋণের দুঃসহ চাপে অনেক সময় তাদের জমিটুকু পর্যন্ত বিক্রয় করে ফেলতে হয়। এর সামাজিক প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ হস্তান্তরিত জমির মালিক যদি সঙ্গতিপন্ন ও কৃষিকার্যে বিশেষ উৎসাহী হয়ে থাকে তবে তার পরিচালনায় জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি আশা করা যায়। কিন্তু জমিহীন কৃষকদের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকলে ভবিষ্যতে তাদের কাছ থেকে দক্ষ শ্রম বা কৃষি শিল্পে শান্তি ও শৃঙ্খলা আশা করা ভুল হবে। যেভাবেই দেখা হোক না কেন, কৃষকদের দারিদ্র্য কৃষিক্ষেত্রের অর্থনৈতিক ভিতকে আঘাত করতে বাধ্য। কৃষি শ্রমকে কাম্য স্তরে সমাজের সেবায় নিয়োজিত করতে হলে কৃষকদের দারিদ্র্যমুক্ত করতে হবে। তাদের উন্নত জীবনের সম্ভাবনা নিশ্চিত করতে হবে। জাতির মেরুদণ্ড কৃষিজীবী। তাদের সক্রিয় করে তুলতে না পারা বর্তমান ভারতের অন্যতম প্রধান ও প্রত্যক্ষ সমস্যা।

বিভিন্ন এজেন্সি কর্তৃক প্রদত্ত কৃষি ঋণ (কোটি টাকা)

এজেন্সি (1)	1979-80 সনে প্রদত্ত অনুমিত আগাম (2)	1984-85 সনের লক্ষ্য (3)
সমবায়		
স্বল্পকালীন	1300	2500
মধ্যকালীন	125	240
দীর্ঘকালীন	275	555
কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক (আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক সহ)		
স্বল্পকালীন	450	1500
মেয়াদী ঋণ	400	620
মোট	2550	5415

সূত্র : ষষ্ঠ পরিকল্পনা।

পূর্বপুরুষদের ঋণ পরিশোধের চেষ্টার ফলস্বরূপ তাদের মোট ঋণের পরিমাণ আরো বৃদ্ধি পায়। যথার্থই বলা হয়, কৃষকরা ঋণ নিয়ে জন্মায়, ঋণের মধ্যেই জীবন কাটায় ও ঋণের মধ্যেই মারা যায়।*

(xi) কৃষকদের আর্থিক উন্নতি ঘটছে। তাদের জীবনধারণের মানও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ঘটনা যেমন সত্য, পাশাপাশি এও সত্য যে, তাদের ঋণ পাবার, ঋণ পরিশোধ না করার ও অমিতচারী হবার পথও সুগম হয়েছে। সাধারণত এ কারণে কৃষক পরিবারেরা আজও ঋণমুক্ত হতে পাচ্ছে না।

(xii) অতিরিক্ত সুদে ঋণ নেয়া। কৃষকেরা অতি উচ্চ সুদে মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে থাকে। কেবল উচ্চ সুদের পথেই নয়, সুচতুর মহাজনেরা হিসাবপত্রের নানারকম কারচুপি করেও কৃষকদের প্রবঞ্চনা করে থাকে।

(xiii) ভূমিস্বত্ব নীতি। কৃষকদের দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ তাদের অধিকাংশই কোন জমির মালিক নয়। অনেকে অতি সামান্য পরিমাণ জমির মালিক মাত্র। জমিরাজস্ব কোন কোন ক্ষেত্রে অত্যধিক ও তা আদায় করার নিয়মকানুনের কড়াকড়িও তাদের স্বার্থবিরোধী।

(xiv) উৎপাদনশীল কাজের জন্য (যেমন, জমি ক্রয় ও জমি উন্নয়ন) কৃষকেরা ঋণ নিয়ে থাকে। তবে প্রতিকূল প্রাকৃতিক আবহাওয়া, ভুল পরিকল্পনা প্রভৃতি কারণে এ জাতীয় ঋণও সময় বিশেষে অনুৎপাদনশীল হয়ে দাঁড়ায়।

ফলাফল

গ্রামীণ ঋণ বা কৃষি ঋণের বিষময় ফল যে শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ তা নয়। সামাজিক ও নৈতিক ক্ষেত্রেও এর প্রভাব রয়েছে। দারিদ্র্য কর্মদক্ষতা নষ্ট করে। বংশানুক্রমিক ঋণের চাপে কৃষকেরা তাদের

---

* ঋণের ধরন (গ্রামীণ গৃহস্থ-ঘর/গড়ে/টাকা)

	1964-65	1974-75
পিতৃপুরুষের ঋণ	14	31
চুক্তিবদ্ধ ঋণ	236	574
ক্রিয়াকর্মজনিত ঋণ	130	281

সূত্র : রুরাল লেবার এনকোয়ারী, 1974-75।

ঋণের সূত্র

পঞ্চম পরিকল্পনার মতে কৃষিকার্যের জন্য কৃষকদের বার্ষিক স্বল্পমেয়াদী ঋণের প্রয়োজনের পরিমাণ 3000 কোটি টাকা এবং মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণের প্রয়োজনের পরিমাণ 2400 কোটি টাকা। কৃষি ও কৃষি সম্পর্কিত ক্ষেত্রে প্রধানত যে সমস্ত এজেন্সি ঋণ দিয়ে থাকে তাদের মধ্যে রয়েছে সমবায় সমিতি, কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক ও রিজিওনাল রুরাল ব্যাঙ্ক। এদের মধ্যে সমবায়ের ভূমিকা প্রধান।

তথ্যগত ভাবে

(i) ব্যাঙ্কগুলির মোট ঋণদানে কৃষি ঋণের অংশ মাত্র 11·8 শতাংশ (জুন, 1979)।

(ii) ব্যাঙ্কগুলির গ্রামীণ ও আধা-গ্রামীণ শাখা অফিসগুলি গ্রামাঞ্চল থেকে অপেক্ষাকৃত বেশি আমানত সংগ্রহ করে থাকে, কিন্তু গ্রামীণ ক্ষেত্রে তাদের বিনিয়োগের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম। 1978 সনের ডিসেম্বরের শেষে কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কগুলির মোট আমানতে গ্রামীণ শাখা-অফিসগুলির আমানতের অংশ ছিল 10·4 শতাংশ। সে বছর সে সময়ে কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কগুলির আধা-গ্রামীণ শাখাগুলির আমানত ও আগামের অংশ ছিল যথাক্রমে 21·9 শতাংশ ও 15·4 শতাংশ।

(iii) বিগত কয়েক বছর সমবায় ঋণদানের হার হ্রাস পেয়েছে।

(iv) ক্রমবর্ধমান অনাদায়ী গ্রামীণ ঋণ পরবর্তী ঋণ দেয়ার পথে প্রচণ্ড বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমবায় ক্ষেত্রে অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ মোট চাহিদার পরিমাণের প্রায় 42 শতাংশ ও পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্কগুলির ক্ষেত্রে 49·80 শতাংশ (জুন, 1978)।

(v) সমবায় ঋণদানের ব্যাপারে আঞ্চলিক বৈষম্য লক্ষণীয়। অন্ধ্রপ্রদেশ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব ও তামিলনাড়ু—এ পাঁচটি রাজ্য কর্তৃক গৃহীত সমবায় ঋণের পরিমাণ 1978 সনের জুনের শেষাশেষি মোট প্রদত্ত ঋণের 52 শতাংশ।

(vi) দুর্বল শ্রেণীভুক্ত সম্প্রদায়ই প্রধানত সমবায় থেকে ঋণ নিয়ে থাকে।

মহাজনদের প্রভাব

কৃষি ঋণ সরবরাহকারীদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য মহাজন শ্রেণী।

মহাজনেরা কৃষি ঋণের প্রায় 40-50 শতাংশ সরবরাহ করে থাকে। এর পর উল্লেখ্য সমবায়, আত্মীয়স্বজন, ব্যবসায়ী ও কমিশন এজেন্টরা। সম্প্রতি মহাজনদের প্রভাব কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। 1951-52 সনে তারা মোট কৃষি ঋণের 69·7 শতাংশ সরবরাহ করেছে। 1961-62 সনে তা হ্রাস পেয়ে 49·2 শতাংশ ও 1975-76 সনে তা আরো হ্রাস পেয়ে 43 শতাংশ হয়। অপরদিকে সমবায়ের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা লক্ষণীয় ও আশাপ্রদ। 1951-52 সনে সমবায় সমিতিগুলির ঋণদাণের পরিমাণ ছিল মাত্র 3·3 শতাংশ। 1961-62 সনে তা বৃদ্ধি পেয়ে 15·5 শতাংশ হয়। কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কগুলির নিস্পৃহতাও লক্ষণীয়। এদের ঋণদানের পরিমাণ 1 শতাংশেরও কম ছিল। 1974-75 সনে গ্রামীণ গৃহস্থ-ঘরগুলির মোট ঋণের 47·9 শতাংশ দিয়েছে মহাজনেরা, সমবায় সমিতিগুলি ও ব্যাঙ্কগুলির অংশ যথাক্রমে 5·3 শতাংশ ও 4 শতাংশ।

মহাজন শ্রেণীর প্রাধান্যের কারণ কৃষকেরা পুরুষানুক্রমিক মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে থাকে। তাছাড়া ঋণ দেয়া ব্যাপারে তারা বিশেষ কোন নিয়মকানুন বা দলিলপত্রের কড়াকড়ির মধ্যে না গিয়ে, জামিন বা বন্ধক রাখার উপর বিশেষ জোর না দিয়ে প্রায় চাহিদা মাত্রই ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ দিয়ে থাকে। সাধারণত তারা জমি ও প্রোমিসারী নোটের বিরুদ্ধে ঋণ দিয়ে থাকে। পরস্পরের সঙ্গে পরিচয়, গ্রামে মহাজনদের প্রচণ্ড প্রভাব, ভবিষ্যতে ঋণ না পাবার আশঙ্কা প্রভৃতি কারণে ঋণগ্রহীতারা ঋণ পরিশোধ না করার দুরভিসন্ধি নিয়ে ঋণ নিতে যায় না। তাছাড়া মহাজনেরা অনুৎপাদনশীল কাজেও যেমন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সামাজিক ক্রিয়াকর্ম, বেশ ঝুঁকি নিয়ে ঋণ দিয়ে থাকে। তারা যেকোন মেয়াদের জন্য ঋণ দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। ঋণের ঝুঁকির মাত্রা বেশি বলে তাদের সুদের হারও বেশি। মহাজনেরা যে কেবল অতি উচ্চ হারেই সুদ নিয়ে ঋণগ্রস্ত কৃষকদের শোষণ করে তা নয়, তাদের চরম দারিদ্র্য, সারল্য ও নিরক্ষরতার সুযোগ নিয়েও তারা নানা-ভাবে তাদের শোষণ করে থাকে। বলতে গেলে একবার যে মহাজনদের কবলে পড়ে নিঃস্ব না হওয়া পর্যন্ত তার আর রেহাই নেই।

মহাজনদের হাত থেকে দরিদ্র কৃষক ও গ্রামীণ দুর্বল শ্রেণীর মানুষদের মুক্ত করা সম্পর্কে সমাজ ও সরকার সচেতন। সরকার আইনের আশ্রয় নিয়ে বিভিন্ন রাজ্যে মহাজনী কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে। যেমন, মহাজনী কাজ করার জন্য লাইসেন্স ও নাম রেজেস্ট্রী করা বাধ্যতামূলক, নির্ধারিত

পদ্ধতিতে হিসাবপত্র রাখা ও ঋণগ্রহীতাকে ঋণ পরিশোধ প্রাপ্তির নিয়মিত রসিদ দেয়া। তাদের সুদের উচ্চতম হারও নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। শারীরিক নিগ্রহ, ভীতি প্রদর্শন প্রভৃতির উপরও বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। ঋণগ্রহীতার কতিপয় নির্দিষ্ট সম্পত্তি ক্রোক না করার আইনগত বিধানও করা হয়েছে। 20-দফা অর্থনৈতিক কর্মসূচীতে ক্ষুদ্র কৃষক, জমিহীন শ্রমিক ও কারুশিল্পীদের কাছ থেকে ঋণ উদ্ধার করা ব্যাপারে সাময়িক স্থগিত আদেশ জারি করার কথা বলা হয়েছে। সরকার গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলির মারফত কৃষকদের ঋণ দেয়ার জন্য বিভিন্ন গ্রামে বহু গ্রামীণ ব্যাঙ্ক স্থাপন করেছে। এ সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা সত্ত্বেও অবস্থার খুব একটা পরিবর্তন হয়েছে বলা চলে না। বস্তুত, মহাজনেরা দরিদ্র কৃষক ও দুর্বলশ্রেণীর মানুষের কাছে "প্রয়োজনীয় শত্রু" স্বরূপ। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে যে, মহাজনদের কাজকর্মের নিয়ন্ত্রণের জন্য যে সমস্ত আইন-কানুন করা হয়েছে তার অধিকাংশই কাগজে-পত্রে সীমাবদ্ধ। এ সমস্ত আইন-কানুন কার্যকর করার মত উৎসাহ সরকারের আছে বলে মনে হয় না। কারণ সম্ভবত মহাজনেরা হঠাৎ বিরূপ হয়ে বসলে কৃষি ঋণের ক্ষেত্রে যে সমস্যা দেখা দেবে তার মোকাবিলা করার মত প্রাচুর্য বা মানসিক দৃঢ়তা সরকারের নেই।

ষষ্ঠ পরিকল্পনায় গৃহীত প্রস্তাব

(i) কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন কাজে সাহায্য করার জন্য আর্থিক সংস্থাগুলিকে অধিকতর পরিমাণে ঋণ দেয়া।

(ii) ঋণ দেয়া ব্যাপারে আঞ্চলিক বৈষম্য লাঘব করার নীতি গ্রহণ করা।

(iii) দুর্বল শ্রেণীভুক্ত সম্প্রদায়গুলিকে অধিকতর পরিমাণ ঋণ দেয়া।

(iv) বিভিন্ন আর্থিক সংস্থাগুলির মধ্যে অধিকতর সমন্বয় সাধন।

(v) ঋণ পরিশোধ ব্যবস্থার উন্নতিসাধন যাতে পরিশোধিত ঋণ পুনরায় বিনিয়োগ করা যায়।

কৃষি ঋণ সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত আলোচনা

1979-80 সনে কৃষি ও কৃষি সম্পর্কিত কাজকর্মের জন্য আর্থিক সংস্থাগুলি কর্তৃক ঋণদানের পরিমাণ 2550 কোটি টাকা। 1984-85 সনে, অর্থাৎ, ষষ্ঠ পরিকল্পনার শেষ বছর, এ ঋণদানের পরিমাণ অনুমিত 5415 কোটি

টাকা। এ সময়কালীন কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কগুলির স্বল্পমেয়াদী ঋণদানের পরিমাণ চারগুণ বৃদ্ধি পাবে বলে অনুমান করা হয়। অগ্রাধিকার সেক্টরে মোট ঋণদানের পরিমাণ 40 শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। এর 40 শতাংশ কৃষি ও কৃষি সম্পর্কিত কাজকর্মের জন্য দেয়া হবে। দুর্বল শ্রেণীদের মধ্যে জমিহীন শ্রমিক, কারুশিল্পী প্রভৃতিদের জন্য ঋণদানের পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকবে। স্ত্রীলোকদের স্বার্থে রচিত অর্থনৈতিক প্রকল্পে ঋণ দেয়ার জন্য বিশেষ ব্যয় বরাদ্দ ধরা থাকবে।

ঋণ দেয়া ব্যাপারে আঞ্চলিক বৈষম্য লাঘব করার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। যে সমস্ত গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্কের কাজকর্মের প্রসার লাভ ঘটেনি ষষ্ঠ পরিকল্পনায় সে সমস্ত অঞ্চলে ব্যাঙ্কের শাখা-অফিস খোলার প্রস্তাব করা হয়েছে। তাছাড়া রিজিওনাল রুরাল ব্যাঙ্কগুলির সংখ্যা 65 থেকে বৃদ্ধি করে 170 করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এর ফলে 405 জেলার মধ্যে 270 জেলা এদের আওতায় আসবে। 1981 সনের 15 ডিসেম্বর পর্যন্ত 106 আর-আর-বি 18 রাজ্যের 180 জেলায় কর্মরত ছিল। 1981 সনের 30 জুন এদের মোট আমানতের পরিমাণ প্রায় 252·85 কোটি টাকা ও আগাম দেয়ার পরিমাণ 302·45 কোটি টাকা। 1982 সনের জুন পর্যন্ত আর-আর-বির সংখ্যা 121।

প্রসঙ্গত ডিফারেনসিয়াল রেট অব ইনটারেষ্ট স্কীমের উল্লেখ করা যেতে পারে। এ স্কীম চালু হওয়ার ফলে গ্রামীণ দুর্বল শ্রেণীর মানুষেরা কম সুদে আর্থিক সংস্থাগুলি থেকে ঋণ পাবার সুযোগ পাচ্ছে। এ স্কীমে পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্কগুলি শতকরা 4 টাকা সুদেও ঋণ দিয়ে থাকে।

ষষ্ঠ পরিকল্পনায় সমবায় ও কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে সংযোজনার কথা বলা হয়েছে যাতে ব্যাঙ্কগুলি সমবায় সমিতিগুলির ঋণদান ব্যাপারে আর্থিক সাহায্যে আসতে পারে। পরিকল্পনার প্রস্তাবক্রমে ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফর এগ্রিকালচারেল এণ্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য কৃষি ও কৃষি সম্পর্কিত কাজকর্মের জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেয়া এবং বাজারকরণ, প্রোসেসিং, ষ্টোরেজ ও গ্রামীণ শিল্পগুলির মধ্যে অধিকতর সংযোজন সাধন। এ সমস্ত কাজকর্মের জন্য ব্যাঙ্কটি শীর্ষ রিফিনান্স প্রতিষ্ঠানের ভূমিকায় রয়েছে। এর উপর উন্নয়নমূলক কাজকর্মের ও আর্থিক সাহায্যদানের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এ যাবৎ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া

ও এগ্রিকালচারেল রিফিনান্স এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন এ দায়িত্ব পালন করে আসছিল।

কতিপয় প্রস্তাব

i) ঋণগ্রস্ত কৃষকদের মহাজনদের হাত থেকে মুক্ত করতে হবে। তাদের ঋণপ্রাপ্তির একমাত্র স্থান যাতে আর্থিক সংস্থাগুলি হয় ও তারা যাতে স্বল্প সুদে ও সহজ শর্তে ঋণ পেতে পারে তা সুনিশ্চিত করতে হবে।

(ii) সাধারণত উৎপাদনশীল কাজের জন্য ঋণ দেয়া হবে ও নগদ টাকার পরিবর্তে সার, বীজ, কীটনাশক দ্রব্য, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি সরবরাহ করে তাদের ঋণের অভাব মিটাতে হবে।

(iii) দুর্বলশ্রেণীর গ্রামীণ মানুষদের জন্য অনুৎপাদনশীল ঋণ সরবরাহ করার প্রতিষ্ঠানগত ব্যবস্থা করতে হবে। তাদের নিজেদের আয়ের মধ্যে ব্যয় সীমাবদ্ধ রেখে চলার উপযোগিতা বোধ জাগাতে হবে।

(iv) ক্ষুদ্র কৃষকেরা যাতে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে কৃষিকার্য করতে উৎসাহিত হয় সেজন্য তাদের স্বল্প সুদে ঋণ দিতে হবে। শিবরামন কমিটির (1976) মতে দুর্বলশ্রেণী গ্রামীণ মানুষদের অনুৎপাদনশীল কাজকর্মের জন্য ঋণ দেয়ার দায়িত্ব সরকার, সমবায় ও ব্যাঙ্কগুলিকে নিতে হবে।

(v) সুদসহ আসল ঋণ নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করে নিতে হবে। অপ্রীতিকর হলেও তা বাঞ্ছনীয়। তবে প্রয়োজন বিশেষে ঋণের টাকার পরিমাণ কমিয়ে দেয়া, ঋণ পরিশোধের সময়কাল পরিবর্তন করা প্রভৃতি বিশেষ সুবিধা দেয়ার সুযোগ রাখতে হবে।

(vi) মহাজনদের কাজকর্ম আইনের সাহায্যে কঠিনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

(vii) জমি হস্তান্তরকরণের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করতে হবে যাতে অকৃষিজীবীদের হাতে জমির মালিকানা চলে না যায়। এর ফলে জমিহীন কৃষক সমস্যা হ্রাস পাবে।

(viii) দুর্ভিক্ষ নিবারণ ও দুর্ভিক্ষজনিত দুরবস্থা লাঘব করার জন্য আর্থিক সাহায্য দেয়ার ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করতে হবে। পুনর্বাসন ও উন্নয়ন সাধনের জন্য যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান রয়েছে তাদের সমন্বয় সাধন করাও প্রয়োজন।

9 জমি সংস্কার

জমি সংস্কার

কৃষকদের স্বার্থে, দেশের স্বার্থে ও সময়ের সঙ্গত দাবি মিটাবার জন্য জমি সংস্কারের প্রয়োজন। জমির উৎপাদনশীলতার উপর দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বহুলাংশে নির্ভর করে। জমির উৎপাদনশীলতা নির্ভর করে জমির প্রকৃতি, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ ও জমির মালিকানার উপর। উর্বর জমি, উত্তম সার, উচ্চফলনশীল বীজ, সেচ, উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টার পক্ষে অপরিহার্য। আবার, উর্বর ও সর্বপ্রকার চাষোপযোগী জমির মালিকানার উপযুক্ত বণ্টনও প্রয়োজন। জমি তার যে জমি চাষ করে আর জমি তার যে জমি চাষ না করে চাষের ভাগ নেয় (অর্থাৎ, জমিদার), এ স্বার্থ দুটি পরস্পর বিরোধী। চাষের জমি চাষীর এ ঘটনা চাষের প্রতি নিবিড় আগ্রহ জন্মায়। বিকল্পটি অনীহা সৃষ্টি করে। গ্রামীণ সম্পদ ও আয় বণ্টনে অসমতার মূলে এ সামন্ত প্রথা।

অতএব জমি সংস্কারের উদ্দেশ্য* মধ্যস্বত্বজীবীদের উৎখাত, প্রজাস্বত্বের সংস্কার (খাজনা নিয়ন্ত্রণ, জমির মালিকানার পুনর্বণ্টন ও মালিকানার নিরাপত্তা প্রভৃতি), জমির নিম্নতম ও উচ্চতম সীমা নির্ধারণ, জমি খণ্ডীকরণ ও বিক্ষিপ্ত মালিকানা রোধ এবং সমবায় কৃষি সংগঠন করা। এ উদ্দেশ্যের পেছনে রয়েছে গ্রামীণ আয় ও সম্পদ বণ্টনে অসমতা দূর করে সামাজিক অস্থিরতা লাঘব করা এবং জমির মালিকানা প্রকৃত চাষকারীদের হাতে তুলে দিয়ে, জমির আয়তন কাম্য আয়তনে রেখে, ব্যক্তিগত বা সমবায় কাঠামোতে

---

* Food and Agriculture Organization (FAO) states that land reform "must include a number of measures to improve relationship of the man who works the soil to the land he works, including opportunity for land ownership, improved conditions of tenancy, agricultural credit at reasonable rates of interest, reform of exorbitant rent and taxes, and facilities for obtaining agricultural supplies and marketing agricultural products, with emphasis on co-operatives".

আধুনিক কৃষি প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগ দ্বারা কৃষিকার্য করে জমির উৎপাদনশীলতা তথা বাজার-উদ্বৃত্তের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাতে খাদ্যশস্য ও কাঁচামালে দেশ স্বয়ম্ভর হয়ে উঠতে পারে।

উল্লেখ্য, জমি স্বত্ব প্রথা পরোক্ষ বা অপরোক্ষভাবে আয় বণ্টন ও চাহিদা, কৃষিকার্যে বিনিয়োগ ও কৃষিদ্রব্য সরবরাহ, অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রে বিনিয়োগ, গ্রাম ছেড়ে শহরাঞ্চলে গিয়ে বসবাস এবং অর্থনীতিক ও রাজনীতিক ক্ষমতা বণ্টনকে প্রভাবিত করে থাকে। এক কথায়, জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি-প্রকৃতি নির্ণয়ে জমি স্বত্ব প্রথার ভূমিকা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ।

প্রাক্-স্বাধীনতা

প্রধানত তিন প্রকার জমি স্বত্ব প্রথা ভারতে প্রাধান্য লাভ করে। যথা: (i) জমিদারী, (ii) যুক্ত বন্দোবস্ত বা মহলওয়ারী ও (iii) রায়তওয়ারী।

(i) জমিদারী বন্দোবস্ত। এ ব্যবস্থা অনুসারে এক বা একাধিক ব্যক্তি জমির মালিক। জমির মালিক নির্দিষ্ট সময়ে সরকারকে খাজনা দেয়ার জন্য দায়ী থাকে। জমিদারী বন্দোবস্ত আবার দুরকম—অস্থায়ী ও চিরস্থায়ী। সরকারের জমি রাজস্বের অংশ যেখানে স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে ও যেখানে জমিতে এক বা একাধিক ব্যক্তির মালিকানাকে, শর্ত সাপেক্ষ, চিরস্থায়ী বলে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে তা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নামে পরিচিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, পশ্চিমবঙ্গের জমির বন্দোবস্তের কথা উল্লেখ করা যায়। যে ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বন্দোবস্ত দেয়া হয় তাকে অস্থায়ী বন্দোবস্ত বলা হয়।

(ii) মহলওয়ারী বন্দোবস্ত। এ বন্দোবস্ত অনুযায়ী একটি মহল, অর্থাৎ, একটি বা কয়েকটি গ্রামের কৃষকেরা যৌথভাবে মালিক হিসাবে গণ্য হয়। মহলের দেয় জমি রাজস্বের জন্য রায়তেরা যৌথ ও পৃথকভাবে দায়ী থাকে। এ বন্দোবস্ত অস্থায়ী বন্দোবস্ত। আগ্রা, অযোধ্যা, পাঞ্জাব ও মধ্যপ্রদেশে এ বন্দোবস্ত প্রচলিত ছিল। পাঞ্জাবে লম্বরদার নামে অভিহিত গ্রামের মোড়লের মারফত সকলের খাজনা আদায় করা হত।

(iii) রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত। রায়তওয়ারী বন্দোবস্তে সরকার ও রায়তের মাঝখানে কোন মধ্যজীবী নেই। জমিদারী প্রথায় জমিদার

স্বয়ং মধ্যজীবী। সে সরকারের পক্ষে খাজনা আদায় করে। রায়তওয়ারী বন্দোবস্তে রায়তই সরাসরি সরকারকে রাজস্ব দেয়।

মধ্যপ্রদেশে পৃথক একটি প্রথা চালু ছিল। এর নাম মালগুজারি। মারাঠার রাজন্যবর্গ বিভিন্ন লোকের হাতে জমির রাজস্ব আদায়ের ভার দিয়েছিল। এরা 'মালগুজার' নামে পরিচিত। ইংরেজ সরকার এদের স্বীকার করে নেয়। এদের তালুকদারও বলা চলে। নিজ নিজ তালুক থেকে সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট জমি রাজস্ব আদায় করে সরকারী তহবিলে জমা দেয়া তাদের দায়িত্ব। এও অস্থায়ী বন্দোবস্তের পর্যায়ভুক্ত।

ভারতের গ্রামগুলিকে জমি স্বত্ব অনুসারে দু'ভাগে ভাগ করা চলে। যথা (i) রায়তওয়ারী গ্রাম ও (ii) জমিদারী বা যৌথ গ্রাম। রায়তওয়ারী গ্রামে নির্দিষ্ট ব্যক্তি পৃথকভাবে জমির দখলী স্বত্ব উপভোগ করে ও জমি চাষ করে। সে তার দখলী জমির জন্য রাজস্ব দিতে আইনত বাধ্য। গ্রামের পতিত জমির মালিক সরকার। মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশে এ ধরনের গ্রাম সংস্থা দেখা যায়। জমিদারী বা যৌথ গ্রামে গ্রামকে একক বা ইউনিট হিসাবে গ্রহণ করা হয়। ঐ গ্রামের মালিক একজন জমিদার বা একটি জমিদার পরিবার। ভাগচাষীরা অথবা সহ-মালিকরা জমির বন্দোবস্ত নিয়ে চাষ করতে পারে। এক্ষেত্রে পতিত জমির মালিক গ্রামবাসী। এরূপ জমি স্বত্বে সব জমির একত্রে রাজস্ব ঠিক করা হয়। এ রাজস্ব দেয়ার জন্য সব মালিকেরা যৌথ ও পৃথকভাবে দায়ী থাকে। যে কেহ তার জমি সরকারের অনুমতি নিয়ে পৃথক করে নিতে পারে। সেক্ষেত্রে সে কেবল তার রাজস্বের অংশের জন্যই দায়ী থাকবে। এ ধরনের গ্রাম পাঞ্জাবেই বিশেষভাবে দেখা যায়।

ব্যাডেন পাওয়েলের মতে দেখা যায়, ভারতের জমির উপর প্রধানত চার শ্রেণীর স্বার্থ কায়েম ছিল। এদের মধ্যে প্রধান ও সর্বোচ্চ স্থান অধিকারী সরকার আর সর্বনিম্ন স্থান অধিকারী রায়ত বা চাষী-মালিক। এ দু'শ্রেণীর মালিক ছাড়াও ছিল অধিস্বামী ও ভূস্বামী। তাছাড়া এদের ব্যবস্থাপনায় ও বিভিন্ন শাসকের ব্যবস্থায় আরো কিছু স্বার্থের সৃষ্টি হয়েছিল। জমির উপর এদের প্রত্যক্ষ না হলেও যে উপস্বত্ব ছিল তার ফলে জমির অধিকার ও রাজস্ব সম্পর্কে নানা জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল।

জটিলতা

জমির মালিকানাকে কেন্দ্র করে যে গ্রামীণ কাঠামো গড়ে ওঠে ও তার ফলে যে জটিলতার সৃষ্টি হয় তা প্রধানত নিম্নরূপ।

(i) সরকার ও চাষীদের মধ্যে বহু সংখ্যক মধ্যস্বত্বজীবীর উদ্ভব।

(ii) জমির মালিকানার অসম বণ্টনের ফলে এক বিরাট জমিহীন বা অতি সামান্য জমির মালিকানাসর্বস্ব কৃষক শ্রেণীর উদ্ভব।

(iii) জমি স্বত্বের নিরাপত্তার অভাব। এর পশ্চাতে রয়েছে ক্ষুদ্র কৃষকদের ঋণভার ও জমি স্বত্বের উপর আইনগত অনিশ্চয়তা। ফলে এ শ্রেণীর কৃষকদের দিক থেকে জমির স্থায়ী উন্নয়নের প্রতি আগ্রহের অভাব দেখা যায়।

(iv) উচ্চ হারে খাজনা ধার্য হওয়ার ফলে অধিকাংশ কৃষকদের পক্ষেই তা বহন করা সম্ভব নয়।

(v) ক্ষুদ্র জমি ও বিক্ষিপ্ত মালিকানা উন্নত ধরনের কৃষিকার্যের পরিপন্থী।

(vi) কৃষি সম্পদ ও আয় বণ্টনে অসাম্য ও সরকারের দিক থেকে প্রয়োজনীয় উৎসাহ ও আগ্রহের অভাবের ফলে জমির উৎপাদনশীলতা কম।

(vii) গ্রামস্তরে কৃষকদের সংগঠিত করার মত সংগঠনের অভাব। এ সমস্ত অসুবিধার ফলে চাষীরা চাষে উৎসাহ বোধ করে না। যারা সত্যিকার চাষী তাদের ভাগ্যে অতি সামান্য পরিমাণই ফসল জোটে। এ কাঠামোতে উন্নত কৃষি প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগ দ্বারাও তাদের মূল সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হবে না। তাছাড়া জমি স্বত্বের জটিলতার জন্য সরকারও জমি রাজস্ব থেকে তার নায্য পাওনা পাচ্ছে না।

জমি সংস্কারে সরকারী উদ্যম

জমি সংস্কার সম্পর্কে প্ল্যানিং কমিশনের উদ্দেশ্য অতি স্পষ্ট। কমিশনের মতে, প্রথমত প্রয়োজন কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করার ব্যাপারে কৃষি কাঠামোগত যে সমস্ত বাধাবিঘ্ন আছে তা দূর করা। এর ফলে উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন কৃষি অর্থনীতি গড়ে তোলার মত পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য: মধ্যস্বত্বজীবী সহ সমস্ত শোষণ যন্ত্রগুলিকে নিঃশ্চিহ্ন করে ফেলে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা যাতে চাষীদের জমি স্বত্বে নিরাপত্তাবোধ ও গ্রামের সর্বস্তরের মানুষদের সম মর্যাদা ও সুযোগ সুনিশ্চিত হয়। সংক্ষেপে ঃ

1. মধ্যস্বত্বজীবীদের বিলোপ সাধন।
2. জমিদার-রায়ত সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ।
3. খণ্ডিত ও অসংবদ্ধ জমি একীকরণ।
4. জমির পুনর্বণ্টন।
5. সমবায় কৃষির উন্নয়ন।
6. কৃষকদের জমি সম্পর্কিত দলিলপত্র তৈরি ও তা বর্তমানোপযোগী করে তোলা।

উদ্যম

জমি সংস্কারের জন্য সরকারের উদ্যমকে তিন ভাগে ভাগ করা চলে: (a) স্বেচ্ছামূলক উদ্যম। যথা, সমবায়, কৃষি ও জমি একীকরণ। (b) আইন সম্পর্কিত স্বেচ্ছামূলক উদ্যম। যথা, আইনের সমর্থন দ্বারা জমি একীকরণ। (c) আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক উদ্যম। যথা, মধ্যস্বত্ব-জীবীদের বিলোপ সাধন। জমির মালিকানার উচ্চতম সীমা নির্ধারণ, রায়তদের স্বত্বাদির সংস্কার সাধন প্রভৃতি।

জমি সংস্কার সম্পর্কে সরকারী প্রচেষ্টার সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে করা হল।

1. জমিদারী প্রথার বিলোপ

জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধন অবিভক্ত কংগ্রেসের প্রাক্-স্বাধীনতা-কালীন প্রতিশ্রুতি। স্বাধীনতা অর্জনের পর তারা এ প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য বদ্ধপরিকর হয়। মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ এ ব্যাপারে অগ্রণী হয়। সে সময় জমিদারী প্রথা বিলোপ সম্পর্কে যে সমস্ত সমস্যা দেখা দেয় তার মধ্যে জমিদারদের ক্ষতিপূরণ বাবদ দেয় অর্থের অভাব ও মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কা এবং কতিপয় আইনঘটিত বাধা উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া জমিদারী প্রথার বিকল্প প্রথা সম্পর্কেও কোন সুস্পষ্ট জাতীয় নির্দেশ ছিল না। যাহোক 1952 সনের মধ্যে বিভিন্ন রাজ্য জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধনের জন্য আইন প্রণয়ন করে। এ সমস্ত আইনের ফলে মধ্যস্বত্বজীবীদের বিলোপ সাধন সম্ভব হয়। জমিদারেরা ক্ষতিপূরণ পায়। এ ক্ষতিপূরণের পরিমাণ অনুমিত 670 কোটি টাকা। ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ নগদ টাকা বা সরকারী বণ্ডে বা কিছু নগদ টাকা ও কিছু সরকারী বণ্ডে দেয়া হয়। এ অর্থের অধিকাংশই অনুৎপাদনশীল কাজকর্মে ব্যয়িত হয়। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগের পরিমাণ অতি সামান্য বললেই হয়। খাস, সির প্রভৃতি

ধরনের কিছু জমি এসব আইনের আওতায় না আসার ফলে সামন্ত প্রথা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় না। প্রভাবশালী জমিদাররা এ সমস্ত জমি থেকে রায়ত ও ভাগচাষীদের উৎখাত করার সুযোগ পায়। পরিণামে বহু চাষীর আর্থিক দুর্গতি চরমে ওঠে।

2. রায়তদের স্বত্বাদির সংস্কার

রায়তদের স্বার্থে সে সমস্ত আইন প্রণয়ন করা হয় তার উদ্দেশ্য প্রধানত, (a) খাজনা নিয়ন্ত্রণ, (b) প্রজাস্বত্বের নিরাপত্তা (c) মালিকানার অধিকার।

(a) খাজনা নিয়ন্ত্রণ। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রস্তাব করা হয় যে, রায়তেরা জমিদারদের যে খাজনা দেবে তা তাদের মোট উৎপাদনের 20-25 শতাংশের বেশি হবে না। অবশ্য এ প্রস্তাব সব রাজ্য মেনে নেয়নি। যেমন, পাঞ্জাব, তামিলনাড়ু, জম্মু ও কাশ্মীরে এর হার স্থূল উৎপাদনের 33·3-40 শতাংশ করা হয়। যাহোক, এর আগে প্রায় সব রাজ্যেই রায়তদের জমিদারদের দেয় খাজনার হার মোট উৎপাদনের 50-70 শতাংশ ছিল। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে তাদের জমিদারদের ঘরে বেগারও খাটতে হত।

(b) স্বত্বের নিরাপত্তা। এ সম্পর্কে বিভিন্ন রাজ্য আইন প্রণয়ন করে। যেমন, উত্তর প্রদেশ ও দিল্লীতে যারা জমি চাষ করে তাদের চাষের অধিকার দেয়া হয়েছে। জমির মালিক এ সমস্ত জমিতে আর নিজে চাষ করতে পারবে না। আসাম, মহারাষ্ট্র, গুজরাট প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্যে জমির মালিকদের নিজেদের চাষ করার অধিকার দেয়া হয়েছে বটে, তবে রায়তদের জন্য ন্যূনতম অঞ্চল বা ক্ষেতের অংশ সংরক্ষিত রেখে। তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, কেরল, অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িষ্যা প্রভৃতি রাজ্যে রায়তদের উৎখাত করা বিলম্বিত করার জন্য ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। পশ্চিমবাংলা এবং জম্মু ও কাশ্মীরে জমির মালিকদের নিজেদের জমিতে পুনরায় চাষ করার অধিকার রয়েছে বটে, তবে তার সীমা নির্দেশ করে দেয়া হয়েছে।

অবশ্য বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে রায়তদের উৎখাত করা চলবে। যেমন, খাজনা না দিলে, স্থায়ীভাবে জমির ক্ষতিসাধন করলে, জমির অংশবিশেষ অপরকে ভাড়া দিলে, কৃষিকার্য ছাড়া অন্য কোন কাজে জমি ব্যবহার করলে ও জমির মালিক পুনরায় যদি নিজে জমি চাষ করতে চায়।

(c) মালিকানার অধিকার। যে সমস্ত জমিতে জমিদারদের পুনরায়

চাষআবাদের অধিকার দেয়া হয়নি সে সমস্ত জমির কৃষকদের সরাসরি রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য তাদের জমির মালিকানা দেয়া। এ মালিকানা দেয়ার পদ্ধতি একাধিক। জমির মালিককে ক্ষতিপূরণ দিয়ে রাষ্ট্র কর্তৃক জমির মালিকানা গ্রহণ ও সে মালিকানা রায়তদের হস্তান্তরকরণ অথবা সরকারকে সরাসরি খাজনা দেয়ার শর্তে সে জমির মালিকানা রায়তদের হস্তান্তরকরণ অথবা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিয়ে রায়তদের সে জমি ক্রয় করার অধিকার।

মন্তব্য

(i) "রায়ত"-এর সংজ্ঞা থেকে ভাগচাষীদের বাদ দেয়া হয়েছে। অথচ ভাগচাষীরাই যথার্থ জমি চাষকারী।

(ii) নানা কারণে বা অজুহাতে রায়তদের উৎখাত করার সুযোগ রাখা হয়েছে।

(iii) স্বেচ্ছায় জমি ছেড়ে দেয়ার বিধানের সুযোগ নিয়ে জমিদাররা রায়তদের কাছ থেকে জোর করে জমি কেড়ে নিচ্ছে।

(iv) জমিদারদের পুনরায় জমি চাষ করার যে অধিকার দেয়া হয়েছে তার ফলে তারা রায়তদের উপর জমি ছেড়ে দেয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করার সুযোগ পেয়েছে।

(v) "ন্যায্য খাজনা"-র সংজ্ঞা সুনির্দিষ্ট না থাকাতে ও খাজনা নিয়ন্ত্রণ বিধান কার্যকর করার মত প্রশাসনিক দক্ষতার অভাবের ফলে খাজনা অনিয়ন্ত্রিত রয়েছে বলা চলে।

(vi) রায়তদের জমির মালিকানা দেয়ার বিধান তেমন কার্যকর হচ্ছে না। কারণ তাদের ক্ষতিপূরণ দিয়ে বা ক্রয় করে জমির মালিকানা নেয়ার সামর্থ্য নেই।

(vii) একই জমিতে ক্রমাগত বারো বছর চাষ করলে সে জমির মালিকানা দাবি করার যে অধিকার রায়তকে আইনে দেয়া হয়েছে তা প্রমাণ করা যে কোন রায়তের পক্ষেই কষ্টসাধ্য। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের খাজনার রসিদ দেয়া হয় না। তাছাড়া একই জমিতে তাদের অধিককাল চাষ করতেও দেয়া হয় না। সর্বোপরি দলিল-পত্র এদিক-ওদিক করে রায়তদের উৎখাত করার মত আর্থিক ও সামাজিক প্রভাব জমিদারদের আছে।

3. জমি একীকরণ

জমি খণ্ডীকরণ ও বিক্ষিপ্ত মালিকানার কারণ :

(a) প্রধানত জমির উপর জনসংখ্যার অত্যধিক চাপের ফলেই জমি খণ্ডীকরণ ও বিক্ষিপ্ত মালিকানা সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অপরদিকে বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগের অভাবের ফলে গ্রামীণ জনসংখ্যার অধিকাংশকে জীবিকার জন্য বাধ্য হয়ে তাদের সীমিত জমির উপরই নির্ভর করতে হচ্ছে।

(b) জমির উপর একান্ত নির্ভরশীলতার ফলে জমির অধিকারীদের জমির উপর স্বত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করার মানসিকতা প্রখর হয়ে উঠেছে। উত্তরাধিকার আইন সে পথ সুগম করেছে। হিন্দু ও মুসলমানদের উত্তরাধিকার আইন সম্পত্তির সম বণ্টন স্বীকার করে।

(c) একান্নবর্তী পরিবার প্রথা আজ বিলুপ্ত প্রায়। এর ফলে জমি খণ্ডীকরণ ও বিক্ষিপ্ত মালিকানা আরো সহজসাধ্য হয়েছে।

(d) কৃষিকার্য বৃত্তি হিসাবে সাধারণের পক্ষেও সহজে গ্রহণযোগ্য হওয়ার ফলে জমির উপর চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অসুবিধা

(a) ক্ষেতের আয়তন এমন ক্ষুদ্র আকার ধারণ করেছে যে অনেক ক্ষেত্রে এরূপ ক্ষেতে ভালভাবে লাঙ্গল চালনা করাও সম্ভব নয়। এ অবস্থায় ফসল উৎপাদন কম হয় ; ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

(b) বন্য পশুর হাত থেকে ফসল রক্ষা করার জন্য বেড়া দিয়ে ক্ষেত সুরক্ষিত রাখা প্রয়োজন। অতি ক্ষুদ্র ক্ষেতের পক্ষেও এরূপ সুরক্ষণ প্রয়োজন। ফলে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

(c) জমি খণ্ডিত-বিখণ্ডিত হওয়ার দরুন অনেক বেশি পথঘাট, বেড়া প্রভৃতি তৈরি করতে হয়। অর্থাৎ, জমির অপচয় ঘটে।

(d) সেচের সুব্যবস্থা করা কঠিন। কারণ সুবিধা থাকা সত্বেও জমির আয়তনের অনুপাতে সেচ খরচ বেশি পড়ে যায়।

(e) ক্ষুদ্রায়তন জমিতে ট্র্যাক্টর, থ্রেসার প্রভৃতির সাহায্যে উন্নত কৃষি প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না। এজন্য প্রয়োজন বৃহদাকার জমি।

(f) জমির মালিকানা বিক্ষিপ্ত থাকার ফলে কৃষিকার্যে অপেক্ষাকৃত বেশি মূলধন ও শ্রমের প্রয়োজন। অথচ সে অনুপাতে উৎপাদন কম।

(g) বিক্ষিপ্ত মালিকানার ফলে সময়, শ্রম ও গোবাদি পশুর অপচয় ঘটে। স্থানাভাবের জন্য ক্ষেতে বাসস্থান নির্মাণ করা সম্ভব হয় না। ফলে এক ক্ষেত থেকে অন্য ক্ষেতে কৃষি শ্রমিকের ও গোবাদি পশুর চলাচল করতে হয় যা অর্থ ও সময়ের অপচয়।

(h) এরূপ চলাচলের ফলে অপরের জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। পরস্পরের জমির সীমানা নিয়ে মামলা মোকদ্দমার এটি একটি কারণ।

(i) বিক্ষিপ্ত মালিকানা নিকৃষ্ট কৃষিকার্য পদ্ধতি প্রথাকে কায়েম করে। কারণ এরূপ মালিকানায় উন্নত কৃষি প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ সম্ভব নয়।

সুবিধা

(a) মাটির প্রকারভেদে বিভিন্ন শস্য বিভিন্ন ঋতুতে উৎপাদন করতে হয়। বিভিন্ন প্রকৃতির জমির মালিকানা থাকার ফলে কৃষকদের সারা বছর কৃষিকার্য করার সুযোগ ঘটে।

(b) অর্থনৈতিক বা প্রাকৃতিক কারণে যদি কোন ফসল নষ্ট হয়ে যায় তাহলেও কৃষকেরা অন্তত সম্পূর্ণ বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়বে না। কারণ কোন না কোন ক্ষেতে ফসল হয়ত রক্ষা পাবে।

(c) জমি স্বত্বের বিস্তৃত বিলি-ব্যবস্থা হওয়াতে গ্রামীণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিসাম্যের অন্তত কিছুটা উন্নতি ঘটেছে।

প্রতিবিধান

(a) সমবায় সমিতির মাধ্যমে জমি খণ্ডীকরণ প্রথার কুফল প্রচার ও তা রোধ করা প্রয়োজন। এ প্রচেষ্টা পাঞ্জাবে সফল হয়েছে।

(b) জমি খণ্ডীকরণ ও বিক্ষিপ্ত মালিকানার প্রতিবিধানের জন্য আইনের সাহায্য নেয়া সঙ্গত। এ প্রসঙ্গে পাঞ্জাবের কনসলিডেসন অব হোল্ডিংস এ্যাক্ট উল্লেখযোগ্য।

(c) নতুন জমিতে চাষ-আবাদ করা ব্যাপারে সরকারের দিক থেকে কৃষকদের উৎসাহ দেয়া।

(d) জমি বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করা। কেহ যদি জমি বিক্রয় করতে চায় তবে তাকে তার অন্য অংশীদার বা অংশীদারদের কাছে তা বিক্রয় করার বাধ্য-বাধকতা নিতে হবে।

(e) উত্তরাধিকার আইনের সংস্কার সাধন করা যাতে জমি খণ্ডীকরণ হ্রাস পায়।

(f) কুটির শিল্প তথা গ্রামীণ সার্বিক উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামের মানুষদের জন্য বিকল্প বা অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। শহরে শিল্প বাণিজ্যের প্রসার সাধনের ফলেও জমির উপর একান্ত নির্ভরশীলতা হ্রাস পাবে।

(g) শস্য একীকরণ দ্বারাও জমি খণ্ডীকরণ ও বিক্ষিপ্ত মালিকানার অসুবিধা দূর করা যেতে পারে। অর্থাৎ, একই ধরনের শস্য সংশ্লিষ্ট সমস্ত জমিতে উৎপাদন করা হবে। ব্যক্তিগত মালিকানায় হস্তক্ষেপ করা হবে না। এর ফলে বৃহদাকারে কৃষিকার্য করার সুযোগ পাওয়া যাবে।

কার্যকর করার পথে অন্তরায়

(a) পৈতৃক জমির উপর প্রবল আকর্ষণ। যার ফলে কৃষকেরা নিজেদের জমি অপরের সঙ্গে যুক্ত করতে সম্মত হতে চায় না।

(b) নিজের জমি নিজের মনোমত চাষ করার ইচ্ছা জমি একীকরণ বা সমবায়িক মানসিকতার বিরোধী।

(c) জমি একীকরণ ব্যয়বহুল। কৃষকেরা এ ব্যয় বহন করতে সাধারণত অনিচ্ছুক। মহারাষ্ট্র প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্যে এ ব্যয় সম্পূর্ণভাবে সরকার বহন করে থাকে।

(d) জমি একীকরণ একটি টেকনিক্যাল ব্যাপার। আমাদের দেশে এ শ্রেণীর দক্ষ টেকনিক্যাল লোকের অভাব রয়েছে।

(e) যথাযথ দলিল-পত্রের অভাবের ফলে জমির যথার্থ মালিকানা নির্ণয় করা কঠিন। ফলে বিবাদ ও মামলা-মোকদ্দমা দেখা দেয়।

(f) জমি একীকরণ প্রচেষ্টা ও জমি খণ্ডীকরণ একই সঙ্গে চলতে পারে না। কিন্তু বর্তমান সামাজিক, আর্থিক ও আইনগত কারণে জমি খণ্ডীকরণ সম্পূর্ণ বন্ধ করা প্রায় অসম্ভব বললেই চলে।

(g) জমি সংস্কারের প্রশাসনিক দায়িত্ব রাজস্ব বিভাগের কর্মীদের উপর দেয়া হয়েছে। এদের সংশ্লিষ্ট আইনকানুনের সঙ্গে পরিচয় উচ্চাঙ্গের নয়। যাদের উপকারের জন্য জমি একীকরণ প্রচেষ্টা তারাও তাদের অধিকার ও এর উপযোগিতা সম্পর্কে সাধারণত অজ্ঞ। অবশ্য এ সমস্ত অন্তরায় দূর করা কঠিন কিছুই নয়। অভাব রাজনৈতিক দৃঢ়তার। ন্যাশনাল কমিশন অন এগ্রিকালচার যথার্থই বলেছে, জমি একীকরণ বাধ্যতামূলক ও তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কার্যকর করতে হবে। এ সম্পর্কিত বিবাদের শুনানির জন্য কনসোলিডেসন

কোর্ট স্থাপন করতে হবে। জমি একীকরণের কাজে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার কথাও বলা হয়েছে।

4. জমির পুনর্বণ্টন

গ্রামাঞ্চলে জমির মালিক কি পরিমাণ জমি নিজের দখলে রাখতে পারবে তা বিভিন্ন রাজ্য আইন দ্বারা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। উদ্বৃত্ত জমি সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের দখলে আসবে। সরকার সে জমি দুর্বল শ্রেণীর মধ্যে পুনরায় বণ্টন করে দেবে।

সমর্থনে যুক্তি

(a) এর ফলে গ্রামীণ ক্ষেত্রে সম্পত্তি ও আয় বণ্টনে যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে তা হ্রাস পাবে।

(b) অসম বণ্টনকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ ক্ষেত্রে যে সামাজিক অস্থিরতা রয়েছে তা লাঘব হবে।

(c) কৃষি উৎপাদন ও কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে। কারণ যে আবাদযোগ্য জমি জমিদারদের আগ্রহের অভাবে অনাবাদী অবস্থায় পড়ে আছে তাতে চাষবাস করা সম্ভব হবে। জমিহীন কৃষকেরা জমির মালিকানা পেয়ে পরম উৎসাহ ও দক্ষতার সঙ্গে চাষে উৎসাহী হবে।

(d) উদ্বৃত্ত জমির পুনর্বণ্টনের ফলে অগণিত জমিহীন কৃষকদের চাষের তথা কর্মের সংস্থান হবে।

বিপরীত যুক্তি

(a) জমির পুনর্বণ্টনের ফলে ক্ষেতের আয়তন হ্রাস পাবে। ফলে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগ করা সম্ভব হবে না। অর্থাৎ, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে না; বরঞ্চ হ্রাস পাবার আশঙ্কা রয়েছে।

(b) উদ্বৃত্ত জমি অধিগ্রহণের জন্য সরকারকে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ বাবদ দিতে হবে। এর ফলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটবে।

(c) জমি পুনর্বণ্টনই শেষ কথা নয়। জমি চাষের জন্য চাই বিবিধ উপকরণ। দরিদ্র কৃষকদের এ সমস্ত উপকরণ সরবরাহের দায়িত্ব প্রায় সবটাই সরকারকে নিতে হবে। অবশ্য সরকারের সে সামর্থ্য ও সংগঠন আছে কিনা সেটিও একটি প্রশ্ন।

(d) আয় ও সম্পদের অসম বণ্টন কেবল গ্রামীণ ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়; শহরাঞ্চলেও তা প্রসারিত ও অধিকতর তীব্র। এ ব্যাপারে শহরের ক্ষেত্রে

সরকারের নিস্পৃহতা বৈষম্যমূলক ও জাতীয় সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা নীতির বিরোধী।

বিপরীত যুক্তির প্রসঙ্গে বলা যায়, একথা ঠিক নয় যে উৎপাদনশীলতা জমির আয়তনের সঙ্গে সরাসরিভাবে যুক্ত। জাপান ও ইজরাইলের অভিজ্ঞতা এ সত্যই প্রতিষ্ঠা করে। যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নে ক্ষেতের আয়তন জাপানের তুলনায় অনেক গুণ বেশি হওয়া সত্ত্বেও তাদের হেক্টর প্রতি উৎপাদনশীলতা কম। যথা, যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষেতের গড় আয়তন 124 হেক্টর; হেক্টর প্রতি চাল উৎপাদন 52 কুইন্টাল। জাপানে গড় আয়তন 1·2 হেক্টর; হেক্টর প্রতি চাল উৎপাদন 52·5 কুইন্টাল।

জমি অধিগ্রহণের ফলে সরকার ও জাতীয় অর্থনীতির উপর হঠাৎ যে একটা চাপ আসবে তা অজানা নয়। যে কোন মৌল পরিবর্তনই ঝুঁকি ও ব্যয়বহুল। ভবিষ্যতের সম্ভাবনার স্বার্থে এর মোকাবিলা করতেই হবে।

শহরাঞ্চলে আয় ও সম্পদ বণ্টনে যে অসমতা রয়েছে তা উপেক্ষণীয় নয়। তবে সে সমস্যা এত জটিল ও সুদূর প্রসারিত যে, উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি না করে তাতে হস্তক্ষেপ করতে গেলে জাতীয় বিপর্যয় ঘটা অসম্ভব নয়। গ্রামাঞ্চলে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হলে শহরাঞ্চলের অসাম্য দূর করার পথ সহজ হয়ে আসবে।

রূপায়ণে সমস্যা

জমির উচ্চতম সীমা নির্ধারণ করা সহজ নয়। কারণ, প্রথমত, উপযুক্ত দলিল-পত্রের অভাব। দ্বিতীয়ত, জমি বেনামীকরণ, গোপনে উদ্বৃত্ত জমি হস্তান্তরকরণ প্রভৃতি কারচুপির সুযোগ ও জমির মালিকদের সে সমস্ত সুযোগ গ্রহণ করা। তৃতীয়ত, জমি জরিপ করা, জমির গুণাগুণ নির্ণয় করা প্রভৃতি কাজের জন্য উপযুক্ত লোকের অভাব। চতুর্থত, জমির উচ্চতম সীমা সম্পর্কিত আইনে কোন কোন প্রকার জমিকে বাদ দেয়া হয়েছে। ফলে এ নিয়ে বিবাদ সৃষ্টি ও মামলার সুযোগ রয়েছে। মামলামোকদ্দমার জন্য আইনের বিধানগুলিকে কার্যকর করা বিলম্বিত হচ্ছে।

সমতার প্রচেষ্টা

সুরুতে "ব্যক্তি"-কে আবেদনের একক রূপে গণ্য করা হোত। ফলে পরিবারগতভাবে জমিদাররা বহু পরিমাণ জমি দখলে রাখতে পারত। অর্থাৎ, উদ্বৃত জমির পরিমাণ যৎকিঞ্চিত মাত্র হোত। 1972 সন থেকে

অবস্থা পরিবর্তিত হয়। "পরিবার" আবেদনের একক রূপে গণ্য হয়। পরিবারের মধ্যে থাকছে স্বামী, স্ত্রী ও নাবালক সন্তান।

1971 সন পর্যন্ত বিভিন্ন রাজ্যে জমির উচ্চতম সীমার মধ্যে কোন সমতা ছিল না। তামিলনাড়ুতে জমির উচ্চতম সীমার পরিমাণ ছিল 12-60 একর। অন্ধ্রপ্রদেশে 27-30 একর। 1972 সন থেকে অবস্থা একটা সমতায় আনার চেষ্টা করা হয়। এজন্য কেন্দ্রীয় সরকার ন্যাশনাল গাইড-লাইন্স রচনা করেন। সমস্ত রাজ্য তা মেনে নেয়। এর ফলে যে সমস্ত জমিতে সরকারী সেচের সুবন্দোবস্ত আছে ও যাতে অন্তত দু'রকম শস্যের আবাদ হয় সে সমস্ত জমির উচ্চতম সীমা, জমির উৎপাদনশীলতা ও অন্যান্য বিষয় সাপেক্ষ, 10-18 একর নির্দিষ্ট করা হয়। যেক্ষেত্রে জমির মালিক স্বয়ং সেচের ব্যবস্থা রেখেছে সেক্ষেত্রে 1·2 একর জমি 1 একর জমির সমান বলে গণ্য করা হয়। তবে এক্ষেত্রেও উচ্চতম সীমা 18 একর থাকবে। যেক্ষেত্রে একটি মাত্র ফসল আবাদ করার মত সেচের ব্যবস্থা রয়েছে সেক্ষেত্রে উচ্চতম সীমা নির্দিষ্ট হয়েছে 27 একর। অন্যান্য ক্ষেত্রে উচ্চতম সীমার পরিমাণ 54 একর।

1971 সন পর্যন্ত জমির উচ্চতম সীমা সম্পর্কিত আইনে নানারকম ব্যতিক্রমের ব্যবস্থা ছিল। উত্তরপ্রদেশে এর সংখ্যা ছিল 20, কেরলে 17, মধ্যপ্রদেশে 14, পাঞ্জাবে 13 প্রভৃতি। 1972 সনে এ ব্যতিক্রমের সংখ্যা হ্রাস করা হয়। ফলে উদ্বৃত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাবার সুযোগ হয়েছে।

5. সমবায় কৃষির উন্নয়ন

সমবায় কৃষি প্রথা ক্ষুদ্র কৃষি, রায়ত ও জমিহীন কৃষকদের নানা সমস্যা মিটাবার একটি স্বীকৃত সুন্দর পথ। কিন্তু এ পথে জটিলতাও রয়েছে। ধনী কৃষি শ্রেণী শ্রেণী স্বার্থে এর বিরোধী। ক্ষুদ্র কৃষি শ্রেণী এর নিশ্চয়তা সম্পর্কে সন্দিহান। সাধারণত ক্ষুদ্র কৃষকদের ধারণা সমবায় কৃষিভুক্ত হলে তাদের জমির মালিকানা চলে যাবে। তাছাড়া রয়েছে সমবায় কৃষি সমিতিগুলির আর্থিক অনটন এবং প্রশাসনিক নানাবিধ অসুবিধা ও ক্রটিবিচ্যুতি।

6. জমি সম্পর্কিত দলিলপত্র তৈরি ও বর্তমানোপযোগী করা

জমির পুনর্বণ্টন বা জমি স্বত্বের কোন প্রকার কাঠামোগত পরিবর্তনের প্রচেষ্টা জমি সম্পর্কিত প্রামাণ্য দলিলপত্রের অভাবে ব্যর্থ হতে বাধ্য।

শুধু তাই নয়, প্রতিটি দলিল আধুনিক হওয়া চাই। জমির মালিকদের দলিলপত্র নেই; থাকলেও তা অনেক ক্ষেত্রে প্রমাণ সাপেক্ষ। আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দলিলপত্র অতি প্রাচীন—এ অবস্থা থেকে মুক্ত হতে গেলে এ বিষয়ে জরুরী ভিত্তিতে সরকারী হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

মূল্যায়ন

জমি সংস্কার নীতি কার্যকর করার ফলে যে সমস্ত পরিবর্তন ঘটেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঃ

(a) জমিদারী, জায়গীরদারী, ইনামদারী প্রভৃতি সামন্ত স্বার্থের মোটামুটি বিলোপ। এর ফলে প্রায় 2 কোটি কৃষকদের সঙ্গে সরকারের সরাসরি সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে।

(b) আইনের সাহায্যে রায়তদের প্রজা স্বত্ব নিরাপদ করা হয়েছে। তাদের খাজনার হারও নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশ, হরিয়ানা ও পাঞ্জাব ছাড়া অন্যান্য সমস্ত রাজ্যে খাজনার উচ্চতম হার এক-চতুর্থাংশ থেকে কমিয়ে এক-পঞ্চমাংশ করা হয়েছে।

(c) কোন কোন রাজ্যে ন্যাশনাল গাইডলাইন্স অনুযায়ী বর্গাদারদের জমির মালিকানা দেয়া সম্পূর্ণ হলেও অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, তামিলনাড়ু, হরিয়ানা ও পাঞ্জাবে এ নির্দেশ পুরাপুরি অনুসরণ করা হয়নি।

(d) ন্যাশনাল গাইডলাইন্স অনুযায়ী জমির মালিকানার উচ্চতম সীমা প্রায় সমস্ত রাজ্যেই চালু করা হয়েছে। যে সমস্ত রাজ্য এখনও তা চালু করতে সমর্থ হয়নি তাদের মধ্যে রয়েছে নাগাল্যাণ্ড, মেঘালয়, অরুণাচল প্রদেশ ও মিজোরাম। এ সমস্ত অঞ্চলে জমির মালিকানা সাধারণত সম্প্রদায়ভুক্ত।

(e) উদ্বৃত্ত জমি অধিগ্রহণ ও বণ্টনের কাজ আশানুরূপ নয়। 1980 সনের মার্চে বিভিন্ন রাজ্যে মোট 16·88 লক্ষ হেক্টর জমি উদ্বৃত্ত বলে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু সরকারের অধিগ্রহণের পরিমাণ মাত্র 10·98 লক্ষ হেক্টর ও বণ্টনের পরিমাণ প্রায় 7·65 লক্ষ হেক্টর। উদ্বৃত্ত জমি বণ্টনের ফলে প্রায় 11·54 লক্ষ জমিহীন কৃষক জমির মালিক হতে পেরেছে। তাদের মধ্যে 6·13 লক্ষ তপশীলী জাতি ও তপশীলী উপজাতিভুক্ত। বন্টিত জমি উন্নয়নের জন্য দরিদ্র চাষীদের যে সাহায্য দেয়া দরকার তা না দেয়ার ফলে উদ্বৃত্ত জমি বণ্টনের মূল উদ্দেশ্য অনেক ক্ষেত্রেই অসম্পূর্ণ রয়েছে। জমির

মালিকানার উচ্চতম সীমা নির্ণয়ের কাজ প্রামাণ্য দলিলপত্রের অভাবে ও মামলা-মোকদ্দমার জন্য দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে না। উদ্বৃত্ত জমি বণ্টন করা ছাড়াও 1975-78 সনে 21 লক্ষ একর সরকারী পতিত জমি জমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে অধিকাংশই তপশীলী জাতি ও উপজাতিভুক্ত এবং অন্যান্য দুর্বল শ্রেণীর মানুষ।

বেশির ভাগ রাজ্যই জমি একীকরণ সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন করেছে। প্রায় 4 কোটি 50 লক্ষ হেক্টর জমি, অর্থাৎ, একীকরণ উপযোগী মোট জমির প্রায় এক-চতুর্থাংশ, একীকরণ করা হয়েছে। পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ ছাড়া অন্য কোন রাজ্যে জমি একীকরণ তেমন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়নি। দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতে ও রাজস্থানে জমি একীকরণের কোন প্রচেষ্টাই দেখা যায় না। পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে একমাত্র বিহার ও ওড়িষ্যা এ কাজ সম্প্রতি সুরু হয়েছে।

সব রাজ্যেই জমি সম্পর্কিত দলিলপত্র বর্তমানোপযোগী করার কাজ সুরু হয়েছে। এর ফলে জমির যথার্থ মালিকানা, রায়ত, বর্গাদার প্রভৃতি শ্রেণীর প্রকৃত সংখ্যা ও তাদের চাষাধীন জমির প্রকৃত পরিমাণ প্রভৃতির তথ্য পাওয়া যাবে।

জমি সংস্কার নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য গ্রামাঞ্চলের দরিদ্রতর শ্রেণীর রায়তরা যে ভিটে-মাটিতে বসবাস করছে তাতে তাদের মালিকানার অধিকার দেয়া। এ সম্পর্কে বিভিন্ন রাজ্য আগ্রহ দেখাচ্ছে। অধিকাংশ রাজ্যেই তাদের জোতের স্বত্বের নিরাপত্তা ও মালিকানার অধিকার দেয়ার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। মিনিমাম নিডস প্রোগ্রাম অনুযায়ী গ্রামাঞ্চলের জমিহীন কর্মী ও কারুশিল্পীদের মধ্যে প্রায় 86 লক্ষ গৃহ নির্মাণের উপযোগী জমি বণ্টন করে দেয়া হয়েছে।

মন্তব্য

জমিদারী উচ্ছেদ প্রচেষ্টা সম্পর্কে যে সমস্ত মন্তব্য করা হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য :

(i) জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করা বাবদ জমিদারদের যে ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়েছে তার পরিমাণ 670 কোটি টাকা। এ ক্ষতিপূরণলব্ধ অর্থের অতি সামান্য অংশই জমি উন্নয়নের জন্য ব্যয়িত হয়েছে।

(ii) খাস জাতীয় জমি জমিদারী উচ্ছেদ আইনের বাইরে রাখার ফলে মধ্যজীবীদের সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন করা সম্ভব হয়নি।

জমি সংস্কার সম্পর্কিত আইন সম্পর্কে বলা হয়ঃ

(i) 'রায়ত'-এর সংজ্ঞা থেকে বর্গাদারদের বাদ দেয়ার ফলে প্রকৃত চাষীদের অনেকেই এ আইনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

(ii) কোন কোন শর্তে রায়তদের উচ্ছেদ করার অধিকার মেনে নেয়া হয়েছে।

(iii) পুনরায় নিজের জমি নিজে চাষ করার অধিকার আইনে স্বীকৃত হওয়ার ফলে অসাধু জমিদারদের জমি ফিরে পাওয়ার ও জমি বেনামীতে চাষ করার সুযোগ ঘটেছে।

(iv) জমির খাজনা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে বলা চলে না। যেখানে জমি স্বত্বের নিরাপত্তার অভাব সেখানে নিয়ন্ত্রিত খাজনার দাবির সঙ্গে উচ্ছেদের আশঙ্কাও জড়িত।

(v) রায়তদের হাতে জমির মালিকানা তুলে দেয়ার নীতি সম্পূর্ণ কার্যকর হয়েছে বলা যায় না। কারণ এজন্য রায়তদের যে পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ বাবদ দিতে হবে তা দেয়ার মত সামর্থ্য তাদের অনেকেরই নেই।

জমি সংস্কার সম্পর্কে সমীক্ষার জন্য প্ল্যানিং কমিশন টাস্ক ফোর্স অন এগ্রিকালচারেল রিলেসনস নিযুক্ত করে। এ টাস্ক ফোর্সের মতে জমি সংস্কারের অগ্রগতি অতি মন্থর। কারণঃ

(i) রাজনৈতিক চাপ। জমি সংস্কারের ফলে কায়েমী স্বার্থ ক্ষুন্ন হবে।

(ii) গ্রামের মানুষ দরিদ্র, অজ্ঞ ও অসংগঠিত। এ ব্যাপারে তাদের আন্দোলন গড়ে তোলার অক্ষমতার সুযোগ কায়েমী স্বার্থ গ্রহণ করছে।

(iii) রাজস্ব প্রশাসকদের উপর জমি সংস্কার সম্পর্কিত প্রশাসনিক কাজকর্মের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। যথাযোগ্য গুরুত্ব দিয়ে এ দায়িত্ব পালন করার মত মানসিকতা ও প্রশিক্ষণ তাদের অনেকেরই নেই।

(iv) আইনগত বাধা উপেক্ষণীয় নয়। জমি সংস্কার আইনে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে। বিরোধী স্বার্থ সে সমস্ত সুযোগ পুরাপুরি গ্রহণ করে থাকে।

(v) জমি সংক্রান্ত দলিলপত্রের অভাবে জমির প্রকৃত মালিকানা ও জমির মালিকানার পরিমাণ নির্ণয় করা কঠিন।

(vi) জমি সংস্কার বিষয়টিকে মূল অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিপথ থেকে পৃথক করে দেখার ফলে এর গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে।

ষষ্ঠ পরিকল্পনায় জমি সংস্কার নীতি

ষষ্ঠ পরিকল্পনায় জমি সংস্কার সম্পর্কে বিশেষ কোন নতুন নীতি নির্ধারিত হয়নি। পূর্ববর্তী পরিকল্পনায় গৃহীত নীতিগুলি সুষ্ঠুভাবে ও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যাতে কার্যকর করা হয় ষষ্ঠ পরিকল্পনায় মূলত সে নির্দেশ রয়েছে। যথা—

(i) যে সমস্ত রাজ্যে এখনও সব রায়তদের (কার্যরত দেশরক্ষা কর্মী, অপ্রাপ্ত বয়স্ক বা বয়স্কা ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী প্রভৃতি ছাড়া) জমির মালিকানার স্বত্ব দেয়ার জন্য আইন প্রণয়ন করা হয়নি সে সমস্ত রাজ্যে 1981-82 সনের মধ্যে সে সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন করা।

(ii) 1981-83 সনের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমির মালিকানা ও বণ্টনের কাজ শেষ করতে হবে। জমি বণ্টন ব্যাপারে তপশীলী জাতি ও উপজাতিদের অগ্রাধিকার দেয়া।

(iii) 1980-85 সনের মধ্যে জমি সম্পর্কিত দলিলপত্র সংকলন ও বর্তমানোপযোগী করার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচী গ্রহণ।

(iv) সমস্ত রাজ্য কর্তৃক জমি একীকরণ কর্মসূচী গ্রহণ ও আগামী দশ বছরের মধ্যে তা কার্যকর করা। ভবিষ্যতে যাতে জমি খণ্ডীকৃত না হয় তা প্রতিরোধ করার জন্য আইন প্রণয়ন করার কথাও চিন্তা করতে হবে।

(v) জমিহীনদের শীঘ্র বাসস্থান দেয়ার কর্মসূচী গ্রহণ করা।

(vi) বর্তমানে জমি সংস্কার সম্পর্কিত যে সমস্ত আইন রয়েছে ও ভবিষ্যতে এ সম্পর্কিত যে সমস্ত আইন হবে তা আদালতের বিচার বহির্ভূত রাখার জন্য সংবিধানের নবম সিডিউল সংশোধন করা।

উপসংহার

সরকারের জমি সংস্কারের উদ্যম বিশেষ সাফল্য লাভ করেছে বলা চলে না। এর কারণ বিবিধ। যথা, রাজনৈতিক ইচ্ছার অভাব, কৃষকদের আগ্রহের অভাব, কর্মসূচী রূপায়ণে অনীহা, আইনগত বাধা ও জমিজমার মালিকানার উপযুক্ত দলিলপত্রের অভাব।

কোনকিছু নীতিগতভাবে গ্রহণ কিন্তু তা কার্যকর না করা বা নীতি কার্যকর করা সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করা কিন্তু সে আইন কার্যকর না করার একমাত্র কারণই হচ্ছে রাজনৈতিক ইচ্ছার অভাব। অর্থাৎ, প্রভাবশালী কায়েমী স্বার্থ চায় না যে জমি স্বত্ব প্রথার কোন মৌল পরিবর্তন ঘটুক। এ মনোভাব ও এর প্রভাব আমাদের দেশের সর্বক্ষেত্রে, বিশেষত জমি স্বত্ব পরিবর্তনের উদ্যমের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রমাণিত। এ কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে জমি স্বত্ব প্রথার মৌল পরিবর্তন দ্বারা সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করার মত সংগ্রামী মানসিকতা ও দৃঢ়তা কৃষক শ্রেণীর মধ্যে বিশেষ পরিলক্ষিত হয় না। বরঞ্চ দেখা যায়, অনেক ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র কৃষকেরা তাদের জমির একাংশ বৃহৎ কৃষকদের কাছে ইজারা দিয়ে বৃহৎকে আরো বৃহৎ করে তুলছে। সব রাজ্যেই জমি সংস্কারের কর্মসূচী রূপায়ণের দায়িত্ব রাজস্ব প্রশাসনের উপর ন্যস্ত। প্রয়োজনীয় সামাজিক মানসিকতার অভাবের কথা ছেড়ে দিলেও এ প্রশাসন থেকে এ বিষয়ে বিশেষ কিছু আশা করা যায় না। কারণ রাজস্ব সংক্রান্ত বহুবিধ কাজের দায়িত্বের সঙ্গে প্রশাসনটি জড়িত। জমি স্বত্ব সম্পর্কিত আইনকানুন যথেষ্ট ক্রটিযুক্ত। জমির মালিকানা সম্বন্ধে উপযুক্ত প্রমাণপত্রেরও অভাব রয়েছে। কায়েমী স্বার্থ আদালতে এর পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে থাকে। তাছাড়া রাজ্যগুলির মধ্যে জমি সংস্কার নীতি সম্পর্কে অনৈক্য, জমি সংস্কারের কর্মসূচী রূপায়ণে রাজ্যগুলির অর্থাভাব ও জমি সংস্কারকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা প্রভৃতি কারণেও জমি সংস্কার মূলত অসংস্কৃত স্তরেই রয়েছে।

10

গ্রামীণ উন্নয়ন

গ্রামীণ উন্নয়ন ঃ উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলির অন্যতম বিশেষ লক্ষ্য গ্রামীণ উন্নয়ন। পঞ্চাশ দশকের সুরুতে কম্যুনিটি ডেভেলপমেণ্ট প্রোগ্রাম গ্রহণ করা হয়। গ্রামাঞ্চলে বিস্তৃতভাবে উন্নয়নমূলক সেবার ভিত রচনা করা হয়। এর ফলে গ্রামের মানুষদের মধ্যে দ্রুত গ্রামীণ উন্নয়নের সম্ভাবনা সম্পর্কে জাগরণ আসে। মধ্যজীবী জমিদারদের বিলোপ সাধন ও জমি স্বত্ব প্রথার সংস্কারের ফলে পরিবহন, সেচ প্রভৃতি ও প্রতিষ্ঠানগত ভিত-কাঠামো গঠন করা সহজ হয়ে ওঠে। সত্তর দশকের প্রারম্ভে প্রান্তিক কৃষক, জমিহীন কৃষক ও কৃষি শ্রমিকদের আর্থিক উন্নতিসাধনের দিকে লক্ষ্য রেখে গ্রামীণ উন্নয়নের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। তাছাড়া এ সময় খরা-প্রবণ ও মরুভূমি অঞ্চল উন্নয়ন ও 1977 সনে "ফুড ফর ওয়ার্ক" কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। আঞ্চলিক বৈষম্য, বিশেষত পাহাড়ী ও উপজাতি অঞ্চলে, লাঘব করার জন্য বিশেষ উন্নয়নমূলক সাব-প্ল্যানও রচিত হয়। গ্রামাঞ্চলে যুক্তিযুক্ত সময়ের মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয়-জল, বিদ্যুৎ সরবরাহ, সড়ক ও গৃহ নির্মাণের জমি প্রভৃতি সুনিশ্চিত করার জন্য মিনিমাম নিডস প্রোগ্রাম রূপায়িত করা হয়। কৃষি-ভিত্তিক শিল্পগুলির উন্নয়নের জন্য স্বল্প সুদে এবং সুবিধামত শর্তে ঋণ ও ভরতুকি দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য বেশ কিছু কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে বটে, তবে তার কোনটিই জাতীয় স্তরে রচিত হয়নি। এ সমস্ত কর্মসূচীর আঞ্চলিক অতিব্যাপ্ততা ও তাদের মধ্যে আর্থিক ও আনুষঙ্গিক সাহায্যদান ব্যাপারে বিশেষ কোন পার্থক্য না থাকার ফলে তাদের যথাযথ মূল্যায়ন করা কঠিন হয়ে উঠেছে। এমনকি বিভিন্ন কর্মসূচীর উদ্দেশ্য যথাযথ নিরূপণ করাও কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, সমস্ত কর্মসূচীরই উদ্দেশ্য ভরতুকি দেয়া মাত্র। গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের নিজস্ব প্রচেষ্টায় স্থানীয় সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার দ্বারা দীর্ঘস্থায়ী সম্পদ গড়ে তোলার বিশেষ কোন স্বাক্ষর কোন কর্মসূচীতে নেই।

গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য যে সমস্ত কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচীর আলোচনা নিম্নে করা গেল।

1. ফুড ফর ওয়ার্ক

1977 সনের এপ্রিল থেকে "ফুড ফর ওয়ার্ক" স্কীম রাজ্য সরকার ও ইউনিয়ন অঞ্চলগুলির প্রশাসনের মাধ্যমে চালু করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকার এদের বিনামূল্যে খাদ্যশস্য সরবরাহ করে। সূচনায় কেন্দ্র থেকে মজুরীর বদলে কেবল গম দেয়া হয়। পরে গমের বদলে চালও দেয়া হয়। কেন্দ্র থেকে যে গম দেয়া হয় তার মূল্য রাজ্য সরকারদের গ্রামাঞ্চলে পূর্ত সংস্থা কর্তৃক নির্মিত সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চলতি ব্যয়ের 30 শতাংশের সমান। বাকী 70 শতাংশ রাজ্য ও ইউনিয়ন অঞ্চলগুলিকে বহন করতে হয়। রাজ্য সরকার-গুলি পূর্ত সংস্থার খাতে বাজেটে যে টাকা বরাদ্দ করবে তার বাইরে এ 70 শতাংশ টাকা তাদের সংগ্রহ করতে হবে। অসমর্থ হলে যে খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হবে টাকার অঙ্কে তার মূল্য সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের কাছ থেকে উদ্ধার করা হবে।

এই স্কীমে যে খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হয় তা ঠিকাদাররা যে সমস্ত মজুর খাটাবে তাদের মজুরী দেয়ার জন্যও ব্যয় করা চলবে। তবে সেক্ষেত্রে ঠিকাদারদের যথাযথ হিসাবপত্র রাখতে হবে। রাজ্য সরকারগুলি সঙ্গত মনে করলে এ কর্মসূচী রূপায়ণের দায়িত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠানগুলিকে দিতে পারে।

উদ্দেশ্য

ফুড ফর ওয়ার্ক স্কীমের উদ্দেশ্য :

(i) গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা।

(ii) দীর্ঘস্থায়ী গ্রামীণ সর্বজনীন সম্পদ যথা, রাস্তাঘাট ও সেচ প্রকল্প, নির্মাণ।

(iii) গ্রামের পূর্ত সংস্থা নির্মিত সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণে সাহায্য করা।

(iv) উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য উৎপাদনশীল কাজে নিয়োগ করা।

সংক্ষেপে, ফুড ফর ওয়ার্ক স্কীমের উদ্দেশ্য গ্রামাঞ্চলের সর্বস্তরের মানুষদের সাহায্য করা, বিশেষত দরিদ্রদের মধ্যে দরিদ্রতমদের।

বর্তমানে নানাপ্রকার প্রকল্প ফুড ফর ওয়ার্ক স্কীমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেমন, বৃহৎ, মধ্য ও ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন, মাটি ও জল সংরক্ষণ ও

বৃক্ষরোপণ ; রাজ্যস্তরে রাজপথ সহ রাস্তাঘাট নির্মাণ, সেচ প্রধান অঞ্চলে ড্রেন নির্মাণ, ক্ষেতে নালাকাটা, মাটি সমতল করা প্রভৃতি ; সরকার কর্তৃক পঞ্চায়েত ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক সংস্থাগুলির অধীনে বিদ্যালয় ভবন ও গণহল নির্মাণ। গুজরাট, মহারাষ্ট্র, উড়িষ্যা ও উত্তরপ্রদেশে এ স্কীমে বন ও গোবাদির প্রজনন কাজও করা হয়েছে। এ সমস্ত কাজের জন্য 5000 পরিবারকে প্রতি সপ্তাহে 10 কেজি গম ও কিছু পুষ্টিকর খাদ্য সারা বছর দেয়া হয়েছে।

ফুড ফর ওয়ার্ক খাতে কেন্দ্র 1977-78 সনে বিভিন্ন রাজ্যের জন্য 2·04 লক্ষ এমটি খাদ্যশস্য বরাদ্দ করে। এর মধ্যে 1·46 লক্ষ এমটি ব্যয় হয়।

1978-79 সনে এ কর্মসূচী খাতে 12 লক্ষ এমটি খাদ্যশস্য ব্যয় হয়। এর ফলে 372·8 মিলিয়ন ম্যানডেজের কাজ পাওয়া যায়। এ কর্মসূচীর ফলে গ্রামাঞ্চলের মজুরীর ক্ষেত্রে স্থিতিস্থাপকতা দেখা দেয়। খাদ্যশস্যের দাম বৃদ্ধিও কিছুটা রোধ করা সম্ভব হয়। তবে দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা ও উপযুক্ত পরিচালনার অভাবে এ কর্মসূচীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে ওঠে। প্রধানত এ কারণেই এর কাজকর্মের তত্ত্বাবধানের জন্য রাজ্য সরকারগুলি এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় কারিগরি ও প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে না। তাছাড়া রাস্তাঘাট প্রভৃতি নির্মাণের জন্য যে পরিমাণ অর্থ ও মালমসলার প্রয়োজন তা সংগৃহীত না হওয়ার দরুনও অনেক ক্ষেত্রে কার্যকর স্থায়ী সম্পদ গড়ে তোলা সম্ভব হয় না। তা সত্ত্বেও এ কর্মসূচীর ফলপ্রস্বরূপে গ্রামাঞ্চলে বহু দীর্ঘস্থায়ী সম্পদ গঠিত হয়েছে। যেমন, সেচের জন্য জলাশয়, বিদ্যালয় ভবন, পঞ্চায়েত গৃহ, পানীয় জলের জন্য কূপ, পাকা রাস্তাঘাট, পয়প্রণালীর উন্নয়ন প্রভৃতি।

ফুড ফর ওয়ার্ক স্কীমের মাধ্যমে 1977-78 সন থেকে 1980-81 সন পর্যন্ত যে সর্বজনীন সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে তার বিবরণ নিম্নে দেয়া হল।

ফুড ফর ওয়ার্ক প্রোগ্রাম

সর্বজনীন সম্পদ সৃষ্টির পরিমাণ

1977-78 থেকে 12ই ফেব্রুয়ারী 1982

মৃত্তিকা সংরক্ষণের অধীন অঞ্চল (হেক্টর)	প্রধান ক্ষুদ্র সেচের অধীনে আনিত অঞ্চল (হেক্টর)	বন্যা প্রতিহত করে আবাদী অঞ্চলে পরিণত অঞ্চল (হেক্টর)
83,11,699	12,70,285	4,92,258
বৃক্ষরোপিত অঞ্চল (হেক্টর)	**বিদ্যালয় গৃহনির্মাণ ও মেরামত (সংখ্যা)**	**পঞ্চায়েত ঘর, গণহল নির্মাণ (সংখ্যা)**
4,74,151	1,14,160	5,642

সড়কের কাজ		সেচ কম্যাণ্ড অঞ্চলে	অন্যান্য কাজ
সংরক্ষণ উন্নয়ন ও মেরামত (সংখ্যা)	নতুন সড়ক নির্মাণ (সংখ্যা)	মধ্যবর্তী মেন ড্রেনের মাঠ প্রণালী ও জমি সমীকরণ প্রভৃতি কাজ (সংখ্যা)	সংখ্যা
4,78,893	2,28,377	2,15,916	3,79,22

সূত্র: ইণ্ডিয়া 1982

বর্তমানে ফুড ফর ওয়ার্ক স্কীমকে ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লোয়মেণ্ট প্রোগ্রাম-এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।

2. ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লোয়মেণ্ট প্রোগ্রাম (এন-আর-ই-পি)

গ্রামীণ বেকারদের দু'ভাগে ভাগ করা যায়: পরিপূর্ণভাবে কর্মে নিযুক্ত নয় ও মরসুমী বেকার। এ দু'শ্রেণীর বেকারত্ব দূর করার পথ সেচ ও উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে নিবিড় ও ব্যাপক উভয় প্রক্রিয়ায় কৃষিকার্য দ্বারা বহুবিধ ফসল উৎপাদনের জন্য কৃষি ক্ষেত্রের প্রসার সাধন। এর পাশাপাশি সহকারী চাকরির সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। বিশেষত যে সময় চাষ-আবাদের চাপ থাকে না।

ষষ্ঠ পরিকল্পনায় কর্মসংস্থান বিষয়টিকে উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। তবে এও স্বীকৃত যে, উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির

পক্ষে ক্রমবর্ধমাণ গ্রামীণ শ্রমশক্তির কর্মসংস্থানের পূর্ণ ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে না। তাছাড়া গ্রামের বহু মানুষেরই কোন সম্পদ নেই। তাদের পক্ষে গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচীর দ্বারা উপকৃত হবার বিশেষ সুযোগ নেই। প্রধানত এ শ্রেণীর দুর্বল মানুষদের দারিদ্র্য ও দুরবস্থা দূর করার জন্যই এন-আর-ই-পি গ্রহণ করা হয়েছে। এ কর্মসূচী গ্রহণের ফলে উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির সঙ্গে লক্ষ্য-ভিত্তিক কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী প্রকল্পগুলিকে নিবিড়ভাবে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করে দেয়া সম্ভব হয়।

এন-আর-ই-পি স্কীমটি কেন্দ্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এ কর্মসূচীতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির অংশ 50:50। কেন্দ্র তার দেয় অংশ খাদ্যশস্যে দেবে। এর পরিমাণ নির্ভর করবে কেন্দ্রের উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্যের পরিমাণের উপর। বাকী অংশ, যদি কিছু থাকে, তবে তা দেয়া হবে নগদ টাকায়। এ কর্মসূচী সংশ্লিষ্ট রাজ্যের প্রান্তিক কৃষক, কৃষি শ্রমিক ও যারা দারিদ্র্য রেখার নিম্নে রয়েছে তাদের উন্নতিসাধনের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে। রাজ্যগুলি যাতে স্থানীয় খাদ্যশস্য সংগ্রহ করতে পারে সেজন্য তাদের উৎসাহিত করার কথা বলা হয়েছে। এর ফলে কৃষকেরা তাদের খাদ্যশস্য বাজারকরণের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হবে। সংগৃহীত খাদ্যশস্য মজুত করার জন্য গ্রামীণ গুদাম-ঘর নির্মাণের কর্মসূচী ও গ্রামাঞ্চলে খাদ্যশস্য মজুত করে রাখার ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য অন্যান্য কর্মসূচীও গ্রহণ করা হয়েছে। এন-আর-ই-পি অনুযায়ী যে মজুরী দেয়া হবে তা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জন্য নির্ধারিত ন্যূনতম কৃষি মজুরীর সমান হবে। কোনক্রমেই খাদ্যশস্যের পরিমাণ দৈনিক জনপ্রতি 2 কেজির বেশি হবে না। যেসব কেন্দ্রে গ্রামোন্নয়ন কাজকর্ম চলতে থাকবে সেসব কেন্দ্রে ভ্রাম্যমান ন্যায্য মূল্যের দোকান গঠন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে যাতে কর্মরত ব্যক্তিরা অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ন্যায্য মূল্যে ক্রয় করার সুযোগ পায়। এন-আর-ই-পির কোন কাজকর্মের সঙ্গে ঠিকাদার বা মধ্যজীবীদের যুক্ত করা চলবে না। এর সঙ্গে পঞ্চায়েত রাজ সংস্থাগুলিকে জড়িত করার সুপারিশ করা হয়েছে। রাজ্যস্তরে ব্লক-ভিত্তিক প্রকল্প রচনার উপরও গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এজন্য তাদের ব্লক ও উচ্চতর তত্ত্বাবধায়ক স্তরে কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে সংগঠন করতে হবে। প্রকল্প নির্বাচনে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে গ্রামীণ সর্বজনীন সম্পদ সৃষ্টি হয়। কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের সুবিধার জন্য কোন প্রকল্প গ্রহণ করা চলবে না।

তপশীলী সম্প্রদায় ও তপশীলী উপজাতিদের ঘরবাড়ী ও জমি উন্নয়নের ব্যাপারে এর ব্যতিক্রম করা যেতে পারে। যে প্রকল্পে স্ত্রীলোকদের কর্ম-সংস্থানের সুযোগের সম্ভাবনা অধিক সেরূপ প্রকল্পের প্রতিও দৃষ্টি রাখতে হবে।

দুর্বল শ্রেণীর মানুষেরা যাতে এন-আর-ই-পির সুবিধা গ্রহণ করতে পারে সেজন্য মোট ব্যয় বরাদ্দের অন্তত 10 শতাংশ এমন কর্মসূচীতে ব্যয় করতে হবে যাতে তপশীলী সম্প্রদায় সরাসরি এর সুবিধা পায়। যেমন, হরিজন বস্তির জন্য পানীয়জলের কূপ, সেচ স্কীম, পরিবেশ উন্নয়নমূলক কাজ প্রভৃতি ও তাদের জন্য বাসস্থান ও বাসগৃহ নির্মাণ। তাছাড়া আরো 10 শতাংশ বন রচনা ও জ্বালানি উদ্ভিজ্জের খাতে বরাদ্দ করে রাখতে হবে। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় এন-আর-ই-পি খাতে কেন্দ্রীয় ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হয়েছে 980 কোটি টাকা। রাজ্যগুলির গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচীতে যে মোট 1509·22 কোটি টাকা ধরা হয়েছে তার মধ্যে এন-আর-ই-পিতে তাদের দেয় অর্থ ধরা হয়েছে। অনুমিত হয় এন-আর-ই-পি রূপায়ণের ফলে গড়ে প্রতি বছর 300-400 মিলিয়ন ম্যানডেজ কাজ পাওয়া যাবে। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় এন-আর-ই-পির কাজকর্ম সম্পর্কে পরামর্শ দেয়া ও কাজকর্মের তত্ত্বাবধানের জন্য একটি উচ্চ পর্যায় কমিটি গঠন করার প্রস্তাব রয়েছে।

বর্তমানে এন-আর-ই-পি ফুড ফর ওয়ার্কের পরিবর্তিত নাম।

3. পঞ্চায়েত রাজ

বলবন্ত রাই মেহতা কমিটির (1958) সুপারিশক্রমে 1959 সনে স্বায়ত্ত-শাসনমূলক পঞ্চায়েত রাজ সংস্থাগুলি গঠিত হয়। পঞ্চায়েত রাজের তিনটি স্তর: গ্রামস্তর, ব্লকস্তর ও জেলাস্তর। এ স্তরগুলি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। রাজ্যগুলির নিজেদের অবস্থা অনুযায়ী এ স্তর কাঠামোর পরিবর্তন সাধনের স্বাধীনতা রয়েছে। পঞ্চায়েত সংস্থাগুলিতে অনুন্নত শ্রেণী, স্ত্রীলোক ও সমবায় সমিতিগুলির মত স্বার্থের বিশেষ প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হয়েছে। গ্রামাঞ্চলের মানুষদের ভোটে সরাসরি নির্বাচিত গ্রামের মানুষ দ্বারা গঠিত পঞ্চায়েত রাজের মূল উদ্দেশ্য ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ। কেন্দ্র ও রাজ্য স্তর থেকে জেলা, ব্লক ও গ্রাম স্তর পর্যন্ত ক্ষমতা বিকেন্দ্রী করতে হবে। স্থানীয় অভাব-অভিযোগ ও প্রয়োজনের মূল্যায়ন, উন্নয়নমূলক কর্মসূচী পরিকল্পন ও তা রূপায়ণে স্থানীয় লোকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং ভবিষ্যৎ জাতীয় নেতা সৃষ্টির একটি সুন্দর গণতান্ত্রিক পথ পঞ্চায়েত রাজ।

কৃষি উৎপাদন, গ্রামীণ শিল্প, চিকিৎসা, মাতৃত্ব ও শিশুকল্যাণ, সর্বজনীন গোচারণ ভূমি, গ্রামের সড়ক, পুকুর, কূপ ও স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন পঞ্চায়েতের দায়িত্ব।

অধিকাংশ রাজ্যই বিভিন্ন স্তরে পঞ্চায়েত রাজ সংস্থা গঠন করে তাদের উপর স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষমতা ন্যস্ত করেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের আদালতের দায়িত্বও দেয়া হয়েছে। গুজরাট, অন্ধ্রপ্রদেশ ও রাজস্থানে পঞ্চায়েত রাজ সংস্থাগুলিকে বিবিধ ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। কয়েকটি রাজ্যে শুধু গ্রাম পঞ্চায়েত গঠিত হয়েছে। যথা, জম্মু ও কাশ্মীর, মণিপুর, সিকিম ও ত্রিপুরা। উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে যেখানে উপজাতির আধিপত্য সেখানে অনেক বিষয়ের ও বিবাদের সালিসি ব্যাপারে প্রাচীন পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রাধান্য দেখা যায়। আবার কোন কোন রাজ্যে তিন স্তরে পঞ্চায়েত গঠিত হয়েছে। গ্রাম স্তরে গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্লক স্তরে ব্লক পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা স্তরে জেলা পরিষদ।

বর্তমানে গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা 212248, ব্লক পঞ্চায়েতের সংখ্যা 4481 ও পঞ্চায়েত রাজের সংখ্যা 252। মেঘালয় ও নাগাল্যাণ্ডে পঞ্চায়েত রাজ নেই। মিজোরাম ও পণ্ডিচেরী বাদে সমস্ত ইউনিয়ন অঞ্চলগুলিতে গ্রাম পঞ্চায়েত আছে। পঞ্চায়েতগুলির কাজকর্মের পথে বাধার মধ্যে রয়েছে প্রধানত সীমিত ক্ষমতা, কাজকর্মের সীমিত পরিধি, উপযুক্ত আর্থিক সমর্থনের অভাব ও দুর্নীতি। পঞ্চায়েতগুলির কর ধার্য করার ক্ষমতা আছে। তারা ঘরবাড়ী, নির্দিষ্ট ধরনের জমি, মেলা ও উৎসব এবং বিক্রয়ের উপর কর ধার্য করার আইনত অধিকারী। তাছাড়া তারা লাভজনক সর্বজনীন সম্পদও গড়ে তুলতে পারে। কর বা শুল্ক ধার্য করার অনীহার দরুন তাদের আর্থিক অনটন আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক নেতাদের ইচ্ছে নয় যে পঞ্চায়েত রাজ প্রথা শক্তিশালী ও সক্রিয় হয়ে ওঠে। বলা প্রয়োজন, পঞ্চায়েত রাজ সংস্থা-গুলির ক্ষমতা ও দায়িত্বের উৎস শুধু সংশ্লিষ্ট বিধান সভার আইনই নয়, রাজ্য-সরকার নির্দেশিত প্রশাসনিক ও আর্থিক রাজনীতিও বটে।

1977 সনে কেন্দ্রীয় সরকার পঞ্চায়েত রাজ সম্পর্কে অশোক মেহতার সভাপতিত্বে একটি কমিটি নিযুক্ত করে। 1978 সনে কমিটির রিপোর্টে সুপারিশ করা হয় যে, পঞ্চায়েতগুলির জন্য অধিক পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করতে

হবে। জেলা পরিষদগুলিকে প্রধান কার্যনির্বাহকের দায়িত্ব দিতে হবে ও ব্লক পঞ্চায়েতগুলিকে মণ্ডল পঞ্চায়েতের ভূমিকা পালন করতে হবে। 10-20 গ্রাম ও 15,000 থেকে 20,000 লোকসংখ্যা নিয়ে মণ্ডল পঞ্চায়েত গঠিত হবে। উপজাতি ও অন্যান্য অঞ্চল যেখানে জনবসতি কম সেখানে মণ্ডল পঞ্চায়েতের আয়তন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হলেও চলবে। এ সমস্ত সুপারিশ সম্পর্কে রাজ্যগুলির মতানৈক্য রয়েছে। পঞ্চায়েতগুলির কাছে অধিকতর ক্ষমতা হস্তান্তরকরণ, তাদের কাজকর্মের প্রকৃতি ও পরিধি এবং তারা কি পরিমাণ অর্থ পেতে পারে সে সম্বন্ধে রাজ্যগুলির মধ্যে বিশেষ মতবিরোধ না থাকলেও মণ্ডল পরিষদ গঠন ব্যাপারে তারা একমত নয়। জেলা পরিষদ ও ব্লক পঞ্চায়েতগুলি সম্পর্কে রাজ্যগুলির সাধারণ অভিমত এই যে সমগ্র দেশে একই ধরনের গঠন পদ্ধতি বাঞ্ছনীয় নয়। তাছাড়া বিভিন্ন রাজ্যে যে বিভিন্ন ধরনে গঠিত জেলা পরিষদ ও ব্লক পঞ্চায়েত আছে তাদের আমূল পরিবর্তন সাধন করা সহজসাধ্য নয়। প্রয়োজনও নেই।

ষষ্ঠ পরিকল্পনা ও পঞ্চায়েত রাজ

ষষ্ঠ পরিকল্পনায় গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ পদ্ধতি শক্তিশালী করে তোলার প্রস্তাব করা হয়েছে। পঞ্চায়েতগুলির গঠন ও ধরন যাই হোক না কেন যে স্তরে যার কাজ করার যোগ্যতা ও যৌক্তিকতা রয়েছে সে স্তরে তাকে কাজ করার ক্ষমতা ও দায়িত্ব দিতে হবে। এসব প্রতিষ্ঠানগুলিকে ইনটিগ্রেটেড রুরাল ডেভেলপমেণ্ট প্রোগ্রাম ও ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লোয়মেণ্ট প্রোগ্রামের কর্মসূচী রচনা ও রূপায়ণের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। জেলা ও ব্লক স্তরে এবং মিনিমাম নিডস কর্মসূচী রচনায় এদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে।

ষষ্ঠ পরিকল্পনায় গ্রামীণ উন্নয়নে মহিলাদের প্রয়োজনীয়তা ও ভূমিকা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাদের সহযোগিতা পেতে হলে মহিলামণ্ডলের সাহায্য নেয়া দরকার। সামাজিক ও আর্থিক কর্মসূচী অনুযায়ী এরূপ প্রায় 66000 মহিলামণ্ডল গঠিত হয়েছে। এদের অধিকাংশই উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে প্রায় নিষ্ক্রিয়। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় মহিলামণ্ডলগুলিকে ইনটিগ্রেটেড ডেভেলপমেণ্টভুক্ত করে সক্রিয় করে তোলার প্রস্তাব রয়েছে। ব্লক এজেন্সি-গুলিকেও শক্তিশালী করে তোলার সুপারিশ রয়েছে। কারণ তাদের কার্য-কারিতার উপর গ্রামীণ উন্নয়নের যাবতীয় কর্মসূচীর সাফল্য নির্ভর করে।

ষষ্ঠ পরিকল্পনায় পঞ্চায়েত রাজ ও কম্যুনিটি ডেভেলপমেণ্টের জন্য কেন্দ্রীয়

খাতে 7·17 কোটি টাকা এবং রাজ্য ও ইউনিয়ন অঞ্চলগুলির ক্ষেত্রে 344·90 কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ করা হয়েছে। অর্থাৎ, মোট বরাদ্দের পরিমাণ 352·07 কোটি টাকা।

4. স্মল ফার্মস ডেভেলপমেণ্ট এজেন্সিস (এস-এফ-ডি-এ)

1971 সন থেকে এস-এফ-ডি-এ কর্মরত। 1818 ব্লকে এদের কাজকর্ম হচ্ছে। এ সমস্ত এজেন্সিদের কাজ ক্ষুদ্র কৃষক, প্রান্তিক কৃষক* এবং কৃষি শ্রমিকদের* উপার্জন বৃদ্ধির চেষ্টা করা। এ উদ্দেশ্যে তারা যাতে উন্নতমানের কৃষি প্রযুক্তিবিদ্যা ও সেচের সাহায্যে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয় তার ব্যবস্থা করা। তাছাড়া পশুপালন, ডেয়ারী প্রভৃতি কাজকর্মে তাদের আগ্রহ সৃষ্টি করা। তাদের সমবায় ঋণদান সমিতির সদস্যভুক্ত হওয়ার জন্য উৎসাহিত করাও এজেন্সিগুলির অন্যতম উদ্দেশ্য। এর ফলে তাদের অর্থসাহায্য পাবার পথ সুগম হবে। 1980 সনের মার্চ পর্যন্ত 16·7 বিলিয়ন লোক এজেন্সিগুলির সাহায্য পেয়েছে। এস-এফ-ডি-এর প্রসার আশানুরূপ নয়। এর কারণ ব্লক এজেন্সিগুলির নিষ্ক্রিয়তা, ঋণদান সংস্থাগুলির ঋণদানে অক্ষমতা ও তাদের মধ্যে সংযোজনার অভাব। তাছাড়া সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলির দিক থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার অভাবও রয়েছে।

5. ড্রাউট প্রোণ এরিয়া প্রোগ্রাম (ডি-পি-এ-পি)

আমাদের দেশের প্রায় কুড়ি শতাংশ জমি খরার কবলে। খরা অঞ্চলকে উৎপাদনশীল করে তোলার জন্য ড্রাউট প্রোণ এড়িয়া প্রোগ্রাম রচনা করা হয়। চতুর্থ পরিকল্পনা থেকে এ প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য খরার প্রভাব হ্রাস করা, খরা অঞ্চলের মানুষদের আয় স্থিতিশীল করা ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করা। এ উদ্দেশ্যে যে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে জলসম্পদের উন্নয়ন ও পরিচালন, মৃত্তিকা ও আর্দ্রতা সংরক্ষণ, বনসম্পদ রচনা, মেষপালন ও গোচারণ ভূমির পরিচালনার উন্নয়ন, গোবাদি পশু ও ডেয়ারীর উন্নয়ন, শস্য উৎপাদনের ধরনের পুনর্বিন্যাস ও সহকারী পেশাসমূহের উন্নয়ন। 13 রাজ্যের 70 জেলার 511 ব্লকে এর কাজ চলছে। 1980 সনের মার্চ পর্যন্ত এ উদ্দেশ্যে ব্যয়ের

---

* ক্ষুদ্র কৃষক বলতে 2 হেক্টরের কম পরিমাণ সেচ জমির অধিকারীকে বোঝায়; প্রান্তিক কৃষক বলতে 1 হেক্টরের কম জমির অধিকারীকে বোঝায়; কৃষি শ্রমিক বলতে তাকে বোঝায় যার বসতভিটা আছে ও যার আয়ের 50 শতাংশের বেশি কৃষি থেকে আসে।

পরিমাণ 426 কোটি টাকা। এ কর্মসূচী রূপায়ণের ফলে 1979 সনের ডিসেম্বর পর্যন্ত 13·30 লক্ষ হেক্টর জমিতে মৃত্তিকা ও আদ্র'তা সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়েছে। 2·72 লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। 4·77 লক্ষ হেক্টর জমিতে বন ও গোচারণ ভূমির উন্নয়নের ব্যবস্থা হয়েছে। 72,000 গরু বণ্টন করা হয়েছে। শুষ্ক জমি চাষ প্রথার ও ফলনের ধরনের উপর খরার প্রভাব নির্ভর করে। এ সম্পর্কিত প্রকল্প রূপায়ণে দৃঢ়তার অভাবের ফলে কর্মসূচীর সাফল্য আশানুরূপ নয় বলে স্বীকৃত হয়েছে।

6. ডেজার্ট ডেভেলপমেণ্ট প্রোগ্রাম (ডি-ডি-পি)

মরু অঞ্চলের উন্নয়নের জন্যে 1977-78 সনে এ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। 5 রাজ্যের 20 জেলার 126 ব্লকের অনুর্বর অঞ্চলে এ কর্মসূচী কার্যকর করা হয়েছে। এর প্রধান উদ্দেশ্য মরু অঞ্চলের প্রসার প্রতিহত করা। এজন্য এমন সব প্রকল্পের সঙ্গে মরু অঞ্চলকে যুক্ত করতে হবে যাতে মরু অঞ্চলের ও স্থানীয় প্রাকৃতিক সম্পদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। এ উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর জন্য 1981 সনের মার্চ পর্যন্ত 37·81 কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। এ অর্থ প্রধানত ফসল সংগ্রহ, গ্রামীণ বিদ্যুতিকরণ ও পশুপালন খাতে ব্যয় করা হয়েছে। এ কর্মসূচী রূপায়ণে কেন্দ্রীয় সাহায্যের পরিমাণ 1977-78 ও 1980-81 সনে যথাক্রমে 610 কোটি টাকা ও 798·34 কোটি টাকা। 1981-82 সনের জন্য ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ 800 কোটি টাকা।

7. ইনটিগ্রেটেড রুরাল ডেভেলপমেণ্ট প্রোগ্রাম (আই-আর-ডি-পি)

আই-আর-ডি-পি 1980 সনের 2 অক্টোবর থেকে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে কার্যকর করা হয়।

ভারতের 35 কোটি লোক দারিদ্র্য রেখার নিম্নে। এদের মধ্যে 30 কোটি লোকের বাস গ্রামাঞ্চলে। এরা ভূমিহীন কৃষক, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক জমির মালিক, গ্রামীণ কারুশিল্পী ও অন্যান্য শ্রমজীবী। আই-আর-ডি-পির প্রধান উদ্দেশ্য গ্রামীণ আয় বৃদ্ধি করা এবং এ উদ্দেশ্যে কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা। এজন্য প্রয়োজন অধিকতর দক্ষতার সঙ্গে স্থানীয় শ্রম ও জমি এবং বীজ, সার, জল ও সূর্যালোকের সুপরিকল্পিত ব্যবহার। তাছাড়া পশুপালন, ডেয়ারী, বন, মৎস ও রেশম কীট চাষের উন্নয়নসাধন দ্বারা কৃষির উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করা। এ কর্মসূচীর এ সমস্ত বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রয়েছে। ফসল উৎপাদনের পর তার রক্ষণাবেক্ষণ

ও বাজারকরণের উপরও গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সংক্ষেপে, এমন কৃষি শিল্প কমপ্লেক্স গড়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে, যাতে গ্রামীণ ক্ষেত্রে চাকরির সুযোগ, শ্রম দক্ষতা, উৎপাদনশীলতা ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার বৃদ্ধি পায় এবং গ্রামের অতি সাধারণ মানুষও সমাজ সচেতন হয়ে উঠতে পারে ও সাধারণ কৃষকেরাও আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সুযোগ গ্রহণ করে স্বয়ম্ভরতার দিকে অগ্রসর হতে পারে।

ষষ্ঠ পরিকল্পনা

ষষ্ঠ পরিকল্পনায় আই-আর-ডি-পির রূপায়ণের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে।

(i) জেলাগুলিকে ব্লকে ভাগ করে প্রত্যেক জেলার জন্য একটি পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন নক্সা রচনা করা। এ সমস্ত নক্সা স্থানীয় সম্পদের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে রচিত হবে।

(ii) ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকেরা যাতে কৃষিকার্যের উন্নয়ন সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যাদির সুযোগ গ্রহণ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা। এ উদ্দেশ্যে এক্সটেনসন এজেন্সিগুলিকে ফলপ্রসূ কর্মসূচী রচনা করতে হবে।

(iii) গ্রামীণ গৃহস্থ ক্ষেত্রে যারা দরিদ্রদের মধ্যে দরিদ্রতম, বিশেষত যারা তপশীলী জাতি ও তপশীলী উপজাতিভুক্ত, তাদের দারিদ্র্য রেখার ঊর্ধ্বে নিয়ে আসার জন্য বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করা। এ কর্মসূচী ধাপে ধাপে কার্যকর করতে হবে। এ ব্যাপারে গ্রামসভাকে জড়িত করতে হবে।

(iv) মধ্য ও তৃতীয় ক্ষেত্রে যে সম্পদ রয়েছে তার পূর্ণ ব্যবহারের জন্য একটি নক্সা রচনা করা। এতে যে সমস্ত ব্লক ও পরিবার অন্তর্ভুক্ত হবে তাদের ট্রেনিং ও বাজারকরণ সম্পর্কে সাহায্য করা।

(v) জেলা, ব্লক ও গ্রামস্তরের কর্মসূচী রূপায়ণের এজেন্সিগুলিতে যাতে দরিদ্র গ্রামবাসীদের প্রতিনিধিরা যোগদান করতে পারে সেজন্য উপযুক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করা। এর ফলে সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও তা রূপায়ণ সম্ভব হবে।

(vi) জেলা ও ব্লকের ক্রেডিট পরিকল্পনায় সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের যে গোষ্ঠীর উন্নতি বিধানের জন্য কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তার ক্রেডিটের অভাব মিটাবার জন্য ক্রেডিট সংক্রান্ত কর্মসূচীও গ্রহণ করতে হবে।

(vii) প্রত্যেক জেলায় একটি মাত্র এজেন্সির মাধ্যমে আই-আর-ডি-পি

রূপায়িত করতে হবে। এ সমস্ত এজেন্সিগুলিকে তাদের কর্মসূচী রচনা ও কার্যকর করার জন্য যথোচিত স্বাধীনতা দেয়া সঙ্গত হবে।

(viii) ব্লক সংস্থাগুলিকে শক্তিশালী করে তুলতে হবে যাতে তারা সর্বনিম্ন স্তরেও দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে সমর্থ হয়।

(ix) আই-আর-ডি-পির মূল উদ্দেশ্য দরিদ্রতম পরিবারদের উপর দারিদ্র্যের চাপ লাঘব করা। এ উদ্দেশ্যে এসব পরিবার যাতে উৎপাদনমূলক সম্পদ, প্রযুক্তিবিদ্যা ও শ্রমদক্ষতার অধিকারী হয় তার চেষ্টা করা এবং তাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জন্মনিয়ন্ত্রণ ও বাসগৃহের প্রতিও দৃষ্টি দেয়া।

আই-আর-ডি-পির লক্ষ্য 1980-85 সনের মধ্যে মোট 5011 ব্লকের প্রতি ব্লকে গড়ে 3000 পরিবারকে নির্দিষ্ট কারণের জন্য সাহায্য দেয়া। গ্রাম ও কুটির শিল্প এবং সেবা সেক্টরের সঙ্গে যুক্ত পরিবারবর্গও এ কর্মসূচীর সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে। এজন্য ষষ্ঠ পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় খাতে 750 কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। এস-এফ-ডি-এ, আই-আর-ডি ও এস-এল-পি-পি কর্মসূচীগুলির পরিবর্তে আই-আর-ডি-পি প্রত্যেক ব্লকে কাজ করবে। ফলে ক্ষুদ্র সেচের জন্য আর পৃথক ভরতুকি দেয়ার ব্যবস্থা করার প্রয়োজন হবে না। স্ব-নিয়োগের জন্য যুব সম্প্রদায়কে প্রশিক্ষণ দেয়া আই-আর-ডি-পির অঙ্গীভূত হবে।

কাজকর্ম

আই-আর-ডি-পি নতুন 20-দফা কর্মসূচীভুক্ত হওয়াতে এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে; কাজকর্মও বেশ সাফল্য লাভ করেছে। নিম্নের তালিকা থেকে তা বোঝা যাবে।

আই-আর-ডি-পি ঃ কাজকর্ম, 1980-83

	1980-81	1981-82	1982-83 (ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত)
1. সাহায্যপ্রাপ্ত পরিবারের সংখ্যা (লক্ষ)	27·90	28·30	22·00
2. সাহায্যপ্রাপ্ত তপশীলী জাতি ও তপশীলী উপজাতির সংখ্যা (লক্ষ)	7·00	10·00	9·00

	1980-81	1981-82	(ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত) 1982-83
3. কেন্দ্রীয় সাহায্য (কোটি টাকা)	82·58	128·44	176·17
4. রাজ্য সরকারগুলির সাহায্য (কোটি টাকা)	153·9	255·8	190·0
5. আর্থিক সংস্থাগুলির সাহায্য (কোটি টাকা)	199	470	380·72 (জানুয়ারী 1983 পর্যন্ত)
6. জনপ্রতি ভরতুকি (টাকা)	550	928	1036
7. জনপ্রতি ক্রেডিট (টাকা)	741	1713	2076
8. জনপ্রতি বিনিয়োগ (টাকা)	1249	2641	2112
9. ভরতুকি ক্রেডিট অনুপাত	1·35	1·84	2·00

1982-83 সনে তপশীলী জাতি ও তপশীলী উপজাতিদের 41·5 শতাংশ লোক এ কর্মসূচী দ্বারা উপকৃত হয়েছে। 1980-81 ও 1981-82 সনে এ শতাংশ ছিল যথাক্রমে 24·9 ও 35·11। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে রয়েছে আর্থিক সংস্থাগুলির সাহায্য এবং জনপ্রতি ভরতুকি, ক্রেডিট ও বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি। কর্মসূচীতে ভরতুকি ক্রেডিট অনুপাত ধরা হয়েছিল 1:2 ; 1982-83 সনে এ অনুপাত লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব হয়েছে।

সমালোচনা

আই-আর-ডি-পি যে সমস্ত সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখ্য :

(i) কর্মসূচী রচনা ও রূপায়ণের মধ্যে যে প্রস্তুতি দরকার তার অভাব।

(ii) সংযোগ ও পরিবহনের অভাব যার ফলে সুদূর গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্কের

শাখা-অফিস খোলা বা প্রতি ব্লকে 600 পরিবারকে সাহায্য দেয়া অসম্ভব বললেই চলে।

(iii) গ্রামীণ দারিদ্র্য এত গভীর যে ঋণ নেয়ার ন্যূনতম যোগ্যতাবিশিষ্ট দরিদ্রের সংখ্যা অতি অল্প।

(iv) এজেন্সিগুলির উন্নয়নমূলক কাজকর্ম রূপায়ণে আগ্রহের অভাব।

(v) ব্যয় ও বিনিয়োগের দিক থেকে কর্মসূচী সাফল্য অর্জন করলেও দরিদ্র শ্রেণীকে দারিদ্র্য রেখার উর্ধ্বে নিয়ে আসার মূল লক্ষ্যে কতটা পৌছানো সম্ভব হয়েছে সে সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে।

8. ন্যাশনাল স্কীম অব ট্রেনিং অব রুরাল ইয়ুথ ফর সেলফ-এমপ্লোয়মেন্ট

এ স্কীম 1979 সনের আগষ্টে চালু করা হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য গ্রামীণ যুবকদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যাতে তারা প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও কারিগরি জ্ঞান অর্জন করে স্ব-নিয়োগের পথে বেকারত্ব দূর করতে সক্ষম হয়। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় এ স্কীমের জন্য 5 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য ষষ্ঠ পরিকল্পনায় গৃহীত প্রস্তাব

দ্রুত গ্রামোন্নয়নের জন্য ষষ্ঠ পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত কর্মসূচী গ্রহণের প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

(i) কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা।

(ii) দুর্বলশ্রেণীদের সম্পদ ও আয় বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন স্তরভুক্ত আর্থিক ক্ষেত্রগুলির উন্নয়ন সাধন।

(iii) দরিদ্র শ্রেণীর কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এরূপ কর্মসূচী গ্রহণ করা যাতে তারা স্ব-নিযুক্ত হতে পারে অথবা মজুরীর পরিবর্তে স্ব-নিয়োগের পথে দক্ষতা অর্জন করতে পারে।

(iv) গ্রামীণ দরিদ্র শ্রেণীর জন্য গৃহীত উন্নয়নমূলক কর্মসূচী রূপায়ণের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত পরিমাণ ক্রেডিটের ব্যবস্থা করা।

(v) বাজারকরণের উন্নয়ন সাধন দ্বারা দরিদ্র কৃষি-উৎপাদকদের মুনাফা অর্জনের পথ প্রশস্ত করা।

(vi) যে সময় ক্ষেতখামারের কাজে মন্দা থাকে সে সময় যাতে দরিদ্র গ্রামবাসীরা ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লোয়মেণ্ট প্রোগ্রামের মারফত এ অবসর সময়ের জন্য চাকরি পায় তার ব্যবস্থা করা।

(vii) তাদের ন্যূনতম আর্থিক অভাব মিটাবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(viii) স্ব-নিয়োগ, এন-আর-ই-পির জন্য প্রকল্প ও স্থানীয় সম্পদের বৈজ্ঞানিক ব্যবহার সংক্রান্ত রণকৌশল রচনা করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণাগার ও কারিগরি সংস্থাগুলিকে জড়িত করা।

১১ সমবায় ও অন্যান্য কৃষি ঋণদান সংস্থা

সমবায় ঃ অর্থ, উদ্দেশ্য ও রূপ

সেলিগম্যানের মতে, সমবায়ের পারিভাষিক অর্থ, উৎপাদন ও বণ্টন ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় আবদ্ধ না হওয়া ও সমস্ত প্রকার মধ্যজীবীর উচ্ছেদ সাধন। এল. এস. গর্ডন ও সি. ও' ব্রায়েন, 'কো-অপারেশন ইন ডেনমার্ক' নামক পুস্তকে সমবায়ের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলছেন যে, সমবায় এক ধরনের অর্থনৈতিক সংস্থা যেখানে কয়েকজন লোক ব্যবসায়ের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে একসঙ্গে কাজ করে। তারা সুনির্দিষ্ট ব্যবসায় সম্পর্কিত আইন-কানুন দ্বারা পরিচালিত হয়। সমবায়ের বৈশিষ্ট্য ঃ (i) এটি একটি সম অর্থনৈতিক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ কতিপয় ব্যক্তির সংস্থা ; (ii) সংস্থাটি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছামূলক ; (iii) এ সংস্থা শিক্ষামূলক প্রভাবের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে, মুনাফামুখী নয় ; (iv) সমবায়ের অর্থনৈতিক দিকের মত নৈতিক দিকও সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

কার্যতঃ, সমবায় প্রথা অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্ন স্তরে, যেমন, উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগ, প্রয়োগ করা যেতে পারে। অর্থনৈতিক মূল্য ছাড়া সমবায়ের মানবিক ও রাজনৈতিক মূল্যও আছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সমাজ-সেবার জন্য সমবায় সংগঠনের উপযোগিতা বর্তমানে সব দেশেই স্বীকৃত। ধনতন্ত্রের ধনবণ্টনের বৈষম্য, সমাজতন্ত্রের ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ— এ দু'এর বাড়াবাড়ির হাত থেকে একমাত্র সমবায় প্রথাই সমাজকে রক্ষা করতে পারে বলে অনেকে মনে করেন। ম্যাকলাগান কমিটির মতে সমবায় প্রথায় বিভক্ত ও ক্ষমতাবিহীন মানুষ অপর দশজনের সঙ্গে সহযোগিতা করে নৈতিক উন্নতিসাধন দ্বারা ও পারস্পরিক সাহায্যে সাধ্যমত ধনী বা ক্ষমতাশীল মানুষদের অনায়াসলভ্য পার্থিব সুখসুবিধার অধিকারী হতে ও নিজের প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ সাধন করতে পারে। শক্তির একতা ও যুক্ত কর্মপ্রচেষ্টায় যা প্রকাশ পাবে তা "উন্নততর ব্যবসায়, উন্নততর কৃষিকার্য ও উন্নততর জীবনযাপন"।

আন্দোলনের ক্রমবিকাশ

কৃষকদের ঋণের বোঝা লাঘব করার জন্য জমি ব্যাঙ্ক গঠনের সম্ভাবনা সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান করে রিপোর্ট দেয়ার জন্য মাদ্রাজ সরকার ফ্রেডেরিক নিকল্‌সনকে নিযুক্ত করেন। 1897 সনে নিকল্‌সন তাঁর রিপোর্টে কৃষিঋণ দূর করার জন্য ভারতে সমবায় প্রথা প্রচলন করার সুপারিশ করেন। 1901 সনে লর্ড কার্জন ভারতে সমবায়ের সম্ভাবনা সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য স্যার এডওয়ার্ড ল'র সভাপতিত্বে একটি কমিটি নিযুক্ত করেন। এ কমিটির সুপারিশ অনুসারেই 1904 সনে কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটিস এ্যাক্ট বিধিবদ্ধ হয়।

কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটিস এ্যাক্ট, 1904

এ এ্যাক্ট অনুসারে একই গ্রাম, শহর, জাতি বা বর্ণের প্রাপ্তবয়স্ক যে কোন দশজন একত্রে সমবায় সমিতি গঠনের অধিকারী হয়। ঋণদান সমিতিগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যথা, পল্লী ও পৌর। সদস্যদের চার-পঞ্চমাংশ কৃষিজীবী হলে সমিতিকে পল্লী সমিতি বলা হয়, অন্যথায় তা পৌর সমিতির সংজ্ঞায় পড়ে। পল্লী সমিতির দায় নিঃসীম। পৌর সমিতিরা নিজেদের অভিপ্রায় অনুযায়ী নিজেদের দায় ঠিক করার অধিকারী। পল্লী সমিতিদের সাধারণত সমস্ত মুনাফা মজুত তহবিলে রেখে দিতে হয়। পৌর সমিতিদের মুনাফার এক-চতুর্থাংশ মাত্র মজুত তহবিলে রাখতে হয়। প্রত্যেক প্রদেশে সমবায়ের কাজ তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একজন রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত করা হয়। সমবায় আন্দোলনকে উৎসাহিত করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কতগুলি বিশেষ সুবিধা মঞ্জুর করা হয়। যেমন, আয়কর, ষ্ট্যাম্প কর, রেজিষ্ট্রেসন ফি রদ প্রভৃতি। সমবায় সমিতিদের প্রথম তিন বছর বিনা সুদে শর্তাধীন 2000 টাকা পর্যন্ত ঋণ দিতে সরকার প্রতিশ্রুত হয়।

এ এ্যাক্ট বিধিবদ্ধ হওয়ার ফলে সমবায় আন্দোলন যথেষ্ট প্রসার লাভ করে। 1906-07 সনে সমবায় সমিতির সংখ্যা ছিল 843। 1911-12 সনে সমিতির সংখ্যা দাঁড়ায় 8177।

সমবায় সমিতিগুলির উন্নতি আশাতীত হলেও 1904 সনের এ্যাক্টের অনেক অসুবিধা দেখা দেয়। তাছাড়া এ এ্যাক্ট শুধু ঋণ দেয়ার জন্য বিধিবদ্ধ হয়। উৎপাদন, বণ্টন প্রভৃতির জন্যও সমবায় সমিতি গঠন করার প্রয়ো-

জনীয়তা দেখা দেয়। এ সমস্ত অসুবিধা দূর করার জন্য 1912 সনে কো-অপারেটিভ সোসাইটিস এ্যাক্ট প্রণয়ন করা হয়।

কো-অপারেটিভ সোসাইটিস এ্যাক্ট, 1912

এ এ্যাক্ট দ্বারা অঋণদান সমবায় সমিতিগুলিকে স্বীকার করে নেয়া হয়। তাছাড়া তিন রকম কেন্দ্রীয় সমিতিকেও স্বীকৃতি দেয়া হয়। যথা, (1) ইউনিয়ন, প্রাথমিক সমিতি সহ; (2) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক; ও (3) প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক। পল্লী ও পৌর সমিতি নামে যে শ্রেণীবিভাগ ছিল তা বাতিল করে সীমাবদ্ধ ও নিঃসীম দায়যুক্ত সমিতি এ দু'ভাগে সমিতি-গুলিকে ভাগ করা হয়। যে সমস্ত ঋণদান সমিতির অধিকাংশ সদস্য কৃষি-জীবী সে সমস্ত সমিতিগুলিকে নিঃসীম দায়যুক্ত সমিতি বলে গণ্য করা হয়। নিঃসীম দায়যুক্ত সমিতিগুলিকে লভ্যাংশ ঘোষণা করার অধিকার দেয়া হয়।

1912 এ্যাক্টের ফলে সমবায় আন্দোলন আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে। 1910-11 সন থেকে 1914-15 সন পর্যন্ত, অর্থাৎ, 5 বছরে, সমবায় সমিতির সংখ্যা হয়েছিল 12 হাজার, সদস্য সংখ্যা 5·5 লক্ষ ও কার্যকর মূলধন 5·48 কোটি টাকা। 1939-40 সনের শেষে সমিতির সংখ্যা হয় 237 হাজার, সদস্য সংখ্যা 60·8 লক্ষ ও কার্যকর মূলধন 107·10 কোটি টাকা।

ম্যাকলাগনে কমিটি, 1914

সমবায় আন্দোলনের আশাতীত সাফল্যের পাশাপাশি দেখা দেয় নানা জটিলতা ও অসুবিধা। এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ করার জন্য 1914 সনে স্যার এডওয়ার্ড ম্যাকলাগানের সভাপতিত্বে একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। 1915 সনে কমিটি রিপোর্ট পেশ করে। কমিটির রিপোর্টের ফলে বিভিন্ন প্রদেশে প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়।

1919 সনের গভার্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট থেকে 1939 সন পর্যন্ত সমবায় আন্দোলনের ইতিহাস

1919 সনের রিফর্ম এ্যাক্ট দ্বারা সমবায়কে প্রাদেশিক বিষয়ভুক্ত করা হয়। প্রাদেশিক সরকারগুলি সমবায় আন্দোলনের উন্নতির জন্য নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করে। 1921 সন থেকে সমবায় সমিতির সংখ্যা বেশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। 1929 সনের বিশ্বব্যাপী মন্দার ফলে এ বৃদ্ধি কিছুটা ব্যাহত হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া কর্তৃক কৃষিঋণ বিভাগ স্থাপন, কয়েকটি প্রদেশে গ্রামোন্নয়ন আন্দোলন ও 1937 সনে বিভিন্ন প্রদেশে

কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কারণে সমবায় আন্দোলন আবার শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

1939-45

1939 সনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ স্থরু হয়। যুদ্ধের ফলে নিয়মিত প্রয়োজনীয় দীর্ঘমেয়াদী ঋণ পাওয়া দুষ্কর হয়ে ওঠে। তাছাড়া যুদ্ধের মুখে ও 1940 সনের মাঝামাঝি সমবায় ও কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কগুলি থেকে টাকা তুলে নেয়ার হিড়িক পড়ে যায়। অবশ্য শীঘ্রই এ অবস্থার অবসান ঘটে এবং সমবায় ও ব্যাঙ্কগুলির উপর আবার আস্থা ফিরে আসে। অতিরিক্ত মুনাফা রোধ করার জন্য কোন কোন প্রদেশে কনজিউমার কো-অপারেটিভ গঠনে উৎসাহ দেখা দেয়। সে সময় অনেক সমবায় বাজারকরণ সমিতিও গড়ে ওঠে।

সমবায় আন্দোলনে ঋণদান সমিতির প্রভাব অনেকটা কমে আসে। 1938-39 সনে ঋণদান সমিতির সংখ্যা ছিল 77·7 শতাংশ ও অঋণদান সমিতির সংখ্যা 9·5 শতাংশ। 1945-46 সনে তাদের সংখ্যা দাঁড়ায় যথাক্রমে 72·7 শতাংশ ও 13·4 শতাংশ। 1938-39 সনে কৃষি সম্পর্কবিহীন ঋণদান সমিতির সংখ্যা ছিল 5·5 শতাংশ ও অঋণদান সমিতির সংখ্যা 7·3 শতাংশ। 1945-46 সনে এদের সংখ্যা হয় যথাক্রমে 4·4 শতাংশ ও 9·5 শতাংশ। বিশ্বযুদ্ধের ফলে সমিতি ও সদস্য সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে। 1938-39 সনে সমিতির সংখ্যা ছিল 105·3 হাজার, সদস্য সংখ্যা 36 লক্ষ। 1945-46 সনে তাদের সংখ্যা যথাক্রমে 147·02 হাজার ও 55 লক্ষ। আদায়ী মূলধন ও মজুত অর্থের পরিমাণও প্রায় 30 শতাংশ বৃদ্ধি পায়। সে সময় সমবায় আন্দোলনের অবস্থার উন্নতি হলেও বিভিন্ন প্রদেশে উন্নতির পার্থক্য ঘটে। বোম্বে, দিল্লী, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব ও কুর্গে সমবায় আন্দোলনের যথেষ্ট উন্নতি ঘটে। অন্যদিকে বঙ্গদেশ ও সিন্ধুপ্রদেশের উন্নতি কোনমতেই উল্লেখযোগ্য বলা যায় না।

যুদ্ধোত্তর

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সমবায়ের গঠনের পরিবর্তন হয় সত্য, সার্বিক উন্নতিও ঘটে, তবে তা প্রধানত কৃষিপ্রধান। 1947-48 সনে প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল 14। কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কের সংখ্যা 5 ও প্রাথমিক জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক ও সমিতির সংখ্যা 271।

অঋণদান সমিতির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কয়েকটি বহু উদ্দেশ্যসাধক সমিতি

প্রতিষ্ঠিত হয়। অপর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা কৃষি সমিতির উদ্ভব। 1947-48 সনে এদের সংখ্যা ছিল 200। 1948-49 সনে 40,000 একর জমি সমবায়ের ভিত্তিতে চাষ-আবাদ করা হয়।

পরিকল্পনাকালীন

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলির নির্দেশিত পথে অগ্রসর হওয়ার ফলে সমবায় আন্দোলন প্রায় অব্যাহতরূপে উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে থাকে। নিম্নের তালিকা থেকে তা বুঝতে পারা যাবে।

সমবায় সমিতির বৃদ্ধি

	পরিকল্পনা					
পরিকল্পনার সুরুতে	I	II	III	IV	V	VI
সমিতির সংখ্যা (লক্ষ)	1·8	2·4	3·3	3·3	3·3	2·9
সদস্য সংখ্যা (লক্ষ)	13·7	176	342	585	734	1010
শেয়ার মূলধন (কোটি টাকা)	45	77	222	663	1226	1987
কার্যকর মূলধন (কোটি টাকা)	276	469	1312	4473	8648	19058

সূত্র : ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচার ইন ব্রীফ।

তৃতীয় পরিকল্পনার পর থেকে সমবায় সমিতির সংখ্যা প্রায় অপরিবর্তিত থাকার কারণ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া কর্তৃক রুগ্ন সমিতির সংখ্যা বৃদ্ধি করার পরিবর্তে রুগ্ন সমিতিগুলিকে সুস্থ-সমর্থ সমিতিগুলির সঙ্গে সংযুক্তকরণ নীতি গ্রহণ।

1979-80 সনের 30 জুন সমবায় সমিতিগুলির মোট সংখ্যা 2·9 লক্ষ, সদস্য সংখ্যা 1010 লক্ষ, শেয়ার মূলধন 1987 কোটি টাকা ও কার্যকর মূলধন 19058 কোটি টাকা।

উপসংহার

সমবায় আন্দোলনের অগ্রগতির সঙ্গে তার কাঠামোগত পরিবর্তনও দেখা দেয়। এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখ্য ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ ফেডারেসন গঠন ও

ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ ইউনিয়ন অব ইণ্ডিয়া স্থাপন। অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সমবায় প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর পুনর্বিন্যাস। বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে সমবায়ের অগ্রগতিতে যথেষ্ট বৈষম্য দেখা যায়। গুজরাট, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব ও তামিল-নাড়ু সমবায় ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় রূপে উন্নত। অপরদিকে আসাম, ওড়িষ্যা, রাজস্থান ও পশ্চিমবাংলা লক্ষণীয়রূপে অনুন্নত।

অনাদায়ী ঋণ সমবায় সমিতিগুলির এক মস্ত সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। 1968-69 সনে প্রাথমিক সমিতি স্তরে মোট অনাদায়ী ঋণের 39 শতাংশ বহু পুরাতন অনাদায়ী ঋণ। 1972 সনের 30 জুন এর পরিমাণ ছিল 41 শতাংশ।

সমবায় ক্ষেত্রে ভোগকারীদের সমবায় গঠন এক উল্লেখ্য প্রচেষ্টা। এ উদ্দেশ্যে চার-স্তর বিশিষ্ট একটি কাঠামো গঠিত হয়। এতে আছে জাতীয় স্তরে ন্যাশনাল ফেডারেসন, রাজ্য স্তরে ষ্টেট ফেডারেসন, জেলা স্তরে সেণ্ট্রাল সোসাইটি ও প্রাথমিক স্তরে প্রাইমারী সোসাইটি। 1979 সনের 30 জুন এ কাঠামোতে 1 ন্যাশনাল ফেডারেসন, 14 ষ্টেট কনজিউমার্স কো-অপারেটিভ ফেডারেসন, 8 ষ্টেট কনজিউমার্স মার্কেটিং-কাম-কনজিউমার্স ফেডারেসন, জেলা স্তরে 481 সেণ্ট্রাল অথবা হোলসেল কনজিউমার্স সোসাইটি ও প্রাথমিক স্তরে 16,348 প্রাইমারী কনজিউমার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি।

গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্প ক্ষেত্রেও সমবায় প্রসার লাভ করেছে। 1979 সনের 30 জুন শিল্প সমবায়ের সংখ্যা ছিল প্রায় 40000, সদস্য সংখ্যা 26 লক্ষ। 1977-78 সনে এ সমস্ত সমিতির উৎপাদন ও বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে প্রায় 262·47 কোটি টাকা ও 189·42 কোটি টাকা।

দেখা যাচ্ছে, সংখ্যা ও বহুমুখী আন্দোলনের দিক দিয়ে সমবায় দ্রুত এগিয়ে গেছে। কিন্তু গুণগতর দিক দিয়ে আন্দোলন সাফল্য লাভ করেছে বলা যায় না। পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে এর ব্যর্থতা বিশেষ লক্ষণীয়। এমনকি সমবায়ে উন্নত রাজ্যগুলিও সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। বিশেষত সমবায় ঋণদান সমিতিগুলির অনাদায়ী ঋণের বোঝা তাদের এক প্রচণ্ড সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রাইমারী মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলির প্রায় 37 শতাংশ নামে মাত্র রয়েছে। মাত্র পাঁচটি রাজ্যে সমবায় কৃষিপণ্য বাজার-করণের 80 শতাংশের অধিক কাজ হচ্ছে। সমবায় দ্বারা ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক এবং দুর্বলশ্রেণীর মানুষেরা বিশেষ উপকৃত হয়েছে বলা চলে না।

সমবায়ের অসুবিধা

সমবায়ের পথে যে সমস্ত অসুবিধা রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য :

(i) সমবায় প্রেরণা হবে স্বতঃস্ফূর্ত। কিন্তু আমাদের দেশে 1904 সন থেকেই সমবায় আন্দোলন সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় অগ্রসর হচ্ছে। সমবায় মানসিকতা কোন স্তরেই সৃষ্টি হয়নি।

(ii) সমবায় চেতনাবোধ জনসাধারণের এমনকি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও কম। সমবায় সমিতি আরো পাঁচটা ব্যবসায় সংস্থার মতই একটি, সাধারণ মানুষ এ অর্থেই তাকে গ্রহণ করেছে।

(iii) প্রশাসনগত ত্রুটিও উল্লেখ্য। এর মূলে রয়েছে সমবায় মানসিকতা-সম্পন্ন দক্ষ কর্মীর অভাব, সমবায়ের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সংযোজনার অভাব, অর্থের অভাব, অনাদায়ী ঋণের চাপ, হিসাবপত্রে কারচুপির সুযোগ, ঋণদান সমিতির উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ, রাজনৈতিক ইচ্ছা ও প্রচারের অভাব প্রভৃতি।

(iv) সমবায় সমিতিগুলি সদস্যদের ঋণ, বীজ, সার প্রভৃতি উপকরণ সরবরাহ করেই কর্তব্য শেষ বলে মনে করে। কিন্তু সে ঋণ, বীজ বা সারের যথাযথ ব্যবহার হল কিনা, ব্যবহারের পথে বাধা-বিঘ্নই বা কি বা কোথায় তা জানবার, ভাববার দায়িত্ব তাদের রয়েছে বলে তারা মনে করে না। এ কারণে সমবায় আন্দোলন উদ্দেশ্যের দিক থেকে অসম্পূর্ণ।

উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন

সমবায় আন্দোলনের মূলগত সার্বিক উন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাব রাখা যেতে পারে।

(i) বহুমুখী ঋণদান সমিতি গঠন। যাতে সমিতির সদস্যরা উৎপাদন ও অনুৎপাদন উভয় কাজের জন্য ঋণ পেতে পারে। দৈনন্দিন জীবন-ধারণের স্বচ্ছলতার ফলে তারা উৎপাদন বৃদ্ধি করতে উৎসাহিত হবে।

(ii) সমবায় বাজারকরণের উন্নয়নের জন্য পণ্যদ্রব্যের ষ্টোরেজের সুব্যবস্থা করা।

(iii) সমবায়ের মাধ্যমে আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস করা যেতে পারে। এ সম্ভাবনার দিকে লক্ষ্য রেখে সমবায় সম্পর্কিত নীতি রচনা করা বাঞ্ছনীয়।

(iv) বিভিন্ন স্তরের সমবায়গুলির মধ্যে সংযোজনার ব্যবস্থা করা যাতে প্রত্যেক স্তরের করণীয় কাজ সুনির্দিষ্ট হয়।

(v) গ্রামের দুর্বল শ্রেণীর লোকেরা যাতে সমবায়ের সুযোগ পেতে পারে সেজন্য তাদের অগ্রাধিকার দেয়া। সমবায় প্রধানত তাদেরই দ্বারা ও তাদেরই জন্য।

(vi) সমবায় আন্দোলনকে সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও আমলাতন্ত্রের হাত থেকে মুক্তি দিতে হবে ও জাতীয় সমবায় ফেডারেসনগুলিকে আরো কার্যকর করে তুলতে হবে যাতে তারা সমবায় সমিতিগুলির পরিকল্পনা ও পরিচালনায় নেতৃত্ব দিতে পারে। সমবায় আন্দোলনে সরকারকে নির্বিরোধ ও হস্তক্ষেপের মধ্যে সমদূরত্ব রক্ষা করে চলতে হবে।

(vii) সরকারের সর্বপ্রথম কর্তব্য হচ্ছে সমবায় সম্বন্ধে ভারতের ধারণা সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা ও সে ধারণা অনুযায়ী সমবায় পরিকল্পনা রচনা করে সমবায়ের নিজস্ব গণতান্ত্রিক কাঠামোর মাধ্যমে তা রূপায়িত করা। সমবায় সমিতিগুলির সদস্যদের মধ্যে চেতনা ও সমবায় পরিচালনার কাজে তাদের যোগ্যতাবোধের ধারণা জাগাতে হবে।

ষষ্ঠ পরিকল্পনা ও সমবায়

ষষ্ঠ পরিকল্পনায় সমবায়ের উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে:

(i) প্রাথমিক গ্রামীণ সমিতিগুলিকে শক্তিশালী করে তোলার জন্য কর্ম-ভিত্তিক কর্মসূচী রচনা করতে হবে যাতে তারা বহুমুখী সমিতিরূপে সমিতির সদস্যদের বিভিন্ন সমস্যা মিটাতে পারে।

(ii) গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র জনগণের দুঃখদুর্দশা লাঘব করার জন্য সমবায় সমিতিগুলি যাতে পরস্পরের কাজকর্মের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে পারে সেজন্য বর্তমান সমবায় নীতি ও কাজকর্মের পদ্ধতির প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন।

(iii) সমবায় ফেডারেল সমিতিগুলির পুনর্বিন্যাস ও একীকরণ যাতে তারা তাদের অঙ্গীভূত সমিতিগুলির মাধ্যমে কৃষি ঋণদান, উৎপাদনের উপকরণ সরবরাহ, বাজারকরণ ও অন্যান্য সেবামূলক কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে পারে।

(iv) সমবায় সমিতিগুলির পরিচালনার জন্য যোগ্য পেশাদারী কর্মী নিয়োগ ও তাদের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

ষষ্ঠ পরিকল্পনায় (1980-85) বিবিধ সমবায় স্কীমের জন্য কেন্দ্রীয়

পরিকল্পনায় মোট 330·15 কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ হয়। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলির ক্ষেত্রে এ ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হয়েছে 584·04 কোটি টাকা। অর্থাৎ, পাবলিক সেক্টর ক্ষেত্রে এ খাতে মোট ব্যয়ের পরিমাণ 914·23 কোটি টাকা। এ টাকা প্রধানত সমবায় সমিতিগুলির মূলধনের ভিত শক্তিশালী করার জন্য এবং তারা যাতে প্রয়োজনীয় ভিত-কাঠামো গঠন করতে পারে, উচ্চপর্যায়ে কাজকর্মে রত হতে পারে ও উন্নতমানের কাজকর্মের অধিকারী হতে পারে সেজন্য ব্যয় করা হবে।

কর্মসূচী

সমবায় কাঠামোর ভিত বহুমুখী প্রাথমিক গ্রামীণ সমিতিগুলি। এ সমিতিগুলির পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন। যে সমস্ত সমিতিগুলির পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে বলে দাবি করা হয় সে সমস্ত ক্ষেত্রেও সুদক্ষ পরিচালনার অভাব রয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে পূর্ণ সময়ের জন্য প্রশাসক পর্যন্ত নেই বা থাকলেও তার যোগ্যতার প্রশ্ন রয়েছে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে কর্মীরা নিয়মিত বেতন পায় না। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় এ সমস্ত সমিতিগুলির শেয়ার মূলধন বৃদ্ধি করার ও তাদের কেন্দ্রীয় সাহায্য দেয়ার প্রস্তাব রাখা হয়েছে যাতে তারা তাদের আর্থিক দুর্গতি লাঘব করতে সমর্থ হয়।

গ্রামাঞ্চলে দুর্বল শ্রেণীর জনগণ সমবায়ের সুযোগ পাচ্ছে সত্য, কিন্তু রায়ত, কৃষি শ্রমিক ও গ্রামীণ কারুশিল্পীদের অবস্থা প্রায় অপরিবর্তিত রয়েছে। বিগত তিরিশ বছর ধরে মোট কৃষি ঋণে সমবায়ের অংশ 3 থেকে 5 শতাংই চলছে। গ্রামীণ সমবায় ক্ষেত্রে তাদের সদস্য সংখ্যারও বিশেষ কোন উন্নতি দেখা যায় না। 1977-78 সনে যেখানে মোট সদস্য সংখ্যার মধ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের সংখ্যা ছিল 44 শতাংশ সেখানে তাদের সংখ্যা মাত্র 10 শতাংশ। দুর্বল শ্রেণীর মধ্যে দুর্বলতর শ্রেণী যাতে সমবায়ের সুযোগসুবিধা আরো বেশি পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে সমবায় সমিতিগুলিতে তাদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা দরকার। তাদের মধ্যে যারা দারিদ্র্য রেখার নিম্নে রয়েছে তাদের চিহ্নিত করা প্রয়োজন। তাদের আর্থিক উন্নতির জন্য সুনির্দিষ্ট ঋণদান পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। ইনটিগ্রেটেড রুরাল ডেভেলপমেণ্ট প্রোগ্রামের সঙ্গে এ পরিকল্পনার সংযোগ সাধন করার কথাও বলা হয়েছে।

সমবায় ফেডারেসন সংস্থাগুলিতে তাদের অঙ্গীভূত সমিতিদের স্বার্থ

হানি করে নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের মানসিকতা দেখা যায়। এ মানসিকতা দূর করতে হবে। যে ক্ষেত্রে রাজ্যগুলির মধ্যে পণ্যদ্রব্য বিনিময়ের সম্ভাবনা রয়েছে সে ক্ষেত্রে রাজ্য ও জাতীয় স্তরের সমবায় ফেডারেসনগুলির আন্তঃ-বাণিজ্যের প্রসার সাধনে সচেষ্ট হতে হবে। বাজারকরণ ও ভোগকারী সমবায়গুলির মধ্যে বন্ধনও শক্তিশালী করে তুলতে হবে যাতে ভোগকারী সমবায় সমিতিগুলি বাজারকরণ সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে কৃষিপণ্য সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারে। শহরাঞ্চলের ভোগকারী সমবায় সমিতিগুলির উন্নতিবিধান ও গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক সমবায় সমিতি-গুলিকে ভোগকারীদের সমবায় সমিতিগুলির উন্নয়নের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়ার কথাও ষষ্ঠ পরিকল্পনায় বলা হয়েছে। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র ও মধ্য-শ্রেণীর সমবায়গুলির উচ্চপদে যোগ্য কর্মীর অভাব মিটাবার জন্য উচ্চ বেতন, পদোন্নতির সম্ভাবনা প্রভৃতি প্রচলন করার কথা বলা হয়েছে। ডেয়ারী, মৎস্যচাষ, ক্ষুদ্র সেচ, সরকারী বণ্টন, ষ্টোরেজ ও বাজারকরণ, চিনির কারখানা, স্পিনিং মিল প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমবায়ের সম্ভাবনার কথাও পরিকল্পনায় উল্লেখ করা হয়েছে।

সমবায় ঋণদান সমিতি

সমবায় ঋণদান সমিতিগুলিকে দুটো ভাগে ভাগ করা যায়। স্বল্প ও মধ্য-মেয়াদী ঋণদান সমিতি। এর মধ্যে রয়েছে প্রথম স্তরে প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমিতি (বহুমুখী সমবায় সমিতি ও ফার্মাস সার্ভিসেস সোসাইটি সহ), জেলা স্তরে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ও শীর্ষে রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক। রাজ্য সমবায় জমি উন্নয়ন ও প্রাথমিক সমবায় জমি উন্নয়ন ব্যাঙ্কগুলি দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিয়ে থাকে।

প্রাথমিক ঋণদান সমিতি

ভারতের সমবায় আন্দোলন প্রধানত পল্লী ঋণদান সমিতিরই আন্দোলন। সংখ্যায় ও গুরুত্বে এরা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে। প্রাপ্তবয়স্ক যে কোন 10 জন লোক পল্লী ঋণদান সমিতি রেজিষ্ট্রারী করার জন্য আবেদন করতে পারে। সমিতির সদস্য সংখ্যা 100 জনের অনধিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। সাধারণত এক গ্রামে একটির বেশি সমিতি গঠন করতে দেয়া হয় না। সদস্যদের দায় সাধারণত :নিঃসীম। সমিতির কাজকর্ম গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাহ হয়। কর্মকর্তাগণ বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করে থাকেন। সমস্ত কাজকর্ম দুটি সমিতির উপর ন্যস্ত। যথা, সাধারণ সমিতি

ও ব্যবস্থাপক সমিতি। সব সদস্যই সাধারণ সমিতির সদস্য। সমিতিগুলির কার্যকর মূলধন সদস্যদের ভর্তি ফি, আমানত, শেয়ার-পুঁজি (যদি কিছু থাকে) ও মজুত তহবিলের উদ্বৃত্ত অর্থ দ্বারা গঠিত হয়। বাইরের থেকেও অর্থ সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। যেমন, অন্যান্য সমিতি এবং সরকার ও কেন্দ্রীয় আর্থিক সাহায্যকারী এজেন্সী। অর্থাৎ, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্কগুলি থেকে গৃহীত ঋণ ও আমানত। সমিতিগুলি উৎপাদন ও অনুৎপাদন কাজে এবং পূর্ব ঋণ পরিশোধ করার জন্য সদস্যদের ঋণ দিয়ে থাকে। কিস্তিবন্দীতে এ ঋণ পরিশোধ করতে হয়। একের ঋণের জন্য অপর কোন সদস্যকে জামিন হতে হয়। তাছাড়া জামিন হিসাবে নির্দিষ্ট পরিমাণ স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ঋণদানকারী সমিতির কাছে জমা রাখতে হয়। সমিতির লভ্যাংশ সাধারণত মজুত তহবিলে রাখা হয়। প্রয়োজন-বোধে সমবায় সমিতিগুলির রেজিষ্ট্রার যে কোন সমিতিকে কাজকর্ম গুটিয়ে ফেলার নির্দেশ দিতে পারেন।

1980 সনে কো-অপারেটিভ সোসাইটিস এ্যাক্ট বিধিবদ্ধ করে প্রাইমারী এগ্রিকালচারেল ক্রেডিট সোসাইটি (পি-এ-সি-এস) প্রতিষ্ঠা করা হয়। এরা গ্রাম স্তরে কাজ করে ও কৃষকদের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক রেখে চলে। সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সঙ্গে এদের যোগসূত্র আছে। পি-এ-সি-এস সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক থেকে প্রয়োজনীয় ফিনান্স পেয়ে থাকে। অল ইণ্ডিয়া রুরাল ক্রেডিট সার্ভের (1951-54) সুপারিশক্রমে ফার্মাস সার্ভিস সোসাইটিগুলি গঠিত হয়। এদের কাজ বহুমুখী। এরা সদস্যদের ঋণ দিয়ে থাকে, তাদের সঞ্চয়ে উৎসাহিত করে, কৃষিকার্যের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের ব্যবস্থা করে। অবশ্য স্বল্প ও মধ্যকালীন ঋণ দেয়ার উপরই তারা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

প্রাইমারী এগ্রিকালচারেল ক্রেডিট সোসাইটিগুলির
আমানত ও ঋণদান

(কোটি টাকা)

বছর	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81
আমানত	4·28	14·59	69·46	266·0
ঋণ	22·90	202·75	577·88	1656·0

সূত্র : আর-বি-আই, রিপোর্ট অন ট্রেণ্ড এণ্ড প্রোগ্রেস অব ব্যাঙ্কিং ইন ইণ্ডিয়া 1981-82।

1950-51 সন থেকে 1980-81 সন পর্যন্ত পি-এ-সি-এসগুলির আমানত ও ঋণদানের পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রয়োজনের তুলনায় তা সামান্য মাত্র। গ্রামীণ স্বল্পকালীন ঋণের প্রয়োজন প্রায় 5000 কোটি টাকা। সোসাইটিগুলি এর এক-তৃতীয়াংশও মিটাতে সমর্থ হয়নি।

সেণ্ট্রাল কো অপারেটিভ ব্যাঙ্কগুলি জেলা স্তরে কাজ করে। 1980-81 সনে এদের সংখ্যা 27, সদস্য সংখ্যা 36 হাজার। 1980-81 সন পর্যন্ত এদের ঋণদানের পরিমাণ 3792 কোটি টাকা।

সমবায় ক্ষেত্রে জমি উন্নয়ন ব্যাঙ্কগুলি কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প, কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়, জমি পুনরুদ্ধার প্রভৃতি কাজে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিয়ে থাকে। এরা ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক গ্রুপ ও আই-ডি-এ ফিনান্সে গঠিত বহুরকম কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প রূপায়িত করার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও পালন করে। বর্তমানে এদের সংখ্যা 19। প্রাথমিক জমি উন্নয়ন ব্যাঙ্কের সংখ্যা 893। 1979-80 সনে তাদের ঋণদানের পরিমাণ ছিল 309·0 কোটি টাকা। সে বছর পর্যন্ত তাদের অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ ছিল 1535·3 কোটি টাকা।

মন্তব্য

(i) প্রাইমারী এগ্রিকালচারেল ক্রেডিট সোসাইটি ও সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কগুলি আর্থিক ও প্রশাসনিক দিক থেকে সাধারণত দুর্বল। ফলে কৃষকদের প্রয়োজনীয় ঋণের চাহিদা মিটাবার সামর্থ্য তাদের নেই। সোসাইটিগুলির প্রায় 40 শতাংশ রুগ্ন। সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কগুলির প্রায় 50 শতাংশ দুর্বল।

(ii) ধনী কৃষকেরাই ঋণের সুযোগ পেয়ে থাকে। ক্ষুদ্র ও মধ্য কৃষকেরা কায়েমী স্বার্থের কৌশলে তাদের সঙ্গত অংশটুকু থেকেও বঞ্চিত হয়।

(iii) সমবায় আন্দোলনে আঞ্চলিক ভারসাম্যের অভাব রয়েছে। বিহার, ওড়িষ্যা, আসাম, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমবাংলা সমবায় ক্ষেত্রে অনুন্নত। সমবায়ে উন্নত মহারাষ্ট্র ও গুজরাট উন্নয়নমূলক প্রকল্পের অভাবে অর্থ বিনিয়োগ করতে সমর্থ হচ্ছে না। অপরদিকে অনুন্নত রাজ্যগুলি ফিনান্সের অভাবে নতুন প্রকল্পের কথা ভাবতে পাচ্ছে না।

(iv) সমবায় ঋণদান সংস্থাগুলিকে অর্থের জন্য প্রধানত অপরের উপর নির্ভর করতে হয়। যেমন, সরকার, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ও এগ্রি-

কালচারেল রিফিনান্স এণ্ড ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের ক্রেডিট দেয়ার ক্ষমতা সীমিত ও অনিশ্চিত।

(v) অনাদায়ী ঋণ সমবায় ঋণদান সংস্থাগুলির এক দারুণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। 1978-79 সনে প্রাইমারী এগ্রিকালচারেল ক্রেডিট সোসাইটিগুলির দীর্ঘকাল অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ মোট প্রদত্ত ঋণের 45·2 শতাংশ। ষ্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ও সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কগুলির দীর্ঘকাল অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ যথাক্রমে 8·8 ও 35·9 শতাংশ।

অন্যান্য ঋণদান সংস্থা

1. কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক

কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কগুলি কৃষকদের কৃষিকার্য ও সংশ্লিষ্ট কাজকর্মের উদ্দেশ্যে সরাসরি ও পরোক্ষে ঋণ দিয়ে থাকে। পরোক্ষে যে ঋণ দেয়া হয় তা চার শ্রেণীতে ভাগ করা যায়: (a) ফার্মাস সার্ভিস সোসাইটিস, প্রাইমারী এগ্রিকালচারেল ক্রেডিট সোসাইটিস প্রভৃতির মাধ্যমে তাদের সদস্যদের কৃষিকার্যের জন্য প্রদত্ত ক্রেডিট। (b) রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদগুলিকে বিদ্যুৎ প্রসারণের জন্য প্রদত্ত ক্রেডিট যাতে কৃষিকার্যের উদ্দেশ্যে জল তোলার পাম্পগুলিকে বিদ্যুৎ-চালিত করা সম্ভব হয়। (c) সার ব্যবসায়ীদের কার্যকর মূলধনের প্রয়োজন মিটাবার জন্য প্রদত্ত ক্রেডিট। (d) সমবায় দুগ্ধ সমিতি, মেষ প্রজনন সমবায় সমিতি প্রভৃতিকে প্রদত্ত ক্রেডিট যাতে তারা তাদের সদস্যদের দুগ্ধবতী গরু, মেষ প্রভৃতি ক্রয় করার জন্য ঋণ দিতে সমর্থ হয়।

কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কগুলি সরাসরি স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিয়ে থাকে। স্বল্পমেয়াদী ফসল-ঋণ ফসল চাষ করার জন্য দেয়া হয়ে থাকে। উৎপাদন-ঋণ সারা বছর জন্মায় এমন উদ্ভিজ্জ দ্রব্যের (চা, কফি প্রভৃতি) বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় নির্বাহ বাবদ দেয়া হয়। ঋণ পরিশোধ নিশ্চিত করার জন্য ব্যাঙ্কগুলি ঋণ দেয়ার ব্যাপারে সাধারণত অপরকে জড়িয়ে নেয়। যেমন, কফি উৎপাদনকারীদের আর্থিক সাহায্য দেয়ার পূর্বে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধ সম্পর্কে কফি বোর্ডের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নেয়া হয়। তেমনি অন্যান্য ক্ষেত্রেও, যেমন, চায়ের ক্ষেত্রে চা ব্রোকারদের সঙ্গে, ডেরিদের ক্ষেত্রে ডেরি সমিতির সঙ্গে বোঝাপড়া করে নেয়া হয়।

কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কগুলি মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ সাধারণত দীর্ঘ-

মেয়াদী কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য দিয়ে থাকে। সাধারণত 3 থেকে 15 বছরের মধ্যে এ ঋণ পরিশোধ করতে হয়। এ জাতীয় ঋণ ক্ষুদ্র সেচ, জমি উন্নয়ন, জমি যান্ত্রিককরণ, ডেরিং, পোলট্রি প্রভৃতি প্রকল্প রূপায়ণের কাজে দেয়া হয়।

1970 সনে কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কগুলি যে সমস্ত অঞ্চলের সমবায়ের ঋণ কাঠামো আর্থিক বা কর্মদক্ষতার ক্ষেত্রে অনুন্নত সে সমস্ত অঞ্চলের কৃষকদের কৃষিকার্যের জন্য পি-এ-সি-এসগুলির মারফত ফিনান্স দেয়া স্কীম গ্রহণ করে। বর্তমানে 13 রাজ্যে এ স্কীম চালু আছে। 25 ব্যাঙ্ক তাদের 695 শাখা-অফিস সহ 2725 প্রাথমিক এগ্রিকালচারেল ক্রেডিট সোসাইটিগুলির মাধ্যমে কৃষকদের ঋণ দিয়েছে।

মন্তব্য

কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কগুলি কৃষি ঋণ দেয়া ব্যাপারে যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হয় তার মধ্যে রয়েছে ব্যাঙ্ক কর্মীদের গ্রামাঞ্চলের প্রতি অনাসক্তি, গ্রামীণ ক্ষেত্রে বিনিয়োগে আগ্রহের অভাব, ও অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি।

ব্যাঙ্কের একটি গ্রামীণ ছোট শাখা-অফিস চালনা করার জন্য বার্ষিক ব্যয় প্রায় এক লক্ষ টাকা ও প্রতিটি কৃষি-ঋণ গ্রহীতার পেছনে ব্যয় বার্ষিক অন্তত 75 টাকা। এরূপ অবস্থা লাভসূচক নয়।

ভারতে গ্রামের সংখ্যা 5·75 লক্ষ। এর মধ্যে মাত্র 46000 গ্রাম কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কের সুবিধা পেয়ে থাকে। আবার এও দেখা গেছে যে, ব্যাঙ্ক-গুলির গ্রামীণ আমানতের মাত্র 58 শতাংশ গ্রামীণ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা হয়। অর্থাৎ, বাকী 42 শতাংশ গ্রামীণ আমানত শহরাঞ্চলে চলে আসে। অনুন্নত গ্রাম, দুর্বল শ্রেণী ও সম্ভাবনাপূর্ণ প্রকল্প ব্যাঙ্ক ঋণে অগ্রাধিকার পাচ্ছে না, এর দৃষ্টান্তও রয়েছে। ব্যাঙ্কগুলির অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবার ফলে বিনিয়োগ অব্যাহত রাখা ব্যাঙ্কগুলির পক্ষেও যথার্থ সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

2. রিজিওনাল রুরাল ব্যাঙ্ক (আর-আর-বি)

রিজিওনাল রুরাল ব্যাঙ্কস এ্যাক্ট 1976 অনুযায়ী এ ব্যাঙ্কগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রাথমিক অবস্থায় পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্কগুলিকে রুরাল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব দেয়া হয়। তারা আর-আর-বির মূলধনের 35 শতাংশের অধিকারী। অপর অংশীদারদের মধ্যে রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার (50 শতাংশ)

ও সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলি (15 শতাংশ)। যে সমস্ত অঞ্চল অর্থনীতির দিক দিয়ে অনুন্নত, ব্যাঙ্কিঙের সুযোগ থেকে বঞ্চিত প্রধানত সে সমস্ত অঞ্চলেই রুরাল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

1981 সনের 15 ডিসেম্বর পর্যন্ত 106 আর-আর-বি 18 রাজ্যের 180 জেলায় কর্মরত ছিল। 1984 সনের 31 মার্চ আর-আর-বিগুলির মোট আমানতের পরিমাণ প্রায় 698 কোটি টাকা। আগাম দেয়ার পরিমাণ 809 কোটি টাকা। 1984 সনের মার্চ পর্যন্ত আর-আর-বির সংখ্যা দাঁড়ায় 159। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় 270 জেলায় মোট 270 আর-আর-বি খোলার প্রস্তাব রয়েছে।

মন্তব্য

(i) ব্যাঙ্কগুলি কাজকর্মের জন্য যে সমস্ত অঞ্চল বেছে নিয়েছে কোন কোন ক্ষেত্রে তা কাজের পক্ষে অনুপযুক্ত।

(ii) ব্যাঙ্ক কর্মীদের মধ্যে সেবামূলক মানসিকতার অভাব।

(iii) ব্যাঙ্কগুলির দুর্বল শ্রেণীর প্রতি সহানুভূতি থাকার ফলে ধনী শ্রেণী তাদের সঞ্চয় এ সমস্ত ব্যাঙ্কে রাখার প্রতি শুভ মনোভাব পোষণ করে না। ফলে ব্যাঙ্কগুলির আমানতের পরিমাণ আশানুরূপ নয়।

(iv) স্বল্প সুদে ঋণ দেয়া ও অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ব্যাঙ্কগুলির কাজকর্মের প্রসার ব্যাহত হচ্ছে।

(v) ব্যাঙ্কগুলির ঋণ দেয়ার রীতিনীতি বোঝা ও মেনে চলা সাধারণ মানুষের পক্ষে কঠিন। ফলে তারা ঋণ পাবার যোগ্য হলেও ঋণের সুযোগ নিতে পারে না।

সুপারিশ

(a) কমিটি অন রিজিওনাল রুরাল ব্যাঙ্কস, জুন 1977 (দান্ত-ওয়ালা কমিটি)

কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশসমূহ :

(i) প্রতিটি আর-আর-বির কাজকর্মের ক্ষেত্র সীমিত অঞ্চলের মধ্যে আবদ্ধ থাকবে। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জনসংখ্যা 20,000 অধিক হবে না।

(ii) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীন অন্যান্য কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কগুলির সম মর্যাদায় তারা কাজ করবে।

(iii) গ্রামীণ ক্ষেত্রে যে সমস্ত আর্থিক সংস্থা কর্মরত তাদের প্রত্যেকের সুদের হার একই হওয়া সঙ্গত।

(iv) ব্যাঙ্ক কর্মীদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

(b) ওয়ার্কিং গ্রুপ অন মালটি-এজেন্সি প্রজেক্ট ইন এগ্রিকালচারেল ফিনান্স

এই গ্রুপ 1976 সনের আগস্টে গঠিত হয়। 1978 সনে গ্রুপ তার রিপোর্ট পেশ করে। রিপোর্টে বলা হয়ঃ

(i) ক্রেডিট এজেন্সীগুলির বিন্যাস আঞ্চলিক কাজকর্মের ভিত্তিতে না হয়ে ভৌগোলিক ভিত্তিতে হওয়া অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

(ii) কৃষি ও সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য ঋণ দেয়া ব্যাপারে সমবায় সমিতিগুলির মুখ্য ভূমিকা থাকা সঙ্গত। কারণ একমাত্র তাদেরই অজস্র ক্ষুদ্র ও বিক্ষিপ্ত কৃষকদের কাছে পৌঁছাবার মত সাংগঠনিক শক্তি আছে।

(iii) কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক ও রিজিওনাল রুরাল ব্যাঙ্কগুলি দরকার হলে যে সমস্ত অঞ্চলে প্রাইমারী এগ্রিকালচারেল ক্রেডিট সোসাইটিগুলি দুর্বল সেখানে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় আবদ্ধ না হয়ে নিজেরাই সরাসরি কৃষকদের ঋণ দিতে পারবে।

(iv) যে সমস্ত অঞ্চলে একাধিক কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক ও আর-আর-বি রয়েছে সে সমস্ত অঞ্চলে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা এড়াবার জন্য তারা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে গ্রামগুলিকে নিজের নিজের কর্মক্ষেত্র রূপে ভাগ করে নিতে পারে।

(v) সরাসরি ঋণদানের ব্যাপারে কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কগুলি অপেক্ষা আর-আর-বিগুলিকে অগ্রাধিকার দেয়া সঙ্গত। কারণ এদের সংগঠন গ্রাম-ভিত্তিক ও অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়বহুল।

(vi) কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কগুলি বর্তমানে আর-আর-বিগুলিকে যে রিফিনান্সের সুবিধা দিচ্ছে তা অক্ষুণ্ণ রাখা যেতে পারে।

(vii) ধনী ও মধ্য শ্রেণী কৃষকদের আর-আর-বি প্রদত্ত ঋণদানের সুবিধা থেকে সরিয়ে নেয়া সঙ্গত।

(viii) যে সমস্ত অঞ্চলে আর-আর-বি ও কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কগুলি কৃষকদের ঋণ দেয় ও জমি উন্নয়ন ব্যাঙ্কগুলিও 'টার্ম লোন' বা মেয়াদী ঋণ

দিয়ে থাকে সে সমস্ত অঞ্চলে আর-আর-বি ও কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কগুলি স্বল্প-মেয়াদী ঋণের শর্তানুযায়ী কৃষকদের মেয়াদী ঋণ দিতে পারে।

(ix) গ্রাম বা গ্রামভাবাপন্ন অঞ্চল যেখানে সমবায় সমিতির সংখ্যার অভাব নেই, তাদের কাজকর্মও সুষ্ঠু, সে সমস্ত অঞ্চলে কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক ও আর-আর-বিগুলির শাখা-অফিস খোলা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যাতে সমবায় সমিতিগুলিকে এদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নাবতে না হয়।

(c) কমিটি টু রিভ্যু দি এরেঞ্জমেন্টস ফর ইনষ্টিটিউসন্যাল ক্রেডিট ফর এগ্রিকালচারেল এণ্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট

এ কমিটি 1981 সনে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার কাছে তার চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করে। কমিটির সুপারিশ প্রধানত ঃ

(i) আর-আর-বিগুলিকে গ্রামীণ অঞ্চলে শাখা-অফিস খোলার জন্য অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(ii) কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কগুলির গ্রামীণ শাখা-অফিসের কাজকর্মের যে অংশ আর-আর-বিগুলি গ্রহণ করতে সক্ষম তা তাদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে।

আর-আর-বিগুলির কাজকর্মের উন্নতির জন্য অন্যান্য যে সমস্ত সুপারিশ করা হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঃ

(i) ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্ব আর-আর-বিগুলির উপর ন্যস্ত করা।

(ii) ঋণ দেয়া ব্যাপারে যে সমস্ত জটিল পদ্ধতি ও শর্ত রয়েছে (যেমন, স্বল্প ঋণের ক্ষেত্রে কোলাটারেল সিকিউরিটি বা তৃতীয় ব্যক্তির গ্যারেন্টি) তা সহজ করা।

(iii) গ্রাম পঞ্চায়েত, বাজার সমিতি প্রভৃতি সংস্থাগুলির অর্থ আমানত-রূপে আর-আর-বিগুলির কাছে জমা রাখা।

(iv) অনাদায়ী ঋণের টাকা উদ্ধার করার ব্যবস্থা।

(v) যে কাজের বা প্রকল্পের জন্য ঋণ দেয়া হয় তার সাফল্যের জন্য সরকারকে উদ্যোগী হওয়া।

3. ফার্মাস সার্ভিস সোসাইটি (এফ-এস-এস)

ফার্মাস সার্ভিস সোসাইটিগুলি 1973-74 সনে প্রথম গঠিত হয়।

উদ্দেশ্য :

(i) কৃষকদের, বিশেষত ক্ষুদ্র কৃষক, ঋণ দেয়া এবং সমষ্টিগতভাবে তাদের সেবা ও কারিগরি জ্ঞানের প্রশিক্ষণ দেয়া যাতে তারা বিভিন্ন প্রকার কৃষি সম্পর্কিত কাজকর্ম দক্ষতার সঙ্গে করতে সমর্থ হয়।

(ii) সোসাইটি একটি বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হবে। বোর্ডের নির্বাচিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ দুর্বল শ্রেণীভুক্ত হবে।

(iii) সোসাইটির কাজের ক্ষেত্র একটি ব্লক বা 10,000 লোকসংখ্যা নিয়ে গড়ে উঠবে যাতে সোসাইটিগুলি দক্ষ নিয়ামক ও কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন কর্মী নিয়োগ করে সীমিত ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল হয়ে উঠতে পারে।

ন্যাশনাল কমিশন অন এগ্রিকালচার পরিকল্পিত গ্রামীণ ক্রেডিট সম্পর্কিত "কমপ্রিহেনসিভ স্কীম-এ" এফ-এস-এসগুলিকে বিশেষ দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এর ফলে এদের প্রথম ছয় বছর 2520, পরবর্তী বছরগুলিতে 1000 হারে সার্ভিস সোসাইটি গঠন করতে হবে। সম্প্রতি আর-আর-বিগুলির সঙ্গে এফ-এস-এসগুলিকে যুক্ত করার জন্য রাজ্য সরকারগুলিকে উদ্যোগ নিতে বলা হয়েছে।

4. এগ্রিকালচারেল রিফিনান্স এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন (এ-আর-ডি-সি)

1963 সনে এগ্রিকালচারেল রিফিনান্স এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন স্থাপিত হয়। কর্পোরেশনটির মূলধন 5 কোটি টাকা। ভারত সরকার একে সুদমুক্ত 5 কোটি টাকা ঋণ দেয়। তাছাড়া এর আমানত, বণ্ড ও ডিবেঞ্চার মারফত অতিরিক্ত 100 কোটি টাকা তোলার অনুমতি রয়েছে। এ-আর-ডি-সির উদ্দেশ্য যে ক্ষেত্রে ল্যাণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ব্যাঙ্কগুলি ঋণ দিতে সমর্থ নয় (যেহেতু ঋণের চাহিদার পরিমাণ বেশি বা অতি দীর্ঘমেয়াদী) সে ক্ষেত্রে ঋণ দেয়া। এ-আর-ডি-সি কৃষকদের সরাসরি ঋণ দেয় না। যে সমস্ত সংস্থা কৃষকদের কৃষিকার্যের উন্নয়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিয়ে থাকে তাদের ফিনান্স করা যাতে তারা তাদের ঋণের চাহিদা মিটাতে সক্ষম হয়। এ-আর-ডি-সি সেণ্ট্রাল ল্যাণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ব্যাঙ্ক, স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, সিডিউল ব্যাঙ্ক ও কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলির ডিবেঞ্চার ক্রয় করে থাকে। রিফিনান্স ছাড়াও অনুমোদিত সমবায় সমিতিগুলিকে তারা 25 বছরে পরিশোধনীয় শর্তে ঋণ ও আগাম দিয়ে থাকে। আই-ডি-এ ও

আই-বি-আর-ডি প্রকল্প রূপায়ণে যে ঋণ দিয়ে থাকে তা এ-আর-ডি-সির মারফত বন্টিত হয়। এ সংস্থা 1979-80 সনে 412 কোটি টাকা রিফিনান্স করে।

1982 সনের জুলাইতে এ-আর-ডি-সিকে এনএ-বি-এ-আর-ডির সঙ্গে এক করে দেয়া হয়েছে।

ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফর এগ্রিকালচার এণ্ড রুরাল ডেভেলপমেণ্ট (এনএ-বি-এ-আর-ডি)

1982 সনে এনএ-বি-এ-আর-ডি প্রতিষ্ঠিত হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার এগ্রিকালচারেল ক্রেডিট ডিপার্টমেণ্ট ও রুরাল প্ল্যানিং এণ্ড ক্রেডিট সেলকে এর সঙ্গে যুক্ত করে দেয়া হয়। তাছাড়া এগ্রিকালচারেল রিফিনান্স এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশনও এর অঙ্গীভূত হয়।

এনএ বি-এ-আর-ডির মূলধনের পরিমাণ 100 কোটি টাকা। এ মূলধনে ভারত সরকার ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া উভয়েরই সম পরিমাণ অংশ রয়েছে। এনএ-বি এ-আর-ডি ঋণ দেয়ার জন্য ভারত সরকার, ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক, মালটিন্যাশনাল কর্পোরেশন ও ন্যাশনাল রুরাল ক্রেডিট (লংটার্ম অপারেশনস) এণ্ড স্ট্যাবিলাইজেসন ফাণ্ড থেকে টাকা পেতে পারে। তার বণ্ড ও ডিবেঞ্চার ইস্যু করার অধিকারও আছে। বর্তমানে (30 জুন, 1983) এনএ-বি এ-আর-ডির সম্পদের পরিমাণ 4517 কোটি টাকা। বিভিন্ন রাজ্যে এর 16 আঞ্চলিক অফিস ও তিনটি সাব-অফিস আছে।

এনএ-বি-এ-আর-ডি একটি শীর্ষ সংস্থা। এর কাজকর্মের মধ্যে আছে ঃ

(i) গ্রামীণ ক্রেডিট সম্পর্কিত উন্নয়ন, নীতি নির্ধারণ, পরিকল্পন, কর্মসূচী গ্রহণ, সংযোজন, সতর্ককরণ, গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ জ্ঞাপন প্রভৃতি যাবতীয় কাজ।

(ii) সমবায়, রিজিওন্যাল রুরাল ব্যাঙ্ক এবং কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কগুলিকে তাদের মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেয়ার প্রয়োজন মিটাবার জন্য রিফিনান্স করা।

(iii) সমবায় ও রিজিওন্যাল রুরাল ব্যাঙ্কগুলির কাজকর্ম পরীক্ষা করা এবং এ সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শ দেয়া।

(iv) ইনটিগ্রেটেড রুরাল ডেভেলপমেণ্ট প্রোগ্রামভুক্ত ব্যক্তিরা যাতে ঋণ পেতে পারে সেজন্য ক্রেডিট ব্যবস্থার প্রসার সাধন।

(v) অনাদায়ী ঋণ সমস্যার সমাধান করা।

(vi) ঋণদান সরবরাহ ও সেবার সঙ্গে যুক্ত করা যাতে উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি পায়।

কাজকর্ম

এনএ-বি-এ-আর-ডি অনুন্নত অঞ্চলের উন্নয়নের প্রতি বিশেষ আগ্রহশীল। 1982-83 সনে দশটি অনুন্নত অঞ্চল ও যে সমস্ত রাজ্যে ব্যাঙ্কের অভাব রয়েছে সে সমস্ত অঞ্চল ও রাজ্যে এনএ-বি-এ-আর-ডির ঋণদানের পরিমাণ 296 কোটি 80 লক্ষ টাকা। সে বছর সমগ্র দেশে এর ঋণদানের পরিমাণ ছিল 702 কোটি 69 লক্ষ টাকা। অর্থাৎ, অনুন্নত অঞ্চলে উন্নয়নের জন্য ঋণদানের পরিমাণ মোট ঋণদানের 42·2 শতাংশ। অনুন্নত অঞ্চল অথবা উন্নত ব্যাঙ্কিং-এর সুবিধা থেকে বঞ্চিতরূপে চিহ্নিত রাজ্যগুলি হচ্ছে উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, ওড়িষ্যা, পশ্চিমবাংলা, আন্দামান ও নিকোবার, আসাম ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল, রাজস্থান, জম্মু ও কাশ্মীর এবং হিমাচল-প্রদেশ। 1982-83 সনে এনএ-বি-এ-আর-ডি থেকে উত্তরপ্রদেশ সর্বাপেক্ষা বেশি সাহায্য পায় (106 কোটি 30 লক্ষ টাকা); তারপর যথাক্রমে বিহার (47 কোটি 40 লক্ষ টাকা), মধ্যপ্রদেশ (44 কোটি 60 লক্ষ টাকা) এবং রাজস্থান (43 কোটি 54 লক্ষ টাকা)। পশ্চিমবাংলা যে সাহায্য পেয়েছে তার পরিমাণ 8 কোটি 8 লক্ষ টাকা।

এনএ-বি-এ-আর-ডি রিফিনান্স স্কীমে ক্ষুদ্র সেচকে সর্বাধিক সাহায্য দিয়ে থাকে। 1982-83 (জুন) সনে যে 3492 কোটি টাকা ঋণ দেয়া হয় তার 54 শতাংশ দেয়া হয় ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়নের জন্য। জমি উন্নয়ন, কৃষিকার্য যান্ত্রিককরণ, বনোন্নয়ন, স্টোরেজ প্রভৃতির উদ্দেশ্যেও রিফিনান্স দেয়া হয়ে থাকে। ক্ষুদ্র সেচের পরেই কৃষিকার্য যান্ত্রিককরণ প্রাধান্য পেয়ে থাকে।

এনএ-বি-এ-আর-ডি সমবায় অর্থসংস্থা ও রাজ্য সরকারগুলিকেও অর্থ সাহায্য করে থাকে। রাজ্য সরকারগুলিকে যে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেয়া হয় তা সমবায় ক্রেডিট সংস্থাগুলির শেয়ার মূলধন বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে। স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কগুলিকে এবং রাজ্য সরকারগুলিকে যে স্বল্পমেয়াদী ঋণ দেয়া হয় তার উদ্দেশ্য বিবিধ। যথা, ফসল বাজারকরণ, সার ক্রয় ও বণ্টন, হস্তচালিত তাঁতশিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি ও তাঁতবস্ত্র বাজারকরণ, অন্যান্য কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়ন সাধন প্রভৃতি। সাধারণত সুদের হার ব্যাঙ্ক

অন্যান্য ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানগুলিকে কৃষি ঋণ সম্পর্কে পরামর্শ দেয়া। স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত কৃষি ঋণদান ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের কাজকর্ম মোটামুটি পরামর্শদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। স্বাধীনতার, বিশেষত কয়েকটি ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়ার পর তাকে সমবায় ঋণ সংগঠনের ও সমবায়ের মারফত গ্রামীণ ক্ষেত্রে ঋণ দেয়ার অধিকতর দায়িত্ব নিতে হয়।

1951 সনের আগস্টে ব্যাঙ্ক একটি "কমিটি অব্ ডাইরেকসন" নিযুক্ত করে। এরই ফলপ্রসূ অল ইণ্ডিয়া রুরাল ক্রেডিট সার্ভে। এই সার্ভে (1954) প্রস্তাব করে :

(i) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার প্রথম ও প্রধান কাজ সর্বস্তরে সমবায় ঋণদান ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে তোলার জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলিকে উৎসাহিত করা।

(ii) কৃষি ঋণ দেয়া ব্যাপারে যে সমস্ত সাংগঠনিক ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে তা দূর করা, ঋণদান নীতি যুক্তিযুক্ত করা ও তা কার্যকর করার জন্য পরিচালন ও প্রশাসনগত দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

(iii) ব্যাঙ্ক থেকে উৎপাদন ও বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে ফিনান্স পাওয়া সম্বন্ধে সমবায় ঋণদান সমিতিগুলিকে সুনিশ্চিত করা।

(iv) সমবায় ব্যাঙ্কগুলির কর্মসূচী রূপায়ণের নীতির পুনর্বিন্যাসে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা যাতে সমবায় ঋণদান উৎপাদনমুখী হতে সমর্থ হয়।

ব্যাঙ্ক সরাসরি কৃষি ঋণ দেয় না। সে পরোক্ষে ঋণ দিয়ে থাকে ও তা বিভিন্ন মেয়াদী এবং বিশেষ কাজে ও বিশেষ শর্তে। যথা,

(i) স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কগুলিকে ঋতুগত কৃষিকর্ম ও বাজারকরণের জন্য ব্যাঙ্ক রেটের 2 শতাংশ কম সুদে স্বল্পমেয়াদী ঋণ দেয়া

(ii) স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কগুলিকে বিশেষ কৃষিকার্যের উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্ক রেটের $1\frac{1}{2}$ শতাংশ কম সুদে মধ্যমেয়াদী ঋণ দেয়া।

(iii) ন্যাশনাল এগ্রিকালচারেল ক্রেডিট (স্ট্যাবিলাইজেসন) ফাণ্ড থেকে স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কগুলিকে মধ্যমেয়াদী ঋণ দেয়া যাতে তারা খরা ও বন্যা প্রভৃতি বিশেষ প্রয়োজনের সময় স্বল্পমেয়াদী কৃষি ঋণকে মধ্যমেয়াদী ঋণে রূপান্তরিত করতে পারে।

(iv) সেণ্ট্রাল ল্যাণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ব্যাঙ্কগুলির কিছু ডিবেঞ্চার ক্রয়

রেটের কম হয়। মধ্যমেয়াদী ঋণ সাধারণত অনুমোদিত কৃষিকার্যের উদ্দেশ্যে, স্বল্পমেয়াদী ঋণ মধ্যমেয়াদী ঋণে রূপান্তরিত করার উদ্দেশ্যে ও সমবায় চিনির কারখানার বা প্রোসেসিং সমিতির শেয়ার ক্রয় করার উদ্দেশ্যে দেয়া হয়।

এনএ-বি-এ-আর-ডি ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক ও ইণ্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেণ্ট এসোসিয়েসনের আর্থিক সাহায্য ও সহযোগিতায় বিবিধ প্রকল্প রূপায়ণ করে থাকে। এনএ-বি-এ-আর-ডির সঙ্গে সংমিশ্রণের পূর্বে এ কাজ এগ্রিকালচারেল রিফিনান্স এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশনের উপর ন্যস্ত ছিল।

এনএ-বি-এ-আর-ডি কি উদ্দেশ্যে কত টাকা বণ্টন করেছে নিম্নের তালিকা থেকে তা বোঝা যাবে।

অর্থ বণ্টন (কোটি টাকা)

উদ্দেশ্যে	1981-82	1982-83	1983 সনের 30 জুন পর্যন্ত
অতি ক্ষুদ্র সেচ	252 (42)	244 (35)	1891 (54)
জমি উন্নয়ন	11 (2)	21 (3)	110 (3)
কৃষিক্ষেত্র যান্ত্রিককরণ	128 (21)	147 (21)	664 (19)
বাগিচা/উত্থান কর্ষণ	33 (6)	27 (4)	145 (4)
স্টোরেজ ও বাজার প্রাঙ্গণ	9 (2)	13 (2)	144 (4)
বন	2 (-)	4 (–)	10 (–)
আই-আর-ডি-পি	98 (16)	185 (26)	301 (9)
অন্যান্য	67 (11)	62 (9)	227 (7)
মোট	600 (100%)	703 (100%)	3492 (100%)

6. রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট 1934 অনুযায়ী 1935 সনে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া (ব্যাঙ্ক) ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক রূপে স্থাপিত হয়। ব্যাঙ্কের সঙ্গে যুক্ত একটি কৃষি বিভাগ স্থাপন করা হয়। এ বিভাগের কাজ সিডিউল্ড ও স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কগুলির মাধ্যমে কৃষি ঋণের ব্যবস্থা করা এবং ভারত সরকার, রাজ্য সরকার, স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ও

করে ও তাদের দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিয়ে সাহায্য করা যাতে তাদের মারফত কৃষকদের দীর্ঘমেয়াদী ঋণের সমস্যা লাঘব করা যায়।

(v) রাজ্য সরকারগুলি যাতে সমবায় ঋণদান সমিতিগুলিকে দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণ দিতে পারে সেজন্য ন্যাশনাল এগ্রিকালচারেল (লং-টার্ম অপারেশনস) ফাণ্ড থেকে রাজ্য সরকারগুলিকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেয়া।

বর্তমানে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার এ সমস্ত কাজকর্ম এনএ-বি-এ-আর-ডি গ্রহণ করেছে। এর ফলে তাকে রুরাল প্ল্যানিং এণ্ড ক্রেডিট ডিপার্টমেণ্ট (আর-পি-সি-ডি) নামে একটি নতুন বিভাগ খুলতে হয়েছে। এ বিভাগ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দেখাশুনা করে।

(i) নিউ ব্যাঙ্ক স্কীম, জেলা ক্রেডিট স্কীমসহ।

(ii) অগ্রাধিকার সেক্টর ও দুর্বল শ্রেণীদের ঋণ দেয়া।

(iii) স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ও রিজিওনাল রুরাল ব্যাঙ্কগুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট 1934 ও ব্যাঙ্কিং রেগুলেসন এ্যাক্ট 1949 সম্পর্কিত বিধানগুলি মেনে চলছে কিনা তা দেখা।

(iv) এ সমস্ত ব্যাঙ্কের আমানত ও আগামের সুদের হার সম্পর্কে নির্দেশ দেয়া।

(v) চলতি ও নতুন স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ও তাদের শাখা-অফিসগুলিকে লাইসেন্স দেয়া।

(vi) এনএ-বি-এ-আর-ডিকে নির্দেশ ও সাহায্য দেয়ার জন্য তার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা।

(vii) আই-আর-ডির কর্মসূচীর উন্নতি বিধান ও গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য ব্যাঙ্কের নীতি গঠন সম্পর্কে বিশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা।

পার্থক্যসূচক সুদের হার

দুর্বল উদ্যোগী সম্প্রদায়গুলিকে ব্যাঙ্কগুলি যাতে অপেক্ষাকৃত কম সুদে ঋণ দিয়ে সাহায্য করতে পারে সে উদ্দেশ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া 1970 সনের সেপ্টেম্বরে একটি কমিটি নিযুক্ত করে। কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন ডঃ আর. কে. হাজারী, তৎকালীন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার ডেপুটি গভার্ণর। কমিটির অন্যতম কাজ ঋণ গ্রহণকারী নিম্ন আয়বিশিষ্ট গোষ্ঠীগুলিকে চিহ্নিত করা যাতে তাদের অপেক্ষাকৃত কম সুদে ঋণ দেয়া যায়। কমিটি

1971 সনের মেতে রিপোর্ট দেয়। এর ভিত্তিতে কোন্ কোন্ পরিবারকে এ স্কীমের সুযোগ দেয়া হবে তা নির্ধারণ করার দায়িত্ব সরকারকে দেয়া হয় এবং ঠিক করা হয় যে, এ সমস্ত পরিবারদের পাবলিক সেক্টরের ব্যাঙ্কগুলি 4 শতাংশ সুদে ঋণ দেবে। এ স্কীমে পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্কগুলিকে তাদের মোট আগামের এক শতাংশের অর্ধেক আগাম দিতে হবে। 1972 সনে এর পরিমাণ ছিল 20 কোটি টাকা। 1973 সনে এসব শর্তাদির কিছু পরিবর্তন করা হয়।

পার্থক্যসূচক সুদ স্কীমের বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপঃ

(i) গ্রামাঞ্চলের সে সমস্ত পরিবার এ স্কীমের সুযোগ পাবে যাদের বার্ষিক আয় 2000 টাকার বেশি নয় এবং শহর ও শহরভাবাপন্ন অঞ্চলে যাদের বার্ষিক আয় 3000 টাকার বেশি নয়। পূর্বে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 1200 টাকা ও 2000 টাকা।

(ii) পরিবর্তিত শর্তে এস-এফ-ডি-এ ও এম-এফ-এ-এলভুক্ত জেলা-গুলিতেও এ স্কীমের সুযোগ দেয়া হচ্ছে। এর ফলে এ স্কীমের অধীন জেলার সংখ্যা 163 থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 265 হয়েছে। অর্থাৎ, ভারতের মোট জেলা সংখ্যার তিন-চতুর্থাংশ।

(iii) জমিজমার পরিমাণ সম্পর্কিত শর্তের কোন পরিবর্তন করা হয়নি। পূর্বের মতই তা সেচ জমিজমার ক্ষেত্রে 1 একর ও সেচের সুবিধা পাচ্ছে না এমন জমিজমার ক্ষেত্রে 2·5 একর পর্যন্ত।

(iv) ঋণের উচ্চতম পরিমাণ কার্যকর মূলধনের ক্ষেত্রে 500 টাকা থেকে বৃদ্ধি করে 1500 টাকা এবং মেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে 2500 টাকা থেকে বৃদ্ধি করে 5000 টাকা করা হয়।

1977 সনের জুনে ভারত সরকারের নির্দেশক্রমে পার্থক্যসূচক সুদ স্কীমে দেয় ঋণের অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ গ্রাম ও গ্রামভাবাপন্ন অঞ্চলের পরিবারদের জন্য পৃথক করে রাখা হয়। তাছাড়া তপশীলী জাতি ও তপশীলী উপজাতিদের জন্য নির্দিষ্ট হয় অন্তত এক-তৃতীয়াংশ। হরিজনদেরও বিশেষ সুবিধা দেয়া হয়। তাদের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র শিল্প ও লাভজনক কাজকর্মে নিযুক্ত হওয়ার জন্য 4 শতাংশ সুদে প্রায় 40 কোটি টাকা অর্থ সাহায্যের বরাদ্দ হয়। 1977 সনের জুন থেকে প্রাইভেট সেক্টরের ব্যাঙ্কগুলিকেও এ স্কীম স্বেচ্ছায় গ্রহণ করার সুযোগ দেয়া হয়।

পার্থক্যসূচক স্কীম বেশ সাফল্য লাভ করেছে বলা চলে। এ স্কীমে ঋণ গ্রহীতাদের একাউন্টের সংখ্যা ডিসেম্বর 1972 সনে ছিল 26000, বৃদ্ধি পেয়ে *1982* সনের জুনে দাঁড়ায় 30,84,847 আর অপরিশোধিত আগামের পরিমাণ যথাক্রমে 88 লক্ষ টাকা ও 28,066 লক্ষ টাকা।

সমবায় ব্যাঙ্ক ও রিজিওন্যাল রুরাল ব্যাঙ্কগুলিকে এ স্কীমভুক্ত করা হয়নি। এর ফলে স্বভাবতই এক্ষেত্রে এবং যেসব জেলা বা অঞ্চল এ স্কীমের সুযোগ থেকে বঞ্চিত সেসব ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

নিম্নে পার্থক্যসূচক সুদ স্কীমের অগ্রগতির একটি চিত্র দেয়া হল।

পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে পার্থক্যসূচক সুদ স্কীমের অগ্রগতি

ডিসেম্বরের শেষে	ঋণগ্রহীতাদের একাউন্টের সংখ্যা (হাজার)	অপরিশোধিত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)	পূর্ববর্তী বছরের শেষে প্রদত্ত মোট আগামে পার্থক্য-সূচক সুদে প্রদত্ত আগামের শতাংশ
1972	26	0·87	0·02
1975	465	20·99	0·31
1978	1620	90·00	0·74
1979	2076	139·80	0·98
1980	2510	193·56	1·04
1981	2925	257·50	1·17
1982	3344	311·50	1·17

সূত্র: রুরাল প্ল্যানিং এণ্ড ক্রেডিট ডিপার্টমেন্ট, আর-বি-আই।

12 সমবায় কৃষি

শ্রেণীবিভাগ

সমবায় কৃষি চার প্রকার : (1) সমবায় উন্নততর কৃষি, (2) সমবায় রায়ত কৃষি, (3) সমবায় যুক্ত কৃষি, ও (4) সমবায় যৌথ কৃষি।

(1) সমবায় উন্নততর কৃষি। সমবায় উন্নততর কৃষি প্রথার বৈশিষ্ট্য : জমির, মালিক স্বাধীনভাবে তার জমি চাষ করে। তবে সমবায় সমিতি যে পরিকল্পনা করে দেয় তা সে মেনে চলে। সমিতি থেকে সে ক্রেডিট, বীজ, সার ও বিশেষ বিশেষ সেবার সুবিধা পায়। যেমন, বাজারকরণ, যন্ত্রপাতি ব্যবহার প্রভৃতি।

(2) সমবায় রায়ত কৃষি। এ প্রথার বৈশিষ্ট্য : সমবায় সমিতি জমির ইজারা নেয়। তারপর সমবায়ের প্রত্যেক সদস্যকে জমির এক একটি অংশ পৃথক পৃথক ভাবে ইজারা দিয়ে দেয়া হয়। এজন্য তাদের সমবায়কে নির্দিষ্ট হারে খাজনা দিতে হয়। সমবায় তাদের কৃষিকার্যের জন্য ক্রেডিট, বীজ, সার, কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ প্রভৃতি সেবার দায়িত্ব নেয়। তারা যে ফসল উৎপাদন করে তার মালিকানা তাদের। তবে সমবায় তাদের ফসল বাজার-করণের ব্যবস্থা করে দিতে পারে। সমবায়ের নীট মুনাফা সদস্যদের মধ্যে তাদের সমবায়কে দেয় খাজনার অনুপাতে বণ্টন করে দেয়া হয়।

(3) সমবায় যুক্ত কৃষি। এ প্রথার বৈশিষ্ট্য : সমিতির সদস্যরা স্বেচ্ছায় তাদের জমি একীভূত করে। একটি কেন্দ্রীয় পরিচালক কমিটির উপর পরিচালনার দায়িত্বভার ন্যস্ত থাকে। অবশ্য জমির মালিকানার কোন ইতর-বিশেষ হয় না। সদস্যরা তাদের জমির অংশের অনুপাতে লভ্যাংশ পেয়ে থাকে।

(4) সমবায় যৌথ কৃষি। এ প্রথার বৈশিষ্ট্য : জমি রাষ্ট্রের ; চাষীরা সেখানে শ্রমিক মাত্র। তারা শ্রমের জন্য মজুরী পায়। তাছাড়া উদ্বৃত্ত উৎপাদনের অংশও মজুরীর ভিত্তিতে তাদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হয়। জমি চাষের যাবতীয় উপকরণের উপর সব সদস্যদের সমান অধিকার।

পরিচালনার দায়িত্ব সাধারণত নির্বাচিত পরিচালক সমিতির উপর ন্যস্ত থাকে।

মন্তব্য ঃ সমবায় যুক্ত কৃষির সমর্থনে

সমবায় উন্নততর কৃষি প্রথাতে স্থায়িত্বের অভাব রয়েছে। যে কোন কৃষক যে কোন সময়ে এ সমবায়ের সদস্য হতে পারে, সদস্যপদ থেকে ইস্তফাও দিতে পারে। সমবায় রায়ত কৃষি প্রথা জমিহীন কৃষকদের পক্ষে উপযোগী। পতিত জমি পুনরুদ্ধার করে অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক বা জমিহীন কৃষকদের দ্বারা এ প্রথায় চাষআবাদ করা যেতে পারে। সমবায় যৌথ কৃষি কম্যুনিষ্ট দেশগুলির জনগণতান্ত্রিক সামাজিক কাঠামোর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ; ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামোতে এ প্রথা অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

সব দিক দিয়ে বিচার বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, ভারতের পক্ষে সমবায় যুক্ত কৃষি প্রথাই বাঞ্ছনীয়। কারণ ঃ

(i) এ প্রথায় কৃষকেরা স্বেচ্ছায় সমিতিতে যোগদান করতে পারে ; কোন বাধ্যবাধকতা নেই। যেমন বাধ্যবাধকতা আছে সমবায় যৌথ কৃষি-ক্ষেত্র প্রথায়।

(ii) জমির মালিকানায় হস্তক্ষেপ করা হয় না।

(iii) অথচ সমস্ত সদস্যদের জমি একত্র করে, সকলের গোবাদি পশু প্রভৃতি একসঙ্গে খাটিয়ে কৃষিকার্য করা যায়।

(iv) একীভূত জমি একক রূপে পরিচালিত হয়।

(v) সদস্যরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন দ্বারা পরিচালক কমিটি গঠন করার সুযোগ পায়।

(vi) প্রত্যেক সদস্য তার জমি ও শ্রমের পরিমাণের ভিত্তিতে উদ্বৃত্ত উৎপাদনের অংশের অধিকারী হয়।

(vii) সদস্যদের যুক্ত ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রম বিনিয়োগে উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা অনেক বেশি।

(viii) পতিত জমিতে আবাদ করা, জমি ক্ষরণ রোধ করা, জমি সংরক্ষণ ও সেচের ব্যবস্থা করা একমাত্র সমবায় যুক্ত প্রচেষ্টাই ভারতের মত গণতান্ত্রিক সমাজে ও আবহাওয়ায় সম্ভব হতে পারে।

বিপক্ষে

সমবায় যুক্ত কৃষি প্রথা সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। এ প্রথায় জমি

একীভূত করা হয় বটে, তবে তা যুক্ত সম্পত্তি বলে গণ্য হয় না। জমির মালিকেরা জমি খাটাচ্ছে বলে লভ্যাংশ পায়। অর্থাৎ, তারা জমির খাজনা ও অপরের শ্রমলব্ধ ফসলের অংশবিশেষ উভয়ই ভোগ করে। এ প্রথা সামন্ত প্রথারই পৃথক রূপ মাত্র।

জি. মিরড্যালের মতে, এ জাতীয় সমবায় কৃষি প্রথা বর্গাদারদের মজুর-শ্রমিকে পরিণত করার এক অভিনব কৌশল। এর ফলে অনুপস্থিত জমিদারদের সুবিধা হচ্ছে। তারা শ্রম না দিয়েও ভাল মুনাফা নিচ্ছে। অথচ চাষীদের শ্রম ও সরকারের সাহায্য ও সমর্থনে তাদের জমির উৎপাদন ও মুনাফা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ব্যাপারে তাদের শ্রম, ঝুঁকি বা অতিরিক্ত মূলধন বিনিয়োগ কোন কিছুরই দায়িত্ব নিতে হচ্ছে না। তাছাড়া তাদের জমি সমবায় কৃষির সঙ্গে যুক্ত হওয়াতে জমি সংস্কারের নিয়ন্ত্রণের আওতা থেকে মুক্ত থাকছে। তাই অনেকের মতে সমবায় যুক্ত কৃষি জয়েন্ট স্টক কোম্পানিরই সামিল, যার প্রকৃত অর্থ পুঁজিবাদী কৃষিকার্য।

সমবায় কৃষির সমর্থনে

(1) সমবায় কৃষির ফলে বৃহদায়তন কৃষিকার্য সম্ভব হবে। অর্থাৎ, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তিবিদ্যা দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

(2) বৃহদায়তন কৃষিকার্যের ফলে সমবায়ের ভিত্তিতে গ্রামীণ শিল্প, সেচ, রাস্তাঘাট প্রভৃতির উন্নয়ন ও প্রসার সাধন সম্ভব হবে। গ্রামীণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো আধুনিক রূপ নেবে।

(3) ফলে ছদ্মবেশী বেকারের সংখ্যা হ্রাস পাবে। অগণিত গ্রামীণ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ ঘটবে। উৎপাদন কাজে স্থানীয় প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে।

(4) সরকারের পক্ষে পৃথক পৃথক ভাবে অসংখ্য কৃষকদের সাহায্য করা অসুবিধাজনক। সমবায় কৃষি গঠিত হলে তাদের মাধ্যমে কৃষকদের ক্রেডিট, বীজ, সার, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি দিয়ে সাহায্য করা সরকারের পক্ষে সহজ হবে।

বিরুদ্ধে

(1) বৃহদায়তন কৃষিকার্যের ফলে কৃষি উৎপাদন কৃষক-মালিক কর্তৃক ক্ষুদ্রায়তন কৃষিকার্যের তুলনায় বৃদ্ধি পাবে কিনা এ বিষয় মতভেদ রয়েছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এমনও প্রমাণিত হয়েছে যে, জমির আয়তন বৃদ্ধি পেলে

হেক্টর প্রতি উৎপাদন হ্রাস পায়। তাছাড়া ভারতীয় মাটিতে, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশে বৃহদায়তন কৃষিকার্যের সুফল সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। ব্যক্তিগত মালিকানা ও তত্ত্বাবধানে কৃষকেরা কৃষিকার্যে যে উৎসাহ পাবে তা অন্য কোন প্রথায় সম্ভব কিনা এ সহজ জিজ্ঞাসা এ সন্দেহই ঘনীভূত করে।

(2) বৃহদায়তন উৎপাদন সম্পর্কে যে সমস্ত প্রচলিত অর্থনৈতিক সুবিধার কথা বলা হয় কৃষিক্ষেত্রে তা কতটা প্রযোজ্য সে সম্বন্ধেও প্রশ্ন রয়েছে। বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা প্রসঙ্গে 'ওভারহেড' ব্যয় হ্রাসের সমর্থনে যে সমস্ত কথা বলা হয়ে থাকে সেবা সমবায়ের মাধ্যমে ও যুক্ত প্রচেষ্টায় সেচ, সার, গোবাদি পশু প্রভৃতির সুযোগ স্বল্প ব্যয়ে ক্ষুদ্র কৃষকেরা ব্যক্তিগতভাবেও তা পেতে পারে।

(3) কৃষিকার্য যান্ত্রিককরণের ফলে কৃষি বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধির আশঙ্কা উপেক্ষা করা যায় না। ক্ষুদ্রায়তন জমিতে উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা, রাসায়নিক সার, উচ্চফলনশীল বীজ, সারা বছর জল সরবরাহ ব্যবস্থা, বন্যা নিরোধ, কীটনাশক দ্রব্যাদির প্রয়োগ প্রভৃতি দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধি যে সম্ভব আমাদের দেশের মাটিতে তা আজ পরীক্ষিত। অথচ এজন্য বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধির কোন ঝুঁকি নিতে হচ্ছে না।

(4) গ্রামীণ বেকার সমস্যার মোকাবিলা করার একমাত্র পথ কৃষির সহযোগী কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রগুলির প্রসার সাধন। যেমন, কৃষি-ভিত্তিক শিল্প, রাস্তাঘাট নির্মাণ, সেচের প্রসার সাধন, বাজারকরণের উন্নয়ন প্রভৃতি। বৃহদায়তন কৃষিকার্যের ফলে এ প্রসার যেমন প্রায় অসম্ভব, ক্ষুদ্রায়তন কৃষি-কার্যের ফলে তেমনি তা সম্ভব।

ব্যর্থতা

সমবায় কৃষিক্ষেত্রে সাড়া জাগাতে সমর্থ হয়নি। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সমবায় কৃষি সংগঠনের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। আশা করা গিয়েছিল যে, তৃতীয় পরিকল্পনার শেষাশেষি বেশ কিছু পরিমাণ অঞ্চলে সমবায় কৃষি প্রথায় কৃষিকার্য হবে। 1960 সনের সেপ্টেম্বরে ওয়ার্কিং গ্রুপ অন কো-অপারেটিভ ফার্মিং পাইলট প্রকল্পরূপে 320 সমবায় কৃষি গঠন করার প্রস্তাব রেখেছিল। সমবায় কৃষি সংগঠনে উৎসাহ দেয়ার জন্য সরকারের দিক থেকেও ঋণ ও অনুদানসহ অন্যান্য বহু প্রকার সাহায্যের ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু কোন

কিছুই তেমন ফলপ্রসূ হয়নি। 1970 সনে 2 শতাংশের মত কৃষক সমবায় কৃষির সঙ্গে যুক্ত ছিল। তারা মোট আবাদী জমির 0·4 শতাংশ চাষ করেছে।

ব্যর্থতার কারণ

সমবায় কৃষির ব্যর্থতার কারণ:

(i) সমবায় কৃষির উদ্যোক্তা সরকার। এতে বিশেষ উৎসাহিত হয় ধনী ও অনুপস্থিত জমিদাররা, যারা জমির উচ্চতম সীমার আইনের তাড়নায় ও নিশ্চিত মুনাফার আশায় তাদের জমি সমবায় কৃষির সঙ্গে যুক্ত করে। অনেকের মতে জমি স্বত্বের আমূল পরিবর্তন দ্বারা চাষীদের হাতে জমির মালিকানা তুলে না দেয়া পর্যন্ত সমবায় কৃষি প্রথা সাফল্য লাভ করতে সক্ষম হবে না।

(ii) আবার অনেকের মতে, ব্যর্থতার কারণ সমবায় কৃষি প্রথা রূপায়ণের পেছনে দৃঢ় রাজনৈতিক প্রচেষ্টার অভাব। তদুপরি কোন গণতান্ত্রিক দেশের কৃষকই তার জমিটুকু অপরের হাতে তুলে দিতে সম্মত নয়। "নিজের জমি" এ বোধ ও স্বাধীনভাবে চাষ-আবাদ করার গণতান্ত্রিক অধিকার তাদের চেতনার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। এ চেতনা মুছে ফেলতে হলে চাই সরকারী শক্তির প্রয়োগ যা গণতন্ত্রে সম্ভব নয় অথবা এর উপযোগিতা সম্পর্কে ফলপ্রসূ কাজ ও প্রচারের মারফত কৃষকদের মনে আস্থা স্থাপন। মূলত সমবায়ের আদর্শ সম্পর্কে দুর্বল ধারণা, এর ফলপ্রসূতা সম্বন্ধে সন্দেহ ও প্রশাসনের সমবায়িক মানসিকতার অভাবে সমবায় কৃষির প্রসার সম্ভব হয়ে উঠছে না। প্রসঙ্গক্রমে, এক শ্রেণীর লোক আদর্শগতভাবে সমবায়-যুক্ত কৃষির বিরোধিতা করেন। তাদের বক্তব্য, এ প্রথা সামন্ত স্বার্থ কায়েম করার কৌশল মাত্র। কৃষি কাঠামোর মূল গলদ—জমি ও সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য—দূর করার হাতিয়ার সমবায় কৃষি নয়। প্রয়োজন মৌল সামাজিক বিপ্লব।

13 শিল্প

ক্ষুদ্র শিল্প কাহাকে বলে

সরকারী মতে "ক্ষুদ্র শিল্প" বলতে সে ম্যানুফ্যাকচারিং বা রিপেয়ারিং শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝায় যে ক্ষেত্রে কারখানা ও যন্ত্রপাতির উপর বিনিয়োগের সর্বোচ্চ পরিমাণ 35 লক্ষ টাকা এবং সহায়ক শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর বিনিয়োগের পরিমাণ 45 লক্ষ টাকার* অনধিক। যেসব ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ 2 লক্ষ টাকার অনধিক সেসব প্রতিষ্ঠানগুলিকে "অতি ক্ষুদ্র একক" রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে।

গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্প রূপে যাদের পৃথক করা হয়েছে তাদের মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা (i) পরম্পরাগত শিল্প। যথা, তাঁত শিল্প, খাদি ও গ্রাম শিল্প, হস্তশিল্প, গুটিপোকার চাষ ও নাড়িকেল ছোবড়া শিল্প। (ii) আধুনিক ক্ষুদ্র শিল্প, অতি ক্ষুদ্র একক ও শক্তিচালিত তাঁত শিল্প সহ। পরম্পরাগত শিল্পগুলি সাধারণত কারুশিল্প-ভিত্তিক। এসব শিল্প প্রায়ই গ্রাম বা শহর ভাবাপন্ন অঞ্চলে অবস্থিত। যন্ত্রপাতিতে এদের বিনিয়োগ স্বল্প। সাধারণত এসব শিল্পে আংশিক সময়ের জন্য কর্মসংস্থান হয়। আধুনিক ক্ষুদ্র শিল্পে শক্তিচালিত যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে জটিল কারিগরি পদ্ধতিও প্রয়োগ করা হয়। এ জাতীয় শিল্প শহরতলি বা বৃহৎ শিল্পের আশপাশে গঠিত।

গুরুত্ব

ভারতীয় অর্থনীতিতে গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্প একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলির অন্যতম উদ্দেশ্য এ জাতীয় শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ যাতে দেশব্যাপী বহু স্থানীয় লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ ঘটে, মুনাফা কেন্দ্রীভূত না হয় ও আঞ্চলিক বৈষম্য লাঘব হয়। কারু-শিল্পীদের দক্ষতা বৃদ্ধির দিকে নজর দেয়া হয়েছে যাতে তাদের তৈরী

---

* 1985-86 সনে কেন্দ্রীয় বাজেটে ঘোষিত। 1980 সনে নির্ধারিত ছিল যথাক্রমে 20 লক্ষ টাকা ও 25 লক্ষ টাকা।

দ্রব্যাদির মান ও তার ফলপ্রস্বরূপে রপ্তানি বৃদ্ধি পায়। এ উদ্দেশ্যে ঝুঁকি নেয়ার মত এক শ্রেণীর যোগ্য কর্মী সৃষ্টি করার পরিকল্পনা রয়েছে।

জাতীয় অর্থনীতিতে গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলির অবদান নিম্নরূপ ঃ

(1) 1979-80 সনে গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্প সেক্টরে পূর্ণ ও আংশিক সময়ের জন্য কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা ছিল 2 কোটি 35 লক্ষ 40 হাজার। পক্ষান্তরে এ সময়কালীন বৃহৎ ও মধ্য শিল্প ক্ষেত্রে পূর্ণ সময়ের জন্য নিযুক্ত কর্মীদের সংখ্যা অনুমিত মাত্র 45 লক্ষ।

(2) 1979-80 সনে ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরে মোট দেশীয় উৎপাদনে গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্প সেক্টরের অংশ ছিল উৎপাদনের স্থূল মূল্যে প্রায় 49 শতাংশ ও ভ্যালু এডেডের মূল্যে 51 শতাংশ।

(3) 1983-84 সনে রপ্তানি ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র শিল্প সেক্টরের স্থান মোট রপ্তানির এক-চতুর্থাংশ।

ষষ্ঠ পরিকল্পনায় গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্পকে ভারতীয় অর্থনীতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত ও আরো গতিশীল করে তোলার প্রস্তাব করা হয়েছে। 1979-80 সনে পরম্পরাগত শিল্পগুলির মোট উৎপাদনের পরিমাণ 4419 কোটি টাকা; 1984-85 সনে (ষষ্ঠ পরিকল্পনার শেষ বছর) এর মূল্য ধরা হয়েছে 7227 কোটি টাকা। 1979-80 সনে এসব শিল্পে নিয়োজিত কর্মীদের সংখ্যা 132·84 লক্ষ; রপ্তানির পরিমাণ 1175 কোটি টাকা। 1984-85 সনে অনুমিত সংখ্যা ও পরিমাণ যথাক্রমে 195.00 লক্ষ ও 1835 কোটি টাকা। 1979-80 সনে আধুনিক ক্ষুদ্র শিল্প ও শক্তিচালিত তাঁত শিল্প ক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিমাণ, কর্মসংস্থানের সংখ্যা ও রপ্তানির পরিমাণ যথাক্রমে 24885 কোটি টাকা, 78 লক্ষ ও 1050 কোটি টাকা। 1984-85 সনে এদের সংখ্যা অনুমিত যথাক্রমে 36973 কোটি টাকা, 103 লক্ষ ও 1835 কোটি টাকা।

গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্পের* দ্রুত প্রসার ও তাদের উন্নয়নের জন্য সরকারের আগ্রহের কারণ—

---

* গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্প সেক্টরে রয়েছে আনরেজিষ্টার্ড ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর ও রেজিষ্টার্ড ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরের কিছু অংশ যাদের কারখানা ও যন্ত্রপাতিতে বিনিয়োগের পরিমাণ 35 লক্ষ টাকার অনধিক (সহকারী এককে 45 লক্ষ টাকার অনধিক)।

(i) গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্প শ্রমিক প্রধান। অর্থাৎ, এ সেক্টরে কর্মসংস্থানের সুযোগ অধিক। এর উন্নয়ন ও প্রসারণের ফলে দেশের বেকার সমস্যা হ্রাস পাবে।

(ii) ক্ষুদ্র শিল্পে প্রতি একক উৎপাদনের জন্য অপেক্ষাকৃত কম মূলধনের প্রয়োজন। এসব শিল্পের উন্নয়নের জন্য বিদেশের কোন সাহায্যের প্রয়োজন নেই বললেই হয়। বলা বাহুল্য, ভারতে মূলধনের অভাব রয়েছে। বিদেশ থেকে সাহায্য প্রাপ্তির সুযোগও সীমিত।

(iii) গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্প সহজেই বিকেন্দ্রী করা চলে। বিশেষত যেসব ক্ষেত্রে বৃহৎ শিল্পের আশপাশে তা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা কম। বৃহৎ শিল্প অঞ্চল বিশেষে কেন্দ্রীভূত হয়। ফলে আঞ্চলিক বৈষম্য সৃষ্টি হয়, শ্রমিক অসন্তোষ বৃদ্ধি পায় ও প্রাকৃতিক পরিবেশ দূষিত হয়।

(iv) বৃহৎ শিল্পের ফলে অর্থনৈতিক ক্ষমতা মুষ্টিমেয় শিল্পপতিদের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়। এর ফলে মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে ব্যবধান বৃদ্ধি পায়। শ্রমিক-মালিক অসন্তোষ ও নানাপ্রকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সৃষ্টি হয়।

গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্প এ সমস্ত সমস্যা থেকে মুক্ত। স্বল্প মূলধন, স্বল্প সংখ্যক শ্রমিক, স্বল্প দক্ষতা, স্বল্প যন্ত্রপাতি ও শক্তির ব্যবহার, স্বল্প মুনাফা, স্বয়ম্ভরতা, বিকেন্দ্রী মালিকানা, শ্রমিক-মালিক সান্নিধ্য ও নির্মল প্রাকৃতিক পরিবেশ গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্পের বৈশিষ্ট্য। এ কাঠামোতে অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়া, শ্রমিক শোষণ, প্রভৃতি সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা বিশেষ স্থান পায় না।

(v) গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলির ক্ষেত্রে অব্যবহৃত স্থানীয় প্রাকৃতিক ও জনসম্পদ ও গ্রামীণ সঞ্চয়ের ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। এসব শিল্পে উদযোগ নেয়ার মত উদ্যোগী লোকের অভাব নেই। গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্প এসব উদ্যোগী মানুষের প্রতিভার বিকাশের সহায়ক হবে।

(vi) সম্পদ ও আয় বণ্টনে অসমতা হ্রাস পাবে। কারণ মুষ্টিমেয় বৃহৎ শিল্পপতিদের হাতে অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার সুযোগ সীমিত হয়ে আসবে।

(vii) গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্পের কাঠামোগত নমনীয়তা আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করতে সমর্থ হবে।

অসুবিধা

(i) ফিনান্স। গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলির ঋণ নেয়ার যোগ্যতা কম। ব্যাঙ্ক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি তাই তাদের ক্রেডিট দিতে আগ্রহ প্রকাশ করে না। তাছাড়া ক্রেডিট পাবার রীতিনীতি জটিল ও সময় সাপেক্ষ। ফলে এদের নিজস্ব সীমিত সঞ্চয়ের উপরই বেশি নির্ভর করতে হয়।

(ii) কাঁচামাল। কাঁচামালের অভাব, অনিয়মিত সরবরাহ, দামের আধিক্য ও নিম্নমানের দ্রব্য উৎপাদন গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলির অন্যতম প্রধান সমস্যা। কোন কোন ক্ষেত্রে কাঁচামাল সংগ্রহ করার ব্যাপারে তাদের বৃহৎ শিল্পগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আসতে হয়। ফলে তাদের কাঁচামাল পাওয়া আরো কষ্টকর হয়ে ওঠে।

(iii) শক্তি। দেশময় শক্তির অভাবের ফলে ক্ষুদ্র শিল্পগুলির সমস্যা আরো জটিল হয়ে উঠেছে। তাছাড়া অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে শক্তির সুযোগ প্রধানত বৃহৎ শিল্পগুলি পেয়ে থাকে। তাদের ক্ষেত্রে শক্তি সরবরাহ যৎসামান্য বলা চলে। বৃহৎ শিল্পগুলির নিজস্ব থারমাল ইউনিট বা ক্যাপটিভ জেনারেটার বসাবার মত সম্পদ আছে; ক্ষুদ্র শিল্পগুলির তা নেই। শক্তির অভাবে উৎপাদন ব্যাহত হয়, ব্যয় বৃদ্ধি পায়, চাহিদা হ্রাস পায়। ফলে মুনাফা না হওয়ার আশঙ্কা বৃদ্ধি পায়।

(iv) বাজার। বৃহৎ শিল্পগুলির সহায়করূপে যে গ্রাম বা ক্ষুদ্র শিল্প উৎপাদনে নিযুক্ত এরূপ কয়েকটি শিল্প ছাড়া সাধারণভাবে গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলির কাছে বাজারকরণ এক মস্ত সমস্যা। দূরত্ব, পরিবহন ব্যয়, চাহিদার অনিশ্চয়তা, গুদামঘরের অভাব প্রভৃতি তাদের বিক্রয়কে সাধারণত স্থানীয় বাজারের মধ্যেই আবদ্ধ রাখে।

আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতের গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্যাদির সমাদর লক্ষণীয় হলেও তার প্রভাব উৎপাদন ক্ষেত্রে তেমন প্রতিফলিত হয়নি। বাজারে মধ্যজীবীদের উপস্থিতিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। নিম্নমানের দ্রব্য ও দ্রব্যাদির মানের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির অভাবের ফলে বিস্তৃত বাজারের সুযোগ নেয়া সম্ভব হচ্ছে না।

(v) সংরক্ষণ। গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্প সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করে সরকার কিছু শিল্পক্ষেত্র তাদের জন্য পৃথক করে রেখেছে। তারা যাতে ক্রেডিটের অভাব বোধ না করে তারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। যদিও তা পর্যাপ্ত বলা

চলে না। ক্ষুদ্র শিল্পের এককের সরকারী সংজ্ঞা অতিক্রম করা মাত্রই সংশ্লিষ্ট এককটি ক্ষুদ্র শিল্পের প্রাপ্য সমস্ত বিশেষ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে হঠাৎ তাকে বৃহৎ ও সুপ্রতিষ্ঠিত মধ্য শিল্পগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আসতে হয়। ফলে ক্ষুদ্র শিল্পগুলি উন্নয়নের প্রতি বিশেষ আগ্রহান্বিত নয়।

(vi) শ্রমিক অসন্তোষ। অধুনা ব্যাপক সামাজিক অস্থিরতার ফলে ক্ষুদ্র শিল্পগুলিতেও শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। এদের ক্ষেত্রে শ্রমিক-মালিক বিরোধ মিটাবার একমাত্র পথ উভয়ের একমত হওয়া। অথচ মধ্যস্থতা ছাড়া একমত হওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি করা কঠিন।

পরিকল্পনায় প্রস্তাব

প্রথম পরিকল্পনায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সুযোগরূপে গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়নের উপর জোর দেয়া হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্প সম্পর্কিত প্রস্তাব প্রধানত কার্ভে কমিটি ও ইনডাস্ট্রিয়াল পলিসি রেজোলিউসন 1956-এর উপর ভিত্তি করে রচিত হয়। যেমন, আর্থিক সাহায্য দান, বাজারকরণের পদ্ধতি আধুনিকীকরণ, উৎপাদন ক্ষেত্র সংরক্ষণ, ভরতুকি, রিবেট প্রভৃতি দেয়া। তৃতীয় পরিকল্পনায় কর্মসংস্থানের সুযোগ ব্যাহত না করে উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন সাধনের উপর অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। চতুর্থ ও পঞ্চম পরিকল্পনায় এ সমস্ত প্রস্তাবের বিস্তৃত আলোচনা ও তা কার্যকর করার উপর জোর দেয়া হয়েছে।

ষষ্ঠ পরিকল্পনা

গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্প সম্পর্কে ষষ্ঠ পরিকল্পনার প্রস্তাব :

(i) উৎপাদন ও আয়স্তরের উন্নতিসাধন। বিশেষত কারুশিল্পীদের ক্ষেত্রে। এজন্য প্রয়োজন দক্ষতা ও আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা, উৎপাদনের মান বৃদ্ধি ও উৎপাদন-ভিত্তিক বাজারকরণ প্রভৃতি।

(ii) গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্পের অধিকতর বিকেন্দ্রীকরণ দ্বারা অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি।

(iii) বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতা প্রভৃতির পূর্ণ ব্যবহার দ্বারা ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরে উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা।

(iv) প্রশিক্ষণ ও উপযুক্ত প্রেরণার ব্যবস্থা করে বিস্তৃত উদ্‌যোগ সৃষ্টি করা।

(v) গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য উন্নয়নমুখী কাঠামো সৃষ্টি করে ক্রমে ক্রমে ভরতুকির দায় লাঘব করা।

(vi) গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্পজাত পণ্যদ্রব্যের রপ্তানির বিস্তার সাধনের জন্য অধিকতর প্রচেষ্টা।

ইনডাস্ট্রিয়াল পলিসি স্টেটমেণ্ট, 1980

জুলাই 1980 সনের ইনডাস্ট্রিয়াল পলিসি স্টেটমেণ্টে বলা হয়, সরকার দেশে এমন শিল্প কাঠামো গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর যা গ্রামীণ অর্থনীতিকে উন্নয়নমুখী করে তুলতে সমর্থ হবে। হস্তশিল্প, হস্তচালিত তাঁত, খাদি ও অন্যান্য গ্রাম শিল্পগুলির উপর অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হবে যাতে গ্রামীণ ক্ষেত্রে তারা আরো দ্রুত প্রসার লাভ করতে পারে। স্টেটমেণ্টে আরো বলা হয়েছে যে, অর্থনৈতিক ফেডারেলইজমের ধারণার বিস্তার সাধন করতে হবে। সেজন্য প্রতিটি অনুন্নত জেলায় কতিপয় নিউক্লিয়াস প্লাণ্ট স্থাপন করতে হবে যাতে যতটা সম্ভব সহায়ক এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠিত হতে পারে। এ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে ষষ্ঠ পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব রাখা হয়।

(i) গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্প ক্ষেত্রের উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর সঙ্গে অন্যান্য আঞ্চলিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচী একীকরণ।

(ii) জেলা স্তরের সংগঠন আরো কার্যকর ও ফলপ্রসূ করার জন্য এর পুনর্বিন্যাস।

(iii) প্রযুক্তিবিদ্যা ও দক্ষতার উন্নতিসাধন এবং বিস্তৃতভাবে এর সুযোগ গ্রহণ করা।

(iv) কাঁচামালের সরবরাহ বৃদ্ধি করা। আবশ্যিক কাঁচামালের মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলা যাতে এরূপ কাঁচামালের অভাবের সম্মুখীন হতে না হয়।

(v) আর্থিক সংস্থাগুলির ফাণ্ড শক্তিশালী করে তোলা যাতে বিশেষ করে কারুশিল্প, গ্রাম শিল্প ও অতি ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির অর্থের অভাব না হয়। সুদের হার হ্রাস করার প্রস্তাবও রয়েছে।

(vi) দেশে ও বিদেশে উৎপাদন-ভিত্তিক বাজারকরণ সংস্থা গঠন করা।

(vii) কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের একান্ত উৎপাদনের জন্য উৎপাদন ক্ষেত্র সংরক্ষণ। তাদের কতিপয় নির্বাচিত উৎপন্ন দ্রব্য ক্রয় করার বাধ্যবাধকতাও সরকারকে গ্রহণ করতে হবে।

(viii) সহায়ক শিল্পের কার্যকর উন্নয়নসাধন।

(ix) অতি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নের জন্য সমবায় সংগঠনের শক্তি বৃদ্ধি ও প্রসার সাধন।

(x) যথাযথ নীতি নির্ধারণ ও মূল্যায়নের সুবিধার জন্য নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান ভিত সৃষ্টি করা।

নীতি রূপায়ণ

(i) **শিল্প ও অঞ্চলের যুক্ত উন্নয়ন**

শিল্প ও অঞ্চলের যুক্ত উন্নয়নের কাজ শুরু হয়েছে। 'শিল্প', 'সেবা' ও 'ব্যবসায়'-কে আই-আর-ডি কর্মসূচীভুক্ত করা হয়েছে। আই-আর-ডি কর্মসূচী দেশের সমস্ত ব্লকে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। প্রতি বছর প্রতি ব্লকের 600 পরিবারকে এ কর্মসূচীর আওতায় আনা হবে। আশা করা যায় ষষ্ঠ পরিকল্পনাকালীন প্রায় 25 লক্ষ পরিবার গ্রামীণ শিল্প গঠনের জন্য সাহায্য পাবে। আরো 25 লক্ষ পরিবার স্ব-নিয়োগের জন্য 'সেবা' সেক্টরে অনুরূপ সাহায্য পাবে।

(ii) **জেলা স্তরে সাংগঠনিক ব্যবস্থা**

1980 সনের মার্চের মধ্যে 392 জেলাব্যাপী 382 ডিস্ট্রিক্ট ইনডাস্ট্রিজ সেণ্টার গঠনের অনুমোদন দেয়া হয়। উদ্দেশ্য যাতে একই স্থান থেকে সেবা ও সাহায্যের সুযোগসুবিধা পরিবেশন করা সম্ভব হয়। এদের কাজকর্ম আশানুরূপ হচ্ছে না বলে সরকারের ধারণা।

(iii) **প্রতিষ্ঠানগত ফিনান্স**

গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্প সেক্টর প্রধানত কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক, কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, রিজিওনাল রুরাল ব্যাঙ্ক ও স্টেট ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশন থেকে ঋণ পেয়ে থাকে। তাদের ঋণ পেতে যাতে অসুবিধা না হয় সেজন্য গ্রামীণ ও গ্রামভাবাপন্ন শহরে ব্যাঙ্কের শাখা-অফিসের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কগুলি থেকে ঋণ পাওয়া ব্যাপারে এ সেক্টরকে 'অগ্রাধিকার' সেক্টরের তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এ সমস্ত কারণে গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্পে ঋণের সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে।

(iv) **উপযুক্ত প্রযুক্তিবিদ্যা, গবেষণা, উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ**

গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্প সেক্টরের জন্য যে প্রযুক্তিবিদ্যার কথা ভাবা হয়েছে তা কর্মসংস্থানের পরিপন্থী হবে না। শিল্প কাঠামোর পরিবর্তনের ফলে উৎপাদন-

শীলতা বৃদ্ধি পাবে। গবেষণা ও উন্নয়ন বিষয়ক দায়িত্ব বিভিন্ন বোর্ড ও সংস্থাগুলির উপর দেয়া হয়েছে। যথা, প্রোটোটাইপ ডেভেলপমেণ্ট সেণ্টারস, যমনালাল বাজাজ রিচার্স ইনস্টিটিউট, সেরিকালচার রিসার্চ ইনস্টিটিউটস, কাউন্সিল ফর সাইন্টিফিক এণ্ড ইনডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারেল রিসার্চ প্রভৃতি। তবে এদের গবেষণালব্ধ ফল বাস্তবে বিশেষ প্রয়োগ করা হয়নি। ফলে শিল্পক্ষেত্রে এর উপযোগিতা তেমন কোন প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়নি। বর্তমানে বিভিন্ন সর্বভারতীয় বোর্ড, রাজ্য সংস্থা ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানে কারুশিল্পী, তত্ত্বাবধায়ক ও উদ্‌যোগীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গেছে, প্রশিক্ষণ আদৌ ফলপ্রসূ নয়। আবার এও দেখা গেছে যে এক শ্রেণীর লোক বৃত্তির আকর্ষণে প্রশিক্ষণে আসে, কিন্তু প্রশিক্ষণ শেষে কাজে যোগদান করে না। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে তাদের দীর্ঘকাল বেকার বসিয়ে রাখাও এর একটি কারণ।

(v) কাঁচামাল সরবরাহ

কাঁচামাল সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য "বাফার স্টক" গড়ে তোলার প্রয়োজন। কেন্দ্রে ন্যাশনাল স্মল ইনডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন ও রাজ্যগুলিতে স্মল ইনডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশনগুলির সাহায্যে ক্ষুদ্র শিল্পের কাঁচা-মালের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রয়োজন নির্ধারণ ও বণ্টনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। হস্তচালিত তাঁতের ক্ষেত্রে ন্যাশনাল হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন গঠন করার সম্ভাবনা রয়েছে।

(vi) বাজারকরণ

1979-80 সনে পরীক্ষামূলকভাবে ব্লক স্তরে একটি সেণ্ট্রাল স্কীম অব রুরাল মার্কেটিং সেণ্টারস গ্রহণ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য কারুশিল্পী ও অতি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলির বাজারকরণের প্রয়োজন মিটানো। সরকার ক্ষুদ্রায়তন সেক্টর থেকে যেসব দ্রব্য ক্রয় করবে তার সংখ্যা 379। ক্ষুদ্রায়তন সেক্টরে উৎপন্ন দ্রব্যাদি ক্রয় করা ব্যাপারে দামের সুবিধা দেয়া হয়। কিন্তু এসব বিক্ষিপ্ত সুবিধা বাজারকরণের উন্নয়নসাধনে বিশেষ কোন কাজেই আসেনি। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় তাই সমগ্র বাজারকরণ ব্যবস্থা উৎপাদক-ভিত্তিক করার জন্য প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

বিদেশীয় বাজারে গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্যাদির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করার

উদ্দেশ্যে এক্সপোর্ট প্রোমোসন কাউন্সিলগুলি রয়েছে। ক্ষুদ্রায়তন সেক্টরের স্বার্থরক্ষার জন্য পৃথক কোন কাউন্সিল নেই বটে, তবে তাদের রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য সম্প্রতি একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠিত হয়েছে।

ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির একান্ত উৎপাদনের জন্য 834 দ্রব্যকে চিহ্নিত করা হয়েছে। অবশ্য এর ফলে এসব দ্রব্যের উৎপাদন তেমন বৃদ্ধি পায়নি। হস্তচালিত তাঁত সেক্টরের একান্ত উৎপাদনের জন্য মোট 12 দ্রব্য পৃথক করে রাখা হয়েছে। কিন্তু এ ব্যবস্থা যথাযথ কার্যকর করা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে, ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির সংরক্ষণ প্রচেষ্টার পেছনে উদ্দেশ্য যাতে কালক্রমে তারা মধ্য ও বৃহৎ শিল্পগুলির প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে পারে।

(vii) **সহায়ক প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নয়ন**

সহায়ক প্রতিষ্ঠানগুলির একটি বিশেষ সুবিধা এই যে, তাদের উৎপন্ন দ্রব্য কোন না কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান ক্রয় করার শর্তে আবদ্ধ। অর্থাৎ, তাদের উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয় সমস্যা তেমন নেই। 1979 সনে পাবলিক সেক্টর আণ্ডার-টেকিং, রেলওয়েজ ও দেশরক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের সহায়ক ক্ষুদ্রায়তন প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে মোট প্রায় 150 কোটি টাকার মাল ক্রয় করেছে। অবশ্য তাদের মোট উৎপাদনের অনুপাতে এ বিক্রয়ের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য নয়। ইনডাস্ট্রিয়াল পলিসি স্টেটমেণ্টে (1980) জেলা স্তরে যে নিউক্লিয়াস প্লাণ্ট-গুলির কথা বলা হয়েছে সেসব প্লাণ্ট-এর উদ্দেশ্য যতটা সম্ভব সহায়ক এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প একক গঠন করা।

(viii) **শিল্প সমবায়**

হস্তচালিত তাঁত, নাড়কেলের ছোবড়া ও গ্রাম শিল্পগুলিতে সমবায় সমিতি রয়েছে। কিন্তু এদের মধ্যে 50-60 শতাংশ প্রায় নিষ্ক্রিয় বলা চলে। শীর্ষ সমবায়গুলিও নানা সমস্যায় জড়িত। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় এদের পুনরুজ্জীবিত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে শিল্প সমবায়গুলির কর্মসূচীর সঙ্গে সহায়ক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির উৎপাদন, কর্মসংস্থান, উৎপাদনশীলতা ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্য যুক্ত করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

(ix) **পরিসংখ্যান**

গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্প সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যান সরবরাহের সূত্র এ্যানুয়েল সার্ভে অব ইনডাস্ট্রিজ (এ-এস-আই)। এ সূত্র থেকে শুধু ফ্যাক্টরী

এ্যাক্টে রেজেষ্ট্রিকৃত ক্ষুদ্রায়তন এককগুলি সম্পর্কিত তথ্যাদি পাওয়া যায়। ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভে (এন-এস-এস) ও ইকোনোমিক এণ্ড পোপুলেসন সেনসাস এ-এস-আইর পরিপূরক নয়। ফলে ভি-এস-আইর পূর্ণ চিত্র পাওয়া সম্ভব নয়। এর কিছুটা অভাব মিটাবার জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে নিজস্ব চেষ্টার উপর নির্ভর করতে হয়। এ সমস্ত সীমাবদ্ধতার কথা মনে রেখে ষষ্ঠ পরিকল্পনায় পরম্পরাগত শিল্পগুলি সম্বন্ধে রাজ্য সরকারগুলির কাছে তাদের পরিসংখ্যান সংগ্রহকারী এজেন্সিগুলিকে আর্থিক সাহায্য দিয়ে শক্তিশালী করে তোলার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এস-আই-ডি-ওর সঙ্গে যুক্ত আধুনিক ক্ষুদ্রায়তন শিল্প সম্পর্কে কমিশনের বক্তব্য, এক্ষেত্রে সংগৃহীত তথ্যাদির বার্ষিক সংকলনের প্রয়োজন রয়েছে। তাছাড়া মাঝে মাঝে সেনসাসের ভিত্তিতে তথ্যাদি আধুনিকীকরণের জন্য নমুনার সংখ্যা 2 শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে 20 শতাংশ করা সঙ্গত।

ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের অগ্রগতি

এস-আই-ডি-ওর (স্মল ইনডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেণ্ট অর্গানাইজেসন) অধীনে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির উৎপাদন 1979-80 সনে 7200 কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 19060 কোটি টাকা হয়। অর্থাৎ, বার্ষিক বৃদ্ধির হার 9·5 শতাংশ। কর্মসংস্থানের বৃদ্ধির পরিমাণ 39·65 লক্ষ থেকে 64·60 লক্ষ। রপ্তানি বৃদ্ধির পরিমাণ 538 কোটি টাকা থেকে 1050 কোটি টাকা। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উন্নয়নের জন্য যে সমস্ত পন্থা গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে ঃ (a) একান্ত উৎপাদনের জন্য সংরক্ষিত 807 দ্রব্য ও সরকার ও সম্পর্কিত সংস্থাগুলির একান্ত ক্রয়ের জন্য 257 দ্রব্য ; (b) অতি ক্ষুদ্র এককরূপে যে সমস্ত একককে চিহ্নিত করা হয়েছে তাদের কলকারখানার উপর বিনিয়োগের পরিমাণ এক লক্ষ টাকা করা ও 50,000 কম জনসংখ্যা বিশিষ্ট শহরে অবস্থিত কলকারখানাগুলির উন্নয়নের জন্য বিশেষ প্রেরণা দেয়া ; (c) কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য সংস্থা থেকে আর্থিক সাহায্য পাবার রীতিনীতি ও শর্তাদির কড়াকড়ি হ্রাস করা ; (d) কাঁচামাল ও অন্যান্য উপকরণ আমদানি করা ব্যাপারে বিশেষ সুবিধা দেয়া ; ও (e) এক্সটেনসন সার্ভিস জোরদার করা।

শিল্পোন্নয়নের গতি ও প্রকৃতি

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পূর্ব পর্যন্ত ভারতের শিল্পোন্নয়ন কোন বিশেষ নীতি বা নির্দেশ অনুযায়ী ঘটেনি। পঞ্চাশ দশকের শুরুতে এ ধারার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। শিল্পোন্নয়ন পরিকল্পিত পথে অগ্রসর হতে থাকে। বিভিন্ন শিল্প ক্ষেত্রে প্রভূত বিনিয়োগ করা হয়। যার ফলে তৎকালে শিল্প উৎপাদন প্রায় পাঁচগুণ বৃদ্ধি পায়। শিল্প বিকেন্দ্রীকরণের ফলে বিবিধ ভোগ-দ্রব্য ও মূলধন দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব হয়। অধিকাংশ শিল্পদ্রব্য উৎপাদনে দেশ প্রায় স্বয়ম্ভর হয়ে ওঠে। এর ফলে শিল্পদ্রব্যের আমদানি ক্রমে হ্রাস পেতে থাকে। অপরদিকে রপ্তানি ক্ষেত্রেও এসব শিল্পদ্রব্যের, বিশেষত ইঞ্জিনিয়ারিং, অংশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে প্রযুক্তি-বিদ্যা ও পরিচালন দক্ষতাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিল্প গবেষণা ক্ষেত্রেও উন্নতি দেখা দেয়।

প্রথম চৌদ্দ বছর শিল্প বৃদ্ধির হার মোটামুটি স্থিতিশীল ছিল—প্রায় 8 শতাংশ। এর পর শিল্প বৃদ্ধির হারে স্থিতিশীলতার অভাব দেখা দেয়। 1966-68 সনে বৃদ্ধির প্রায় গতিরোধ হয়। 1976-77 সনে বৃদ্ধির হার 9·5 শতাংশ। কিন্তু এর পরে 1979-80 সনে তা হ্রাস পেয়ে −1·4 শতাংশ হয়। এর কারণ প্রধানত : (a) সঞ্চয় ও মূলধন গঠন হ্রাস, ফলে বিনিয়োগ হ্রাস। 1966-67—1975-76 সন পর্যন্ত (নয় বছর) প্রকৃত বিনিয়োগের গড় বৃদ্ধির পরিমাণ মাত্র 3·1 শতাংশ যেখানে পূর্ববর্তী দশ বছরে গড় প্রকৃত বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল 12·6 শতাংশ। (b) পাবলিক সেক্টরে বিনিয়োগ হ্রাস। (c) উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস। 1964-65 সনে কেন্দ্রীয় সরকারের মোট ব্যয়ের 59·4 শতাংশ উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় হয়। 1971-72 সনে এ ব্যয়ের পরিমাণ 44·6 শতাংশ ও 1973-74 সনে 46·2 শতাংশ। (d) সরকারের অর্থনৈতিক নীতির পরিবর্তন। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শুরুতে শিল্পোন্নয়নের পেছনে ছিল সরকারের 'আমদানি পরিবর্ত' নীতি কার্যকর করার দৃঢ়তা। দেশীয় বাজারের সমর্থন থাকাতে প্রথমাবস্থায় তা সম্ভব হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে শিল্পোন্নয়ন দেশের সাধারণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলতে থাকে। অর্থাৎ, শিল্পোন্নয়ন দেশের ও বিদেশের অস্থিতিশীল অবস্থার উপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠে। এর ফলে শিল্প বৃদ্ধির হারেরও পরিবর্তন ঘটতে থাকে। (e) শক্তি, যানবাহন, কয়লা ও

সিমেণ্টের অভাব ; অলাভজনক নিয়ন্ত্রিত দাম, শ্রমিক অসন্তোষ, শিল্প পরিচালনায় ব্যর্থতা প্রভৃতি কারণেও শিল্পোন্নয়ন ব্যর্থ হয়।

সরকারের উদ্যমের ফলে পাবলিক সেক্টরের দ্রুত প্রসার লাভ ঘটে। ফলে ভিত শিল্পগুলি শক্তিশালী হয়ে ওঠে। যথা, ইস্পাত, অলৌহনির্মিত ধাতু, পেট্রোলিয়াম, কয়লা, সার ও ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং। ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পগুলিতেও পাবলিক সেক্টরের অনুপ্রবেশ ঘটে। ফলে সেসব শিল্পও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। যথা, বস্ত্র, ভেষজ, ফারমাসিউটিক্যাল, সিমেণ্ট ও চিনি। ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন ক্ষেত্রে পাবলিক সেক্টরের অনুপ্রবেশের অন্যতম কারণ সরকার কর্তৃক রুগ্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি অধিগ্রহণ। স্থানীয় সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি রেখে রাজ্য সরকারগুলি পাবলিক সেক্টরে বিনিয়োগ করছে। তাদের বিনিয়োগ প্রধানত মধ্য আয়তন শিল্প ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। মূলধনঘন শিল্পোন্নয়নের উদ্যোগ কেন্দ্রীয় সরকারই গ্রহণ করছে। কেন্দ্রীয় পাবলিক সেক্টরে 1977 সনের মার্চ পর্যন্ত বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল 15,600 কোটি টাকা। এর মধ্যে প্রায় 12,800 কোটি টাকা শিল্প ও খনিজ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা হয়। 1952-53 সনে পাবলিক সেক্টরে শিল্প এককের সংখ্যা ছিল 29 ; মূলধনের পরিমাণ 30 কোটি টাকা। 1982-83 সনে শিল্প এককের সংখ্যা 203 ; মূলধনের পরিমাণ 25,000 কোটি টাকা। 1952-53 সনে পাবলিক সেক্টরের বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল মাত্র 7 শতাংশ ; 1982-83 সনে এর পরিমাণ 72 শতাংশ। সরকারের মতে মূলধনের কাঠামোতে এটি একটি "আমূল পরিবর্তন"। তবে পাবলিক সেক্টরে যে পরিমাণ বিনিয়োগ করা হয়েছে, যে প্রেরণা দেয়া হচ্ছে সে তুলনায় এর সম্পদ সৃষ্টির পরিমাণ নগণ্য বলা যেতে পারে।

শিল্পোন্নয়নের পাশাপাশি কতিপয় কাঠামোগত সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। যেমন, আঞ্চলিক অসমতা ও বেকারত্ব। আশা করা হয়েছিল যে কেন্দ্রীয় সেক্টরে যে পরিমাণ বিনিয়োগ করা হয়েছে তা ক্ষুদ্র ও সহায়ক প্রতিষ্ঠানগুলিকে উৎসাহিত করতে সমর্থ হবে। কিন্তু অধিকাংশ রাজ্যেই তা সম্ভব হয়নি। এমনকি রাজ্যগুলিতেও শিল্প বিকেন্দ্রীকরণ আশানুরূপ হয়নি। শিল্পগুলির উৎপাদন ব্যয়ের গুরুত্ব উপেক্ষা করে চলার উদ্যমও লক্ষণীয়। সরকারের উদার সংরক্ষণ নীতি এর প্রধান কারণ। ফলে শিল্পোন্নয়ন উচ্চ উৎপাদন ব্যয় কাঠামোর রূপ নিয়েছে। প্রযুক্তিবিদ্যা ও দ্রব্যাদির গুণগত মানের

দিকেও বিশেষ নজর দেয়া হয়নি। ফলে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে অসমর্থ হয়ে অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠানকে রুগ্নতার আশ্রয় নিতে হয়েছে।

তাছাড়া বিদেশীয় ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। 1982-83 সনে ভারতে বিদেশীয় ঋণের মোট পরিমাণ 16,000 কোটি টাকা। এ ঋণ প্রধানত যুক্তরাষ্ট্রের কাছে। 1981-82 সনে বহির্বাণিজ্যে ঘাটতির পরিমাণ 5,868 কোটি টাকা, 1983-84 সনে 5,861 কোটি টাকা। প্রযুক্তিবিদ্যার জন্যও বিদেশের উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মুদ্রাস্ফীতির জন্য সাধারণ মানুষের প্রকৃত আয় হ্রাস পাচ্ছে। সামাজিক ও রাজনৈতিক বিক্ষোভ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাচ্ছে বটে, কিন্তু তারই পাশাপাশি বহু শিল্প প্রতিষ্ঠান তাদের উৎপাদন ক্ষমতার 20-50 শতাংশের বেশি ব্যবহার করতে সমর্থ হয়নি। সবচেয়ে বড় সমস্যা একদিকে পাবলিক সেক্টরের প্রসার ঘটছে অপরদিকে প্রাইভেট সেক্টরে মুষ্টিমেয় শিল্পপতিদের হাতে আর্থিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হচ্ছে।

ষষ্ঠ পরিকল্পনায় প্রস্তাব

(i) পাবলিক অথবা প্রাইভেট সেক্টরের ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষমতা বিশেষভাবে বৃদ্ধি করতে হবে যাতে ভোগ্যদ্রব্যের, দীর্ঘস্থায়ী ভোগ্যদ্রব্য সহ, উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষি ও শিল্প উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় মাধ্যমিক ও মূলধন দ্রব্যের উৎপাদন ও সরবরাহও বৃদ্ধি পায়। শিল্পে বিনিয়োগের হার বৃদ্ধি করা প্রয়োজন যাতে শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় ও প্রতিযোগিতামূলক বাজারের চাহিদা মিটাবার ব্যাপারে তারা সমর্থ হয়ে উঠতে পারে। মূল কথা, উপকরণের অভাবের দরুন যাতে অর্থনীতির উপর কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি না হয়।

(ii) মূলধন দ্রব্য শিল্পের, বিশেষত ইলেকট্রোনিক, প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। কারণ এ জাতীয় শিল্পের সমর্থনের উপর বহু অর্থনৈতিক কাজকর্মের উন্নতি নির্ভর করে। ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি, ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে পরিবহন প্রভৃতি কয়েকটি নির্বাচিত শিল্পের উন্নয়নও ত্বরান্বিত করতে হবে যাতে শুধু দেশীয় চাহিদা মিটানোই নয়, রপ্তানি বাজারের সুবিধা নেয়ার পথও প্রশস্ত হয়।

(iii) পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য বৈদেশিক বিনিময় সম্পদ প্রয়োজন। এজন্য ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য, শিল্পদ্রব্য ও প্রকল্প রপ্তানি দ্রুত বৃদ্ধি করতে হবে।

এ সমস্ত শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতার বৃদ্ধির উপর রপ্তানি বৃদ্ধির সম্ভাবনা নির্ভর করে।

(iv) ক্রমাগত প্রযুক্তিবিদ্যার উৎকর্ষ সাধনের উপর শিল্পোন্নয়ন নির্ভর করে। এ কারণে একদিকে যেমন বিদেশ থেকে অধুনাতন প্রযুক্তিবিদ্যার আমদানি অপরিহার্য অপরদিকে তেমনি অপরিহার্য দেশীয় প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়ন সাধন।

(v) শক্তি ব্যবহারে দক্ষতার উৎকর্ষ সাধন যাতে এ দুর্মূল্য উপকরণের কিছুমাত্র অপচয় না ঘটে। সড়ক পরিবহন প্রভৃতি ক্ষেত্রের জন্য শক্তির বিকল্পের কথা ভাবতে হবে।

(vi) অনুন্নত অঞ্চলগুলির উন্নয়নের জন্য নতুন ষ্ট্র্যাটেজির উদ্ভাবন করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে শিল্প স্থানীয়করণ ব্যাপারে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে কতিপয় অঞ্চলে শিল্পগুলি কেন্দ্রীভূত না হয়ে পড়ে। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় আশা করা হয়েছে 1980-85 সনে শিল্প উৎপাদনের বার্ষিক গড় বৃদ্ধির হার 8 শতাংশ হবে। অবশ্য এজন্য ভিত-কাঠামোর উন্নতিসাধন প্রয়োজন। বিশেষত কয়লা, শক্তি ও রেলপথের। পাবলিক সেক্টরে বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও কৃষি উন্নয়নের ফলে শিল্পদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। চাহিদা সঙ্কট সৃষ্টি হবার আশঙ্কা হ্রাস পাবে। পরিকল্পনা কমিশনের মতে রপ্তানির বার্ষিক গড় বৃদ্ধির হার 9 শতাংশ হওয়া প্রয়োজন। শিল্প উৎপাদনের বৃদ্ধির হার 8 শতাংশ না হলে তা সম্ভব হবে না।

ষষ্ঠ পরিকল্পনায় শিল্প খাতে, কয়লা ও পেট্রোলিয়াম সহ, মোট 20,407 কোটি টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে। এর মধ্যে 19,018 কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সেক্টরে ব্যয় করা হবে। রাজ্য সেক্টরে ব্যয়ের পরিমাণ 1,389 কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনায় সর্বাধিক পরিমাণ ব্যয় হবে পেট্রোলিয়মে (4,300 কোটি টাকা), তারপর ইস্পাত (3,613 কোটি টাকা), কয়লা (2,870 কোটি টাকা) ও সার (2,367 কোটি টাকা)। পাবলিক সেক্টরে যে ব্যয় হবে তার মোটামুটি 26 শতাংশ ব্যয় হবে গ্রামীণ ও কৃষিক্ষেত্রের কর্মসূচী রূপায়ণের সমর্থনে।

শিল্পের রুগ্নতা

সংজ্ঞা

সে শিল্প প্রতিষ্ঠানকে রুগ্ন বলা হয় যে প্রতিষ্ঠানটি অভ্যন্তরীণ উদ্বৃত্তের প্রবাহ অব্যাহত রাখতে সমর্থ নয়। অর্থাৎ, যে প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব ক্রমাগত বহিরাগত অর্থসাহায্যের উপর নির্ভরশীল। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার মতে, সে শিল্প প্রতিষ্ঠান রুগ্ন বলে বিবেচিত হবে যে প্রতিষ্ঠানকে গত বছর নগদ ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে, চলতি ও পরবর্তী বছরও এরূপ ক্ষতি স্বীকারের আশঙ্কা রয়েছে ও যার আর্থিক কাঠামোতে ভারসাম্যের অভাব ঘটেছে। যথা, চলতি সম্পদ ও চলতি দায়ের অনুপাত 1 : 1-এর কম ও 'ডেট ইকুউটি'র অনুপাত অবনতির দিকে যাচ্ছে।

সংখ্যা বৃদ্ধি

ভারতের শিল্পক্ষেত্রে রুগ্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকার যেভাবেই হোক এদের বাঁচিয়ে রাখার নীতি গ্রহণ করেছে। ফলে এক নতুন অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। 1978 সনের জুনের শেষাশেষি 325 বৃহৎ ও মধ্য আয়তন শিল্প প্রতিষ্ঠান রুগ্ন বলে ঘোষিত হয়। এদের কাছে অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ ছিল 956 কোটি টাকা। 1979 সনের জুনের শেষাশেষি রুগ্ন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় 345 ; অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ 1102 কোটি টাকা। 1980 সনের জুনের শেষাশেষি এ সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেয়ে হয় 378 ; অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ 1158 কোটি টাকা। ইঞ্জিনিয়ারিং (লৌহ ও ইস্পাত সহ) শিল্পে রুগ্নতা সর্বাধিক। 30 জুন 1978, 1979 ও 1980 সনে এদের সংখ্যা যথাক্রমে 112, 115 ও 130। পরবর্তী স্থান তুলা বস্ত্র শিল্পের, সংখ্যা যথাক্রমে 78, 84 ও 88। অন্যান্য উল্লেখ্য শিল্পের মধ্যে রয়েছে চিনি, রাসায়নিক দ্রব্য, পাটবস্ত্র, রবার ও সিমেণ্ট।

বৃহৎ ও মধ্য আয়তন রুগ্ন শিল্প ক্ষেত্রে রাজ্যগুলির মধ্যে প্রথম স্থান অধিকারী পশ্চিম বাংলা। তারপর মহারাষ্ট্র ও উত্তরপ্রদেশ। 1983 সনের 30 জুনের এক পরিসংখ্যানে প্রকাশ পশ্চিমবাংলার এরূপ রুগ্ন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা 111, মহারাষ্ট্রে 88 ও উত্তরপ্রদেশে 53।

ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ক্ষেত্রেও রুগ্নতা রয়েছে। 1979 সনের জুনের শেষাশেষি এ ক্ষেত্রে রুগ্ন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা 16,805 ; অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ 182

কোটি টাকা। 1980 সনের জুনের শেষাশেষি এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় 20,975 ; অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ 262 কোটি টাকা। এ ক্ষেত্রেও পশ্চিমবাংলার স্থান প্রথম। 1979 সনের ডিসেম্বরের শেষাশেষি পশ্চিমবাংলায় রুগ্ন ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা 6948 ; দ্বিতীয়, মহারাষ্ট্র 2763 ; তৃতীয়, অন্ধ্রপ্রদেশ, 1,323 ও চতুর্থ, উত্তরপ্রদেশ 1152।

1983 সনের জুনের শেষাশেষি বৃহৎ ও মধ্য আয়তন শিল্পক্ষেত্রে রুগ্ন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল 463 ; অনাদায়ী ব্যাঙ্ক ফিনান্সের পরিমাণ 1,913·10 কোটি টাকা। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পক্ষেত্রে এদের সংখ্যা 64,388 ; অনাদায়ী ব্যাঙ্ক ফিনান্সের পরিমাণ 626·52 কোটি টাকা। বৃহৎ ও মধ্য আয়তন শিল্পগুলির মধ্যে রয়েছে ইঞ্জিনিয়ারিং (লৌহ ও ইস্পাত সহ)(139), তুলা বস্ত্র (119), চিনি (44), পাট বস্ত্র (37), রাসায়নিক দ্রব্য (27) ও অন্যান্য (97)। রুগ্নতা যে কি ভীষণ আকার ধারণ করেছে তার সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত বস্ত্র শিল্প। দেশের ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রে বস্ত্র শিল্পের অংশ 20 শতাংশ। কর্মীর সংখ্যা 12 লক্ষ। বস্ত্র ও বস্ত্রজাত দ্রব্যের রপ্তানির পরিমাণ দেশের মোট রপ্তানির 20 শতাংশ। বোম্বে শহরে 60 কাপড়ের কল রয়েছে। 1983 সনের 19 অক্টোবর সরকার এক অর্ডিনান্স জারি করে এদের মধ্যে 13 মিল রুগ্নতার কারণে অধিগ্রহণ করেছে। এর আগে অধিগ্রহণ করা হয়েছে 12 মিল। সংক্ষেপে, গোটা বস্ত্র শিল্পই বর্তমানে অসুস্থতায় ভুগছে। বর্তমানে এর সামিল হয়েছে পশ্চিমবাংলার পাট শিল্প। ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কর্মাসের মতে 1982 সনে আমাদের দেশে রুগ্ন শিল্পের সংখ্যা ছিল 60000, 1984 সনে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় 100000। রুগ্ন প্রতিষ্টানগুলিকে দেয়া ব্যাঙ্কগুলির অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ 1983 সনের ডিসেম্বরে 3101 কোটি টাকা।

রুগ্নতার কারণ

1. বহিরাগত কারণ। বহিরাগত কারণ কোন শিল্পেরই সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। যথা :

(i) উৎপাদন ব্যয় যে অনুপাতে বৃদ্ধি পায় সে অনুপাতে বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় না। ফলে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। রুগ্নতা সৃষ্টি হয়।

(ii) উৎপাদনের উপকরণের অভাব। যথা, কাঁচামাল, শক্তি, পরিবহন প্রভৃতি। ফলে উৎপাদন ব্যাহত হয় ; ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

(iii) সাধারণ মন্দা। এর ফলে বাজারে চাহিদার অবনতি ঘটে ; আয় হ্রাস পায়।

(iv) আবগারী শুল্ক, আমদানি শুল্ক, আয়কর বৃদ্ধি প্রভৃতি উৎপাদন ও মুনাফাকে প্রভাবিত করে।

(v) টাকা ও মূলধন বাজারের সমর্থনের অভাব। যার ফলে ক্রেডিটের অভাব ঘটে।

(vi) সরকারের রাজস্ব, আমদানি-রপ্তানি ও মুদ্রা নীতির প্রতিকূলতার ফলে অনেক ক্ষেত্রে রুগ্নতা সৃষ্টি হয়।

(vii) সরকারের অবাস্তব দাম নিয়ন্ত্রণ ও বণ্টন নীতিও রুগ্নতার কারণ।

2. অভ্যন্তরীণ কারণ। এর উপর সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আছে। যথাঃ

(i) ত্রুটিপূর্ণ পরিকল্পনা ও পরিকল্পনা রূপায়ণে ব্যর্থতা।

(ii) পরিচালনায় যোগ্যতার অভাব ও অসাধুতা। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার এক সাম্প্রতিক সমীক্ষায় প্রকাশ 53 শতাংশ ক্ষেত্রে রুগ্নতার কারণ পরিচালনাগত ব্যর্থতা। অন্যান্য কারণের মধ্যে রয়েছে ভুল পরিকল্পনা ও কারিগরি ত্রুটিবিচ্যুতি (14%), কাঁচামাল ও শক্তির অভাব (9%), মন্দা বাজার (23%) ও শ্রমিক অসন্তোষ (2%)।

(iii) মূলধনের অভাব, বিশেষত কার্যকর মূলধন।

(iv) ফিনান্স, স্টক ও বাজারকরণের উপর নিয়ন্ত্রণের অভাব।

(v) প্রতিকূল পরিবেশে শিল্প স্থাপন, অনুপযুক্ত প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ ও স্থির সম্পদের অনমনীয়তা।

(vi) চাহিদা সম্পর্কে অবাস্তব ধারণা।

(vii) ক্রমাগত উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি ও শ্রমিক অসন্তোষ।

প্রতিবিধান

শিল্পের রুগ্নতার যথার্থ কারণ থাকতে পারে। যেমন, সাধারণ আর্থিক মন্দা বা কাঁচামালের অভাব। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সুস্থ থাকা নিজের দক্ষতার উপর খুব কমই নির্ভর করে। আবার এমনও হতে পারে যে, সে রুগ্ন রূপেই জন্মগ্রহণ করেছে। যেমন, এমন একটি শিল্পকে বেছে নেয়া হয়েছে বা এমন স্থানে তা স্থাপন করা হয়েছে যে এর কোন ভবিষ্যৎ থাকতে

পারে না। পরিচালনার অযোগ্যতা বা শ্রমিক অসন্তোষের বাড়াবাড়ির ফলে সুস্থও অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে।

যথার্থ কারণে যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠান রুগ্ন হয়ে পড়ে তাদের রুগ্নতা এড়াবার বা নিরাময়ের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

(i) কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ক্রেডিট দেয়ার আগে আর্থিক সংস্থাগুলিকে নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে যে তাদের সাহায্য ব্যর্থ যাবে না।

(ii) এ ব্যাপারে কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কসহ সবরকম আর্থিক সংস্থাগুলির মধ্যে সহযোগিতা থাকা প্রয়োজন।

(iii) আর্থিক সংস্থাগুলি তাদের দেয়া ঋণকে সাধারণত ইকিউটিতে রূপান্তরিত করার অধিকার হাতে রাখে। রুগ্ন শিল্প ক্ষেত্রে তাদের অধিকার কার্যকর করার আগ্রহ থাকা বাঞ্ছনীয়। রুগ্ন শিল্পক্ষেত্রের পরিচালনায় আর্থিক সংস্থাগুলির অনুপ্রবেশের ফলে পরিচালনাগত দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে, তদুপরি সুদ বাবদ দেয়া অর্থ রদ পাবে।

(iv) রুগ্ন প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রে ক্রেডিটদাতাদের উচিত সুদের হার হ্রাস করা। তাদের ঋণ পরিশোধের শর্তাদির পরিবর্তন ও পুনর্বাসন ব্যাপারে উত্তমর্ণ ও কর্মীদের মধ্যে সহযোগিতার প্রয়োজন রয়েছে।

(v) পরিচালন দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বোর্ড অব ডাইরেক্টরস সুদক্ষ ও সৎ ব্যক্তিদের নিয়ে গঠন করা সঙ্গত। সর্বস্তরে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়োগ করতে হবে।

এ প্রসঙ্গে আর্থিক সংস্থাগুলির বক্তব্য

(i) শিল্প পরিচালনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের জন্য এক শ্রেণীর অভিজ্ঞ ও সুদক্ষ পেশাদারী কর্মী গঠন করা প্রয়োজন যারা সাহায্যপ্রাপ্ত শিল্প এককগুলির পরিচালনাগত ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করতে সাহায্য করবে। অবশ্য স্বল্পকালের ভিত্তিতে তাদের নিয়োগ করা হবে।

(ii) একটি "ড্যাটা ব্যাঙ্ক" গঠন করা প্রয়োজন। ব্যাঙ্কটির কাজ হবে উদ্যোগিদের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি দিয়ে সাহায্য করা যাতে তারা সঠিক প্রকল্প পরিকল্পন ও তার সুষ্ঠু রূপায়ণে সমর্থ হয়।

(iii) মনোনীত ডাইরেক্টর সংস্থাকে শক্তিশালী করে তুলতে হবে যাতে ডাইরেক্টররা সাহায্যপ্রাপ্ত শিল্প এককগুলিকে অধিকতর দক্ষতার সঙ্গে

পরিচালনা করতে সমর্থ হয়। অবশ্য তাদের পক্ষে এককগুলির দৈনন্দিন কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করা সঙ্গত হবে না।

সরকারী নীতি ও কার্যক্রম

শিল্পের রুগ্নতা সম্পর্কে সরকারী নীতি ইনডাষ্ট্রিয়াল পলিসি স্টেটমেণ্ট 1980-তে ব্যক্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, সরকার স্বেচ্ছায় রুগ্ন করে তোলা শিল্প প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত হবে না। কিন্তু যেসব রুগ্ন শিল্প এককের সম্ভাবনা রয়েছে, সাহায্য পেলে সাফল্যের পথে এগিয়ে যেতে সমর্থ সেসব ক্ষেত্রে সরকার সুস্থ শিল্প এককগুলির সঙ্গে তাদের একীকরণ দ্বারা কার্যক্ষম করে তুলতে আগ্রহান্বিত; তাছাড়া সরকার নিজেও রুগ্ন একককে রাষ্ট্রায়ত্ত করে নিতে পারে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সহযোগিতায় সরকার শিল্প এককগুলির স্বাস্থ্যের সংবাদ সংগ্রহ করে থাকে। এ উদ্দেশ্যে সে কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কগুলিকে বিশেষ সেল গঠন করার, রুগ্ন এককগুলিকে উপদেশ দেয়ার ও তাদের যথাযথ পরিচর্যার পরামর্শ দিয়েছে। এ ব্যাপারে সে নিজেও একটি বিশেষ সেল গঠন করেছে। বৃহৎ রুগ্ন শিল্প এককগুলি সম্বন্ধে এ সেল কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক-গুলির কাছ থেকে ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন পেয়ে থাকে। ইনডাষ্ট্রিয়াল ডেভেলপমেণ্ট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার রিহ্যাবিলিটেসন ফিনান্স ডিভিসনেও এমনি একটি বিশেষ সেল গঠিত হয়েছে। সেলটি কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কগুলি কর্তৃক সংগৃহীত রুগ্ন শিল্প সম্পর্কিত তথ্যাদির পর্যালোচনা করে থাকে যাতে রুগ্ন অথচ সম্ভাবনাপূর্ণ এককগুলিকে যথাসময়ে সাহায্য দিয়ে পুনর্বাসন করা সম্ভব হয়।

কেন্দ্রীয় শিল্প মন্ত্রণালয় 1981 সনের জুনে রুগ্নতা নিবারণ, রুগ্ন এককগুলির দ্রুত পুনর্বাসন ও তাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ সম্পর্কে অবিলম্বে সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যবস্থা করেছে। যেসব রুগ্ন এককে কর্মীর সংখ্যা এক হাজারের অধিক অথবা স্থির সম্পদে বিনিয়োগের পরিমাণ 9 কোটি টাকা বা তার অধিক সেসব ক্ষেত্রে রুগ্নতা দূর করা সম্ভব না হলে শর্ত সাপেক্ষ তাদের রাষ্ট্রায়ত্ত করা সঙ্গত বলে অভিমত প্রকাশ করা হয়।

সরকারের অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আই-আর-সি-আই স্থাপন, সফ্ট লোন স্কীম প্রবর্তন ও একীকরণ নীতি অবলম্বন। ইনডাস্ট্রিয়াল রিকনস্ট্রাকসন কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া (1971) স্থাপনের উদ্দেশ্য রুগ্ন শিল্প

এককগুলির পুনর্গঠন ও পুনর্বাসনের জন্য আর্থিক সাহায্য দেয়া। আই-আর-সি-আইর সমস্যার মধ্যে রয়েছে অন্যান্য এজেন্সির সহযোগিতার অভাবের ফলে পুনর্গঠন স্কীম রূপায়ণে অসুবিধা, পুনর্বাসন স্কীম রূপায়ণে দক্ষ ব্যক্তির অভাব ও প্রয়োজন-ভিত্তিক প্রথা ও পদ্ধতি প্রবর্তনে বাধা।

সফ্‌ট লোন স্কীম (1976)-এর উদ্দেশ্য নির্বাচিত কতিপয় শিল্পকে যথা, তুলা বস্ত্র, সিমেণ্ট, পাট, চিনি ও ইঞ্জিনিয়ারিং, তাদের পুরাতন যন্ত্রপাতি আধুনিকীকরণ ও পুনর্বাসনের জন্য সুবিধাজনক শর্তে অর্থ সাহায্য করা যাতে তাদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। এ স্কীম তেমন ফলপ্রসূ হয়নি। তার অন্যতম কারণ রুগ্ন এককগুলির পক্ষে এসব সুবিধাজনক শর্তও মেনে নেয়া সম্ভব নয়।

যে কোন দুটো কোম্পানিকে একীকরণ ইনকাম ট্যাক্স এ্যাক্ট ও মোনোপলিসটিক এণ্ড রেস্ট্রিকটিভ ট্রেড প্র্যাকটিসেস এ্যাক্ট সাপেক্ষ। 1981 সনের জুন পর্যন্ত এরূপ একীকরণের জন্য 72 আবেদনপত্র পাওয়া যায়। তার মধ্যে 41 অনুমোদন লাভ করে, 10 নামঞ্জুর হয় ও 21 বিবেচনাধীন থাকে। একীকরণ নীতি প্রকারান্তরে শিল্প কেন্দ্রীকরণ ও একচেটিয়া কাঠামো সৃষ্টির সহায়ক। এর প্রতিকার রূপে একীকরণের অনুমতি দেয়ার আগে নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে যে, প্রস্তাবিত একীকরণ জাতীয় স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর হবে না। যাহোক এ স্কীম তেমন কার্যকর হয়নি।

শিল্পের রুগ্নতা এড়াবার জন্য যে সমস্ত সরকারী নির্দেশ জারি করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঃ

(i) আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে যুক্তভাবে কিছু পেশাদার ডাইরেক্টর নিযুক্ত করতে হবে। যথাসময় এ সমস্ত ব্যক্তিদের রুগ্ন কোম্পানির বোর্ড অব ডাইরেক্টরস-এ মনোনীত করে পাঠাতে হবে। এরপর আর্থিক সংস্থাগুলিকে সংশ্লিষ্ট রুগ্ন এককের কাজকর্ম সম্পর্কে অনুসন্ধান করে তার রিপোর্ট আই-ডি-বি-আইর সভাপতিত্বে গঠিত আন্তঃপ্রতিষ্ঠান গ্রুপের কাছে পাঠাতে হবে। এ রিপোর্টের ভিত্তিতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ও সমস্ত আর্থিক সংস্থাগুলিকে একযোগে স্থির করতে হবে সংশ্লিষ্ট একক অথবা তার সঙ্গে যুক্ত অন্য কোন একককে তার পরিচালকমণ্ডলীর পরিবর্তন সাধন না করা পর্যন্ত আর আর্থিক সাহায্য দেয়া হবে কিনা।

(ii) ইনডাস্ট্রিয়াল (ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড রেগুলেসন) এ্যাক্ট অনুযায়ী

কোন রুগ্ন একককে অধিগ্রহণ করার আগে দেখতে হবে এর পুনর্বাসন বা একীকরণের সুযোগ আছে কিনা। যে ক্ষেত্রে এরূপ সুযোগের সম্ভাবনা নেই, থাকলেও তা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় নয় শুধু সেরূপ ক্ষেত্রেই এককটিকে অধিগ্রহণ করা যেতে পারে।

(iii) অধিগ্রহণ করার পর এককটিকে :

(a) কোন চলতি সুস্থ এককের কাছে বিক্রয় করে দেয়া ; অথবা (b) পুনর্গঠন করা ; অথবা (c) কোন পাবলিক সেক্টর আণ্ডারটেকিঙের সঙ্গে একীভূত করা ; অথবা (d) রাষ্ট্রায়ত্ত করা।

(iv) ক্ষুদ্রায়তন সেক্টরের রুগ্ন এককগুলির পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে স্কীম রচনা করার জন্য সংশ্লিষ্ট স্টেট ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশন ও কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কগুলিকে বলা হবে। তারা এদের যে অর্থ সাহায্য দেবে তা আই-আর-সি-আই ও আই-ডি-বি-আই রি-ফিনান্স করবে।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী 1985-86 সনের বাজেট বক্তৃতায় প্রস্তাব রেখেছেন যে একটি বোর্ড ফর ফিনান্সিয়াল এণ্ড ইনডাস্ট্রিয়াল রিকনস্ট্রাকসন প্রতিষ্ঠা করা হবে। বোর্ড কোম্পানিগুলির সংযোজন ও একীকরণের কাজ যাতে দ্রুত সম্পন্ন হতে পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় পদ্ধতি পরিবেশন এবং বৃহৎ ও মধ্য সেক্টরের রুগ্ন এককগুলির সমস্যা সমাধানের উপায় নির্ধারণ করবে। কোন শিল্প একক রুগ্ন হয়ে উঠলে তা জানাবার দায়িত্ব থাকবে এককটির পরিচালকদের উপর। এককটির নীট মূল্যের 50 শতাংশের বেশি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেলে পরিচালকদের শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে নতুন করে হুকুমনামা নিতে হবে। যদি কোম্পানির নীট গোটা মূল্যই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তবে যারা পরিচালনায় আছেন ও যারা মালিক তাদের আর এককটিকে চালাবার কোন অধিকার থাকবে না। শুধু তাই নয় যারা এককটির অপ-পরিচালনার জন্য চিহ্নিত হবে তারা কোন নতুন উদ্যোগ নিলেও সে উদ্যোগের জন্য আর্থিক সংস্থাগুলি থেকে কোন সাহায্য পাবে না। অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য, খারাপ পরিচালকদের খারাপ কারেন্সির মত বাজার থেকে হটিয়ে দেয়া হবে।*

* "Bad managers, like bad currency, have to be kept out of circulation."

উৎপাদন ক্ষমতার অপূর্ণ ব্যবহার

শিল্পগুলির মোট উৎপাদন ক্ষমতার প্রায় 25 শতাংশ অব্যবহৃত থাকে। 1980 সনে ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প সেক্টরে অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতা 25·6 শতাংশ। ফলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি সত্ত্বেও উৎপাদন, আয় ও কর্মসংস্থান বাঞ্ছিত হারে বৃদ্ধি পায় না। নতুন বিনিয়োগও ব্যাহত হয়। আমদানি পরিবর্ত দ্রব্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না। রপ্তানি বৃদ্ধিও প্রয়োজনের তুলনায় কম হয়। ফলে বহির্বাণিজ্যে ঘাটতি সঙ্কট প্রচণ্ড হয়ে ওঠে। তাছাড়া উৎপাদন বৃদ্ধি না পাবার দরুন মুদ্রাস্ফীতি ঘটে, মূলধন সম্পদের অপচয় ও সঞ্চয় বৃদ্ধির হার ব্যাহত হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, মূলধন দ্রব্য উৎপাদন সেক্টরে উৎপাদন ক্ষমতার ব্যবহার যখন অবনতির দিকে তখন ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন সেক্টরে উৎপাদনের গতি বিপরীত দিকে। 1961-65 সনে মূলধন দ্রব্য উৎপাদন সেক্টরে উৎপাদন ক্ষমতার গড় বার্ষিক ব্যবহারের হার 57·6 শতাংশ ; 1969-71 সনে তা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় 42·৪ শতাংশ। এ সময়কালীন ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন সেক্টরে এর হার যথাক্রমে 46·3 ও 53·0 শতাংশ।

পূর্ণ ব্যবহার না হওয়ার কারণ

(i) উৎপাদনের উপকরণের অভাব। যথা, কাঁচামাল, শক্তি, পরিবহন, দক্ষ শ্রমিক প্রভৃতি।

(ii) বৈদেশিক বিনিময়ের অভাব। ফলে উৎপাদনের উপকরণরূপে প্রয়োজনীয় অনেক দ্রব্য আমদানি করা সম্ভব হচ্ছে না।

(iii) চাহিদার অভাব। আয় বৃদ্ধির স্বল্পতা, আয় ও সম্পদ বণ্টনে অসমতা ও শিল্প-ভিত্তিক পরিকল্পনের ফলে চাহিদা অপেক্ষাকৃত কম হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অধিক উৎপাদন ব্যয়, উৎপন্ন দ্রব্যের নিম্ন মান, চাহিদার পরিকল্পনার অভাব, আন্তর্জাতিক মন্দা প্রভৃতি কারণে রপ্তানির পরিমাণও প্রয়োজন মত বৃদ্ধি পাচ্ছে না।

(iv) অর্থনৈতিক নীতির স্থিতিশীলতার অভাব। অর্থনৈতিক নীতির স্থিতিশীলতার অভাবের ফলে শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতার ব্যবহার ব্যাহত হয়। আমদানি-রপ্তানি নীতি, লাইসেন্সিং নীতি, শ্রমিক নীতি, দাম নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রভৃতি ঘন ঘন পরিবর্তিত হলে উৎপাদন পরিকল্পনা ব্যাহত হতে বাধ্য।

(v) শ্রমিক অসন্তোষের ফলে উৎপাদন ব্যাহত হয়। 1979-81 সনে

শ্রমিক-মালিকদের বোঝাপড়ার অভাবের দরুন 73 মিলিয়ন ম্যানডেজ নষ্ট হয়। উৎপাদনের ক্ষতির পরিমাণ অনুমিত 1,029,85 কোটি টাকা। 1983 ও 1984 সন (জানুয়ারী—নভেম্বর)-এ শিল্প বিবাদের দরুন যথাক্রমে প্রায় 42 মিলিয়ন ও 28 মিলিয়ন ম্যানডেজ নষ্ট হয়।

(vi) শিল্প পরিচালকদের অযোগ্যতা ও অসাধুতা। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে শিল্প পরিচালকরা শুধু অযোগ্যই নয়, অসাধুও বটে। তাছাড়া নতুন প্রতিষ্ঠিত শিল্পের পক্ষে উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার সময় সাপেক্ষ। কোন কোন শিল্প সংস্থা ভবিষ্যতে উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হতে পারে এ আশায় বর্তমানে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে রাখে। প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে এক-চেটিয়া উৎপাদনের সুযোগ নেয়ার জন্যও উদ্বৃত্ত ক্ষমতার উদ্ভব হয়।

সরকারী নীতি

উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব করে তোলার জন্য সরকার যে সমস্ত ব্যবস্থা নিয়েছে তার মধ্যে রয়েছে :

(a) শিল্প লাইসেন্স প্রথার নিয়মকানুন শিথিল করা ও শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতার সীমা বৃদ্ধি। (b) আমদানি শিথিল করা যাতে শিল্পগুলি বিদেশীয় কাঁচামাল ও মূলধন দ্রব্যের বিশেষ অভাব বোধ না করে। (c) শক্তির অভাব লাঘব করার জন্য অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে শক্তি পরিকল্পনা গ্রহণ। (d) উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রেরণা দেয়ার জন্য সম্প্রতি করের ছাড়, এলাউন্স প্রভৃতি নানাবিধ রাজস্বের সুবিধা দেয়া হয়েছে।

14 বৃহৎ শিল্প পরিচিতি ও সমস্যা

বস্ত্র শিল্প

ইতিবৃত্ত ঃ 1918 সনে কলিকাতায় প্রথম কাপড়ের কল স্থাপিত হয়। কিন্তু মূলধন ও পরিবহনের সুবিধা এবং চীনের সঙ্গে সুতার ব্যবসায়ের সুযোগ থাকার ফলে বোম্বে ক্রমে বস্ত্র শিল্পের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। 1854 সনে বোম্বেতে প্রথম কাপড়ের কলের কাজ শুরু হয়। 1877 সন থেকে বস্ত্র শিল্প অন্য প্রদেশেও গঠিত হতে থাকে। নাগপুর, আমেদাবাদ, সোলাপুর, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ ও বঙ্গদেশে কাপড়ের কল স্থাপিত হতে থাকে। 1946 সনে ভারতে মোট কাপড়ের কলের সংখ্যা ছিল 421। এর 50 শতাংশ বোম্বেতে অবস্থিত ছিল।

1905 সনের পূর্ব পর্যন্ত বস্ত্র শিল্প ক্রমশই উন্নতির পথে এগোচ্ছিল। কিন্তু এর পর মুদ্রার বিনিময় মূল্যের অসুবিধা এবং জাপান ও চীনের বস্ত্র শিল্পের উন্নতির ফলে অবস্থা পরিবর্তিত হতে থাকে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (1914-18) বস্ত্র শিল্পের বিস্তার অনিবার্য হয়ে ওঠে। এর কারণ বিদেশ থেকে ভারতে বস্ত্র আমদানি হ্রাস ; অপর দিকে বৈদেশিক বাজারে ভারতীয় বস্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধি। যুদ্ধের ফলে দেশেও অতিরিক্ত চাহিদার সৃষ্টি হয়। যুদ্ধোত্তর প্রথম পাঁচ বছর বস্ত্র শিল্পের আরও উন্নতি ঘটে। এর পর মন্দা শুরু হয়। 1929 সনে বিশ্বব্যাপী মন্দা দেখা দেয়, ফলে বস্ত্র শিল্প দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। জাপানী বস্ত্রের তীব্র প্রতিযোগিতার ফলে ভারতীয় বস্ত্র শিল্পের দুর্দশা চরমে ওঠে। টাকার বিনিময় মূল্য 1 শিলিং 4 পেন্সের পরিবর্তে 1 শিলিং 6 পেন্স হওয়াতে ভারতীয় বস্ত্র শিল্পের পক্ষে বৈদেশিক প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হওয়া আরো কঠিন হয়ে ওঠে। 1923-25 সনে ও 1932 সনে ইয়েনের (জাপানী মুদ্রা) বিনিময় মূল্য হ্রাস পাওয়াতে অবস্থা গুরুতর আকার ধারণ করে।

1927 সনে ট্যারিফ বোর্ড ভারতীয় বস্ত্র শিল্পের জন্য সংরক্ষণের সুপারিশ

করে। 1927 সনে সুতার উপর ও 1931 সনে সুতীদ্রব্যের উপর আমদানি শুল্ক ধার্য হয়। 1947 সনের 31 মার্চ আমদানি শুল্ক তুলে নেয়া হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে (1939-45) বস্ত্র শিল্পের প্রভূত উন্নতি ঘটে। এর কারণ আমদানি হ্রাস, যুদ্ধ চাহিদা, রপ্তানি বৃদ্ধি ও দেশীয় বাজারের বর্ধিত চাহিদা। 1938-39 সনে 13·71 লক্ষ টাকা মূল্যের সুতীদ্রব্য ভারতে আমদানি করা হয়েছিল। 1941-42 সনে এর পরিমাণ ছিল 4·87 লক্ষ টাকা। বিদেশের চাহিদা মিটাতে গিয়ে দেশীয় বাজারে কাপড়ের দারুণ অভাব দেখা দেয়। 1944 সনের জুলাইতে কাপড় ও সুতা রপ্তানির উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। সরকার কাপড়ের দাম নিয়ন্ত্রণের আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। 1948 সনের জানুয়ারীতে কাপড়ের উপর নিয়ন্ত্রণ বিধি তুলে নেয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে কাপড়ের দাম 50 শতাংশ থেকে 180 শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এ সুযোগে কাপড়ের মালিকেরা কমপক্ষে 200 কোটি টাকা অতিরিক্ত মুনাফা করে বলে ধরা হয়েছে। 1948 সনের 2 আগষ্ট আবার কটন টেকস্টাইল (কণ্ট্রোল) অর্ডার কার্যকর করা হয়।

1949 সনে সুতা ও বস্ত্র উৎপাদনে অবনতি দেখা দেয়। তবে বস্ত্র রপ্তানি বৃদ্ধি পায়। 1949 সনের জুনে কাপড়ের উপর ধার্য 10 শতাংশ রপ্তানি শুল্ক রদ করা হয়। এর ফলে এবং ডলারের অনুপাতে টাকার মূল্য হ্রাস পাওয়ার জন্যই এ বৃদ্ধি সম্ভব হয়। 1950 সনে বস্ত্র উৎপাদনে আরো অবনতি ঘটে। এ অবনতির মূল কারণ কাঁচা তুলার অভাব ও তুলার অত্যধিক দাম। সরকারের পক্ষ থেকে ভারতীয় তুলার যে দাম নির্দিষ্ট করে দেয়া হয় তার চেয়ে বেশি দামে মিলগুলিকে তুলা ক্রয় করতে হয়, ফলে সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত দামে স্থানীয় বাজারে বস্ত্র বিক্রয় অসম্ভব হয়ে ওঠে। টাকার মূল্য হ্রাস এবং রপ্তানি ও আমদানি সম্পর্কে কিছু সুযোগসুবিধা দেয়ার ফলে বস্ত্র রপ্তানি বৃদ্ধি পায়। এর ফলে মিল মালিকেরা স্থানীয় বাজারে বস্ত্র বিক্রয়জনিত লোকসান মিটাতে সক্ষম হয়। দুর্বল মিলগুলির সমস্যা অবশ্য থেকে যায়।

বর্তমান অবস্থা ঃ 1951 সনের এপ্রিলে আমাদের দেশে কাপড়ের কলের সংখ্যা ছিল 378। এর মধ্যে 103 স্পিনিং মিল ও 275 কম্পোজিট মিল ছিল। স্পিনিং মিলের সংখ্যা বৃদ্ধি করার নীতি গ্রহণ করার ফলে

1980 সনে এর সংখ্যা হয় 370। সে বছর কম্পোজিট মিলের সংখ্যা ছিল 291।

বস্ত্র শিল্প ভারতের শ্রেষ্ঠ শিল্প। বর্তমানে এ শিল্পে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় 270 কোটি টাকা। বার্ষিক মোট উৎপাদনের মূল্য 2500 কোটি টাকা। কর্মী সংখ্যা 9 লক্ষ। অর্থাৎ, সুসংগঠিত সেক্টরের মোট নিয়োগের প্রায় 20 শতাংশ।

বস্ত্র শিল্প তিনটি পৃথক সেক্টরে বিভক্ত: মিল, হস্তচালিত তাঁত শিল্প ও শক্তিচালিত তাঁত শিল্প। 1960 সনে মোট বস্ত্র উৎপাদনের প্রায় 72·5 শতাংশ মিলে উৎপাদন হত। 1965 সনে এর পরিমাণ হ্রাস পেয়ে প্রায় 60 শতাংশ হয়, 1975 সনে 50 শতাংশ এবং 1982-83 ও 1983-84 সনে তা আরও হ্রাস পেয়ে 30 শতাংশে দাঁড়ায়। এর কারণ শিল্প নীতিতে মিল বস্ত্র উৎপাদনের উপর বিবিধ নিয়ন্ত্রণ বিধি ধার্য ও অসংগঠিত সেক্টরে বস্ত্র উৎপাদনে নানাপ্রকার উৎসাহ প্রদান। সুতা উৎপাদনেও উন্নতি দেখা যায়। 1950-51 সনে সুতা উৎপাদনের পরিমাণ ছিল 53·4 কোটি কেজি; 1982-83 সনে এর পরিমাণ 99 কোটি কেজি।

সমস্যা: ভারতের বস্ত্র শিল্পের মূল সমস্যাগুলিকে নিম্নে উল্লেখ করা হল।

(i) আধুনিকীকরণ। ভারতের বস্ত্র শিল্প একটি প্রাচীন শিল্প। অন্যান্য দেশের আধুনিক বস্ত্র শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হলে শিল্পটির যন্ত্রপাতি, প্রযুক্তিবিদ্যা, পরিচালনা প্রভৃতির আধুনিকীকরণ দ্বারা উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি তথা উৎপাদন ব্যয় হ্রাস ও গুণগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি সাধন প্রয়োজন। এ পথে যেসব বাধা রয়েছে তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য অর্থাভাব, বিদেশের সহযোগিতার অভাব, শ্রমিক অসন্তোষ ও সরকারী নীতি ও সাহায্যের স্থিতিশীলতার অনিশ্চয়তা। শিল্পটিকে আধুনিকীকরণের জন্য যে আর্থিক সম্পদ প্রয়োজন তা শিল্পের নিজস্ব সম্পদ, আর্থিক সংস্থাগুলি থেকে ঋণ নেয়ার সুযোগ ও বিদেশের আর্থিক সহযোগিতার উপর নির্ভর করে। শিল্পের নিজস্ব সম্পদ স্বল্প। সরকারের শিল্প নীতি ক্ষুদ্র বস্ত্র শিল্পগুলিকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। ফলে আর্থিক সংস্থাগুলি বৃহৎ বস্ত্র শিল্পগুলিকে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ সাহায্য করতে উৎসাহী নয়। আধুনিক যন্ত্রপাতি, উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা প্রভৃতির জন্য বর্তমান অবস্থায় বিদেশের সহযোগিতার

উপর নির্ভর করা ছাড়া দ্বিতীয় পথ নেই। কিন্তু এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক রাজনীতি, বিদেশের আর্থিক সঙ্গতি ও ভারতে বিনিয়োগে তাদের ইচ্ছা এবং সরকারের শিল্প নীতির বিভিন্ন দিক জড়িত। সরকার বৃহৎ বস্ত্র শিল্পগুলির আধুনিকীকরণের বিরোধী, তা নয়; কিন্তু এ জন্য যে বৈদেশিক সম্পদ বিনিয়োগ করা প্রয়োজন, বৃহৎ শিল্পকে প্রয়োজনীয় অগ্রাধিকার দেয়া দরকার সে সম্বন্ধে তার শিথিলতা রয়েছে। উন্নত দেশগুলিও সেসব দেশেই যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তিবিদ্যা বিক্রয় করে থাকে যেসব দেশ সর্বোচ্চ মূল্য দিতে সমর্থ। ভারত এ সামর্থ্যের প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে রয়েছে।

(ii) উৎপাদনের উপকরণের অভাব। তুলা বস্ত্রের মোট উৎপাদন ব্যয়ের 40-50 শতাংশ ব্যয়িত হয় কাঁচা তুলার জন্য। দেশীয় তুলার অভাব রয়েছে। এ অভাব সহজে মেটার নয়। কারণ আমাদের দেশে প্রতি একর জমিতে তুলা উৎপাদনের পরিমাণ অত্যন্ত কম। যুক্তরাষ্ট্রে গড়ে একর প্রতি জমিতে তুলা উৎপাদনের পরিমাণ 453 পাউণ্ড। সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইজিপ্ট, সিরিয়া ও পাকিস্তানে যথাক্রমে 794, 693, 691 ও 242 পাউণ্ড। সেখানে ভারতে মাত্র 142 পাউণ্ড। এ অবস্থার শীঘ্র পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম। কারণ যেসব জমিতে তুলা চাষ হয়ে থাকে তার 75 শতাংশ বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল। তাছাড়া তুলা বীজ উন্নতমানের নয়; কীটনাশক ব্যবস্থাও আশানুরূপ নয়। অপরদিকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ তুলা আমদানি করা সহজসাধ্য নয়। কটন কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া তুলা আমদানির একমাত্র সংস্থা। কিন্তু তার পক্ষেও দেশের সম্পূর্ণ চাহিদা মিটানো সম্ভব হচ্ছে না। কারণ বিদেশের বাজারে তুলার দাম অত্যধিক। গুণগতর দিক থেকেও ভারতীয় কাঁচা তুলা নিম্নমানের। বস্ত্র শিল্পের উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণের মধ্যে রয়েছে রঙ, রসায়নী দ্রব্যাদি, মণ্ড, কয়লা, বিদ্যুৎ ও পরিবহন। এ সব উপকরণেরও অভাব রয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে দামের সমস্যাও রয়েছে।

(iii) উৎপাদন ব্যয় ও বাজার। প্রাচীন প্রযুক্তিবিদ্যা ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে উৎপাদন ব্যয় স্বভাবতই বেশি। তাছাড়া শ্রমিক মজুরী ও অন্যান্য উপকরণের দামও বেশি। উৎপাদন ব্যয় অত্যধিক হওয়ার দরুন ভারতীয় বস্ত্রের রপ্তানির পরিমাণ আশানুরূপ নয়। দেশীয় বাজারেও সুতী-

বস্ত্রের চাহিদা কম। এর কারণ প্রধানত সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য ও সিনথেটিক বস্ত্রের ব্যবহার বৃদ্ধি।

সরকারী নীতি : 1978 সনে সরকার ইনট্রিগ্রেটেড টেকস্টাইল পলিসি গ্রহণ করে। এ নীতি অনুসারে প্রাইভেট সেক্টরের কাপড়ের কলগুলির উপর নিয়ন্ত্রিত দামে বস্ত্র তৈরি করার যে নিয়ন্ত্রণ-বিধি ছিল তা 1978 সনের অক্টোবর থেকে তুলে নেয়া হয়। হস্তচালিত তাঁত শিল্পের, বিশেষত ন্যাশনাল টেকস্টাইল কর্পোরেশন (এনটিসি), উপর সমাজের দুর্বল শ্রেণীর মানুষদের কাপড়ের চাহিদা মিটাবার ভার দেয়া হয়। তাদের অভাব মিটাবার জন্য এনটিসিকে নিয়ন্ত্রিত দামে 400 বর্গ মিটার কাপড় উৎপাদনের নির্দেশ দেয়া হয়। নীতিতে এও বলা হয় যে, ভবিষ্যতে সুসংগঠিত সেক্টরে বয়ন ক্ষমতা বৃদ্ধি করার অনুমতি দেয়া হবে না। বস্ত্রের অতিরিক্ত চাহিদা প্রধানত বিকেন্দ্রিত সেক্টরই মেটাবে। এমনকি শক্তিচালিত তাঁতের উৎপাদন ক্ষমতাও বৃদ্ধি করতে দেয়া হবে না। এনটিসিকে নিয়ন্ত্রিত দামে কাপড় উৎপাদন করার অংশ বণ্টন করে দেয়ার পর বাকী অংশ প্রাইভেট সেক্টরের কাপড়ের কলের মিলগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বণ্টন করে দেয়া হবে। তাদের এ দাম-নিয়ন্ত্রিত বস্ত্র এনটিসির উৎপাদন ব্যয়ের ভিত্তিতে নির্ধারিত দামের বেশি দামে বিক্রয় করার অনুমতি দেয়া হবে না। এ নিয়ন্ত্রণের ফলে 1981 সনের জুলাইতে অনেক বস্ত্রশিল্প রুগ্ন হয়ে ওঠে। 1982 সনের জানুয়ারীতে প্রাইভেট সেক্টরভুক্ত 281 বস্ত্র মিলের মধ্যে 139 মিলকে নিয়ন্ত্রিত দামে বস্ত্র উৎপাদন করা থেকে সম্পূর্ণভাবে এবং 24 আংশিকভাবে মুক্তি দেয়া হয়। তবে এনটিসিকে নিয়ন্ত্রিত দামে বস্ত্র উৎপাদন করতে গিয়ে যে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে তার ভার বস্ত্রশিল্পের প্রতিটি ক্ষেত্রকে লেভি আকারে বহন করতে হবে। এনটিসির যন্ত্রপাতি আধুনিকীকরণ প্রভৃতির জন্য ষষ্ঠ পরিকল্পনায় 90 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। আর্থিক সংস্থাগুলিও এনটিসিকে 220 কোটি টাকা ঋণ দিয়ে সাহায্য করবে। উন্নত দেশগুলির সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে সরকার বহুতন্তু (multifibre) বস্ত্র শিল্প গড়ে তুলতে উৎসাহী হয়ে উঠেছে।

প্রস্তাব : (i) বস্ত্র শিল্পের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সরকারকে বলিষ্ঠ, বাস্তবসম্মত নীতি গ্রহণ করতে ও তা রূপায়ণের জন্য উপযুক্ত ভিত-কাঠামো ও প্রশাসন গড়ে তুলতে হবে। এ পথে প্রথম পদক্ষেপ হবে 'শিল্পটিকে

সর্বতোভাবে আধুনিক করে তোলা। শিল্প বিকেন্দ্রীকরণের নামে সুসংবদ্ধ সেক্টরের উন্নয়ন ব্যাহত করা সার্বিক স্বার্থের পক্ষে লাভজনক নয়। সুসংবদ্ধ বস্ত্র শিল্প সেক্টর ও বিকেন্দ্রিত সেক্টরের মধ্যে সুষম ভারসাম্য রক্ষা করে বস্ত্র শিল্পের নীতি নির্ধারণ করা সঙ্গত।

(ii) সীমিত প্রযুক্তিবিদ্যা ও চলতি যন্ত্রপাতির পূর্ণ ব্যবহারের পথে যেসব বাধাবিঘ্ন রয়েছে, বিশেষত শক্তি সরবরাহ ক্ষেত্রে, তা দূর করে উৎপাদন বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা প্রয়োজন।

(iii) বিদেশে ভারতীয় বস্ত্রের যথেষ্ট সমাদর রয়েছে। উপযুক্ত প্রশাসন ও প্রচারের অভাবে, উৎপাদন ব্যয় অধিক হওয়ার ফলে ও উৎপন্ন বস্ত্রের গুণগত মানের উপর তেমন নিয়ন্ত্রণ না থাকাতে বিদেশে ভারতীয় বস্ত্রের যে চাহিদা রয়েছে তার পূর্ণ সুযোগ নেয়া সম্ভব হচ্ছে না।

(iv) আর্থিক সংস্থাগুলির উচিত যথাসময় সুবিধাজনক শর্তে ঋণ দিয়ে বস্ত্র শিল্প এককগুলির রুগ্নতা দূরীকরণে সাহায্য করা। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় রুগ্নতা অতি সঙ্কটজনক অবস্থায় পৌছাবার পর আর্থিক সংস্থাগুলি তৎপর হয়ে ওঠে। বস্তুত এ নীতি শ্রমিক বিক্ষোভ এড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র; অর্থনীতির দিক থেকে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। জাতীয় সম্পদেরও অপচয়।

(v) তুলার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উৎপাদকদের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রেখে তুলার ন্যূনতম দাম নির্ধারণ করা সঙ্গত। তুলা উৎপাদনে দেশ স্বয়ম্ভর হয়ে না ওঠা পর্যন্ত তুলা রপ্তানি নিষিদ্ধ করা প্রয়োজন।

(vi) যত শীঘ্র সম্ভব বস্ত্র শিল্পে ভরতুকি দেয়া প্রথা বন্ধ করা সঙ্গত। পরিবর্তে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস ও দেশীয় বাজারে বস্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। ভারতীয় বস্ত্র আমদানির ওপর কতিপয় উন্নত দেশের যে নিয়ন্ত্রণ বিধি রয়েছে তা যাতে রহিত হয়, অবাধে যাতে ভারতীয় বস্ত্র বিদেশের বাজারে স্থান পেতে পারে সেজন্য সরকারকে তৎপর হতে হবে।

পাট শিল্প

ইতিবৃত্ত: 1855 সনে শ্রীরামপুরের কাছে অবস্থিত রিষড়াতে প্রথম পাট কল স্থাপিত হয়। তিরিশ বছর পর্যন্ত পাট শিল্পের বিশেষ কোন উন্নতি দেখা যায়নি। পরে এর দ্রুত উন্নতি ঘটতে থাকে। 1908 সনে ভারত পাট-দ্রব্য উৎপাদনের দিক থেকে ডাণ্ডিকে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পাট শিল্পের উন্নতি ঘটে। এর কারণ যুদ্ধের প্রয়োজনে পাট দ্রব্যাদির চাহিদা বৃদ্ধি। যুদ্ধশেষে পাট শিল্প যুদ্ধোত্তর স্বল্পকালীন চড়া বাজারের সুবিধা ভোগ করে, পরে একে মন্দার সম্মুখীন হতে হয়। 1929 সনে বিশ্বব্যাপী মন্দার ফলে 1933 সন পর্যন্ত অবস্থার বিশেষ অবনতি ঘটে। 1934 সন থেকে আবার উন্নতি দেখা দেয়। 1939 সনে পাট কলের সংখ্যা দাঁড়ায় 107, তাঁতের সংখ্যা 67,939 এবং টাকুর সংখ্যা 13,50,466। মূলধন 24 কোটি টাকা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পাট শিল্পের প্রচুর উন্নতি হয়। 1940 সনে ব্রিটিশ সরকারের নির্দিষ্ট সময়ে মাল গ্রহণের অক্ষমতার দরুন পাটের বাজারে মন্দা দেখা দেয়। এ অবস্থার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য জুট মিল এসোসিয়েশন সাপ্তাহিক শ্রমের সময় 54 ঘণ্টা থেকে কমিয়ে 45 ঘণ্টা নির্দিষ্ট করে দেয়। পরে প্রতি মাসে এক সপ্তাহ কল বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয়া হয়। 1941 সনে অবস্থার উন্নতি ঘটে। ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। 1942-43 সনে অবস্থার আবার অবনতি ঘটে। এর কারণ বার্মা জাপান কর্তৃক অধিকৃত হওয়ার ফলে কলিকাতার অবস্থা আশঙ্কাজনক হয়ে ওঠে। 1945-46 সনে পাট শিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। 1947 সনে আবার অবনতি ঘটে। এর কারণ প্রধানত কাঁচা পাট, কয়লা ও শ্রমিকের অভাব।

1947 সনে পাকিস্তানের জন্ম হওয়াতে ভারতের পাট শিল্পকে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। কারণ সবকটি পাট কল (113) পশ্চিম বাংলা তথা ভারতের অধীনে আসে আর পাট উৎপাদনের শতকরা 73 ভাগ পাকিস্তান রাষ্ট্রভুক্ত হয়। পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত হবার পর (1971) বাংলাদেশ ভারতের পাট শিল্পের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায়।

বর্তমান অবস্থা ঃ বর্তমানে ভারতের পাট শিল্প পৃথিবীর মোট পাটদ্রব্য উৎপাদনের প্রায় 32 শতাংশ ও রপ্তানির প্রায় 46 শতাংশের অধিকারী। পাট শিল্পে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় 300 কোটি টাকা। কর্মীর সংখ্যা প্রায় 25 লক্ষ। তাছাড়া প্রায় 40 লক্ষ পরিবার পাট চাষের সঙ্গে যুক্ত। 1983-84 সনে পাট শিল্পের মোট উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় 500 কোটি টাকা। এর মধ্যে প্রায় 200 কোটি টাকার পাট দ্রব্য রপ্তানি করা হয়।

1951-52 সনে পাট শিল্পের উৎপাদনের পরিমাণ 9·6 লক্ষ এমটি।

1964-65 সনে এর পরিমাণ 13·2 লক্ষ এমটি। 1974-75 সনে উৎপাদন হ্রাস পায় এবং মোট উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়ায় 9·38 লক্ষ এমটি। 1975-76 সনে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। সে বছর উৎপাদনের পরিমাণ 13·02 লক্ষ এমটি। 1980-81 ও 1982-83 সনে উৎপাদনের পরিমাণ যথাক্রমে 13·92 লক্ষ এমটি ও 13·38 লক্ষ এমটি।

পাট শিল্প রপ্তানি-ভিত্তিক। পাটদ্রব্যের রপ্তানি আশাপ্রদ নয়। 1963-1975 সনের মধ্যে পাটদ্রব্যের রপ্তানির পরিমাণ প্রায় 9 লক্ষ এমটি থেকে হ্রাস পেয়ে প্রায় 4·5 লক্ষ এমটি হয়। 1983-84 সনে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনৈতিক সমীক্ষায় রপ্তানির পরিমাণ প্রায় 3·25 লক্ষ এমটি দেখানো হয়েছে। রপ্তানি বাণিজ্যে এ মন্দার কারণ পাটদ্রব্যের বিকল্প দ্রব্যের ব্যবহারের প্রচলন বৃদ্ধি ও বাংলাদেশের পাট শিল্পের প্রসার ও প্রতিযোগিতা।

সমস্যা ঃ (i) কাঁচা পাট সরবরাহে অনিশ্চয়তা। আমাদের দেশে যে পাট উৎপাদন হয় তার পরিমাণ চাহিদার তুলনায় কম। তদুপরি উৎপাদন অনিশ্চিত বলা যেতে পারে। 1960-61 সনে পাট উৎপাদনের পরিমাণ 41·4 লক্ষ বেল ও 1969-70 সনে 56·0 লক্ষ এমটি। কিন্তু 1975-76 সনে উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পেয়ে 44·9 লক্ষ বেল হয়। 1981-82 সনে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে 67·9 লক্ষ এমটিতে দাঁড়ায়। আবার 1982-83 সনে তা হ্রাস পেয়ে 59·5 লক্ষ বেল হয়।

কাঁচা পাট উৎপাদনের স্থিরতার অভাবের ফলে পাটদ্রব্যের দাম অতিশয় ওঠানামা করে। এর ফলে পাটদ্রব্যের আমদানিকারকরা বিকল্প দ্রব্যের প্রতি বেশি আগ্রহশীল হয়ে উঠেছে। তাছাড়া প্রায়ই সময়মত রপ্তানি করতে না পারার দরুনও তারা আমদানির উপর আস্থা রাখতে পারছে না। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, পাট উৎপাদন ও পাটের দাম স্থিতিশীল করার উদ্দেশ্যে 1971 সনে জুট কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া স্থাপিত হয়।

(ii) যন্ত্রপাতি আধুনিকীকরণের অভাব। আমাদের দেশের পাট শিল্পের যন্ত্রপাতি অতি প্রাচীন। অনেক ক্ষেত্রে অকেজোও। ভারত আজ আর পাট শিল্পের একমাত্র অধিকারী নয়। বাংলাদেশ ছাড়া ব্রেজিল, ফিলিপাইনস, জাপান, থাইল্যাণ্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকাতেও পাট শিল্প গড়ে উঠেছে। সেসব দেশের পাট শিল্পের বনিয়াদ আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম

ও উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা। বাংলাদেশের পাট উন্নতমানের, শ্রমিকও সস্তা। ভারতের পক্ষে অবশ্যই তা অসুবিধার কারণ। এ অবস্থায় আমাদের দেশের পাট শিল্পের ভবিষ্যৎ আধুনিকীকরণের উপর অনেকাংশে নির্ভর করছে। টাস্ক ফোর্স অন জুট টেকস্টাইলস (1931)-এর রিপোর্টে প্রকাশ পাট শিল্প আধুনিকীকরণ ও তার বয়ন ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য প্রায় 300 কোটি টাকা দরকার। তাছাড়া কলকারখানা ও যন্ত্রপাতি নবীকরণের জন্যও প্রায় 90 কোটি টাকা প্রয়োজন।

(iii) উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি ও চাহিদা হ্রাস। ভারতীয় পাটদ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষাকৃত বেশি। এমনও অনুমান করা হয় যে, বাংলাদেশের পাটদ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় আমাদের দেশের উৎপাদন ব্যয়ের তুলনায় প্রায় 50 শতাংশ কম। এর কারণ আমাদের দেশের পাট শিল্পে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবহার কম, শ্রমিক মূল্যও বেশি। শ্রমিক অসন্তোষ, কাঁচাপাটের অভাব ও নিম্ন গুণগত মান, অনুন্নত পরিচালনা এবং বিদ্যুৎ ঘাটতি বর্তমানে বিশেষ সমস্যার রূপ নিয়েছে।

পাট শিল্প প্রধানত বিদেশের চাহিদার উপর নির্ভরশীল। শিল্পোন্নত দেশগুলিতে মন্দাভাব, পাটদ্রব্যের পরিবর্ত দ্রব্যের প্রতি তাদের ক্রমবর্ধমান আগ্রহ এবং সংরক্ষণ নীতির ফলে আমাদের পাটদ্রব্যের রপ্তানি হ্রাস পেয়েছে। অবশ্য দেশীয় বাজারে পাটদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে বর্তমানে পাটদ্রব্যের মোট উৎপাদনের প্রায় 60 শতাংশ দেশীয় বাজারের চাহিদা মিটাবার জন্য বিক্রয় করা হয়। দশ বছর আগেও এর পরিমাণ ছিল 40-45 শতাংশ।

প্রস্তাবঃ (i) সরকারের পক্ষে পাট শিল্প সম্পর্কে দীর্ঘমেয়াদী নীতি গ্রহণ করা সঙ্গত।

(ii) পাট সংগ্রহ ব্যাপারে জুট কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়ার একচেটিয়া অধিকার থাকা অবাঞ্ছিত নয়। অবশ্য এ ব্যাপারে তাকে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাহায্য নেয়ার সুযোগ দিতে হবে। পাটের দাম স্থিতিশীল রাখার উদ্দেশ্যে 'বাফার স্টক' সৃষ্টি করতে হবে। পাটের দাম এগ্রিকালচারেল প্রাইসেস কমিশন দ্বারা নির্ধারিত হবে।

(iii) শুধু উৎপাদন বৃদ্ধিই নয়, পাটের গুণগত মানও বৃদ্ধি করতে হবে। গবেষণা দ্বারা এরূপ প্রমাণিত হয়েছে যে, কম ব্যয়ে অতি উচ্চমানের তন্তু

সহজেই উৎপাদন করা যায়। এর ব্যাপক ব্যবহারিক মূল্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন।

(iv) পেট্রোলিয়ামের দাম বৃদ্ধি পাবার ফলে পাটদ্রব্যের প্রতিযোগী সিনথেটিক দ্রব্য পাটদ্রব্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠবে না সে আশায় না থেকে বরঞ্চ কিভাবে বর্তমানে সিনথেটিক দ্রব্যের সঙ্গে সরাসরি প্রতিযোগিতায় এঁটে ওঠা যায় সে বিষয়ে তৎপর হওয়া যুক্তিযুক্ত। এর একটি মাত্র পথ পাট শিল্পকে উন্নতিশীল করে পাটের বাজার বিস্তৃত করে তোলা।

(v) পাট শিল্পে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম আমদানির উপর বিধিনিষেধ এবং শুল্কের হার লাঘব করা প্রয়োজন।

(vi) ভারত ও বাংলাদেশ উভয়ের স্বার্থে একটি ঐক্য সংস্থা বা 'কনসোরটিয়াম' গঠন করা দরকার। বস্তুত আজও এ দু'দেশই বিশ্বের পাট শিল্পের নিয়ন্ত্রক। এ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক স্তরে 'বাফার স্টক' সৃষ্টির কথা ভাবা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে আমাদের জুট ম্যানুফ্যাকচারার্স ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিলের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক নয়। কাউন্সিল অনুন্নত পাটকলগুলিকে উন্নয়নের পথের নির্দেশ দেয়ার জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

(vii) 1985 সনের মে মাসে কলিকাতায় কাঁচাপাট উৎপাদন ও বাজারকরণ সমস্যা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার জন্য তিনদিনব্যাপী যে অধিবেশন হয় তাতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি সহ ইণ্ডিয়ান জুট মিলস এসোসিয়েসন ও অন্যান্য স্বার্থের প্রতিনিধিরাও অংশগ্রহণ করেন। তাদের মূল প্রস্তাবগুলি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

(i) যে জাতীয় কাঁচাপাট প্রয়োজন সেরূপ পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি করা ও উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করা। এর ফলে কাঁচাপাটের অভাব দূর হবে ও পাট শিল্পের পক্ষে আন্তর্জাতিক বাজারে সাফল্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা সম্ভব হবে।

(ii) পাট গবেষণার ফলাফল সাধারণ উৎপাদকদের কাছে অজ্ঞাত থেকে যাচ্ছে। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, পাট গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলি উৎপাদকদের প্রকৃত সমস্যার সঙ্গে পরিচিত নয়। এ সংযোগের অভাব দূর করার জন্য গণপ্রচারের মাধ্যমগুলিকে যথাযথ ব্যবহার করা হচ্ছে না। আমাদের দেশ আন্তর্জাতিক পাট সংস্থার অন্যতম সদস্য। এ সংস্থার মারফত

অন্যান্য দেশের পাট উৎপাদনের আধুনিক পদ্ধতি সম্পর্কে সংবাদাদি সংগ্রহ করা যেতে পারে।

(iii) অধিকাংশ উৎপাদকদেরই উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় আধুনিক যন্ত্রপাতি নেই। যথা, বীজ বোনার খাত তৈরি করার যন্ত্র।

(iv) ভারতের সাতটি রাজ্যে পাট উৎপাদন হয়ে থাকে। এ রাজ্যগুলির পাট উৎপাদকদের চিহ্নিত করার জন্য পরিচয়-পত্র বা 'জুট-কার্ড'-এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এর ফলে জুট কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়ার পক্ষে অধিক সংখ্যক পাট উৎপাদকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা সহজ হবে। কেবল পরিচয়-পত্র প্রাপ্ত উৎপাদকদের কাছ থেকেই পাট ক্রয় করা চলবে।

(v) পাট উৎপাদকদের সমবায় সমিতিগুলিকে আরো কার্যক্ষম করে তুলতে হবে। পাটের বাজার নিয়ন্ত্রণ করার গুরুত্বের উপরও জোর দেয়ার প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

(vi) জুট কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়াকে বিভিন্ন পাট উৎপাদক রাজ্যের উৎপাদন ব্যয়ের ভিত্তিতে সমর্থন দাম নির্ণয় করতে হবে।

(vii) উৎপাদকেরা যাতে যথাসময় উচ্চমানের বীজ ও ক্রেডিট পেতে পারে তার সুব্যবস্থা এবং পাটের ক্ষেত্রেও ফসল বীমা কর্মসূচী চালু করতে হবে।

লৌহ ও ইস্পাত শিল্প

ইতিবৃত্ত ঃ 1874 সনে ঝরিয়ার কয়লা খনির কাছে বরাকর আয়রণ ওয়ার্কস স্থাপিত হয়। লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের এটিই প্রথম উদ্যম। 1889 সনে এ সংস্থাটি বেঙ্গল আয়রণ ও স্টিল কোম্পানি ক্রয় করে নেয়। 1900 সনে এর উৎপাদনের পরিমাণ 35,000 টন অপরিশোধিত লৌহ-পিণ্ড। কিন্তু ইস্পাত তৈরি করার চেষ্টায় এর উদ্যম ব্যর্থ হয়।

1907 সনে সিংভূম জেলার অন্তর্গত সাচকিতে (বর্তমান টাটানগর) জে. এন. টাটার উদ্যোগে টাটা আয়রণ এণ্ড স্টীল কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়। 1911 সনে এ কোম্পানিতে অপরিশোধিত লৌহ পিণ্ড ও 1913 সনে ইস্পাত তৈরি হয়।

1919 সনে বার্ণপুরে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড স্টীল কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়। 1923 সনে মাইসর স্টেট আয়রণ ওয়ার্কস স্থাপিত হয়। 1936

সনে স্টীল কর্পোরেশন অব বেঙ্গল স্থাপিত হয়। 1939 সনে এর উৎপাদন সুরু হয়।

ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত শিল্প মোটামুটি উন্নতির ধারা অক্ষুণ্ণ রেখে চলতে সমর্থ হয়। 1900 সনে অপরিশোধিত লৌহ-পিণ্ড উৎপাদনের পরিমাণ 35,000 টন। 1938-39 সনে এর পরিমাণ 1,576,000 টন। 1916-17 সনে ইস্পাত তৈরির পরিমাণ 139,433 টন। 1927-28 সনে এর পরিমাণ 599,565 টন। তৈরী ইস্পাতের পরিমাণ যথাক্রমে 98,726 টন ও 428,654 টন। 1938-39 সনে ইস্পাত-পিণ্ড উৎপাদনের পরিমাণ 977,000 টন ও তৈরী ইস্পাত উৎপাদনের পরিমাণ 726,000 টন। 1924 সন থেকে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প সংরক্ষণের সুবিধা ভোগ করতে থাকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের পক্ষে শুভ হয়। নানা অসুবিধার মধ্যেও যুদ্ধের চাহিদা মিটাবার জন্য তাকে বিবিধ ইস্পাত নির্মিত দ্রব্য প্রস্তুত করতে হয়। যুদ্ধকালীন প্রচুর উন্নতি সত্ত্বেও ভারত ইস্পাতে স্বয়ম্ভর হয়ে উঠতে সমর্থ হয় না।

বর্তমান অবস্থা ঃ স্বাধীনতার পূর্বে ভারতে তিনটি লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা ছিল। যথা, টাটা আয়রণ এণ্ড স্টীল কোম্পানি (টিসকো), ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড স্টীল কোম্পানি (ইসকো) ও মাইসোর আয়রণ এণ্ড স্টীল ওয়ার্কস। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পূর্বে এ তিনটি কারখানা বার্ষিক গড়ে 1·7 মিলিয়ন এমটি অপরিশোধিত লৌহ-পিণ্ড ও 1 মিলিয়ন এমটি ইস্পাত-পিণ্ড উৎপাদন করত। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে পাবলিক সেক্টরে তিনটি ইস্পাত কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। কারখানাগুলি পশ্চিম জার্মানীর সহায়তায় রাউরকেলা (উড়িষ্যা), সোভিয়েত ইউনিয়নের সহযোগিতায় ভিলাই (মধ্যপ্রদেশ) ও গ্রেট ব্রিটেনের সহায়তায় দুর্গাপুরে (পশ্চিম বাংলা) অবস্থিত। এর ফলে ইস্পাত শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা চারগুণ বৃদ্ধি পায়। টিসকো ও ইসকোর উৎপাদন ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। বৃদ্ধির পরিমাণ যথাক্রমে 1 মিলিয়ন ইস্পাত-পিণ্ড এমটি থেকে 2 মিলিয়ন ইস্পাত-পিণ্ড এমটি এবং 0·5 মিলিয়ন ইস্পাত-পিণ্ড এমটি থেকে 1 মিলিয়ন ইস্পাত-পিণ্ড এমটি।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সহায়তায় বোকারোতে পাবলিক সেক্টরে চতুর্থ ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হয়। 1978 সনের ফেব্রুয়ারীতে কারখানাটি

চালু হয়। এর প্রারম্ভিক উৎপাদন ক্ষমতা 1·7 মিলিয়ন এমটি। চতুর্থ ও পঞ্চম পরিকল্পনায় এদের উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহারের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাছাড়া পাবলিক সেক্টরে আরো তিনটি ইস্পাত কারখানা প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তুতি নেয়া হয়। এ তিনটি প্রস্তাবিত কারখানার স্থান সালেম (অন্ধ্রপ্রদেশ), বিজয়নগর (কর্ণাটক) ও বিশাখাপতনম (অন্ধ্রপ্রদেশ)। ষষ্ঠ পরিকল্পনাকালে ভিলাই ও বোকারো ইস্পাত কারখানার প্রসার সাধন করে প্রত্যেকের উৎপাদন ক্ষমতা 4 মিলিয়ন ইস্পাত পিণ্ড এমটি করা হয়।

1976 সনের 14 জুলাই সরকার ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড স্টীল কোম্পানিকে (ইসকো) অধিগ্রহণ করে। টিসকো ও ইসকো সহ পাবলিক সেক্টরের চারটি ইস্পাত কারখানার অনুমিত উৎপাদন ক্ষমতা 11·4 মিলিয়ন এমটি। এর মধ্যে 9·4 মিলিয়ন এমটি পাবলিক সেক্টরে ও 2·0 মিলিয়ন এমটি প্রাইভেট সেক্টরে। বোকারো ও ভিলাইয়ের প্রসার সাধন সম্পূর্ণ হলে মোট উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় 14·4 মিলিয়ন এমটি এবং বিশাখাপতনমে যে ইস্পাত কারখানা হচ্ছে তার উৎপাদন ক্ষমতা হবে 3·0 মিলিয়ন এমটি। সুতরাং আশা করা যায় 80 দশকের শেষাশেষি ইস্পাত-পিণ্ড উৎপাদন ক্ষমতা 17·5 মিলিয়ন এমটি হবে। বর্তমান অবস্থাতে দেখা যাচ্ছে, কাঁচা ইস্পাতের উৎপাদন 1982 সনে ছিল 11 মিলিয়ন এমটি, হ্রাস পেয়ে 1982 সনে দাঁড়িয়েছে 10·2 মিলিয়ন এমটি। পরে অবস্থার উন্নতি হয়। 1984 সনে কাঁচা ইস্পাতের উৎপাদনের পরিমাণ 10·5 মিলিয়ন এমটি। 1985 সনের জন্য এর পরিমাণ ধরা হয়েছে 12·5 মিলিয়ন এমটি।

ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব স্টীল ইনডাস্ট্রির সূত্রে প্রকাশ পৃথিবীতে ইস্পাত ব্যবহারের পরিমাণ 1990 সনের 722 মিলিয়ন এমটি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 1995 সনে 745 মিলিয়ন এমটি হবে। এবং আগামী কয়েক দশকের মধ্যে উন্নতিশীল দেশগুলিতে ইস্পাত উৎপাদন বৃদ্ধির হার আরো বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা আছে। পৃথিবীতে ইস্পাত শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতার 65 শতাংশের মত ব্যবহৃত হয়। অনেক ক্ষেত্রে ইস্পাত শিল্প অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। গত আট বছরে পাশ্চাত্যের ইস্পাত শিল্পের প্রায় 5 লক্ষ কর্মীর চাকরি চলে গেছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে ভারতীয়

ইস্পাত শিল্প কিছুটা কৃতিত্বের দাবি করতে পারে। স্টীল অথারিটি অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড 1983-84 সনে দেশীয় বাজারে সর্বাধিক পরিমাণ ইস্পাত বিক্রয় করতে সমর্থ হয়। 1982-83 সনের তুলনায় এ বিক্রয় বৃদ্ধির হার 6·2 শতাংশ। ভারতে ইস্পাত আমদানি হ্রাস, দেশীয় বাজারের প্রয়োজন-ভিত্তিক উৎপাদন ও তীব্র প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বের ইস্পাত রপ্তানি বাজারে পুনঃপ্রবেশ ভারতীয় ইস্পাত শিল্পের সাম্প্রতিক উল্লেখ্য ঘটনা।

সমস্যাঃ (i) লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে যে উৎপাদন ক্ষমতা সৃষ্টি হয়েছে তার পূর্ণ ব্যবহার করা হচ্ছে না বা তার সুযোগও নেই বলা চলে। কোন কোন ক্ষেত্রে 55 শতাংশ উৎপাদন ক্ষমতা অব্যবহৃত রয়েছে।

(ii) লৌহ ও ইস্পাত কারখানা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা ও রূপায়ণের ত্রুটি অস্বীকার করা সমীচীন হবে না। এর ফলে কারখানা নির্মাণের কাজ বিলম্বিত হয় ও পরিকল্পিত ব্যয় বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

(iii) মিনি ইস্পাত কারখানা সাধারণত স্থানীয় চাহিদা মিটাবার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এদের সংখ্যা 147 এবং বার্ষিক মোট উৎপাদন ক্ষমতা 3·29 মিলিয়ন এমটি। 1977-78 সনে এ সমস্ত কারখানাগুলি রুগ্ন হয়ে ওঠে। 1978-79 সনে এদের মধ্যে 130 কারখানা কর্মরত ছিল। সে বছর এদের ইস্পাত উৎপাদনের মোট পরিমাণ ছিল 1·73 মিলিয়ন এমটি। মিনি ইস্পাত কারখানাগুলির রুগ্নতার প্রধান কারণ প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাব, বিদ্যুৎ ঘাটতি ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে তাদের অপরিকল্পিত অগ্রাধিকার দেয়া। এদের পুনর্বিন্যাস সঙ্গত, কিন্তু সমস্যামূলক।

(iv) ভারতের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের অন্যান্য সমস্যার মধ্যে উল্লেখ্য, ভারতীয় ইস্পাত নিম্ন মানসম্পন্ন, দাম নিয়ন্ত্রণ, পাবলিক সেক্টরভুক্ত শিল্পে আমলাতন্ত্রের প্রভাব, ও পরিবহনের অসুবিধা।

মন্তব্যঃ লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের উন্নয়ন প্রধানত উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যার উপর নির্ভর করে। সেদিক দিয়ে ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত শিল্প স্বয়ম্ভর বলা চলে। স্টীল অথারিটি অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড (এস এ আই এল) এবং মেটালারজিক্যাল এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কনসালটেন্টস (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড (এম ই সিও এল) প্রভৃতি সংস্থাগুলির গবেষণা বিভাগ এ বিষয়ে যথেষ্ট সতর্ক ও উদ্যোগী। আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতের ইস্পাত শিল্পের সাফল্য সূচিত হলেও এর পেছনে যথেষ্ট ভরতুকির সমর্থন আছে, যা বাঞ্ছনীয় নয়।

উৎপাদন ব্যয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে কতিপয় নির্বাচিত ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ও উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। এ অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতার একটি বিশেষ অংশ বিদেশী বাজারের চাহিদা মিটাবার জন্য সংরক্ষণ প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তিবিদ্যা ছাড়া উৎপাদন ব্যয় প্রতিযোগিতামুখী করা সম্ভব নয়।

ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প

ইতিবৃত্ত ঃ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প প্রধানত স্বাধীনতার পর প্রাধান্য লাভ করতে থাকে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ভারী ও মৌল শিল্পের উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। বস্তুত এর পর থেকেই ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের উন্নয়ন সুরু হয়। এমনকি রপ্তানি বাণিজ্যেও শিল্পটি প্রাধান্য পেতে থাকে। ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের উৎপাদনের মধ্যে রয়েছে বিদ্যুৎ সরবরাহকারী যন্ত্রপাতি, সঞ্চারণ ও বণ্টনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, ইস্পাত শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি, রাসায়নিক দ্রব্য ও সার উৎপাদন কলকারখানার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি, বিদ্যুৎ ও নির্মাণ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি, রেলের রোলিং স্টক, ব্যবসায়ের জন্য প্রয়োজনীয় যান, মাটি সরাবার যন্ত্র, কৃষি যন্ত্রপাতি প্রভৃতি।

বর্তমান অবস্থা ঃ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের দ্রুত উন্নয়ন লক্ষণীয়। 1950-51 সনে মোট উৎপাদনের পরিমাণ ছিল 50 কোটি টাকা। 1983-84 সনে উৎপাদনের পরিমাণ 9,000 কোটি টাকা। অর্থাৎ, ত্রিশ বছরে উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ 180 গুণ।

রপ্তানি বৃদ্ধিও উল্লেখযোগ্য। 1950-51 সনে ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যের রপ্তানির মোট পরিমাণ ছিল 6 কোটি টাকা। 1983-84 সনে এর পরিমাণ দাঁড়ায় 1,170 কোটি টাকা বা দেশের মোট রপ্তানির প্রায় 13 শতাংশ। বর্তমানে ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যের রপ্তানির প্রায় 40 শতাংশ যৌথ উদ্যোগ ও প্রকল্প সরবরাহের সঙ্গে যুক্ত। প্রকল্প রপ্তানি ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের প্রসারের একটি নতুন দিক খুলে দিয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে, বিশ্বের বাজারে ভারতের ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যের রপ্তানির পরিমাণ আদৌ উল্লেখযোগ্য নয়। 1979 সনে বিশ্বের বাজারে ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যের মোট রপ্তানির পরিমাণ 506·20 কোটি টাকা। এতে ভারতের অংশ 0·18 শতাংশ মাত্র।

সমস্যা : (i) সংরক্ষণ। উন্নত দেশগুলি সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করার ফলে সেসব দেশে ভারতের ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য রপ্তানি ব্যাহত হচ্ছে।

(ii) সোভিয়েত ইউনিয়নের আমদানির উপর নির্ভরশীলতা। ভারতের ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যের প্রধান ক্রেতা সোভিয়েত ইউনিয়ন। কোন একটি দেশের উপর এরূপ নির্ভরশীলতা যথেষ্ট ঝুঁকিমূলক। প্রকল্প রপ্তানির ব্যাপারেও পশ্চিম এসিয়ার উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। নতুন ক্রেতা, বিস্তৃত বাজার ও উৎপন্ন দ্রব্যের গুণগত মান ক্রমাগত বৃদ্ধির উপর ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের ভবিষ্যৎ বিশেষভাবে নির্ভরশীল।

(iii) কাঁচামালের অভাব, বিদ্যুৎ, কয়লা ও পরিবহনের অভাব, আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার অভাব, উচ্চ উৎপাদন ব্যয়, ফিনান্সের অভাব প্রভৃতি ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের সমস্যাগুলির অন্যতম।

প্রস্তাব : ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের মধ্যে যে ক্ষুদ্রায়তন এককগুলি রয়েছে তাদের সুসংবদ্ধ করা প্রয়োজন। তারা যাতে সহযোগী শিল্পরূপে যথাযথ অংশগ্রহণ করতে পারে তার ব্যবস্থা করাও দরকার। ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের উন্নয়ন প্রযুক্তিবিদ্যার আধুনিকীকরণ ও স্বয়ম্ভরতার উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। এ বিষয়ে গবেষণা ও গবেষণালব্ধ জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্পর্কে সরকারী উদ্যোগের প্রয়োজন। এ ব্যাপারে বিদেশের সহযোগিতার প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। উপকরণের অভাবে যাতে উৎপাদন ব্যাহত না হয় সে দিকে দৃষ্টি রেখে আমদানি নীতি নির্ধারণ করা সঙ্গত। এর ফলে রপ্তানি বৃদ্ধি করা সহজ হবে।

চিনি শিল্প

ইতিবৃত্ত : চিনি শিল্প ভারতের অন্যতম প্রধান শিল্প। এ শিল্প প্রধানত যুক্তপ্রদেশ ও বিহারে অবস্থিত। 1932 সনে এ শিল্প সংরক্ষিত হয়। নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা দূর করার জন্য 1937 সনে 90 চিনির কল একত্র হয়ে ইণ্ডিয়ান সুগার সিণ্ডিকেট স্থাপন করে। 1937 সনে ভারত সরকার ইণ্টারন্যাশনাল সুগার এগ্রিমেণ্টে যোগদান করে। 21 প্রধান চিনি উৎপাদনকারী দেশের মধ্যে এ চুক্তি সম্পাদন হয়। এর উদ্দেশ্য আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা। এর ফলে ভারত পাঁচ বছরের জন্য সমুদ্রপথে একমাত্র বার্মা ছাড়া অন্য কোন দেশে চিনি রপ্তানি করার অধিকার থেকে

বঞ্চিত হয়। অথচ অন্যান্য দেশ অবাধে ভারতে চিনি রপ্তানি করার সুবিধা পায়।

চিনি শিল্প দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিশেষ সুযোগ গ্রহণ করতে সমর্থ হয়নি। সে সময় রপ্তানি বৃদ্ধি পায়নি। বরঞ্চ বণ্টন ও যানবাহনের অসুবিধার জন্য দেশীয় বাজারে চিনির অভাব ঘটে। চিনির দাম নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এর ফলে উৎপাদন হ্রাস পায়। 1948-49 সনে চিনির কলের সংখ্যা ছিল 134, উৎপাদনের পরিমাণ 1,000,900 টন। 1943-44 সনে উৎপাদনের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা বেশি। এ সময় চিনির কলের সংখ্যা ছিল 145; উৎপাদনের পরিমাণ 1,200,700 টন। উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য ইক্ষু উন্নয়ন, গবেষণা ও ইক্ষু উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়। 1948-49 সনে ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল সুগারকেন কমিটি 5 বছরের জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করে। চিনির উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য ভারত সরকারও পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ পরিকল্পনা অনুযায়ী 1950 সনে 16 লক্ষ টন চিনি উৎপাদন হবে বলে ধরা হয়। 1949 সনের 31 মার্চ পর্যন্ত চিনি শিল্পের উপর সংরক্ষণ বলবৎ ছিল। এর কার্যকাল 1950 সনের মার্চ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। পরে ট্যারিফ বোর্ডের অনুমোদনক্রমে সংরক্ষণের পরিবর্তে চিনির উপর আবকারী শুল্ক ধার্য করা হয়।

বর্তমান অবস্থা ঃ 1950-51 সনে, প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রারম্ভে, আমাদের দেশে চিনির কলের সংখ্যা ছিল 139। মোট উৎপাদনের পরিমাণ ছিল 11·16 লক্ষ এমটি। 1981-82 সনে চিনির কলের সংখ্যা হয় 320। 1983-84 সনে মোট উৎপাদনের পরিমাণ 60 লক্ষ এমটি। সরকারের লাইসেন্স নীতি চিনি শিল্পের কাঠামোগত পরিবর্তন সাধন করে। ফলে মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, গুজরাট, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, কেরল প্রভৃতি রাজ্যে চিনির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এর আগে উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থান চিনি শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। দ্বিতীয়ত, সমবায় সেক্টরে চিনি শিল্পের উন্নয়ন ঘটে। 1981-82 সনে মোট 320 চিনির কারখানার মধ্যে 154 সমবায় সেক্টরভুক্ত।

চিনি উৎপাদনে স্থিতিশীলতার অভাব উল্লেখ্য। 1977-78 সনে উৎপাদনের পরিমাণ 64·72 লক্ষ এমটি। কিন্তু 1978-79 ও 1979-80 সনে উৎপাদনের পরিমাণ যথাক্রমে 58·58 লক্ষ এমটি ও 39 লক্ষ এমটি।

পরে অবশ্য এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। 1980-81 ও 1981-82 সনে উৎপাদনের পরিমাণ যথাক্রমে 59·91 লক্ষ এমটি ও 84·38 লক্ষ এমটি। 1983-84 সনে উৎপাদন আবার হ্রাস পেয়ে 60 লক্ষ এমটি হয়। ইণ্টারন্যাশনাল সুগার এগ্রিমেণ্ট (অক্টোবর 1977) অনুযায়ী ভারতকে 825,000 এমটি চিনি রপ্তানির অধিকার দেয়া হয়। এ চুক্তির মেয়াদ 1978 সনের পয়লা জানুয়ারী থেকে 1982 সনের 31 ডিসেম্বর পর্যন্ত ছিল। এ পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের চিনি আমদানি মোটেও উৎসাহজনক নয়। ইণ্টারন্যাশনাল সুগার অর্গানাইজেসন ভারতকে 1980-81 সনের জন্য 8·57 লক্ষ এমটি চিনি রপ্তানির কোটা দেয়। কিন্তু সে বছর ভারতের রপ্তানির পরিমাণ ছিল মাত্র 60,000 এমটি। 1981-82 ও 1982-83 সনে রপ্তানির পরিমাণ যথাক্রমে 4·2 লক্ষ এমটি ও 7·1 লক্ষ এমটি।

সমস্যা : (i) ইক্ষুর সরবরাহের অভাব। চিনি উৎপাদনের মোট ব্যয়ের দুই-তৃতীয়াংশ ব্যয় হয় ইক্ষু ক্রয় খাতে। স্পষ্টতই ইক্ষুর দামের তারতম্যের উপর চিনির দামের বিশেষ তারতম্য ঘটে। ইক্ষুর উৎপাদন আদৌ স্থিতিশীল নয়। এর প্রধান কারণ ইক্ষু উৎপাদন ব্যাপারে পরিকল্পনার অভাব, গুড় ও খান্দসরি উৎপাদনের জন্য ইক্ষুর চাহিদা বৃদ্ধি এবং ইক্ষু উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সেচ, সার, বীজ প্রভৃতির অভাব। কীট ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাবও উপেক্ষণীয় নয়। তাছাড়া ইক্ষু উৎপাদক ও চিনির কলের মধ্যে যে মধ্যজীবীরা রয়েছে তারাও ইক্ষুর দাম প্রভাবিত করে থাকে।

(ii) চিনির প্রতিযোগী গুড় ও খান্দসরি। এ প্রতিযোগিতায় গুড় ও খান্দসরি কতগুলি বিশেষ সুবিধা ভোগ করে থাকে। যেমন, চিনির উৎপাদন, দাম ও বণ্টনের উপর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে; গুড় ও খান্দসরি এরূপ নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত। চিনি শিল্পকে নানাপ্রকার কর ও শুল্কের ভার বহন করতে হয়। গুড় ও খান্দসরি তা থেকে মুক্ত।

(iii) আমাদের দেশে চিনি উৎপাদনের ব্যয় বেশি। এর কারণ ইক্ষুর উৎপাদন ও সরবরাহ কম, আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব, বহুবিধ নিয়ন্ত্রণ এবং চিনির নিয়ন্ত্রিত দাম উৎসাহজনক নয়।

(iv) ভারতের চিনি শিল্প স্থিতিসম্পন্ন নয়। ফলে মাঝে মাঝে তাকে

সরকারের নিয়ন্ত্রণের অধীনে আসতে হয়েছে। 1952-53 সন থেকে 1957-58 সন, 1961-62 সন থেকে 1962-63 সন (এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যন্ত), 1970-71 সন থেকে 1971-72 সন ও 1978 সনের আগস্ট থেকে 1979 সনের অক্টোবর পর্যন্ত চিনি শিল্প নিয়ন্ত্রণ মুক্ত ছিল। দেখা গেছে, নিয়ন্ত্রণ তুলে নেয়ার ফলে ইক্ষুর চাষ ও চিনির উৎপাদন হ্রাস পায়। চিনির দাম যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়।

(v) বিদেশে ভারতের চিনি রপ্তানির বৃদ্ধির পথে সবচেয়ে বড় বাধা উন্নত দেশগুলির আমদানি নিয়ন্ত্রণ। অধিকাংশ চিনি রপ্তানিকারক দেশ (কিউবা, ব্রেজিল, মেক্সিকো, মরিসাস ও অষ্ট্রেলিয়া) রপ্তানির জন্য দীর্ঘ-মেয়াদী চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার পক্ষপাতি। যে দামে তারা চুক্তিবদ্ধ হতে চায় তা চলতি আন্তর্জাতিক দামের চেয়ে বেশি। এ অবস্থায় ভারতীয় চিনি শিল্পকে আন্তর্জাতিক বাজারের অ-চুক্তিবদ্ধ ক্ষেত্রের সীমিত চাহিদার অনিশ্চয়তার উপর নির্ভর করে চলতে হয়। চিনি ইক্ষু ও বীট উভয় থেকেই উৎপাদন করা যায়। ভারত বীট চিনি উৎপাদন করে না। বিদেশেও কেবল ইক্ষু চিনির চাহিদা। ফলে ভারতের চিনি শিল্প আন্তর্জাতিক বাজারের উপর বেশি নির্ভরশীল।

প্রস্তাবঃ কমিটি অন রিহেবিলিটেসন এণ্ড মডার্ণআইজেসন অব স্যুগার ফ্যাক্টরিজ ও দাগলি কমিটি উভয়ই ভারতের চিনি শিল্পের বিভিন্ন দিকের পর্যালোচনা করে একটি সংযোজিত নীতি উদ্ভাবনের প্রস্তাব রেখেছে। এরূপ নীতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, বর্তমানে 10 মিলিয়ন এমটি চিনির যে 'বাফার স্টক' আছে তার আয়তন বৃদ্ধি করতে হবে যাতে দাম সবসময় সমতায় রাখা যায়। ইক্ষুর সমর্থন দাম এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যাতে ইক্ষু উৎপাদন স্থিতিশীল হতে পারে। খোলা বাজারের চিনি ও লেভি চিনির দামের ব্যবধান হ্রাস করে ক্রমে এ দ্বৈত দাম প্রথার বিলোপ সাধন করতে হবে। ইক্ষুর ব্যবহারের ব্যাপারে গুড় ও খান্দসরি যে বিশেষ সুবিধা ভোগ করে তা আবকারী শুল্ক ধার্য করে দূর করতে হবে।

প্ল্যানিং কমিশন 21 সদস্যবিশিষ্ট একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ নিযুক্ত করেছে। তারা চিনির চাহিদা, উৎপাদন ও উৎপাদন ক্ষমতার পরিমাপ করবে এবং চিনি শিল্পের উন্নয়নের জন্য প্রস্তাব রাখবে। তাদের প্রস্তাবের দিকে দৃষ্টি রেখে সপ্তম পরিকল্পনায় চিনি শিল্প সম্পর্কিত কর্মসূচী রচিত হবে।

উপসংহার

ভারতে শিল্পোন্নয়ন আশানুরূপ নয়। শিল্পোন্নয়নের হার 1981-82 সনে ছিল 8·6 শতাংশ, 1982-83 সনে হ্রাস পেয়ে হয়েছে 3·9 শতাংশ। 1983-84 সনে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়; উৎপাদন বৃদ্ধির হার 5·2 শতাংশ। এরূপ মন্দার কারণ প্রথমত, চাহিদার অভাব। উৎপাদন ক্ষমতার বৃদ্ধির সঙ্গে সমতা রেখে চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে না। তা সত্ত্বেও কোন কোন ক্ষেত্রে বর্ধিত চাহিদা আমদানির আশ্রয় নিয়ে মিটানো হয়। তাছাড়া চোরা-পথেও বিদেশ থেকে মাল আমদানি হয়। যার ফলে দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি বর্ধিত চাহিদার সুযোগ নেয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অনুমিত, বছরে প্রায় 1000 কোটি টাকার সিনথেটিক বস্ত্র চোরা-পথে আমাদের দেশে আমদানি করা হয়। এর ফলে শুধু বস্ত্র শিল্প নয়, সরকারেরও কোটি কোটি টাকার রাজস্বের ক্ষতি হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, মূলধন দ্রব্যের চাহিদার অভাব। ফলে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তৃতীয়ত, অনেক রাজ্যে শক্তি ও কয়লার অভাব বিরাট শিল্প সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া পরিবহন ব্যবস্থার দুরবস্থা তো রয়েছেই। শক্তির অভাবের পরিমাণ 1982-83 সনে ছিল 9·6 শতাংশ, 1983-84 সনে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে 10·8 শতাংশ। 1984 85 সনে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়; অভাবের পরিমাণ 6 শতাংশের মত। শিল্প স্বার্থের বক্তব্য, 1983-84 সনে কয়লা-সরবরাহের কিছুটা উন্নতি দেখা গেলেও স্টিম কয়লার অভাবের পরিমাণ প্রায় 15 শতাংশ। এবং কয়লা সাধারণত নিম্নমানের।

শিল্প বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির বক্তব্য, এ অবস্থায় সরকারকে শিল্পদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে হবে। সেজন্য প্রয়োজন আবকারী শুল্ক কাঠামোর পুনর্বিন্যাস ও দীর্ঘস্থায়ী ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়ের ব্যাপারে হায়ার পারচেজ প্রথাকে উৎসাহ দেয়া। তাছাড়া নতুন বিনিয়োগের উপর যে সমস্ত বাধানিষেধ আছে তা সরিয়ে নেয়া, বিনিয়োগের জন্য অনুমোদন যাতে সহজে পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করা এবং কোর সেক্টর ও রপ্তানি-ভিত্তিক শিল্প এককগুলিকে এমআরটিপি এ্যাক্ট-এর আওতার বাইরে নিয়ে আসা। আধুনিক প্রযুক্তি-বিদ্যার উপযোগিতা ও গুরুত্ব, তৃতীয় পৃথিবীর দেশগুলিতে ভিত-কাঠামো প্রকল্প রপ্তানি, শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের উন্নতির প্রয়োজনীয়তাও তাদের বক্তব্যে স্থান পেয়েছে।

মূল কথা, শিল্প দ্রব্যের চাহিদার অভাব—এ অভাব দেশে ও বিদেশে, উভয় ক্ষেত্রেই। এর প্রকৃত কারণ শুল্কের চাপ, চোরাকারবার, সংরক্ষণ নীতি বা আমলাতন্ত্র নয়; প্রকৃত কারণ আয় ও সম্পদ বণ্টনে প্রচণ্ড অসমতা—দেশভিত্তিক ও পৃথিবীভিত্তিক।

একদিকে প্রযুক্তিবিদ্যা দ্রুত এগিয়ে চলেছে, বিপরীত দিকে অসমতা ততোধিক দ্রুততার সঙ্গে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ অবস্থায় চাহিদা সঙ্কট বা সামাজিক সঙ্কট বা রাজনৈতিক সঙ্কট এড়াবার পথ নেই, বিলম্বিত করা সম্ভব মাত্র। বস্তুত, প্রযুক্তিবিদ্যার অসীম উৎপাদন শক্তির মধ্যেই রয়েছে পুঁজি পুঞ্জীভূত হওয়ার উদ্যম ও নেতিবাচক শক্তিরূপী অসমতা প্রচণ্ড হয়ে ওঠার মর্মকথা।

15 শিল্প নীতি, ফিনান্স ও বিদেশী মূলধন

1. শিল্প নীতি

ইনডাস্ট্রিয়াল পলিসি রেজোলিউসন 1948

1948 সনের 6 এপ্রিল ভারত সরকার সংসদে দেশের শিল্প নীতি ঘোষণা করে। শিল্প নীতিটি মিশ্র অর্থনীতি দ্বারা পরিকল্পিত। অর্থাৎ, এ নীতিতে সমস্ত শিল্প রাষ্ট্রায়ত্তকরণ অথবা শিল্প সম্বন্ধে সরকারের অবাধ নীতি কোনটিই স্থান পায়নি। পক্ষান্তরে রাষ্ট্র ও ব্যক্তি উভয়কেই শিল্পোন্নয়নে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেয়া হয়েছে।

শিল্প নীতিতে শিল্পগুলিকে চার ভাগে ভাগ করা হয়ঃ (i) রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকারমূলক শিল্প; (ii) সে সমস্ত শিল্প যাদের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন রাষ্ট্রের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণাধীন; (iii) রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত শিল্প; (iv) অবশিষ্ট শিল্প সাধারণত বেসরকারী অথবা সমবায় মালিকানা ও পরিচালনার জন্য খোলা থাকবে।

(i) রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকারমূলক শিল্পের মধ্যে রয়েছে রেলপথ, ডাক ও তার, দেশরক্ষা সম্পর্কিত শিল্প, আনবিক শক্তি উৎপাদন ও নিয়ন্ত্রণ এবং অন্যান্য নতুন শিল্প প্রচেষ্টা যাদের উন্নয়নের দায়িত্ব সরকার স্বয়ং গ্রহণ করতে পারে।

(ii) রাষ্ট্রের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প যাদের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল সেগুলি হচ্ছে কয়লা, লৌহ ও ইস্পাত; বিমান, জাহাজ নির্মাণ, টেলিফোন, তার, বেতার গ্রহণকারী যন্ত্র ছাড়া, এবং খনিজ তেল। এ সমস্ত শিল্পের উন্নয়নের দায়িত্ব একান্তভাবে রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত থাকলেও জাতীয় স্বার্থের খাতিরে সরকার, নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষ, বেসরকারী উদযোগের সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারে। এ সমস্ত শিল্প পরিচালনার দায়িত্ব 10 বছরের মধ্যে রাষ্ট্র স্বয়ং গ্রহণ করবে না। অবশ্য যে কোন শিল্প যে কোন সময়ে রাষ্ট্রায়ত্ত করার অধিকার রাষ্ট্রের আছে। 10 বছর এ সমস্ত শিল্পগুলির উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্র প্রাইভেট সেক্টরকে সব রকম সাহায্য করতে

সম্মত থাকবে। 10 বছর পরে প্রয়োজন বোধ করলে এদের রাষ্ট্রায়ত্ত করা হবে। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন কর্পোরেশন দ্বারা পরিচালিত হবে।

(iii) যে সমস্ত শিল্পে অধিক মূলধন ও বিশেষ দক্ষ কর্মীর প্রয়োজন সে সমস্ত শিল্প কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হবে। যথা,

(1) লবণ, (2) অটোমোবাইল, (3) আদি চালক, (4) বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনিয়ারিং, (5) অন্যান্য ভারী যন্ত্র, (6) ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি, (7) ভারী রাসায়নিক দ্রব্য, ফার্মাসিউটিক্যাল ড্রাগস, (8) বৈদ্যুতিক রাসায়নিক শিল্প, (9) অ-লৌহ নির্মিত ধাতু, (10) রবার উৎপাদন, (11) কল চালাবার শক্তি ও শিল্প সুরাসার, (12) তুলা বস্ত্র ও পশম বস্ত্র, (13) সিমেণ্ট, (14) চিনি, (15) কাগজ ও সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ, (16) বিমান পথ ও সমুদ্র পথ, (17) খনিজ দ্রব্যাদি এবং (18) দেশরক্ষা সম্পর্কিত শিল্প।

এ সমস্ত শিল্প কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও এদের সম্বন্ধে পরিকল্পনা রচনা ও তা রূপায়ণ করা সম্পর্কে প্রাদেশিক ও দেশীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে আলোচনা করা হবে। প্রাইভেট সেক্টরের উদযোগ এ সমস্ত শিল্পে অংশগ্রহণ করতে পারবে। সর্বভারতীয়র ভিত্তিতে এ সমস্ত শিল্পের স্থানীয়করণ করা হবে।

(iv) অবশিষ্ট শিল্পগুলি প্রাইভেট সেক্টরের পরিচালনাধীন থাকবে। রাষ্ট্র ক্রমে ক্রমে এক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করবে। প্রাইভেট সেক্টরের পরিচালনায় যদি কোন শিল্পের উন্নয়ন সন্তোষজনক বলে বিবেচিত না হয় সেক্ষেত্রে রাষ্ট্র সরাসরি তাতে হস্তক্ষেপ করতে পারবে।

কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের গুরুত্ব স্বীকার করা হয়। তাদের সমবায়ের ভিত্তিতে সুসংগঠিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টির উপরও জোর দেয়া হয়। বৃহৎ শিল্পগুলির সঙ্গে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির সংযোজন এবং তাদের বিকেন্দ্রীকরণ ও সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে বলা হয়।

শ্রমিক ও মালিক উভয়কেই তাদের যুক্তিযুক্ত মূল্য দেয়া হবে। বিদেশী মূলধন ও প্রযুক্তিবিদ্যার সহযোগিতায় দেশকে দ্রুত শিল্পপ্রধান করে তোলার চেষ্টা করা হবে। তবে সাধারণত বিনা শর্তে বিদেশী মূলধন বা কোনপ্রকার বিদেশী সাহায্য নেয়া হবে না। মালিকানার বৃহত্তর অংশ ও পরিচালনার

দায়িত্ব ভারতীয়দের হাতে থাকবে। সরকারের শুল্ক নীতি অসঙ্গত বিদেশী প্রতিযোগিতা বন্ধ করার জন্য ও দেশের সম্পদের পূর্ণ সদ্ব্যবহারের ভিত্তিতে রচিত হবে। সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টার ফলে যাতে মুষ্টিমেয়র হাতে আর্থিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত না হয় সেজন্য কর প্রথার প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হবে।

মন্তব্য

ইনডাস্ট্রিয়াল পলিসি রেজোলিউসন কংগ্রেসের ইকোনোমিক প্রোগ্রাম কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে রচিত। কমিটি শিল্প রাষ্ট্রায়ত্তকরণের পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন। কিন্তু ভারত সরকার মিশ্র অর্থনীতি গ্রহণ করে। পণ্ডিত নেহরুর মতে এ মিশ্র অর্থনীতি অবস্থান্তরকালীন সময়ের জন্য মাত্র। অদূর ভবিষ্যতে সমস্ত শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করা হবে বলে বলা হয়। তাঁর মতে সরকারের বর্তমান শক্তি ও সামর্থ্যের কথা বিবেচনা করলে মিশ্র অর্থনীতি ছাড়া অন্য কোন অর্থনীতি গ্রহণ করা সরকারের পক্ষে সম্ভবপর বা যুক্তিসঙ্গত নয়। ভারতীয় সমাজবাদীরা ভারত সরকারের এ মধ্যপন্থীয় বা আপোস-মূলক নীতিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করার প্রতি ভারতীয়দের স্বাভাবিক আশা-আকাঙ্খার বিরোধী বলে বর্ণনা করেন। শ্রমিকদের জন্য যে সমস্ত সুবিধা দানের প্রতিশ্রুতি আছে তাও পর্যাপ্ত নয় বলে অভিযোগ করা হয়। ধনতন্ত্রের মুখপাত্ররাও এ রেজোলিউসনকে স্বাগত জানাতে অসমর্থ হয়। সরকারের সমাজতন্ত্রের প্রতি কোমলতা, রাষ্ট্রের জন্য শিল্প সংরক্ষণ ও রাষ্ট্র কর্তৃক শিল্প নিয়ন্ত্রণ, শিল্পোন্নয়নের প্রতি স্তরে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করার অধিকার, দশ বছর পর প্রাইভেট সেক্টরের শিল্পের ভাগ্য নির্ণয় এবং জননেতা ও মন্ত্রী মহোদয়দের অসামঞ্জস্যপূর্ণ বক্তৃতা তাদের মনে ভীতি ও অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করে। এরকম পরিবেশে ভারতের অর্থনীতির প্রতি বিদেশী মূলধন ও প্রযুক্তিবিদ্যার আগ্রহ সৃষ্টি হবে কিনা সন্দেহ। বস্তুত, জাতীয় শিল্প নীতি সর্বশ্রেণীর মানুষকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে কাহাকেও সন্তুষ্ট করতে সমর্থ হয়নি। এর ফলে ভারতীয় অর্থনীতিতে এক নিশ্চল অবস্থার সৃষ্টি হয়।

ইনডাস্ট্রিয়াল পলিসি রেজোলিউসন 1956

1948 সনের পর ভারতের অর্থনীতিতে অনেক পরিবর্তন ঘটে। 1955-56 সনে ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘটে।

সংসদে "সমাজতান্ত্রিক ধাঁচ"-এর সমাজ ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিতরূপে ঘোষিত হয়। সর্বোপরি বাস্তবে মিশ্র অর্থনীতির নানাপ্রকার দুর্বলতা প্রকাশ পেতে থাকে। পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার জন্য শিল্প নীতির পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে ওঠে। ইনডাস্ট্রিয়াল পলিসি রেজোলিউসন 1956 এরই ফলপ্রসূ।

বৈশিষ্ট্য

1956 সনের ইনডাস্ট্রিয়াল পলিসি রেজোলিউসনের উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ।

1. শিল্প ক্ষেত্রকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা,

(i) রাষ্ট্রের পূর্ণ দায়িত্বাধীন। এ তালিকায় রয়েছে 17 শিল্প যাদের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের দায়িত্ব সম্পূর্ণ রাষ্ট্রের। উদাহরণস্বরূপ, অস্ত্রশস্ত্র, পারমাণবিক শক্তি, লৌহ ও ইস্পাত, ভারী শিল্প, কয়লা, খনিজ তেল, খনিজ ধাতু, বিমান, বিমান পরিবহন, রেলপথ, জাহাজ নির্মাণ, তার, টেলিফোন ও টেলিফোনের তার, টেলিগ্রাফ ও বেতার যন্ত্রাদি, বিদ্যুৎ সৃষ্টি ও বণ্টন। এক্ষেত্রে প্রাইভেট সেক্টরের পরিচালনায় যে সমস্ত শিল্প বর্তমানে রয়েছে বা থাকার অনুমোদন পেয়েছে তাতে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করবে না। তবে জাতীয় স্বার্থে সে সমস্ত শিল্পের প্রসার সাধনের জন্য রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করতে পারবে। নতুন শিল্প গড়ে তোলার জন্য এক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থে রাষ্ট্র প্রাইভেট সেক্টরের উদযোগের সহযোগিতা চাইতে পারে। অবশ্য রেলপথ, পরিবহন, অস্ত্রশস্ত্র ও পারমাণবিক শক্তি—এ চারটি শিল্পের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের একচেটিয়া অধিকার থাকবে।

(ii) ক্রমে ক্রমে রাষ্ট্রায়ত্তকরণ। এ তালিকায় 12 শিল্প আছে। যথা, 'ক্ষুদ্র ধাতু' ছাড়া যাবতীয় ধাতু, ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি, লৌহ মিশ্রিত ইস্পাতের তৈরী ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি, এল্যুমিনিয়াম ও অন্যান্য অ-লৌহ নির্মিত ধাতু, রাসায়নিক শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় মূল ও মাধ্যমিক উপকরণ, এন্টিবায়োটিকস ও অন্যান্য অতি প্রয়োজনীয় ভেষজ, সার, সিনথেটিক রবার, কয়লা পরিশুদ্ধকরণ, রাসায়নিক মণ্ড, সড়ক পরিবহন ও সমুদ্র পরিবহন। এ সমস্ত শিল্পগুলিকে কালক্রমে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হবে। তবে বেসরকারী উদযোগগুলিকে এর পরিপূরকরূপে ও নিজেদের উদ্যোগে এতে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেয়া হবে।

(iii) প্রাইভেট সেক্টরের উদযোগের জন্য রক্ষিত। অবশিষ্ট শিল্পগুলি এ তালিকাভুক্ত। এদের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন প্রাইভেট সেক্টরের প্রচেষ্টার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। প্রাইভেট সেক্টরের প্রচেষ্টাকে উৎসাহ দেয়ার জন্য রাষ্ট্র পরিবহন, শক্তি ও অন্যান্য সেবা দ্বারা তাদের সাহায্য করবে। সরকারের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে এ সমস্ত শিল্পের পরিকল্পনা রচনা ও পরিচালনা করতে হবে। অবশ্য যেকোন শিল্পের উৎপাদনের দায়িত্ব নেয়ার অধিকার রাষ্ট্রের থাকবে।

2. কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প। এ সম্পর্কে সরকারী নীতি হচ্ছে এদের উন্নয়নের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা ও যাবতীয় সাহায্য দেয়া। তাছাড়া এদের আধুনিকীকরণ ও স্বয়ম্ভর করে তোলার উপরও জোর দেয়া হয়।

3. শিল্পে শান্তি। শিল্পে শান্তি ও শ্রমিক-মালিকের সহযোগিতা ছাড়া শিল্পোন্নয়ন সম্ভব নয়। শিল্প পরিচালনার প্রতি স্তরে শ্রমিকদের সক্রিয় অংশ-গ্রহণ করতে হবে। এ ব্যাপারে পাবলিক সেক্টরকে পথপ্রদর্শক হতে হবে। রেজোলিউসনে শ্রমিক ও মালিকদের যুক্তভাবে পরিচালনা সম্পর্কে পরামর্শ দান, শ্রমিকদের জীবনধারণের মান উন্নয়ন, কাজের মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি, দক্ষতা বৃদ্ধি ও সেজন্য উপযুক্ত আর্থিক প্রেরণা দেয়া প্রভৃতি সুপারিশ করা হয়েছে।

4. আঞ্চলিক বৈষম্য। আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করার জন্য বলা হয়েছে যে, যে সমস্ত অঞ্চল শিল্পোন্নয়নে পিছিয়ে আছে সে সমস্ত অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য বিশেষ মনোযোগী হতে হবে। আঞ্চলিক বৈষম্য লাঘব করার উপায়-স্বরূপ প্রত্যেক অঞ্চলের শিল্প ও কৃষি অর্থনীতির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করার ও তাদের সংযোজিত উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

5. শিল্পের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে কারিগরি ক্ষেত্রে ও পরিচালনায় দক্ষ বহু লোকের প্রয়োজন হবে। এ কারণে রেজোলিউসনে উপযুক্ত কারিগর ও পরিচালক শ্রেণী গঠন করার উপর জোর দেয়া হয়েছে। তাছাড়া শিক্ষা-নবীশ প্রশিক্ষণের ব্যাপক ব্যবস্থা করার কথাও বলা হয়েছে।

6. বিদেশী মূলধন। বিদেশী মূলধন সম্পর্কে 1948 গৃহীত রেজোলিউ-সনই গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ, বিদেশী মূলধন বা সাহায্যকে শর্তাধীনে গ্রহণ করা যেতে পারে যাতে জাতীয় স্বার্থ বিঘ্নিত না হয়।

1948 ও 1956 রেজোলিউসন : তুলনা

(i) 1948 রেজোলিউসনে রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকারে ছিল 6 শিল্প ; 1956 রেজোলিউসনে তা বৃদ্ধি করে 19 করা হয়। তাছাড়া 'সিডিউল্ড-বি'-ভূক্ত 12 শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করার উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ, অধিকতর সংখ্যক শিল্পের উন্নয়নের দায়িত্ব সরাসরি সরকার গ্রহণ করেছে। সরকারের মতে এ নীতি সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনের পক্ষে অপরিহার্য।

(ii) 1948 সনের রেজোলিউসনে দশ বছরের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর সরকার কয়লা, লৌহ ও ইস্পাত, বিমান, জাহাজ নির্মাণ, টেলিফোন ও খনিজ তেল এ শিল্প কয়টিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করে নিতে পারে এমন হুমকি ছিল। 1956 সনের রেজোলিউসনে এ রকম কোন হুমকি রাখা হয়নি। বরঞ্চ রাষ্ট্র প্রাইভেট সেক্টরের উদযোগকে নানাভাবে উৎসাহ দেয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে।

(iii) মিশ্র অর্থনীতির ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হলেও 1956 সনের রেজোলিউসনেও তাকে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। পাবলিক সেক্টর ও প্রাইভেট সেক্টরকে পরস্পরের পরিপূরকরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। শিল্পগুলিকে তিনটি তালিকায় ভাগ করা হলেও এর মধ্যে যথেষ্ট নমনীয়তা রয়েছে।

1956 রেজোলিউসন : মন্তব্য

(i) 1956 রেজোলিউসন নমনীয়। প্রাইভেট সেক্টরের হাতে যাতে অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত না হয়, পাবলিক সেক্টর যাতে শিল্প ক্ষেত্রে প্রসার লাভ করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে প্রাইভেট সেক্টর, পাবলিক সেক্টর ও সমবায় সেক্টর-এর যুক্ত প্রচেষ্টায় শিল্পোন্নয়নের নীতি গ্রহণ করা হয়েছে।

(ii) প্রাইভেট সেক্টরে সে সমস্ত শিল্পই রাখা হয়েছে যে সমস্ত শিল্পে উদযোগ নেয়া তার পক্ষে সহজ অথচ জাতীয় স্বার্থবিরোধী নয়।

(iii) কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের মধ্যে স্বয়ম্ভরতা ও বৃহৎ শিল্পের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হওয়ার চেতনা জাগ্রত করা হয়েছে।

(iv) শিল্প নীতিতে শিল্প কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলি প্রধানত 1956 রেজোলিউসনে গৃহীত শিল্প কাঠামোর মধ্যেই শিল্প নীতি সম্পর্কে তাদের প্রস্তাব রেখেছে। অপরদিকে, রেজোলিউসনে প্রকারান্তরে প্রাইভেট সেক্টরের স্থায়িত্ব স্বীকার করে নেয়া হয়েছে।

অর্থাৎ, মিশ্র অর্থনীতিকে ভারতের অর্থনৈতিক ভিত বলে গ্রহণ করা হয়েছে। যদিও তা প্রকৃত সমাজতন্ত্রের বিরোধী।

(v) শিল্পগুলির ক্ষেত্র পৃথক করার ব্যাপারে নমনীয়তা থাকার ফলে পাবলিক সেক্টরের জন্য রক্ষিত অনেক শিল্পে যেমন, সিমেন্ট, সার ও রাসায়নিক ইঞ্জিনিয়ারিং, প্রাইভেট সেক্টরের অনুপ্রবেশ ঘটছে।

(vi) বিদেশী মূলধনকে প্রযুক্তিবিদ্যা ও রাজনৈতিক প্রয়োজনের স্বার্থে রাষ্ট্রের জন্য একান্তভাবে রক্ষিত শিল্পক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করার জন্য সুযোগ দেয়া হয়েছে। যেমন, লৌহ ও ইস্পাত, খনিজ তেল আবিষ্কার প্রভৃতি। তাছাড়া দেশরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র দেশে প্রস্তুত করা অপেক্ষা বিদেশ থেকে আমদানি করার নীতিও গ্রহণ করা হয়েছে।

উপসংহারে, 1956 রেজোলিউসনে সরকারের সামাজিক মূল্যবোধের ও গঠনমূলক নমনীয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজতন্ত্রের পথে এগোবার একটি ধাপ রূপে মিশ্র অর্থনীতিকে গ্রহণের মধ্যে বাস্তববোধের পরিচয় আছে বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু পাবলিক সেক্টরের ব্যর্থতা, মুষ্টিমেয়র হাতে পুঁজির আধিক্য এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব ও স্থায়িত্ব এ পরিপ্রেক্ষিতে সমাজতন্ত্রের পথের একটি ধাপরূপে মিশ্র অর্থনীতিকে গ্রহণ বিষয়টি নিঃসন্দেহে বিতর্কমূলক।

ইনডাস্ট্রিয়াল পলিসি স্টেটমেন্ট 1980

ইনডাস্ট্রিয়াল পলিসি রেজোলিউসন 1956-এর কাঠামোর মধ্যে 1980 সনের 23 জুলাই শিল্প নীতি সম্পর্কে একটি নতুন প্রতিবেদন দেয়া হয়।

উদ্দেশ্য

(i) প্রতিষ্ঠিত শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার।

(ii) সর্বোচ্চ পরিমাণ উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।

(iii) কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি।

(iv) শিল্পে অনুন্নত অঞ্চলগুলিকে শিল্পোন্নয়নে অগ্রাধিকার দিয়ে আঞ্চলিক বৈষম্য লাঘব।

(v) কৃষি-ভিত্তিক শিল্পগুলিকে অগ্রাধিকার দিয়ে ও আন্তঃসেক্টর সম্পর্ক গঠন করে কৃষি-ভিত শক্তিশালী করা।

(vi) রপ্তানিমুখী ও আমদানির পরিবর্ত শিল্পগুলির উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা।

(vii) বিনিয়োগের সুষম বিস্তার সাধন এবং গ্রাম ও শহরাঞ্চলের উন্নয়নশীল বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র শিল্প এককগুলির মধ্যে মুনাফার চেতনা জাগ্রত করা।

(viii) মূল্য বৃদ্ধি ও নিম্নমানের দ্রব্যাদির বিরুদ্ধে ভোগকারীদের প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

রূপায়ণ পন্থা

(i) পাবলিক সেক্টরের পুনর্বিন্যাস। পাবলিক সেক্টরের উন্নতিবিধান প্রয়োজন। সেজন্য এর পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন রয়েছে। প্রতিটি এককের কাজকর্ম পর্যালোচনা করে দেখা দরকার এবং প্রয়োজন মত তাদের গঠনমূলক কাজের নির্দেশ দেয়া। এ সমস্ত নির্দেশ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কার্যকর করতে হবে। রুগ্ন এককগুলিকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে উন্নয়নমুখী করে তোলার জন্য পুনর্গঠন করতে হবে। ফিনান্স, বাজারকরণ, তথ্য সরবরাহ প্রভৃতি কাজের জন্য এক শ্রেণী পরিচালক গড়ে তুলতে হবে।

(ii) প্রাইভেট সেক্টরের উন্নয়নের ব্যবস্থা করা। অর্থনীতি ও দেশরক্ষার দিক থেকে অতি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলিকে তাদের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রাদির ক্ষেত্রে বার্ষিক 5 শতাংশ হারে সম্প্রসারণের অনুমতি দিতে হবে। তবে 5 বছরে এ সম্প্রসারণ 25 শতাংশের অধিক হওয়া চলবে না। রপ্তানিমুখী শিল্পে উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ প্রচলন করতে হবে। সুসংগঠিত প্রতিষ্ঠানকে উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা আমদানি করার অনুমতি দিতে হবে। প্রত্যেক শিল্পের আধুনিকীকরণের উপকরণ নির্ধারণ করে দিতে হবে যাতে তারা উৎপাদন ব্যয় হ্রাস ও দুষ্প্রাপ্য উপকরণের ব্যবহারে অধিকতর দক্ষতা দেখাতে সমর্থ হয়।

(iii) ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উন্নয়ন সাধন। ইনডাস্ট্রিয়াল পলিসি স্টেটমেণ্টের ফলে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ এককগুলির মধ্যে যে কৃত্রিম ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে তা দূর করে 'ইকোনোমিক ফেডারেলইজম'-এর ধারণা চালু করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে শিল্পে অনুন্নত অঞ্চলগুলির জেলা স্তরে একটি করে নিউক্লিয়াস প্লাণ্ট প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে যাতে তারা যত সংখ্যক সম্ভব সহায়ক এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প একক গঠন করতে সমর্থ হয়। এজন্য অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রায়তন ও সহায়ক এককগুলির ক্ষেত্রে বিনিয়োগের ঊর্ধ্বসীমা যথাক্রমে 1 লক্ষ টাকা থেকে 2 লক্ষ টাকা, 10 লক্ষ টাকা থেকে 20 লক্ষ টাকা ও 15 লক্ষ টাকা থেকে 25 লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

(iv) রুগ্ন শিল্প এককগুলি সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, এক শ্রেণীর পরিচালক ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের রুগ্ন করে তুলেছে। এদের শক্ত হাতে দমন করতে হবে। রুগ্নতার লক্ষণ সম্বন্ধে সময় থাকতে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। যে সমস্ত রুগ্ন এককের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা রয়েছে তাদের সুস্থ এককদের সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে ও একমাত্র বিশেষ ক্ষেত্রেই রুগ্ন একককে সরকার অধিগ্রহণ করবে।

(v) শিল্পে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের উন্নতি সাধনের জন্য ত্রিপাক্ষিক শ্রমিক কনভেনসন প্রথা পুনরায় চালু করতে হবে।

(vi) ব্যবসায়ীদের সামাজিক দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করে দিতে হবে। যথা, দামস্তর রক্ষা করা, স্পেকুলেসন থেকে বিরত থাকা প্রভৃতি।

সংক্ষেপে, 1980 স্টেটমেণ্টে বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার দ্বারা উৎপাদনশীলতা ও উৎকর্ষ বৃদ্ধি করার উপর জোর দেয়া হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে প্রযুক্তিবিদ্যা ও শ্রমদক্ষতার উন্নতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উৎপাদনের উচ্চতম সীমার পরিবর্তনের জন্য অনুমতি দেয়ার ও 'কোর' সেক্টরভুক্ত শিল্পগুলির ক্ষেত্রে উৎপাদন সীমা নির্ধারণের জন্য কোন অনুমতির অপেক্ষা না রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ ও শক্তির পূর্ণ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে আধুনিক পদ্ধতির উদ্ভাবনের কথাও বলা হয়েছে। রপ্তানিমুখী একক গড়ে তোলার উপরও গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

শিল্প লাইসেন্স

1948 সনে শিল্প লাইসেন্স প্রথা প্রথম প্রবর্তন করা হয়। লাইসেন্সে শিল্প এককটি কোন্ দ্রব্য ম্যানুফ্যাকচার করতে পারবে, তার উৎপাদন ক্ষমতার পরিমাণ কি হবে, কোন্ সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করতে হবে প্রভৃতি উল্লেখ থাকে। লাইসেন্স প্রথার মূল উদ্দেশ্য শিল্প নীতি দ্বারা রচিত. কাঠামোর মধ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে তোলা। এ সম্পর্কে যে সমস্ত আইন প্রণয়ন করা হয়েছে তাদের সম্বন্ধে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

1. ইনডাস্ট্রিজ (ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড রেগুলেসন) এ্যাক্ট 1951

1952 সনের 8 মে থেকে এ এ্যাক্ট কার্যকর হয়। এ এ্যাক্টের উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে : (i) শিল্পোন্নয়ন নির্দিষ্ট পথে নিয়ন্ত্রণ ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত অগ্রাধিকারের ভিত্তি ও লক্ষ্য অনুযায়ী সম্পদের ব্যবহার।

(ii) একচেটিয়া অর্থনৈতিক কাজকর্ম ও মুষ্টিমেয়র হাতে সম্পদ কেন্দ্রীভূত হওয়া রোধ করা। (iii) বৃহৎ শিল্পগুলির প্রতিযোগিতার হাত থকে ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে রক্ষা করার জন্য তাদের সংরক্ষণের সুবিধা দেয়া। (iv) শিল্প গঠনের জন্য নতুন উদযোগীদের উৎসাহ দেয়া। (v) আঞ্চলিক অসমতা দূর করার জন্য অনুন্নত অঞ্চলে শিল্প গড়ে তোলা। (vi) শিল্পে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগে উৎসাহিত করা।

এ্যাক্টে প্রদত্ত উন্নয়নমূলক পন্থাগুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা চলে : (i) প্রতিষেধকমূলক পন্থা, (ii) আরোগ্যমূলক পন্থা ও (iii) নিশ্চিত পন্থা।

(i) প্রতিষেধকমূলক পন্থার উদ্দেশ্য যাতে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি জাতীয় অর্থনীতির স্বার্থবিরোধী কোন কাজ করার সুযোগ না পায় তা দেখা। পন্থা-গুলি যথা, শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রে রেজিষ্ট্রেসন ও লাইসেন্স প্রথা বাধ্যতা-মূলক করা। তাদের কাজকর্ম সম্পর্কে অনুসন্ধান করা ও প্রয়োজন হলে তাদের লাইসেন্স বাতিল করে দেয়া।

(ii) আরোগ্যমূলক পন্থার উদ্দেশ্য কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান রুগ্ন হয়ে পড়লে তার নিরাময়ের ব্যবস্থা করা। যথা, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক রুগ্ন প্রতিষ্ঠানটির নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ ও তার উৎপন্ন দ্রব্যের সরবরাহ বা দাম নিয়ন্ত্রণ করা।

(iii) নিশ্চিত পন্থার উদ্দেশ্য শিল্পগুলির উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য বিস্তারিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এ উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় পরামর্শ পরিষদ, উন্নয়ন পরিষদ প্রভৃতি সংস্থা গঠন করা।

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে লাইসেন্স নিতে হবে : নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠন, চলতি প্রতিষ্ঠানের প্রসার সাধন, নতুন দ্রব্য ম্যানুফ্যাকচার করা ও প্রতিষ্ঠানটির কর্মস্থল পরিবর্তন করা।

এ এ্যাক্ট যে সমস্ত শিল্পক্ষেত্রে প্রযোজ্য তার মধ্যে রয়েছে শিল্প যন্ত্রপাতি, পরিবহন, সার, বস্ত্র, সিমেন্ট, দেশরক্ষা প্রভৃতি। যে সমস্ত কারখানায় শ্রমিক সংখ্যা 50 বা ততোধিক ও শক্তির ব্যবহার আছে এবং যে সমস্ত কারখানায় শ্রমিক সংখ্যা 100 কিন্তু শক্তির ব্যবহার নেই সে সমস্ত কারখানার উপর এ এ্যাক্ট প্রযোজ্য।

নিম্নলিখিত শিল্পগুলি এ এ্যাক্টের আওতায় পড়ে না :

(i) ক্ষুদ্রায়তন ও সহকারী একক।

(ii) ক্ষুদ্রায়তন ও সহকারী ছাড়া অন্যান্য একক যাদের স্থির সম্পত্তির (জমি, গৃহ, কারখানা ও যন্ত্রপাতি প্রভৃতি) উপর বিনিয়োগের পরিমাণ 1 কোটি টাকার (5 কোটি টাকা, 1983) কম।

(iii) চলতি একককে নতুন দ্রব্য ম্যানুফ্যাকচার করার ক্ষমতা দেয়া হবে। তবে এ শর্তসাপেক্ষ যে দ্রব্যটি ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের জন্য সংরক্ষিত নয়; অতিরিক্ত কলকারখানা স্থাপনের কোন প্রয়োজন নেই ও দুষ্প্রাপ্য কাঁচামালের জন্য অতিরিক্ত চাহিদা সৃষ্টি হবে না।

2 মোনোপলিস এণ্ড রেস্ট্রিকটিভ ট্রেড প্র্যাকটিসেস এ্যাক্ট 1969

উদ্দেশ্য: মোনোপলিস এণ্ড রেস্ট্রিকটিভ ট্রেড প্র্যাকটিসেস (এম-আর-টি-পি) এ্যাক্টের উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার রোধ, একচেটিয়া অর্থনৈতিক কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ, একচেটিয়া ও প্রতিবন্ধকমূলক ব্যবসায় ও তৎসম্পর্কিত কার্যকলাপ নিবারণ।

বিধান

(i) অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়া বিষয়টি সে সমস্ত শিল্প সংস্থার উপর প্রযোজ্য যে সমস্ত শিল্প সংস্থা এককভাবে বা আন্তঃসম্পর্কিত সংস্থাগুলির সঙ্গে যুক্তভাবে 20 কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক অথবা যে শিল্প সংস্থা আধিপত্যশীল। আধিপত্যশীল সংস্থা বলতে সে সংস্থাকে বুঝায় যার সম্পত্তি, আন্তঃসম্পর্কিত সংস্থাগুলির সম্পত্তি সহ, 1 কোটি টাকার কম নয় অথবা যে এককভাবে বা আন্তঃসম্পর্কিত সংস্থাগুলির সহযোগিতায় ভারতব্যাপী বা ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলে কোন দ্রব্য বা সেবার কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ সরবরাহ করে।

এ এ্যাক্টে বৃহৎ ব্যবসায় গৃহগুলির কাজকর্মের উপর সরকারকে সতর্ক দৃষ্টি রাখার অধিকার দেয়া হয়েছে। তাদের কোন নতুন একক সুরু করার আগে বা চলতি এককের প্রসার সাধনের বা অপর কোন এককের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার বা তাকে অধিগ্রহণ করার আগে সরকারের অনুমোদন নিতে হবে। সরকার প্রয়োজন মনে করলে এরূপ সংস্থাকে তার কিছু অংশ ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দিতে পারে, এমনকি তাকে ভেঙ্গে কয়েকটি স্বাধীন এককে বিভক্ত করে ফেলতে পারে। এ সমস্ত ক্ষেত্রে সরকারকে এম-আর-টি-পি কমিশনের মতামতের জন্য অপেক্ষা করতে হবে না।

(ii) একচেটিয়া ব্যবসায় সম্পর্কিত কার্যকলাপ বলতে আধিপত্যশীল বা

যুক্ত সংস্থাগুলির সে সমস্ত কার্যকলাপকে বুঝায় যা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। অর্থাৎ, যে কাজের ফলে অযৌক্তিকভাবে অপরের ব্যয়ভার বা সরবরাহকারীদের মুনাফা বৃদ্ধি পায় অথবা অন্যায়ভাবে প্রতিযোগিতার পথ নিয়ন্ত্রিত হয় বা দ্রব্যের গুণগত মান হ্রাস পায়। এরূপ আশঙ্কার কারণ ঘটলে সরকার বিষয়টি এম-আর-টি-পি কমিশনের গোচরে আনতে পারে। এ ব্যাপারে কমিশনের নির্দেশই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

প্রতিবন্ধকমূলক ব্যবসায় সম্পর্কিত কার্যকলাপ বলতে সে সমস্ত কার্যকলাপকে বুঝায় যা যে কোন পদ্ধতিতেই হোক না কেন প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করছে বা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

1985-86 সনের কেন্দ্রীয় বাজেটে এম-আর-টি-পি কোম্পানিগুলির সম্পদের সীমা 100 কোটি টাকা করা হয়েছে। ব্যয় ও প্রকল্পগুলির অর্থনৈতিক আয়তন বৃদ্ধির কারণেই এ পরিবর্তন সাধন করা হয়।

ইনডাস্ট্রিয়াল লাইসেন্সিং পলিসি 1970

ইনডাস্ট্রিয়াল লাইসেন্সিং পলিসি 1970 অনুযায়ী শিল্পগুলিকে কয়েকটি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছে। যথা, (i) সংরক্ষিত, (ii) 'কোর', (iii) 'কোর' বহির্ভূত ভারী বিনিয়োগ, (iv) মধ্য, (v) লাইসেন্স বহির্ভূত ও (vi) রপ্তানিমুখী।

(i) সংরক্ষিত সেক্টর। এ সেক্টরে রক্ষিত শিল্পগুলি একান্তভাবে পাবলিক সেক্টরভুক্ত।

(ii) কোর সেক্টর। এ সেক্টরের প্রতিষ্ঠানের 5 কোটি টাকা বা ততোধিক টাকার সম্পত্তির অধিকারী হতে হবে। এ সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি শিল্প-ভিত গঠনের কাজে নিযুক্ত থাকবে। তাছাড়া তারা ভারী যন্ত্রপাতি, সার, কীটনাশক ও নিউজ প্রিন্ট প্রভৃতি শিল্পের জন্য অতি প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করবে।

(iii) কোর বহির্ভূত ভারী বিনিয়োগ সেক্টর। যে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগের পরিমাণ 5 কোটি টাকার অধিক সে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান এ সেক্টরভুক্ত। এ সেক্টরভুক্ত শিল্প পাবলিক সেক্টরভুক্ত হতে পারবে। বৃহৎ শিল্প গৃহগুলিকে কোর সেক্টরে প্রবেশাধিকার দেয়া হবে না।

(iv) মধ্য সেক্টর। যে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে নতুন বিনিয়োগের

পরিমাণ 1 কোটি টাকা থেকে 5 কোটি টাকার মধ্যে তারা মধ্য সেক্টরভুক্ত। তবে তাদের বিদেশী কোম্পানিভুক্ত বা চিহ্নিত 20 বৃহৎ শিল্প গৃহের একটিও হওয়া চলবে না। এ শ্রেণীভুক্ত হওয়ার অপরাপর শর্তের মধ্যে রয়েছে 10 লক্ষ টাকা বা বিনিয়োগের 10 শতাংশ, এ দুয়ের মধ্যে যেটি কম, শিল্প প্রতিষ্ঠানটির তার অধিক বৈদেশিক বিনিময়ের প্রয়োজন হবে না ও তার এম-আর-টি-পি এ্যাক্ট অনুযায়ী আধিপত্যশীল শিল্প প্রতিষ্ঠানভুক্ত হওয়া চলবে না।

(v) লাইসেন্স বহির্ভূত সেক্টর। এ সেক্টর সে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান নিয়ে গঠিত যাদের বিনিয়োগের পরিমাণ 1 কোটি টাকা পর্যন্ত ও বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রয়োজন 10 লক্ষ টাকা বা প্রস্তাবিত বিনিয়োগের 10 শতাংশের বেশি নয়।

(vi) রপ্তানিমুখী সেক্টর। রপ্তানি বৃদ্ধি করার জন্য এ সেক্টর গঠন করা হয়েছে। এ সেক্টরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যাবতীয় সাহায্য দেয়া হবে।

তাছাড়া নতুন কৃষি-শিল্প গঠনে সমবায় সেক্টরকে লাইসেন্স দেয়া ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। এ পলিসিতে পাবলিক আর্থিক সংস্থাগুলিকে শিল্প পরিচালনায় অধিকতর অংশগ্রহণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

সংক্ষেপে, 1970 পলিসি নতুন শিল্পক্ষেত্রে পাবলিক সেক্টরের সম্প্রসারণ, ক্ষুদ্র ও মধ্য আয়তন শিল্পের দ্রুত উন্নয়ন এবং বৃহৎ শিল্প গৃহ, আধিপত্যশীল শিল্প সংস্থা ও বিদেশী কোম্পানিগুলির সম্প্রসারণ নিয়ন্ত্রণ করার নীতি গ্রহণ করেছে।

ইনডাস্ট্রিয়াল লাইসেন্সিং পলিসি 1973

1973 পলিসিতে যে সমস্ত পরিবর্তন করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য :

(i) যে শিল্প গৃহের সম্পত্তির মূল্য 20 কোটি টাকা তাকে বৃহৎ শিল্প গৃহের সংজ্ঞাভুক্ত করা হয়। 1970 পলিসিতে এ সম্পত্তির সীমা 35 কোটি টাকা নির্ধারিত ছিল।

(ii) 'কোর' সেক্টরের শিল্পের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয় ও ভারী বিনিয়োগ সেক্টর তুলে দেয়া হয়।

(iii) বিশেষ ক্ষেত্রে বৃহৎ শিল্প গৃহ ও বিদেশী কোম্পানিগুলিকে প্রচুর চাহিদাসম্পন্ন ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন করার অনুমতি দেয়া হয়।

(iv) সমবায়, ক্ষুদ্র ও মধ্য সেক্টরের অনুরূপ ক্ষেত্রে ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন করার ব্যাপারে উৎসাহ দেয়া হবে। পাবলিক সেক্টরকেও এ ব্যাপারে উত্তরোত্তর উৎসাহ নিতে হবে।

(v) কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি উভয়েই অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে চিহ্নিত অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য জয়েন্ট সেক্টর গঠন করবে।

ইনডাস্ট্রিয়াল লাইসেন্সিং পলিসি 1975

1975 পলিসি অনুযায়ী 21 শিল্পকে লাইসেন্স প্রথার বাইরে নিয়ে আসা হয়। বিদেশী কোম্পানি ও একচেটিয়া শিল্প গৃহগুলিকে এই 21 শিল্প ছাড়াও অন্যান্য 30 গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে লাইসেন্স-নির্দিষ্ট সীমার বহির্ভূত যে কোন পরিমাণ সম্প্রসারণের অধিকার দেয়া হয়। তবে এজন্য যে অতিরিক্ত উৎপাদন হবে তা রপ্তানি অথবা সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী বিক্রয় করতে হবে।

ইনডাস্ট্রিয়াল লাইসেন্সিং পলিসি 1978

1978 পলিসির উল্লেখযোগ্য নীতি :

(i) মধ্য সেক্টরের ক্ষেত্রে 3 কোটি টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ করা ব্যাপারে কোন লাইসেন্স নেয়ার প্রয়োজন হবে না। এক্ষেত্রে কাঁচামাল ও উপকরণ আমদানি করার ব্যাপারেও বৈদেশিক বিনিময় কোন বাধা হবে না।

(ii) মধ্য সেক্টরের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সর্বোচ্চ সীমা 5 কোটি টাকা নির্ধারিত ছিল। শর্তটি তুলে নেয়া হয়।

(iii) বৃহৎ শিল্প গৃহগুলির ক্ষেত্রে লাইসেন্স প্রথা সম্পর্কিত শর্তাদি সম্পর্কে কোন শিথিলতা না করার নির্দেশ দেয়া হয়।

ইনডাস্ট্রিয়াল লাইসেন্সিং পলিসি 1980

1980 পলিসির বৈশিষ্ট্য :

(i) ইনডাস্ট্রিজ এ্যাক্টে লিপিবদ্ধ (পরিশিষ্ট-1) শিল্পগুলির ক্ষেত্রে বার্ষিক 5 শতাংশ, কিন্তু পাঁচ বছরে 25 শতাংশের বেশি নয়, পরিমাণ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য সরকারের কোন অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন হবে না।

(ii) ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উন্নয়ন ত্বরান্বিত ও সুনিশ্চিত করার জন্য বিনিয়োগের সীমা 10 লক্ষ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে 20 লক্ষ টাকা করা হয়।

ইনডাস্ট্রিয়াল লাইসেন্সিং পলিসি 1982

1982 পলিসিতে শিল্পগুলিকে উৎপাদন ব্যয় সম্পর্কে সচেতন ও প্রতিযোগীমুখী করে তুলে রপ্তানির পরিমাণ 25 শতাংশের মত বৃদ্ধি করার জন্য লাইসেন্স প্রথার রীতিনীতির পরিবর্তন সাধন করা হয়। পলিসির নির্দেশগুলি প্রধানত :

(i) কোর সেক্টরে আরো পাঁচটি শিল্পকে যুক্ত করা হয়। প্রকারান্তরে বিদেশী কোম্পানি ও বৃহৎ শিল্প গৃহগুলিকে এ সেক্টরে প্রবেশাধিকার দেয়া হয়। তবে এক্ষেত্রে শিল্প এককগুলিকে রপ্তানিমুখী হতে হবে। অর্থাৎ, ক্ষুদ্রায়তন সেক্টরের জন্য অসংরক্ষিত পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের 60 শতাংশ ও সংরক্ষিত পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের 75 শতাংশ রপ্তানি করতে হবে।

(ii) শিল্পগুলিকে তাদের গত পাঁচ বছরের সর্বোচ্চ উৎপাদনের 33·3 শতাংশ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। এ বৃদ্ধির সঙ্গে 25 শতাংশ অতিরিক্ত উৎপাদনের কোন সম্পর্ক নেই।

(iii) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প সেক্টর ও অন্যান্য 72 শিল্প যেগুলি বিশেষ নিয়ন্ত্রণ ও লাইসেন্সভুক্ত যথা, বনস্পতি ও দুগ্ধজাতীয় খাদ্য প্রভৃতি, তাদের ক্ষেত্রে 33·3 শতাংশ বর্ধিত উৎপাদন ক্ষমতা সম্পর্কিত শর্ত প্রযোজ্য হবে না।

লাইসেন্সিং পলিসি : মন্তব্য

লাইসেন্সিং পলিসির মূল উদ্দেশ্য শিল্প-গঠন নিয়ন্ত্রণ দ্বারা দেশের সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজগঠনের প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলা। সেজন্য যে ধরনের শিল্প কাঠামো প্রয়োজন শিল্প নীতিতে তা তুলে ধরা হয়েছে। লাইসেন্স প্রথাকে সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। প্রথমত, এর ফলে অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হচ্ছে ও দ্বিতীয়ত শিল্পোন্নয়ন পরিকল্পনায় উৎকর্ষের অভাব ঘটছে। বলা নিষ্প্রয়োজন উভয়ই সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজের বিপরীত চিত্র।

এ অভিযোগ সম্বন্ধে কমিটি অন ডিস্ট্রিবিউসন অব ইনকাম এণ্ড লেভেলস অব লিভিং (মহালানবিশ কমিটি, 1960)-এর মন্তব্য, প্রাইভেট সেক্টরে

অসঙ্গত রকম অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছে। অবশ্য কমিটি নমনীয় শিল্প লাইসেন্সিং প্রথার উপর আস্থা রেখেছে।

মোনোপলিস ইনকোয়ারী কমিটির (দাশগুপ্ত কমিটি, 1964) বক্তব্যও অনুরূপ। কমিটির মতে লাইসেন্সিং প্রথা শিল্পক্ষেত্রে প্রবেশাধিকারের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ করে অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হতে সাহায্য করছে। আর. কে. হাজারী (1966) প্ল্যানিং কমিশনের কাছে প্রদত্ত তাঁর রিপোর্টে বলেন, কোন কোন শিল্প গৃহ একই বা বহুরকম দ্রব্য উৎপাদনের লাইসেন্সের জন্য একাধিক দরখাস্ত দেয়। এর ফলে অপরের পক্ষে দরখাস্ত করার আর সুযোগ থাকে না। কারণ সীমিত সংখ্যা লাইসেন্স দেয়া হয়। বেনামদার বা ভুইফোঁড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে লাইসেন্সের জন্য দরখাস্ত করাও রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রথম দরখাস্তকারীর আবেদন প্রথম বিবেচিত হবে এ নীতি অবলম্বন করাতে একমাত্র বৃহৎ শিল্প গৃহগুলিই লাইসেন্স পাবার অধিকারী হয়েছে। অধ্যাপক হাজারীর মতে, লাইসেন্স প্রথা আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করার পক্ষে পর্যাপ্ত নয় ও তা দূর করা সম্ভবও হয়নি। তাছাড়া লাইসেন্স দেয়ার পর এর পরিণতি সম্পর্কে কোন সংবাদ নেয়া হয় না। লাইসেন্স প্রথায় শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা সম্পর্কে যে উজ্জ্বল চিত্রটি তুলে ধরা হয় তা অতিরঞ্জিত। যে সমস্ত লাইসেন্স অনুমোদন করা হয় তার বেশ-কিছু সংখ্যা ব্যবহার করা হয় না।

দত্ত কমিটির (1967) অভিমত, লাইসেন্স প্রথা বৃহৎ শিল্প গৃহগুলির স্বার্থের সমর্থক। এর ফলে আদৌ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে শিল্পোন্নয়ন সম্ভব হয়নি। লাইসেন্স প্রথা 'আমদানি পরিবর্ত' নীতিকে কার্যকর করতে সাহায্য করেনি। অনেক ক্ষেত্রে শিল্প স্থানীয়করণ ব্যাপারে আঞ্চলিক বৈষম্যের দিক উপেক্ষা করা হয়েছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে পাবলিক সেক্টরকে অগ্রাধিকার না দিয়ে প্রাইভেট সেক্টরকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। দত্ত কমিটির মন্তব্য, লাইসেন্সিং পলিসিতে কোন্ শিল্প বা শিল্পের অংশবিশেষ মধ্য ও ক্ষুদ্র শিল্পভুক্ত সে সম্পর্কে কোন পরিষ্কার বর্ণনা নেই। বৈদেশিক সহযোগিতায় উৎপাদনের জন্য 720 দ্রব্যের ক্ষেত্রে লাইসেন্স দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে 70 ভোগ্যদ্রব্য যা প্রধানত ধনী শ্রেণীর ব্যবহারে আসবে ও যা উৎপাদন করতে বিদেশী উপকরণের প্রয়োজন হবে। শিল্পোন্নয়নে লাইসেন্সিং প্রথার ভূমিকা সীমিত ; প্রয়োজন অর্থ সাহায্যের, কারিগরি জ্ঞানের,

বাজারকরণের, পণ্যদ্রব্যের মান উন্নয়নের যা সাধারণত উপেক্ষিত হয়ে আসছে। শিল্পোন্নয়নের জন্য যে আর্থিক সাহায্য দেয়া হয়েছে তার অধিকাংশই কেন্দ্রীভূত হয়েছে বৃহৎ শিল্প গোষ্ঠীর হাতে। আর্থিক সংস্থাগুলি 1956-1966 সন পর্যন্ত 498 কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে। 73 বৃহৎ শিল্প গৃহ পেয়েছে এর 44 শতাংশ ও তাদের মধ্যে বৃহত্তর 20 গৃহ পেয়েছ 17 শতাংশ। সমবায় ও পাবলিক সেক্টর কোম্পানিগুলির আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ মাত্র 47 কোটি টাকা।

পরবর্তীকালে লাইসেন্সিং নীতি সম্পর্কে যে পরিবর্তন সাধন করা হয় তা সাধারণত মৌল পরিবর্তন নয়। শিল্প লাইসেন্সিং নীতির মূল উদ্দেশ্য পাবলিক সেক্টর এবং মধ্য ও ক্ষুদ্র সেক্টরদের অগ্রাধিকার দিয়ে এবং প্রাইভেট সেক্টরকে সহায়করূপে গ্রহণ করে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সেক্টরের মধ্যে শিল্পক্ষেত্র ও সম্পদ বণ্টন করে দেয়া। বলা বাহুল্য, লাইসেন্স প্রথা এ উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়ারস্বরূপ। উন্নয়নের বৈশিষ্ট্য হবে উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার, আঞ্চলিক অসমতার অবসান ও স্বয়ম্ভরতা। এ ধারণার পেছনে একদিকে রয়েছে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনের আবেগ, অপরদিকে ধনতন্ত্রের কাঠামোতে মিশ্র অর্থনীতি গড়ে তোলার বাস্তবতা। এ ছু'য়ের সংঘাতে উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে, ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হচ্ছে, আঞ্চলিক সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, বহির্বাণিজ্যের ঘাটতি প্রচণ্ড আকার ধারণ করছে। 'লাইসেন্স' শেষ কথাতো নয়ই, হাতিয়ার হিসাবেও তা উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। মিশ্র অর্থনীতি সমাজতন্ত্রের পথের ভারসাম্য রক্ষাকারী কিনা এ প্রশ্নের জবাব মিশ্র অর্থনীতির প্রথম অনুষ্ঠাতা ব্রিটেনের কাছ থেকে পাওয়া গেছে। যার ফলে সে দেশ আজও ধনতন্ত্রের কাঠামোতে ধরা।

মূল্যায়ন

শিল্প নীতি ও লাইসেন্সিং নীতি ব্যর্থ গেছে বলা চলে না। দ্রুত প্রসারমান পাবলিক সেক্টর দেশের শিল্প কাঠামোতে নিঃসন্দেহে আমূল পরিবর্তনের সূচনা করেছে; ক্ষুদ্র ও মধ্য শিল্পগুলির গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছে; বিনিয়োগ শিল্প-ভিত সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে; উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে; উৎপাদনের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে; বিদেশী মূলধনের অনুপ্রবেশ নিয়ন্ত্রিত হয়েছে; আমদানি পরিবর্ত ক্ষেত্রেও কিছুটা সাফল্য অর্জন করা গেছে। অপরদিকে

শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধির নিম্ন হার এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রগত গতি ও আঞ্চলিক অসমতা বৃদ্ধি শিল্প নীতির ব্যর্থতার পরিচায়ক। শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যে সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে সেজন্য শিল্প নীতির ভুল নির্দেশনা বা লাইসেন্সিং নীতির বাস্তবতাবোধের অভাবই যে শুধু দায়ী তা নয়। বস্তুত, উন্নয়ন একটি জটিল অর্থনৈতিক কাঠামোগত সমস্যা। শিল্প নীতি নির্দেশনা মাত্র।

কেন্দ্রগত ক্ষমতা ও আঞ্চলিক অসাম্য কাঠামোগত সমস্যার প্রতিফলন। এ বাস্তবতার গুরুত্ব বর্তমানে আর কোনমতেই উপেক্ষণীয় নয়। কারণ বৃহৎ শিল্প গৃহগুলির মোট সম্পত্তির পরিমাণ 1972-73 সন থেকে 1975-76 সনে 12·4 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে 4994 কোটি টাকা। 1980 সনে এর পরিমাণ আরো বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় 6619 কোটি টাকা। আঞ্চলিক বৈষম্যের দিক থেকে মহারাষ্ট্রে রয়েছে দেশের 16.9 শতাংশ কারখানা ও মোট স্থির মূলধনের 16.7 শতাংশ। কারখানা সেক্টরের মোট উৎপাদনের 25·2 শতাংশ উৎপাদন হয় সে রাজ্যে। অপরদিকে পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি এবং মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান প্রভৃতি রাজ্য শিল্প ক্ষেত্রে অনুন্নত।

ফরিণ এক্সচেঞ্জ রেগুলেসন এ্যাক্ট 1973

ফরিণ এক্সচেঞ্জ রেগুলেসন এ্যাক্ট, 1973 (এফ-ই-আর-এ, 1973) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ও কেন্দ্রীয় সরকারকে নিম্নলিখিত ক্ষমতা দিয়েছে :

(i) রপ্তানি বা অন্য কোনভাবে অর্জিত বৈদেশিক বিনিময়ের যথাযথ হিসাবে রাখা ও তা উদ্ধার করা।

(ii) বৈদেশিক বিনিময়, তা যে আকারেই হোক না কেন, সংগ্রহ করা বা ধরে রাখা নিয়ন্ত্রণ করা।

(iii) এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ম প্রণয়ন করা ও বিজ্ঞপ্তি দেয়া।

(iv) এ সম্পর্কে ব্যাঙ্ক, ট্র্যাভেল এজেণ্ট ও অন্যান্যদের নির্দেশ দেয়া।

বিধান

এফ-ই-আর-এতে যে সমস্ত বিধান আছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য :

(i) বিদেশী কোম্পানিগুলিকে ভারতের কোনপ্রকার ব্যবসায়, বাণিজ্য

বা অন্য কোন ব্যবসায় সংস্থাকে অধিগ্রহণ করতে হলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার অনুমতি নিতে হবে।

(ii) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া কর্তৃক অনুমোদিত নয় এমন কোন ব্যক্তি বৈদেশিক বিনিময় লেনদেন করতে পারবে না। রপ্তানি দ্বারা অর্জিত সমস্ত বৈদেশিক বিনিময় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার কাছে জমা দিতে হবে।

(iii) ভারতে বসবাস করে না এমন কোন ব্যক্তির সম্পত্তি হস্তান্তরকরণ; বন্ধক দেয়া প্রভৃতি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার অনুমতি ছাড়া করা চলবে না।

(iv) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার অনুমতি ছাড়া কোন ভারতীয় ভারতের বাইরে কোন স্থাবর সম্পত্তি রাখতে বা হস্তান্তর করতে পারবে না।

(v) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার অনুমতি নিয়ে যে ব্যক্তি বিদেশ ভ্রমণে গিয়েছেন ও বিদেশে ব্যয় নির্বাহ করার জন্য তাঁকে যে সময়কালের জন্য বৈদেশিক বিনিময় দেয়া হয়েছে তিনি শুধু সে সময়কালের জন্যই বিদেশে থাকতে পারবেন ও তাঁকে যেসব দেশ ভ্রমণের অনুমতি দেয়া হয়েছে কেবল সেসব দেশই তিনি ভ্রমণ করতে পারবেন।

(vi) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার অনুমতি ছাড়া কোন ব্যক্তি ভারতে বা ভারতের বাইরে কোন বিদেশী নাগরিককে চাকরিতে নিয়োগ করতে পারবে না।

এ এ্যাক্টের বিধানগুলি কার্যকর করার জন্য সরকারকে সন্দেহজনক ব্যক্তিদের তল্লাশ, দলিলপত্র বাজেয়াপ্ত প্রভৃতি করার অধিকার দেয়া হয়েছে।

II. শিল্প ফিনান্স

আর্থিক সংস্থা

আর্থিক সম্পদ ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয়। সম্পদ সংগ্রহ ও তার বণ্টনের ধরনের উপর উন্নয়নের গতি, প্রকৃতি ও ভারসাম্য নির্ভর করে। পরিকল্পিত অর্থনীতিতে সঞ্চয় সংগ্রহ ও একীভূতকরণ এবং বণ্টনের দায়িত্ব আর্থিক সংস্থাগুলির উপর ন্যস্ত। তাদের কাজকর্মের উপর সঞ্চয় সৃষ্টি, বিনিয়োগ ও উন্নয়নের হার নির্ভর করে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ফলে বেশ কয়েকটি নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক সংস্থা গঠিত হয়েছে। বস্তুত, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের বহু প্রাচীনতার অবসান ঘটেছে। আর্থিক সংস্থাগুলি তাতে গতি সঞ্চার

করে চলেছে। কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, ভিত-কাঠামো গঠন প্রভৃতি সেক্টরে সরকারের সরাসরি বিনিয়োগের ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আর্থিক সংস্থাগুলির বিনিয়োগের পথ সুগম হয়েছে; দায়িত্বও বৃদ্ধি পেয়েছে। সঠিক পরিমাণে সঠিক আর্থিক উপকরণ সঠিক শিল্পের কাছে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পৌঁছে দেয়া, নতুন নতুন সমস্যার সম্মুখীন হওয়া ও তারই ফসল রূপে দেশের প্রকৃত সম্পদ বৃদ্ধি করা নিঃসন্দেহে দায়িত্বমূলক কাজ।

বহু সংখ্যক আর্থিক সংস্থা ও প্রতিটি সংস্থার বিবিধ উদ্দেশ্য ভারতের শিল্প ফিনান্স ক্ষেত্রের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ইনডাস্ট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া (আই-এফ-সি-আই) ভারতের প্রথম উন্নয়ন ব্যাঙ্ক। এটি একটি সর্বভারতীয় শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্ক। স্টেট ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশনগুলি (এস-এফ-সি) মধ্য ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে মেয়াদী ঋণ দেয়ার উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়। এস-এফ-সিগুলি তাদের অধিকাংশ সম্পদের জন্য ইনডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেণ্ট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার (আই-ডি-বি-আই) উপর নির্ভরশীল। ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের উদ্যোগে ইনডাস্ট্রিয়াল ক্রেডিট এণ্ড ইনভেস্টমেণ্ট কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড (আই-সি-আই-সি-আই) স্থাপিত হয়। এ কর্পোরেশন মূলধন দ্রব্য আমদানির জন্য শিল্পগুলিকে বিদেশী মুদ্রায় দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণ দিয়ে থাকে। আই-সি-আই-সি-আই একটি প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান। কিন্তু এর বর্তমান শেয়ার মালিকানার ধরন, সরকার সমর্থিত গ্যারাণ্টিড বণ্ডের মারফত সম্পদ সংগ্রহ করার মর্যাদা ও বিনিয়োগের ব্যাপারে সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী চলার ফলে তাকে পাবলিক সেক্টরভুক্ত সংস্থা বলে ধরা হয়। আই-ডি-বি-আই গঠন করার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তৎকালীন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী টি. টি. কৃষ্ণমাচারী বলেন, এটি এমন একটি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক যা কেন্দ্রীয় সংযোজক এজেন্সির ভূমিকায় অধিষ্ঠিত হবে। অবশ্য পরিণামে তাকে শিল্প ফিনান্স সম্পর্কিত যাবতীয় সমস্যা বা প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত হতে হবে। ইউনিট ট্রাস্ট অব ইণ্ডিয়ার (ইউ-টি-আই) উদ্দেশ্য সঞ্চয় সংগ্রহ ও তা কর্পোরেট শেয়ার ও ডিবেঞ্চারে বিনিয়োগ করা। অবশ্য ইউনিট হোল্ডারদের স্বার্থ যাতে কোনভাবে ক্ষুণ্ণ না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখা। রাজ্যস্তরে অপর এক ধরনের প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। যথা, স্টেট ইনডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন (এস-আই-ডি-সি)। মধ্য ও ক্ষুদ্র শিল্প এককগুলির উন্নয়নের জন্য নানা-প্রকার উন্নয়নমূলক কাজকর্ম করা তাদের উদ্দেশ্য। এগুলি রাজ্য সরকারের

মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে এরা বেশ কিছু জয়েণ্ট সেক্টর গঠন করেছে ও সেক্টর প্রকল্পগুলিকে সাহায্য করছে। এদের অধীনে কিছু সহযোগী শিল্প এককও গঠিত হয়েছে। আই-ডি-বি-আই এদের রিফিনান্সের সুযোগ দিচ্ছে। উদ্দেশ্য, এদের মারফত আঞ্চলিক অসমতা লাঘব করা, বিশেষত দেশের অনুন্নত অঞ্চলে। আই-ডি-বি-আই নতুন ও দক্ষ উদযোগীদের প্রারম্ভিক মূলধন দিয়ে সাহায্য করার জন্য এদের তার এজেণ্টরূপে কাজ করাচ্ছে যাতে নতুন ও কারিগরি উদযোগ সৃষ্টি হতে পারে।

জাতীয় ও রাজ্যস্তরে যে সমস্ত মেয়াদী আর্থিক সংস্থাগুলি রয়েছে তাদের মোট অনুমোদিত ঋণের পরিমাণ 1970-71 সনে ছিল মাত্র 254 কোটি টাকা ; বৃদ্ধি পেয়ে 1981-82 সনে হয় 3130 কোটি টাকা। অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে 32 লক্ষ লোকের। ষষ্ঠ পরিকল্পনাকালীন প্রাইভেট কর্পোরেট সেক্টরের কমপক্ষে 7000-8000 কোটি টাকা বহিঃসূত্র থেকে সংগ্রহ করার কথা। মেয়াদী ঋণদানকারী সংস্থাগুলির কাছে এটি একটি চ্যালেঞ্জস্বরূপ। আর্থিক সংস্থাগুলির কাজ সঞ্চয় সংগ্রহ ও উৎপাদন-মূলক ক্ষেত্রে তা বিনিয়োগ করা। কিন্তু এদের মধ্যে কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক ও তিনটি বিনিয়োগ সংস্থা মাত্র জনসাধারণের কাছ থেকে সরাসরি সঞ্চয় সংগ্রহ করে। উন্নয়ন ব্যাঙ্কগুলির অর্থ ভাণ্ডারের প্রধান সূত্র : (a) কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, (b) বাজারে বণ্ড ছেড়ে টাকা ধার করা, ও (c) নিজস্ব সম্পদ।

এ অবস্থায় আর্থিক সংস্থাগুলিকে সম্পদের জন্য সরকারের উপর অধিকতর নির্ভরশীল হতে হচ্ছে। 1976 সনের পূর্ব পর্যন্ত আই-ডি-বি-আইর অধিকাংশ সম্পদ সংগৃহীত হত ইকিউটি ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণের মারফত। এর উৎস ছিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার ন্যাশনাল ইনডাস্ট্রিয়াল ক্রেডিট (লং টার্ম অপারেশনস) ফাণ্ড। 1976 সনের পরে আই-ডি-বি-আইর মালিকানা ভারত সরকার গ্রহণ করে। তারপর থেকে সরকারের উপর তার নির্ভরতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। 1981-82 সনে আই-ডি-বি-আই ভারত সরকারের কাছ থেকে ঋণ ও ইকিউটির বিরুদ্ধে 195 কোটি টাকা পায়। কিন্তু ভারত সরকারের আর্থিক অসচ্ছলতার কথা বিবেচনা করলে ভবিষ্যতে এরূপ পরিমাণ অর্থ সাহায্য পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।

1981-82 সনে আর্থিক সংস্থাগুলির বণ্ড মারফত সম্পদ সংগ্রহের

পরিমাণ 805 কোটি টাকা। 1977-78 সনে এর পরিমাণ ছিল 254 কোটি টাকা; 1980-81 সনে 540 কোটি টাকা। এ সমস্ত বণ্ড প্রধানত কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক, জি-আই-সি ও এল-আই-সি গ্রহণ করে থাকে। ব্যাঙ্কগুলির আমানত বৃদ্ধির হার হ্রাস পাবার ফলে বণ্ডে তাদের সমর্থন স্বল্প হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কগুলির স্ট্যাটুটারী লিকিউডিটি রেশিও (এস-এল-আর) ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়াও এর অন্যতম কারণ। 1969 সনে এস-এল-আর ছিল 25 শতাংশ, 1981 সনে 35 শতাংশ। কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কগুলির উপর নির্দেশ আছে যে 1985 সনের মধ্যে তাদের মোট আগামের 40 শতাংশ অগ্রাধিকার সেক্টরে বিনিয়োগ করতে হবে। এ অবস্থায় কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কগুলির কাছ থেকে বণ্ড মারফত সম্পদ সংগ্রহ সীমিত হয়ে পড়বে।

1981-82 সনে আর্থিক সংস্থাগুলি নিজস্ব সম্পদ থেকে মোট সম্পদের 44·5 শতাংশ পূরণ করতে পেরেছিল। 1980-81 সনে এর পরিমাণ ছিল 41·3 শতাংশ। গত কয়েক বছর ধরে যেভাবে দ্রুত ঋন দেয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে এ অনুপাত রক্ষা করা যাবে কিনা সন্দেহ।

ফলে বিদেশ থেকে ঋণ নিয়ে দেশীয় সঞ্চয়ের অভাব মিটাবার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাছে। 1981 ও 1982 সনে আই-সি-আই-সি-আই বিদেশী বাজার থেকে 80 মিলিয়ন ডলার ঋণ নিয়েছে। সম্প্রতি আই-ডি-বি-আইও বিদেশ থেকে 25 মিলিয়ন ডলার ঋণ নিয়েছে।

সম্পদের অভাবে আর্থিক সংস্থাগুলি তাদের ঋণদানের পরিমাণ কমিয়ে আনছে। যে সমস্ত ঋণগ্রহীতারা বহুকাল ধরে তাদের কাছ থেকে ঋণ নিচ্ছে তাদের নির্ভরশীলতা হ্রাস করা হয়েছে। নতুন উদযোগ, ক্ষুদ্র ও মধ্য উদযোগ ও কতিপয় খুব বৃহৎ প্রকল্প যা রূপায়ণ করার মত অর্থ বাজার থেকে সংগ্রহ করা প্রাইভেট সেক্টরের উদযোগের পক্ষে সম্ভব নয় সে সমস্ত ক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্যের নীতির বিশেষ কোন পরিবর্তন করা হয়নি।

সুপ্রতিষ্ঠিত কোম্পানিগুলি বাজার থেকে যাতে মূলধন বাবদ অর্থ সংগ্রহ করতে পারে সে ব্যাপারে আর্থিক সংস্থাগুলির সহযোগিতা করার সুযোগ রয়েছে। তারা কর্পোরেট সেক্টরের যাতে মুনাফা বৃদ্ধি পায় সেজন্য প্রয়োজনীয় নীতি গ্রহণ করা ব্যাপারে ও শিল্প সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করার জন্য বিনিয়োগকারীদের প্রেরণা দিতে পারে। অবশ্য প্রাইভেট সেক্টরকেও কাজে পারদর্শিতা দেখাতে হবে যাতে বিনিয়োগকারীরা তাদের

সঞ্চয়ের অধিকাংশ শিল্প সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করতে উৎসাহ বোধ করে। এ ব্যাপারে সরকারকেও অধিকতর সক্রিয় হতে হবে। 1981-82 সনে ভারত সরকার সিমেন্ট ও ইস্পাতের নিয়ন্ত্রিত দাম শিল্প গুটির অনুকূলে পরিবর্তন করেছে। এর ফলে তাদের মুনাফা বৃদ্ধি পেয়েছে। নন-কনভার-টিবিল ডিবেঞ্চারের সুদের হার বর্তমানে 15 শতাংশ করা হয়েছে। এ সমস্ত ডিবেঞ্চার 5 শতাংশ প্রিমিয়ামে নির্ধারিত সময়ে শোধনীয়। কনভারটিবিল ডিবেঞ্চার মূলধন বাজার থেকে ভাল সাড়া পেয়েছে। 1980-81 সনে এ সূত্র থেকে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ 45 কোটি টাকা, 1981-82 সনে এর পরিমাণ 185 কোটি টাকা। নন-কনভারটিবিল ডিবেঞ্চার যাতে নগদ টাকায় রূপান্তর করা সহজ হয় সেজন্য এল-আই-সি, জি-আই-সি ও ইউ-টি-আই কমিটি অন সেকেণ্ডারী মার্কেট ফর ডিবেঞ্চারস-এর সুপারিশক্রমে যে সমস্ত স্বতন্ত্র বিনিয়োগকারীরা অন্তত এক বছর 40,000 টাকা পর্যন্ত নন-কনভার-টিবিল ডিবেঞ্চার ধরে রেখেছে তাদের ডিবেঞ্চার ক্রয় করে নিতে সম্মত আছে। এর ফলে নন-কনভারটিবিল ডিবেঞ্চারের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। এতে কোম্পানিগুলির অসুবিধার কারণ নেই। কারণ এ সমস্ত ডিবেঞ্চার তারা আবার বাজারে ছাড়তে পারবে। এ সমস্ত ব্যবস্থা নেয়ার ফলে সুপ্রতিষ্ঠিত কোম্পানিগুলির আর্থিক সংস্থাগুলির উপর নির্ভরশীলতা কমে আসছে। আই-ডি-বি-আইর এক সমীক্ষায় দেখা গেছে উহা যে সমস্ত প্রকল্পে সরাসরি অর্থ সাহায্য করেছে সে সমস্ত ক্ষেত্রে প্রকল্প উদযোগীদের বিনিয়োগের অংশ 1978-79 সনে 50 শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 1981-82 সনে 66·5 শতাংশ হয়েছে। এম-আর-টি-পি কোম্পানিগুলি ও যেসব প্রকল্প রূপায়ণের ব্যয় 10 কোটি টাকার বেশি সে সমস্ত ক্ষেত্রে আর্থিক সংস্থাগুলির ঋণদানের অংশ 1979-80 সনে ছিল 51·2 শতাংশ, 1980-81 সনে 52·2 শতাংশ ও 1981-82 সনে 23·5 শতাংশ। এ নির্ভরতা যে ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে তার আরেকটি পরিচয় 1980-81 সনে মূলধন বাজার থেকে যে টাকা তোলা হয়েছে তার পরিমাণ 138 কোটি টাকা। 1981-82 সনে এর পরিমাণ দাঁড়ায় 474 কোটি টাকা।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, 1985-86 সনের কেন্দ্রীয় বাজেটে কোম্পানিগুলি যাতে সহজে বাজার থেকে সম্পদ সংগ্রহ করতে পারে সে উদ্দেশ্যে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এম-আর-টি-পি ও এফ-ই-আর-এ বহির্ভূত কোম্পানিগুলির

কনভারটিবিল ডিবেঞ্চার যাতে বাজারে সহজে বিক্রয় হতে পারে সেজন্য ডিবেঞ্চারের সুদের হার 13·5 শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে 15 শতাংশ করা হয়েছে। সিকিউরিটিস কনট্রাকটস (রেগুলেসন) এ্যাক্ট, 1956 সংশোধন করা হবে যাতে তালিকাভুক্ত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিগুলি অবাধে সিকিউরিটি হস্তান্তর করতে পারে। এর ফলে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরা বিশেষভাবে উপকৃত হবে। তাছাড়া বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণ করার জন্য কনভারটিবিল কিউমিউলেটিভ প্রেফারেন্স শেয়ার প্রচলন করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রয়োজনবোধে আর্থিক সংস্থাগুলি তাদের ঋণ সংশ্লিষ্ট কোম্পানির 51 শতাংশেরও বেশি শেয়ারে রূপান্তরিত করতে পারার অধিকারী। এভাবে বর্তমানে বেশ কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের তারা মালিক। নানাভাবে তারা শেয়ারের মালিক হতে পারে। যথা, সরাসরি শেয়ার ক্রয় করে; বাজারে শেয়ার বিক্রয়ের আণ্ডাররাইটার বা অবলেখক রূপে কাজ করে (যার ফলে তারা কিছু শেয়ারের মালিকানার অধিকারী হয়); বোনাস শেয়ার ক্রয় করে ও মেয়াদী ঋণকে ইকিউটিতে রূপান্তরিত করে। তারা সাধারণত তাদের শেয়ারগুলি অল্প অল্প পরিমাণে বাজারে ছেড়ে দেয়।

উন্নয়নে আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করা আর্থিক সংস্থাগুলির অন্যতম প্রধান কাজ। যে সমস্ত আর্থিক সংস্থা মেয়াদী ঋণ দিয়ে থাকে 1982 সনের মার্চ পর্যন্ত তাদের মোট মঞ্জুরীকৃত ক্রমসঞ্চয়ী ঋণদানের 41 শতাংশ বা 5,553 কোটি টাকা অনুন্নত অঞ্চলের এককগুলিকে দেয়া হয়েছে। কোন কোন অনুন্নত জেলাতে সুবিধাজনক শর্তে সাহায্য দেয়া হয়ে থাকে। যেমন, সুদের হার কম, যথাসময় ঋণ পরিশোধে অসমর্থ হলে ঋণ পরিশোধ স্থগিত রাখা, সুলভ শর্তে ঋণ পরিশোধ প্রভৃতি। এ সমস্ত সুযোগসুবিধা থাকা সত্ত্বেও অনুন্নত জেলাগুলি থেকে কোন প্রকল্প নেয়া বা আর্থিক সাহায্যের জন্য তেমন আগ্রহ দেখা যায় না। সম্প্রতি 87 "নো-ইনডাস্ট্রি ডিস্ট্রিকস" (এন-আই-ডি)-এর উন্নয়নের জন্য বিশেষ চেষ্টা চলছে। আই-ডি-বি-আই ও অন্যান্য আর্থিক সংস্থাগুলি যুক্তভাবে টেকনিক্যাল কনসালটেনসি অর্গানাইজেসন (টি-সি-ও) গঠন করেছে। এ সমস্ত সংস্থাগুলি বিভিন্ন অনুন্নত রাজ্যে শিল্পোন্নয়নের সম্ভাবনা সম্পর্কে সমীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে নিযুক্ত রয়েছে।

শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্ক পরিচিতি

ইনডাস্ট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া (1948)

[আই-এফ-সি-আই]

মূলধন ঃ ইনডাস্ট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়ার অনুমোদিত মূলধন 10 কোটি টাকা। কর্পোরেশনটির শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, সিডিউল্ড ব্যাঙ্কগুলি, বীমা কোম্পানি, ইনভেস্টমেণ্ট ট্রাস্ট, সমবায় ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য আর্থিক সংস্থাগুলি।

উদ্দেশ্য ঃ আই-এফ-সি-আইর উদ্দেশ্য শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে দীর্ঘ ও মধ্যমেয়াদী ঋণ দিয়ে সাহায্য করা। এ উদ্দেশ্যে তাকে যে সমস্ত ক্ষমতা দেয়া হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে ঃ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির 25 বছরের মধ্যে পরিশোধনীয় ঋণের জন্য জামিন হওয়া ; স্টক, শেয়ার, বণ্ড ও ডিবেঞ্চার অবলিখন ও পাবলিক কোম্পানি ও সমবায় সমিতিগুলিকে ঋণ দেয়া। তাছাড়া আই-এফ-সি-আই স্বয়ং ডিবেঞ্চার বিক্রয় করে ঋণ গ্রহণ করতে পারবে ; ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক থেকে বিদেশী মুদ্রা ঋণ বাবদ নিতে পারবে ও জনসাধারণের কাছ থেকে 5 বছরের মেয়াদে 10 কোটি টাকা পর্যন্ত ফিক্সড ডিপোজিট গ্রহণ করতে পারবে। আই-এফ-সি-আই কোন কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করতে পারবে না। সে তার আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ ফাণ্ডের পাঁচগুণ অপেক্ষা বেশি অর্থ ঋণস্বরূপ গ্রহণ করতে পারবে না। প্রয়োজনবোধে সে ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের বোর্ড অব ডাইরেক্টরস-এ একজন ডাইরেক্টরও নিযুক্ত করতে পারবে।

1952 সনে আই-এফ-সি-আই এ্যাক্ট সংশোধিত হয়। এর ফলে যে সমস্ত কোম্পানি ম্যানুফ্যাকচারিং, মাইনিং, শিপিং এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বণ্টন করে থাকে কর্পোরেশনকে তাদের দীর্ঘ ও মধ্যমেয়াদী ঋণ দেয়ার অনুমতি দেয়া হয়। কোন কোম্পানিকে 1 কোটি টাকার অধিক ঋণ না দেয়ার বিধান রয়েছে। অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকার জামিন হলে 1 কোটি টাকার বেশিও ঋণ দেয়া চলবে। কর্পোরেশনকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া থেকে ঋণ নেয়ার অধিকার দেয়া হয়।

কাজকর্ম ঃ আই-এফ-সি-আই 1977-78 সনে 68 প্রকল্পের জন্য 26·32 কোটি টাকা মঞ্জুর করে। এর মধ্যে 11·62 কোটি টাকা দেয়া হয় সফ্ট টার্ম

ঋণ রূপে, 14·70 কোটি টাকা সাধারণ শর্তে। যে সমস্ত শিল্প এ ঋণের সুযোগ নিয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছে তুলা বস্ত্র, ইঞ্জিনিয়ারিং, চিনি, পাট ও সিমেণ্ট। 1978-79 সনে 83 প্রকল্পের জন্য 40·71 কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়। এর প্রায় 50 শতাংশ পায় তুলা বস্ত্র শিল্প। সফ্‌ট লোন স্কীমে 1979-80 সনে অনুমোদিত ঋণের পরিমাণ 25·52 কোটি টাকা। 50 প্রকল্পে এ অর্থ বিনিয়োগ করা হয়। এর মধ্যে সফ্‌ট টার্ম ঋণের পরিমাণ 2·90 কোটি টাকা। এ স্কীমের মোট অনুমোদিত অর্থের 54·3 শতাংশ পায় তুলা বস্ত্র শিল্প। আই-এফ-সি-আই 1979-80 সনে সাহায্যদানের জন্য মোট 138·5 কোটি টাকা মঞ্জুর করে, বণ্টন করে 91·2 কোটি টাকা। 1978-79 সনে এর পরিমাণ যথাক্রমে 138·5 কোটি টাকা ও 73·5 কোটি টাকা। 1980 সনের 31 মার্চ পর্যন্ত ক্রমসঞ্চয়ী অনুমোদিত ও বন্টিত সাহায্যের পরিমাণ যথাক্রমে 991·5 কোটি টাকা ও 743·0 কোটি টাকা। আই-এফ-সি-আইর 1982 সনের 31 মার্চ পর্যন্ত মোট ঋণ অনুমোদন ও বণ্টনের পরিমাণ যথাক্রমে 1445·2 কোটি টাকা ও 1053·7 কোটি টাকা। আই-এফ-সি-আই একটি মর্ডানাইজেসন কেসেস সেল গঠন করেছে। এর কাজ সফ্‌ট লোন স্কীমের অধীনে যেসব বিষয় বিবেচনাধীন রয়েছে তাদের সম্পর্কে তলিয়ে দেখা। রুগ্ন শিল্প এককগুলিকে যোগ্য পরিচালকদের হাতে তুলে দিয়ে তাদের সুস্থ করে তোলার চেষ্টাও করা হয়। আই-এফ-সি-আইর বিরুদ্ধে তুলা শিল্পের প্রতি পক্ষপাতিত্ব, সুদের হার বেশি, ঋণের জন্য ব্যক্তিগত জামিন প্রথা ও ঋণ পেতে অযথা বিলম্ব প্রভৃতি অভিযোগ করা হয়।

স্টেট ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশনস (1951) [এস-এফ-সি]

মূলধন ঃ স্টেট ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশনের শেয়ার মূলধনের পরিমাণ 5 কোটি টাকার বেশি ও 50 লক্ষ টাকার কম হতে পারবে না। 25 শতাংশ শেয়ার জনসাধারণের মধ্যে বণ্টন করা চলবে। রাজ্য সরকার, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানি, ইনভেস্টমেণ্ট ট্রাস্ট, সমবায় ব্যাঙ্কগুলি ও অন্যান্য আর্থিক সংস্থা প্রভৃতিদের মধ্যে শেয়ার বণ্টনের পরিমাণ রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষ স্থির করে দেবে।

উদ্দেশ্য ঃ (a) শিল্প এককগুলি মূলধন বাজার থেকে যে ঋণ গ্রহণ করবে ও যা 20 বছরের মধ্যে পরিশোধনীয় তার জন্য জামিন হওয়া ; (b) 20

বছরের মধ্যে পরিশোধনীয় শর্তে শিল্প এককগুলিকে ঋণ বা আগাম দেয়া অথবা তাদের ডিবেঞ্চার ক্রয় করা ; (c) শিল্প এককগুলির স্টক, শেয়ার, বণ্ড বা ডিবেঞ্চারের অবলেখকের কাজ করা।

কাজকর্ম ঃ 1979-80 সনে 18 স্টেট ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশন আর্থিক সাহায্য বাবদ 263·8 কোটি টাকা মঞ্জুর করে। বণ্টনের পরিমাণ 184·8 কোটি টাকা। 1978-79 সনে এর পরিমাণ ছিল, যথাক্রমে 200·7 কোটি টাকা ও 135·0 কোটি টাকা। 1980 সনের 31 মার্চ পর্যন্ত অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ ছিল 790·1 কোটি টাকা। এস-এফ-সিগুলি প্রধানত সড়ক পরিবহণকারী সহ ক্ষুদ্র শিল্পে বিনিয়োগ করে থাকে। তারা নির্দিষ্ট অনুন্নত অঞ্চলে অবস্থিত শিল্প এককগুলিকেও সুবিধাজনক শর্তে ঋণ দিয়ে থাকে। এরূপ ঋণ অনুমোদনের পরিমাণ 1979-80 সনে 139·1 কোটি টাকা ও বণ্টনের পরিমাণ 95·0 কোটি টাকা। 1978-79 সনে তুলনায় এ বৃদ্ধির পরিমাণ যথাক্রমে 24·4 ও 39·3 শতাংশ।

ইনডাস্ট্রিয়াল ক্রেডিট এণ্ড ইনভেস্টমেণ্ট কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া (1955) [আই-সি-আই-সি-আই]

মূলধন ঃ অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ 25 কোটি টাকা ও বিলিকৃত মূলধনের পরিমাণ 5 কোটি টাকা। বিলিকৃত মূলধন নিম্নলিখিতভাবে বণ্টিত হয়েছে ঃ

(i) বিভিন্ন ভারতীয় ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানি এবং কর্পোরেশনটির কতিপয় ডাইরেক্টর ও বন্ধুবান্ধবদের দেয়া হবে 2 লক্ষ অর্ডিনারী শেয়ার।

(ii) যুক্তরাষ্ট্রের কতিপয় নাগরিক ও কর্পোরেশনকে দেয়া হবে 50 হাজার অর্ডিনারী শেয়ার।

(iii) ব্রিটিশ ইস্টার্ণ এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কস ও যুক্তরাজ্যে এবং অন্যান্য কমন-ওয়েলথ দেশের কতিপয় বীমা কোম্পানি ও অন্যান্য ব্রিটিশ কোম্পানিগুলিকে দেয়া হবে 1 লক্ষ অর্ডিনারী শেয়ার।

(iv) অবশিষ্ট 1 লক্ষ 50 হাজার অর্ডিনারী শেয়ার জনসাধারণের জন্য ইস্যু করা হবে।

উদ্দেশ্য ঃ প্রাইভেট সেক্টরের শিল্প এককগুলিকে সাহায্য করা। সাধারণত নিম্নলিখিতরূপে সাহায্য করা হয়।

(i) শিল্প একক প্রতিষ্ঠা, এককগুলির উন্নয়ন, প্রসার সাধন ও আধুনিকীকরণের জন্য সাহায্য করা।

(ii) শিল্প এককগুলিতে দেশী ও বিদেশী বেসরকারী মূলধন বিনিয়োগ যাতে বৃদ্ধি পায় সেজন্য প্রেরণা দেয়া।

(iii) শিল্পে বিনিয়োগকে বেসরকারী আয়ত্তে আনা ও বিনিয়োগের বাজারের প্রসার সাধনের জন্য উৎসাহ দেয়া।

বিশেষ উদ্দেশ্য

(i) শিল্প এককগুলিকে দীর্ঘ বা মধ্যমেয়াদী ঋণ দিয়ে এবং অথবা তাদের শেয়ার বা স্টক ক্রয় করে তাদের অর্থ সংস্থানের সাহায্য করা।

(ii) নতুন শেয়ার ও সিকিউরিটি ইস্যু ও অবলিখন ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়া।

(iii) অন্য কোন বেসরকারী বিনিয়োগ সূত্র থেকে আগত ঋণের জামিন হওয়া।

(iv) বিনিয়োগের যতটা সম্ভব দ্রুত আবর্তন দ্বারা পুনঃবিনিয়োগের জন্য ফাণ্ডের ব্যবস্থা করা।

(v) পরিচালন, কারিগরি ও প্রশাসনিক সম্পর্কিত উপদেশ দেয়া ও ভারতীয় শিল্পগুলি যাতে এ সমস্ত সেবা পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা।

ভারত সরকারের সঙ্গে চুক্তি

আই-সি-আই-সি-আই ও ভারত সরকারের মধ্যে এক চুক্তি হয়। এ চুক্তির শর্তগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য : (i) সরকার আই-সি-আই-সি-আইকে বিনা সুদে 7·5 কোটি টাকা আগাম দেবে ; (ii) এ ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত বোর্ড অব ডাইরেক্টরস-এ সরকারের একজন ডাইরেক্টর নিযুক্ত করার অধিকার থাকবে।

ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের সঙ্গে চুক্তি

এ চুক্তিক্রমে ঠিক হয় যে, ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক আই-সি-আই-সি-আইকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিদেশী মুদ্রায় 1 কোটি ডলারের সমপরিমাণ টাকা ঋণ ও আগাম বাবদ দেবে। এ টাকা ও এর উপর দেয় সুদ ও অন্যান্য দায়ের জন্য ভারত সরকার জামিন থাকবে। এ সম্পর্কে ভারত সরকার ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হবে। 1981 সনের অক্টোবরে আই-সি-আই-সি-আই

ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের সঙ্গে 150 মিলিয়ন ডলার ঋণ গ্রহণের জন্য এক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়।

বোর্ড অব ডাইরেক্টরস : 11 জন ডাইরেক্টর নিয়ে গঠিত বোর্ডে ভারতীয় শেয়ারহোল্ডারদের প্রতিনিধির সংখ্যা হবে 7, ব্রিটিশ স্বার্থের প্রতিনিধি 2, যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের প্রতিনিধি 1 ও ভারত সরকার মনোনীত 1।

কাজকর্ম : শিল্পে রুগ্নতা বৃদ্ধি সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার জন্য আই-সি-আই-সি-আই ও আই-ডি-বি-আই, আই-এফ-সি-আইর এবং অন্যান্য আর্থিক সংস্থাগুলির মত 1977 সন থেকে তুলা বস্ত্র, পাট, চিনি, সিমেন্ট ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পগুলিকে তাদের আধুনিকীকরণ প্রকল্প রূপায়ণের জন্য সুবিধাজনক শর্তে ঋণ দিচ্ছে। 1977 সনে 41 কোম্পানিকে সফ্‌ট লোন স্কীমে মোট 20·40 কোটি টাকা ঋণ দেয়া হয়। এ স্কীমে 1979-80 সনে 38·9 কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয় ; বণ্টন করা হয় 26·3 কোটি টাকা।

1980 সনে মার্চ থেকে আই-সি-আই-সি-আই তার সুদের কাঠামো পরিবর্তন করে। তিন শ্রেণীর সুদের পরিবর্তে দু'শ্রেণীর সুদের হার চালু করা হয়। সফ্‌ট লোনের সুদের হার নির্ধারিত হয় 7·5 শতাংশ ও অন্যান্য ক্ষেত্রের জন্য 11 শতাংশ। আই-সি-আই-সি-আই যে সমস্ত প্রকল্পকে সাহায্য দিয়েছে তাদের মধ্যে প্রায় 10 শতাংশ নানারকম সমস্যায় জড়িয়ে পড়েছে।

1979-80 সন পর্যন্ত আই-সি-আই-সি-আই 212·4 কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করেছে। ঋণ বাবদ বণ্টনের পরিমাণ 136·8 কোটি টাকা। 1978-79 সনের তুলনায় এর পরিমাণ যথাক্রমে 16·2 শতাংশ ও 25·3 শতাংশ বৃদ্ধি পায়। 1979-80 সনে বিদেশী মুদ্রায় ঋণ মঞ্জুরের পরিমাণ 73·3 কোটি টাকা ; বণ্টনের পরিমাণ 34·2 কোটি টাকা। 1978-79 সনে এদের পরিমাণ যথাক্রমে 51·7 কোটি টাকা ও 35·0 কোটি টাকা। 1980 সনের 31 মার্চ পর্যন্ত ক্রমসঞ্চয়ী অনুমোদিত ও বন্টিত সাহায্যের পরিমাণ যথাক্রমে 1296·8 কোটি টাকা ও 931·4 কোটি টাকা। এ সময় পর্যন্ত সফ্‌ট লোন স্কীমে ক্রমসঞ্চয়ী অনুমোদিত ও বন্টিত সাহায্যের পরিমাণ যথাক্রমে 96·0 কোটি টাকা ও 43·9 কোটি টাকা।

ন্যাশনাল ইনডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (1954) [এন-আই-ডি-সি]

এন-আই-ডি-সি ভারত সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

উদ্দেশ্য ঃ

(i) শিল্প একক সংগঠন, প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা।

(ii) দেশের শিল্প উন্নয়নের জন্য পরিকল্পন ও রূপায়ণ এবং সেজন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ।

(iii) পাবলিক বা প্রাইভেট সেক্টরভুক্ত যেকোন শিল্প একককে কাজ-কর্মের জন্য মূলধন, ঋণ বা অন্যভাবে সাহায্য করা।

(iv) পাবলিক বা প্রাইভেট সেক্টরভুক্ত যেকোন শিল্প একক ও প্রকল্প পরিচালনার জন্য কোম্পানি বা এসোসিয়েশন বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও অন্যান্য স্বার্থ ক্রয় ও বিক্রয় করা।

(v) শিল্প উন্নয়নের উদ্দেশ্যে যদি কোন কোম্পানি, ব্যক্তি বা এসোসিয়েশনকে মূলধন, যন্ত্রপাতি বা অন্য কোন প্রকার সাহায্য দেয়ার দরকার হয় তবে তার ব্যবস্থা করা ও এসব কোম্পানি, ব্যক্তি বা এসো-সিয়েশনের, শেয়ার, ডিবেঞ্চার ও সিকিউরিটি ক্রয়, অবলিখন বা অন্যভাবে ব্যবহার করা।

(vi) দেশে ও বিদেশে মূলধন বিনিয়োগের নতুন পথ উদ্ভাবন করা।

(vii) ভূগর্ভস্থ প্রাকৃতিক সম্পদ আবিষ্কার ও তার যথাযথ ব্যবহারের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা।

(viii) জনহিতকর কাজ বা পাবলিক ওয়ার্কস প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ এবং তাদের উন্নয়ন সাধন।

মূলধন ঃ এন-আই-ডি-সি একটি সরকারী প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি। এর মূলধন 1 কোটি টাকা।

কাজকর্ম ঃ 1954 সনের 22 অক্টোবর এন-আই-ডি-সির বোর্ড অব ডাইরেক্টরস-এর প্রথম সভাতে দুটি বিষয় নির্দিষ্ট হয় ঃ

(i) কর্মক্ষেত্র প্রথমাবস্থায় 14 প্রকার শিল্পের মধ্যে নিবদ্ধ রাখা ;

(ii) প্রযুক্তিবিদ্যা ও উপদেশ সংগ্রহ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া।

নির্বাচিত শিল্পগুলির মধ্যে আছে ঃ নির্মাণ, পাট, তুলা, বয়ন, কাগজ,

চিনি, সিমেণ্ট, রাসায়নিক দ্রব্য, মুদ্রণ, খনি ও যান্ত্রিক পরিবহন কাজে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি। এ সমস্ত শিল্পের জন্য যন্ত্রপাতি তৈরি করা হবে। এছাড়া রয়েছে নানাপ্রকার ধাতব শিল্প, যেমন, তামা, দস্তা প্রভৃতি ; এলুমিনিয়াম, ডিসেল, ভারী রাসায়নিক দ্রব্য, সার, কাষ্ঠমণ্ড প্রভৃতি।

বর্তমানে এন-আই-ডি-সির প্রধান কাজ পরামর্শ দেয়া। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার এবং পাবলিক ও প্রাইভেট সেক্টর ভারতে ও ভারতের বাইরে শিল্প সম্পর্কিত কাজকর্মের ব্যাপারে এন-আই-ডি-সির পরামর্শ নিচ্ছে। 1979-80 সনে এ সংস্থা 60·4 লক্ষ টাকার বৈদেশিক বিনিময় অর্জন করে। 1978-79 সনে এর পরিমাণ ছিল 48·6 লক্ষ টাকা।

ইনডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেণ্ট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া (1964)
[আই-ডি-বি-আই]

মূলধন ঃ আই-ডি-বি-আই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার মালিকানাধীন একটি সাবসিডিয়ারি ব্যাঙ্ক। অনুমোদিত মূলধন 50 কোটি টাকা। এর পরিমাণ 100 কোটি টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা চলবে। বিলিকৃত মূলধনের পরিমাণ 30 কোটি টাকা। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সেণ্ট্রাল বোর্ড অব ডাইরেক্টরস-এর অনুরূপ একটি বোর্ড অব ডাইরেক্টরস দ্বারা আই-ডি-বি-আই পরিচালিত।

উদ্দেশ্য ঃ আই-ডি-বি-আইর প্রধান উদ্দেশ্য আর্থিক সংস্থাগুলির, কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক সহ, কাজকর্মে সংযোগ সাধনের জন্য শীর্ষ সংস্থা রূপে কাজ করা। এর অন্যান্য উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে শিল্পগুলিকে মেয়াদী ঋণ দেয়া ও তাদের মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী ফিনান্স ছাড়াও সাময়িক অর্থাভাব মিটাবার জন্য সরাসরি আর্থিক সাহায্য দেয়া।

পাবলিক ও প্রাইভেট উভয় সেক্টরে যে সমস্ত শিল্প সংস্থা ম্যানুফ্যাক-চারিং ও প্রোসেসিং বা পরিবহন, শিপিং, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বণ্টন, হোটেল প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত তাদের সরাসরি আর্থিক সাহায্য দেয়া। সাহায্য দেয়া ব্যাপারে কি জাতীয় সিকিউরিটি গ্রহণ করা হবে অথবা সাহায্যের নিম্নতম ও উর্ধ্বতম সীমা কি হবে সে সম্পর্কে কোন বাধানিষেধ রাখা হয়নি।

কাজকর্ম ঃ কাজকর্ম মোটামুটি তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ (a) আর্থিক

সংস্থাগুলিকে সাহায্য দেয়া ; (b) নিজের উদ্যোগে অথবা আর্থিক সংস্থাগুলির সঙ্গে যুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে সরাসরি সাহায্য দেয়া ; (c) উন্নয়নমূলক কাজ গ্রহণ করা। যেমন, বাজারকরণ ও বিনিয়োগ, গবেষণা ও সমীক্ষা প্রভৃতি। তাছাড়া শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে কারিগরি, পরিচালন, সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য প্রশাসনিক সাহায্য দেয়া।

আই-ডি-বি-আই শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির শেয়ার, স্টক, বণ্ড ও ডিবেঞ্চার ক্রয় ও অবলিখন দ্বারা তাদের সরাসরি আর্থিক সাহায্য দিয়ে থাকে। প্রয়োজনবোধে তার দেয়া ঋণ ও আগামকে সে ইকিউটি, স্টক বা শেয়ারে রূপান্তরিত করতে পারে। শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক, স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, আই-এফ-সি-আই প্রভৃতি নির্দিষ্ট আর্থিক সংস্থা থেকে ঋণ নেয়া ব্যাপারে আই-ডি-বি-আই জামিন হতে পারবে।

আই-ডি-বি-আই অন্যান্য আর্থিক সংস্থাগুলির মাধ্যমে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য করে থাকে। এজন্য সে আই-এফ-সি-আই, স্টেট ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশন, সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক, স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য আর্থিক সংস্থাগুলি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে যে মেয়াদী ঋণ দেয় তা রিফিনান্স করে থাকে। তাছাড়া সে সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক ও স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক প্রদত্ত রপ্তানি ঋণও রিফিনান্স করে থাকে। আই-ডি-বি-আই আর্থিক সংস্থাগুলির স্টক, শেয়ার, বণ্ড ও ডিবেঞ্চার ক্রয় করেও তাদের আর্থিক সম্পদ বৃদ্ধি করে থাকে।

যেসব শিল্প সংস্থার পক্ষে স্বাভাবিক পথে অর্থ সাহায্য পাওয়া সম্ভব নয় সেসব ক্ষেত্রে আই-ডি-বি-আই ডেভেলপমেণ্ট এসিসট্যান্স ফাণ্ড থেকে তাদের সাহায্য দিয়ে থাকে।

1976 সনের 16 ফেব্রুয়ারী আই-ডি-বি-আই স্বশাসিত কর্পোরেশনে রূপান্তরিত হয়েছে।

কাজকর্ম : 1979-80 (জুলাই-জুন) সনে আই-ডি-বি-আইর মোট অনুমোদিত (জামিন ছাড়া) সাহায্যের পরিমাণ 1334·4 কোটি টাকা। 1978-79 সনের তুলনায় তা 29·6 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বণ্টনের পরিমাণ 834·9 কোটি টাকা। 1978-79 সনের তুলনায় বণ্টন বৃদ্ধির পরিমাণ 22·8 শতাংশ। 1964 থেকে 1980 সনের জুন পর্যন্ত ক্রমসঞ্চয়ী অনুমোদনের পরিমাণ 5391·0

কোটি টাকা ; বণ্টনের পরিমাণ 3611·7 কোটি টাকা। এ সময়কালীন অনাদায়ী অর্থ সাহায্যের পরিমাণ 2397·3 কোটি টাকা।

আই-ডি-বি-আই 1979-80 সনে প্রকল্পগুলিকে যে সরাসরি অর্থ সাহায্যের অনুমোদন দিয়েছে তার পরিমাণ 419·7 কোটি টাকা। 1978-79 সনে এর পরিমাণ 318·6 কোটি টাকা। অর্থাৎ, 1978-76 সনের তুলনায় 1979-80 সনে এর পরিমাণ 15·4 শতাংশ হ্রাস পায়।

রিফিনান্স ইনডাস্ট্রিয়াল লোন স্কীম ক্ষেত্রে অর্থ সাহায্যের অনুমোদন ও বণ্টন উভয়ই 1979-80 সনে 1978-79 সনের তুলনায় যথাক্রমে 54·3 শতাংশ ও 60·6 শতাংশ বৃদ্ধি পায়। আই-ডি-বি-আই সম্প্রতি কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কগুলিকে লক্ষণীয়ভাবে রিফিনান্স করে যাচ্ছে। এরূপ রিফিনান্সের পরিমাণ 1973-74 সনে ছিল 7·5 কোটি টাকা, 1981-82 সনে ছিল 276 কোটি টাকা।

রপ্তানি ফিনান্সের ক্ষেত্রেও বৃদ্ধি ঘটে। 1979-80 সনে অনুমোদন ও বণ্টনের পরিমাণ 1978-79 সনের তুলনায় যথাক্রমে 16 শতাংশ ও 57 শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ফরিণ লাইনস অব ক্রেডিট স্কীমে ভিয়েৎনাম (15 কোটি টাকা), জামবিয়া (5 কোটি টাকা), মালাউই (5 কোটি টাকা), শ্রীলঙ্কা (5 কোটি টাকা), ও মোজামবিককে (1 কোটি টাকা) অর্থ সাহায্য করা হয় যাতে এ সমস্ত দেশ ভারত থেকে যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম আমদানি করতে সমর্থ হয়। 1979-80 সনে আই-ডি-বি-আই কর্তৃক অনুন্নত অঞ্চলের জন্য অনুমোদিত বন্টিত অর্থ সাহায্যের পরিমাণ যথাক্রমে 584·3 কোটি টাকা ও 306·7 কোটি টাকা। 1978-79 সনে অনুমোদন ও বণ্টনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 364·3 কোটি টাকা ও 313·6 কোটি টাকা। স্পষ্টতই বণ্টনের পরিমাণ হ্রাস পায়।

ক্ষুদ্র শিল্প ও ক্ষুদ্র সড়ক পরিবহন চালকদের যে অর্থ সাহায্য করা হয় 1979-80 সনে তার অনুমোদনের পরিমাণ 467·0 কোটি টাকা। 1978-79 সনে এর পরিমাণ ছিল 303·3 কোটি টাকা।

আই-ডি-বি-আই 1976 সনে রিহাবিলিটেসন ফিনান্স ডিভিসন (আর-এফ-ডি) গঠন করে। আর-এফ-ডির কাজ আই-ডি-বি-আইর অধীনে রুগ্ন এককের রুগ্নতার প্রকৃত কারণ নির্ণয় ও সে পরিপ্রেক্ষিতে তার পুনর্বাসনের জন্য স্কীম রচনা করা। 1978-79 সনে আর-এফ-ডি 13 এককের পুনর্বাসনের

জন্য 12·3 কোটি টাকা অনুমোদন করে। 1979-80 সনে 6 রুগ্ন মিনি ইস্পাত কারখানার জন্য অতিরিক্ত 5·9 কোটি টাকা ঋণ অনুমোদন করা হয়।

1982-83 সনে আই-ডি-বি-আইর অনুমোদিত সাহায্যের পরিমাণ মোট 2184 কোটি টাকা। 1981-82 সনের তুলনায় সাহায্যের বৃদ্ধির পরিমাণ 25 শতাংশ। 1982-83 সনে বন্টিত সাহায্যের পরিমাণ 1581 কোটি টাকা। 1981-82 সনের তুলনায় এ বৃদ্ধির পরিমাণ 18 শতাংশ। 1982-83 সনে সর্বভারতীয় আর্থিক সংস্থাগুলি কর্তৃক মোট প্রদত্ত ঋণে আই-ডি-বি-আইর অংশ 66·6 শতাংশ। সর্বাধিক সাহায্য দেয়া হয় সিমেন্ট, বিদ্যুৎ সরবরাহ ও সড়ক পরিবহন শিল্পকে। এক্ষেত্রে মোট সাহায্যের পরিমাণ 666 কোটি টাকা বা মোট সাহায্যের প্রায় 31 শতাংশ। অপরদিকে ক্ষুদ্রায়তন সেক্টরে সাহায্যের পরিমাণ 866 কোটি টাকা। 1981-82 সনের তুলনায় এক্ষেত্রে সাহায্যদানের বৃদ্ধির পরিমাণ 47·3 শতাংশ। অনুন্নত অঞ্চল-গুলিতে সাহায্যের পরিমাণ 852 কোটি টাকা। 1981-82 সনে এর পরিমাণ ছিল 645 কোটি টাকা। 1970-71 সন থেকে 1983, 30 জুন পর্যন্ত অনুন্নত অঞ্চলে মোট প্রদত্ত সাহায্যের পরিমাণ 4140 কোটি টাকা।

ইউনিট ট্রাস্ট অব ইণ্ডিয়া (1964) [ইউ-টি-আই]

মূলধন ঃ ইউনিট ট্রাস্ট অব ইণ্ডিয়ার মূলধনের পরিমাণ 5 কোটি টাকা। এর শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে আছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া (2·5 কোটি টাকা), এল-আই-সি (75 লক্ষ টাকা), স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া (75 লক্ষ টাকা) এবং সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য আর্থিক সংস্থা (1 কোটি টাকা)। পরিচালনার দায়িত্ব বোর্ড অব ট্রাস্টিস-এর উপর ন্যস্ত।

উদ্দেশ্য ঃ ইউ-টি-আইর উদ্দেশ্য প্রধানত (a) মধ্য ও নিম্নআয়-বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঞ্চয়ে উৎসাহিত করা ও তাদের সঞ্চয় সংগ্রহ করা ; (b) তারা যাতে দেশের দ্রুত শিল্পোন্নয়নের সুফলের অংশীদার হতে পারে তার চেষ্টা করা। এ উদ্দেশ্য দু'টো সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার পথ হিসাবে দেশের সর্বত্র ইউনিট ট্রাস্ট বিক্রয় করা ; নিজস্ব মূলধন ও ইউনিট বিক্রয়লব্ধ অর্থ শিল্প ও কর্পোরেট সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করা এবং ইউনিট ক্রেতাদের ডিভিডেণ্ট দেয়া।

সুবিধা : প্রথমত, ইউনিটে বিনিয়োগ করা নিরাপদ। কারণ ইউনিট বিক্রয়লব্ধ অর্থ বহুরকম সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করা হয়। এর ফলে ঝুঁকি হ্রাস পায়। দ্বিতীয়ত, ইউ-টি-আইর আয়ের নয়-দশমাংশই ডিভিডেণ্ড-রূপে বণ্টন করে দেয়া হয়। ইউনিট হোল্ডাররা প্রতি বছরই কিছু না কিছু লভ্যাংশ পাওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত থাকতে পারে। তৃতীয়ত, ইউনিটের লভ্যাংশের উপর আয়কর সম্পর্কিত নানারকম সুবিধা পাওয়া যায়। চতুর্থত, ইউনিটকে যে সময় ইচ্ছে নগদ টাকায় রূপান্তরিত করা চলে। ইউনিট ট্রাস্ট অব ইণ্ডিয়া নির্দিষ্ট মূল্যে নিজেই তার বিক্রিত ইউনিট ক্রয় করে নেয়। পঞ্চমত, ইউনিটের মূল্য কম, নিরাপত্তা বেশি। ফলে ক্ষুদ্র সঞ্চয়ীদের পক্ষে ইউনিটে বিনিয়োগ করা সহজ ও সুবিধাজনক।

কাজকর্ম : 1976-77 (জুলাই-জুন) সনে 34·6 কোটি টাকার ইউনিট বিক্রয় করা হয়। 1978-79 সনে এর মূল্য 101·5 কোটি টাকা। কিন্তু 1979-80 সনে বিক্রয়ের পরিমাণ মাত্র 57·9 কোটি টাকা। এর কারণ প্রধানত ব্যাঙ্ক আমানতের ও ক্ষুদ্র সঞ্চয় স্কীমের উপর সুদের হার বৃদ্ধি ও 1979-80 সনের কেন্দ্রীয় বাজেটে ক্যাপিটাল গেনস-এর উপর থেকে আয়-করের সুবিধা তুলে নেয়া। 1978-79 সনে পুনঃক্রয়ের পরিমাণ ছিল 9·5 কোটি টাকা ; 1979-80 সনে এর পরিমাণ 14·4 কোটি টাকা। ট্রাস্টের কোম্পানি শেয়ার ও ডিবেঞ্চারের উপর বিনিয়োগের পরিমাণ 1976-77 সনে 177·1 কোটি টাকা, 1978-79 সনে 219·8 কোটি টাকা ও 1979-80 সনে 254·9 কোটি টাকা। 1976-77 সন থেকে 1978-79 সন পর্যন্ত 1964 ইউনিট স্কীমে প্রদত্ত ডিভিডেণ্ডের হার 9 শতাংশ ; 1979-80 ও 1980-81 সনে ডিভিডেণ্ডের হার ছিল যথাক্রমে 10 শতাংশ ও 11·50 শতাংশ। 1980-81 সনের তুলনায় 1981-82 (জুলাই-জুন) সনে ইউনিট বিক্রয় 52·1 কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 157·4 কোটি টাকা হয়। অর্থাৎ, বৃদ্ধির পরিমাণ 202·1 শতাংশ। ডিভিডেণ্ডের হার বৃদ্ধি এর কারণ বলে ধরা হয়।

ইনডাস্ট্রিয়াল রিকনস্ট্রাকশন কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া (1971) [আই-আর-সি-আই]

মূলধন : ইনডাস্ট্রিয়াল রিকনস্ট্রাকশন কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়ান কোম্পানিজ এ্যাক্টের অধীনে ভারত সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

আই-আর-সি-আইর অনুমোদিত ও বিলিকৃত মূলধনের পরিমাণ যথাক্রমে 25 কোটি টাকা ও 10 কোটি টাকা। প্রাপ্ত মূলধনের পরিমাণ 2·5 কোটি টাকা। শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে রয়েছে, আই-ডি-বি-আই, আই-এফ-সি-আই, আই-সি-আই-সি-আই, এল-আই-সি, স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি।

উদ্দেশ্য ঃ রুগ্ন শিল্প এককগুলির সমস্যা বিচার-বিশ্লেষণ ও তাদের দ্রুত পুনর্গঠন ও পুনর্বাসনের জন্য সাহায্য করা ; প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট এককটির পরিচালনা অধিগ্রহণ করা।

কাজকর্ম ঃ আই-আর-সি-আই 1979-80 সনে অর্থ সাহায্য বাবদ 15·4 কোটি টাকা অনুমোদন করে। 1978-79 সনের তুলনায় তা 43·9 শতাংশ বেশি। 1979-80 সনে বণ্টনের পরিমাণ 12·5 কোটি টাকা। 1979-80 সনের 31 মার্চ পর্যন্ত 95 শিল্প একককে অর্থ সাহায্য দেয়া হয়েছে। এ সময়কালীন পর্যন্ত মোট অনুমোদিত ও বন্টিত অর্থ সাহায্যের পরিমাণ যথাক্রমে 78·50 কোটি টাকা ও 65·90 কোটি টাকা।

ন্যাশনাল স্মল ইনডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (1955)
[এন-এস-আই-সি]

মূলধন ঃ ন্যাশনাল স্মল ইনডাস্ট্রিজ কর্পোরেশনের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ 20 লক্ষ টাকা। ভারত সরকার এন-এস-আই-সির একমাত্র মালিক।

উদ্দেশ্য ঃ এন-এস-আই-সির উদ্দেশ্য ক্ষুদ্র শিল্প সংগঠনে উৎসাহ, সাহায্য ও ফিনান্স দেয়া এবং তাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এন-এস-আই-সির কাজ হচ্ছে ক্ষুদ্র শিল্প এককগুলি যে দ্রব্যাদি তৈরি করে তা বিক্রয়ের জন্য সরকারী অর্ডার সংগ্রহ করা ; তাদের উৎপাদন যাতে বিঘ্নিত না হয় সেজন্য অর্থ দিয়ে, কারিগরি জ্ঞান দিয়ে ও অন্যান্যভাবে সাহায্য করা ; ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্পগুলির মধ্যে সংযোজনার চেষ্টা করা যাতে ক্ষুদ্র শিল্পগুলি বৃহৎ শিল্পের প্রয়োজনীয় উপকরণ তৈরি করার সুযোগ পায়। ক্ষুদ্র শিল্প এককগুলি যাতে ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য আর্থিক সংস্থা থেকে ঋণ পেতে পারে এন-এস-আই-সিকে সেজন্য ঋণ অবলিখন করতে ও জামিন হতে হবে।

এন-এস-আই-সি কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে হায়ার-পার্চেজ-এর ভিত্তিতে যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম সরবরাহ করা; সরকারী ক্রয় কর্মসূচীর মাধ্যমে বাজার-করণে সমর্থন দেয়া; প্রোটোটাইপ ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ট্রেনিং সেণ্টারগুলি মারফত বিভিন্ন শিল্পে প্রশিক্ষণ দেয়া।

কাজকর্ম: হায়ার পার্চেজ স্কীমে ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে 1979-80 সনে 4·56 কোটি টাকা মূল্যের যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়। 1978-79 সনে এর পরিমাণ ছিল 1·47 কোটি টাকা। ক্ষুদ্র শিল্প এককগুলির জন্য সরকারী ক্রয়ের যে অর্ডার সংগ্রহ করা হয় 1979-80 সনে তার পরিমাণ ছিল 70·30 কোটি টাকা। 1978-79 সনে এর পরিমাণ 65·54 কোটি টাকা।

ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কীম (1960)

ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য আর্থিক সংস্থা ক্ষুদ্র শিল্প এককগুলিকে আগাম দিয়ে থাকে। এ ব্যাপারে তাদের ঝুঁকি নিতে হয়। ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কীমের উদ্দেশ্য তাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার উপর এ স্কীমের প্রশাসনিক দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। ক্ষুদ্র শিল্প এককগুলিকে যে আগাম দেয়া হয় ও যা চাহিদা মাত্র বা সাত বছরের মধ্যে পরিশোধনীয় এ স্কীমে সেসব আগামের জন্য গ্যারান্টি দেয়া হয়। এজন্য যে মাসুল নেয়া হয় তার হার বার্ষিক 0·25 শতাংশ।

1980 সনের 30 জুন পর্যন্ত গ্যারান্টির পরিমাণ 3435·7 কোটি টাকা। পূর্ববর্তী বছর এর পরিমাণ ছিল 2994·8 কোটি টাকা।

উপসংহার

সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ও বিভিন্ন রাজ্যে বেশকিছুসংখ্যক মূলধন সরবরাহ করার সংস্থা গড়ে উঠেছে। ভবিষ্যতে অনুরূপ আরো সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। ব্যাপকভাবে এরূপ সংস্থা প্রতিষ্ঠা করার সার্থকতা সম্বন্ধে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে। মূলধনের বাজারের সীমাবদ্ধতার কথা মনে রাখলে এ প্রশ্নের প্রাসঙ্গিকতা অবশ্যই স্বীকার করতে হয়। এর ফলে মূলধনের বাজারে অযথা প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা উপেক্ষা করা চলে না। তাছাড়া নিয়োগ ক্ষেত্রের সীমা সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত না হওয়া বা নির্ধারণ করা সম্ভব না হওয়ার দরুন একের সঙ্গে অপরের কাজকর্মের ব্যাপারে সংঘর্ষ হওয়া অসম্ভব নয়। বস্তুত এ সমস্যা প্রকাশ্যভাবেই আজ

স্বীকৃত। অবশ্য এদের মধ্যে সুষ্ঠু সংযোজনার চেষ্টা চলছে। আই-ডি-বি-আইর উদ্যোগে পরিকল্পিত সর্বভারতীয় আর্থিক সংস্থাগুলির "কনসরটিয়াম ফিনান্স"-এর দৃষ্টান্ত। সর্বভারতীয় আর্থিক সংস্থাগুলি বিশেষ বিশেষ প্রকল্পে আর্থিক সাহায্য দেয়া ব্যাপারে তাদের কার কি ভূমিকা হবে সে সম্পর্কিত নীতি আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে স্থির করে নিচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কগুলির প্রতিনিধিরাও এ আলাপ-আলোচনায় অংশগ্রহণ করে। বাস্তবতার দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, এ সমস্ত উন্নয়নমূলক আর্থিক সংস্থাগুলির সাহায্যের ফলে বৃহৎ শিল্পগুলি যে পরিমাণ লাভবান হচ্ছে সে তুলনায় ক্ষুদ্র শিল্পগুলির লাভের পরিমাণ অতি সামান্য। আর্থিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার মূলে আঘাত হানা তো দূরের কথা, ক্ষমতা ক্রমাগত অতি মুষ্টিমেয় কয়েকটি শিল্প গৃহের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছে। এম-আর-টি-পি এ্যাক্ট প্রণয়ন এটুকুই প্রমাণ করে যে, দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো মূলত কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা-ভিত্তিক। এম-আর-টি-পি এ্যাক্ট তা শাসনে রাখার জন্য রচিত, নির্মূল করার জন্য নয়।

III. বিদেশী মূলধন

ভারতের প্রাচীন বৃহৎ শিল্পগুলি প্রধানত বিদেশী মূলধনের সাহায্যেই গড়ে উঠেছে। স্বাধীনতার পর বিদেশী মূলধন বিনিয়োগের উপর নানা-প্রকার নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হলেও বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। 1948 সনে ভারতে প্রাইভেট সেক্টরে বিদেশী বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল 225·8 কোটি টাকা, 1960 সনে 634·7 কোটি টাকা, 1972 সনে 1750·4 কোটি টাকা ও 1974 সনে 1943·0 কোটি টাকা।

বিদেশী বেসরকারী মূলধন সরাসরি "পোর্টফলিও" আকারে বিনিয়োগ করা হয়। বিদেশী কোম্পানিগুলি তাদের ভারতের শাখা অফিসের মারফত সরাসরি বিনিয়োগ করে থাকে। বিদেশের নিয়ন্ত্রণাধীন 'রুপি' কোম্পানি-গুলির মারফতও সরাসরি বিনিয়োগ হয়ে থাকে। পোর্টফলিও বিনিয়োগ বলতে ইকিউটি ও সিকিউরিটি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ এবং সরবরাহকারীর ক্রেডিট ও ঋণ প্রভৃতিকে বুঝায়। 1974 সনে সরাসরি বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল 47 শতাংশ ও পোর্টফলিও বিনিয়োগের পরিমাণ 53 শতাংশ। 1948 সনে

অবস্থা বিপরীত ছিল। সরাসরি ও পোর্টফলিও বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 82·5 শতাংশ ও 17·5 শতাংশ।

বিদেশী মূলধনের প্রায় 50 শতাংশ ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পে বিনিয়োগ করা হয়। তাছাড়া, সেবা, মাইনিং পেট্রোলিয়াম ও উদ্ভিজ্জ শিল্পেও বিনিয়োগের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য।

সুবিধা

বিদেশী মূলধন বিনিয়োগের সমর্থনে প্রধানত নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

(i) বিদেশী মূলধন ভারতকে দ্রুত শিল্প প্রধান করে তুলতে সাহায্য করবে।

(ii) আধুনিকতম বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান সংগঠন ও পরিচালন কৌশল সম্বন্ধে ভারতীয় উদযোগকে শিক্ষিত করে তুলবে।

(iii) প্রারম্ভিক ঝুঁকি গ্রহণ ও নানাপ্রকার অসুবিধা দূর করে ভারতের শিল্প উন্নয়নের সহায়ক হবে।

এ সমস্ত সুবিধার কথা ইণ্ডিয়ান ফিসকাল কমিশন (1921) উল্লেখ করেছিল। কমিশনের যুক্তি অভ্রান্ত বলে গ্রহণ করা যায় না। প্রথমত, ভারতের জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির যে উচ্চাশা পোষণ করা হয়েছে তা অমূলক। কারণ, বস্তুত, শ্রমজীবীর মূল্যই ভারতীয়দের দেয়া হয়ে থাকে। অন্যদিকে খনিজ শিল্পের মত শিল্প যার সম্পদ সীমাবদ্ধ তা বিদেশী কোম্পানিগুলির হাতে অপূরণীভাবে শোষিত হবে। আধুনিক শিল্প সংগঠন ও পরিচালন সম্বন্ধে যা বলা হয়ে থাকে সে সম্বন্ধে বলা হয় যে, শিল্প সংগঠন ও পরিচালন কৌশল বা প্রযুক্তিবিদ্যা অধুনা কোন জাতিবিশেষের সম্পদ বলে ধরা হয় না। উপযুক্ত মূল্য দিতে পারলে তা অর্জন করা অসম্ভব নয়। তাছাড়া বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় যে, বিদেশী শিল্প ভারতীয়দের শিল্প কৌশলে শিক্ষিত করে তুলতে উৎসাহী নয়। বরঞ্চ ভারতীয় শিল্পের স্বকীয়তা ও উদ্ভাবনী শক্তিকে খর্ব করতে উৎসাহী।

অসুবিধা

(i) বিদেশী মূলধন ঋণ হিসাবে গ্রহণ না করে বিনিয়োগ মূলধন হিসাবে গ্রহণ করা হয়। ফলে কেবল সুদই নয়, মুনাফা বাবদও প্রচুর অর্থ বিদেশে চলে যায়।

(ii) বিদেশী মূলধন নিজের ও তার দেশের স্বার্থ রক্ষার জন্য অপরের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে থাকে।

(iii) বিদেশী কোম্পানিগুলি বোর্ড অব ডাইরেক্টরস বা গুরুত্বপূর্ণ পদে সুযোগ্য ভারতীয়দেরও নিয়োগ করতে আগ্রহ প্রকাশ করে না।

(iv) দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক পার্থক্য থাকার দরুন বিদেশী মালিক ও ভারতীয় শ্রমিকদের মধ্যে বিরোধের আধিক্যের আশঙ্কা রয়েছে।

(v) বিদেশী কোম্পানি সাধারণত বিলাস দ্রব্যাদি প্রস্তুত করার ব্যাপারে ভারতীয় কোম্পানির সহযোগী হতে আগ্রহান্বিত। সরকারও তাতে উৎসাহ দেখিয়ে থাকে। ফলে দরিদ্র দেশের অমূল্য প্রাকৃতিক এবং আর্থিক ও শ্রম সম্পদ ধনী ব্যক্তিদের বিলাসব্যসন চরিতার্থের জন্য ব্যয়িত হয়। ব্যালেন্স অব পেমেণ্টস-এ ঘাটতি বৃদ্ধির এও একটি কারণ।

(vi) বিদেশী প্রযুক্তিবিদ্যার প্রতি অতিশয় আগ্রহ সৃষ্টি হওয়ার ফলে এমনও দেখা যায় যে, একাধিক ফার্ম একই প্রকার প্রযুক্তিবিদ্যা আমদানি করেছে। তাছাড়া রয়েছে বিদেশী 'ট্রেড মার্কস' ও 'ব্র্যাণ্ড' ব্যবহারের প্রতি ভারতীয় ব্যবসায়ীদের উগ্র আকাঙ্ক্ষা। ফলে ভারতীয় প্রযুক্তিবিদ্যা ও গবেষণা উপযুক্ত স্বীকৃতি পাচ্ছে না।

সরকারী নীতি

ভারত উন্নয়নশীল দেশ। এ উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার পক্ষে দেশীয় সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও প্রযুক্তিবিদ্যা পর্যাপ্ত নয়। তাই বিদেশী সাহায্য ও সহযোগিতা দরকার। একমাত্র উন্নত পশ্চিমী দেশ ও আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থাগুলিই ভারতের বিদেশী মূলধন ও আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার অভাব মিটাতে সাহায্য করে থাকে। কিন্তু প্রধানত রাজনৈতিক কারণে ভারত তাদের কাছ থেকে আশানুরূপ সাড়া পাচ্ছে না। অথচ আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক প্রতিকূল পরিস্থিতির জন্য, বিশেষ করে নিকটবর্তী রাজ্যগুলির বিরূপ রাজনৈতিক দৃষ্টি-ভঙ্গীর ফলে, সম্পদ সৃষ্টির মত মূলধনের স্বল্পতা সত্ত্বেও ভারতকে দেশরক্ষা খাতে বিদেশী মুদ্রা অপচয় করতে হচ্ছে। বিদেশী মূলধনের প্রবাহ অর্থনৈতিক কারণ দ্বারাও প্রভাবিত হয়। যেমন, মূল্যস্তর, শ্রমিক নীতি, সামাজিক আদর্শ ও বিদেশী মূলধন সম্পর্কে সরকারী নীতি। সেদিক দিয়েও ভারত বিদেশী মূলধনের আকর্ষণের বস্তু হয়ে উঠতে পারেনি।

বিদেশী মূলধনকে আকর্ষণ করার জন্য 1949 সনের 6 এপ্রিল তৎকালীন

প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বিদেশী মূলধন সম্পর্কে পার্লামেণ্টে যে বিবৃতি দেন আজও তা সরকারের বিদেশী মূলধন নীতির ভিত হয়ে রয়েছে। পণ্ডিত নেহরু বলেন, ভারতীয় ও বিদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোন বৈষম্য করা হবে না, উভয়ই সমান সুযোগসুবিধার অধিকারী হবে। বিদেশী কোম্পানি তার মুনাফা অন্যত্র পাঠাতে পারবে ও বিদেশী মুদ্রা বিনিময় আইন সাপেক্ষ সে তার মূলধন উঠিয়ে নিতে পারবে। বিদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হলে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে। সাধারণত বিদেশী কোম্পানি ভারতীয়দের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে ও ভারতীয়েরা তার অধিকাংশ শেয়ারের মালিক হবে। বিদেশী মূলধনকে জাতীয় স্বার্থে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠান বিশেষের উপর নিয়ন্ত্রণাধিকার দেয়া যাবে।

1968 সনে সরকার শিল্পগুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করে বিদেশী মূলধনের বিনিয়োগ ক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট করে দেয়। যথা, সেসব শিল্প যেসব শিল্পে বিদেশী বিনিয়োগ অনুমোদন করা যেতে পারে; সেসব শিল্প যেসব শিল্পে বিদেশী কারিগরির সহযোগিতার কোন প্রয়োজন নেই; এবং সেসব শিল্প যেসব শিল্পে কোনপ্রকার বিদেশী সহযোগিতার প্রয়োজন নেই। এ তিনটি তালিকার বহির্ভূত শিল্প ক্ষেত্রে কোন বিদেশী সহযোগিতার প্রয়োজন আছে কিনা তা শিল্প বিশেষের প্রয়োজন বুঝে স্থির করা হবে। 1973 সনে বিদেশী বেসরকারী বিনিয়োগের ক্ষেত্র 19 শিল্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। এফ-ই-আর-এ 1973 এ্যাক্ট অনুযায়ী সাধারণত কোন বিদেশী কোম্পানি সংশ্লিষ্ট কোম্পানিটির 40 শতাংশ শেয়ারের অধিক ক্রয় করতে পারবে না। অর্থাৎ, বিদেশী কোম্পানির অন্তত 60 শতাংশ শেয়ারের মালিকানা থাকবে ভারতীয়দের হাতে। যে ক্ষেত্রে বিদেশী কোম্পানির শেয়ারের উপর মালিকানা 40 শতাংশের বেশি সে ক্ষেত্রে তা 40 শতাংশে কমিয়ে আনতে হবে। 1978 সনে ভারত সরকার 833 মালটিন্যাশনাল কর্পোরেশনকে এফ-ই-আর-এ 1973 বিধান অনুযায়ী তাদের মালিকানার অংশ হ্রাস করার নির্দেশ দেয়। ফলে 130 মালটিন্যাশনাল কর্পোরেশন ভারত থেকে তাদের কাজকর্ম তুলে নেয়। 1982 সনের 30 জুন পর্যন্ত 317 কোম্পানি সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী তাদের মালিকানার অংশ হ্রাস করে 40 শতাংশ করে। বিদেশী এয়ারলাইনস ও শিপিং কোম্পানিগুলির ভারতীয় শাখা-অফিসগুলিকেও ভারতীয় কোম্পানিতে রূপান্তরিত করতে হবে। তাতে ভারতীয়

শেয়ার মালিকানার অংশ হবে ন্যূনতম 26 শতাংশ। বিদেশী কোম্পানিগুলির সমস্ত সহযোগী কোম্পানির শেয়ার মালিকানায়ও ভারতীয় অংশ হবে 26 শতাংশ। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত বিদেশী কোম্পানিগুলিকে নতুন করে আর শেয়ার মালিকানা দেয়া হবে না। যদি দেখা যায় যে, কোন বিদেশী কোম্পানি শুধু রপ্তানি-ভিত্তিকই নয়, জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে নতুন প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগেও সক্ষম সে ক্ষেত্রে বিদেশী মালিকানার অংশ 70 শতাংশ পর্যন্ত রাখা চলবে।

অনাবাসিক ভারতীয়দের ভারতে বিনিয়োগ

ভারতে যারা বাস করে না তাদের দু' শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা (i) ভারতীয় বা ভারতে উৎপত্তি অথচ ভারতে বাস করে না। এরা নন-রেসিডেন্ট ইণ্ডিয়ান (এনআরআই) বলে অভিহিত। (ii) অন্যান্য অনাবাসিক। প্রথম গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিরা ভারতে বিনিয়োগ করতে পারে। এ ব্যাপারে তাদের বিশেষ বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয় না। দ্বিতীয় গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সরকারের নানারকম নির্দেশ রয়েছে। এসব নির্দেশ সরকারের শিল্প নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

বিনিয়োগের পথ

ভারতে এনআরআইদের বিনিয়োগের যেসব পথ রয়েছে সেগুলিকে দু' ভাগে ভাগ করা যায়ঃ (i) যে মূলধন বিনিয়োগ করা হয়েছে এবং এর উপর যে মুনাফা বা লভ্যাংশ পাওনা হয়েছে তা উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার অধিকার এবং (ii) এ অধিকার ত্যাগ করতে সম্মত থাকা।

যারা মূলধন এবং মুনাফা বা লভ্যাংশ উঠিয়ে নিয়ে যেতে চায় তাদের কাছে বিনিয়োগের নিম্নলিখিত পথ খোলা রয়েছে।

(i) নন-রেসিডেন্ট (এক্সটারন্যাল) একাউন্ট (এনআরআই একাউন্ট)-এ বিনিয়োগ। এনআরআই একাউন্ট রুলস, 1970 অনুযায়ী ব্যক্তিবিশেষকে নিজের নামে কোন অনুমোদিত ডিলারের কাছে এনআর-আই একাউন্ট খুলতে ও রাখতে হবে। ভারতীয় টাকায় এ একাউন্ট রাখা হবে। এর ফলে সে কতগুলি বিশেষ সুবিধা ভোগ করতে পারবে। যথা,

(a) এ একাউন্টে রাখা টাকার উপর অর্জিত সুদ আয়করের আওতায় আসবে না।

(b) এ একাউন্ট থেকে এ দেশে যদি কাউকে গিফ্‌ট দেয়া হয় তবে তা গিফ্‌ট করের আওতায় আসবে না।

(c) এ একাউন্টের ব্যালেন্সের উপর সম্পদ কর নেয়া হবে না।

(d) এ একাউন্ট থেকে সুদ সহ সব টাকাই তুলে বিদেশে পাঠানো যাবে, এজন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়াকে জানানো দরকার হবে না।

(e) এ একাউন্টের আমানতের উপর সুদ, সরকারী সিকিউরিটির উপর লভ্যাংশ বা ইউনিট ট্রাস্ট অব ইণ্ডিয়ার ইউনিটস-এর উপর প্রদত্ত লভ্যাংশ এই একাউন্টে ক্রেডিট করা চলবে। তবে এসব সিকিউরিটি ও ইউনিটস এই একাউন্টের আমানত থেকে ক্রয় করতে হবে।

(f) স্থানীয় ব্যয় নির্বাহ করার জন্য এ একাউন্ট ডেবিট করা চলবে।

(g) এ একাউন্টের আমানত দিয়ে ইউটিআই ইউনিটস, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির সিকিউরিটি, ন্যাশনাল প্ল্যান সার্টিফিকেট ও সেভিংস সার্টিফিকেট অবাধে ক্রয় করা চলবে।

(h) ইউটিআই ইউনিটস, সরকারী সিকিউরিটি বা সার্টিফিকেট যা সূচনাতে এ একাউন্টের আমানত থেকে ক্রয় করা হয়েছে তার বিক্রয়লব্ধ অর্থ, মেয়াদ শেষে প্রাপ্ত অর্থ বা পুনঃক্রয় দাম এ একাউন্টে অবাধে ক্রেডিট করা চলবে।

(i) ন্যূনতম এক বছরের জন্য রক্ষিত আমানতের উপর তুলনামূলক স্থানীয় আমানতের উপর যে হারে সুদ দেয়া হয় তার চেয়ে দু' শতাংশ বেশি হারে সুদ দেয়া হবে।

এনআরআই একাউন্ট বিদেশ থেকে প্রেরিত বৈদেশিক বিনিময়, ভারতে সাময়িকভাবে থাকাকালীন ট্র্যাভেলার চেক প্রভৃতি দিয়ে খোলা যায়। তাছাড়া এনআরআই একাউন্ট থেকে একই একাউন্টহোল্ডারের নামে এফসিএনআর (ফরিণ কারেন্সি নন-রেসিডেন্ট) একাউন্টে টাকা স্থানান্তরিত করেও একাউন্ট খোলা চলে। সাধারণ নন-রেসিডেন্ট একাউন্টকে এনআরআই একাউন্টে রূপান্তরিত করা যায়। তবে সেজন্য পূর্বে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার অনুমোদন নিতে হয়।

(ii) এফসিএনআর একাউন্টে বিনিয়োগ। 1975 সনে এফসি

এনআর একাউণ্ট স্কীম চালু করা হয়। এ স্কীমের উদ্দেশ্য আমানতকারীদের বৈদেশিক বিনিময়ের ঝুঁকি থেকে রক্ষা করা ও তাদের টাকা বৈদেশিক মুদ্রায় ফিরিয়ে দেয়া। এফসিএনআর একাউণ্ট এনআরআই একাউণ্টেরই একটি বিশেষ স্কীম। এনআরআই একাউণ্ট সম্পর্কিত নিয়মকানুনগুলি এ স্কীমের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এফসিএনআর একাউণ্টের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হল।

(a) কারেন্সি। পাউণ্ড স্টার্লিং ও যুক্তরাষ্ট্রের ডলার দিয়ে এ একাউণ্ট খোলা যায়।

(b) একাউণ্ট। বিদেশ থেকে প্রেরিত পাউণ্ড বা ডলার দিয়ে একাউণ্ট খোলা যায়। বিদেশ থেকে পাউণ্ড বা ডলার ছাড়া যদি অন্য কোন কারেন্সি পাঠানো হয় তবে প্রেরকের অভিমত অনুযায়ী এফসিএনআর একাউণ্ট খোলা চলবে। তবে এ সম্পর্কিত সব ব্যয় একাউণ্ট-হোল্ডারকে বহন করতে হবে। একাউণ্টহোল্ডারের এনআরআই একাউণ্ট থেকে টাকা স্থানান্তরিত করেও এ একাউণ্ট খোলা যায়। সব ক্ষেত্রেই বৈদেশিক মুদ্রা টাকায় রূপান্তর করার হার হবে রূপান্তর করার দিন যে হার বলবৎ ছিল তা।

(c) একাউণ্টের ধরন। শুধু মেয়াদী আমানতে (টার্ম ডিপোজিট) একাউণ্ট খোলা চলবে। সেভিংস বা কারেণ্ট একাউণ্ট খোলা চলবে না।

(d) আমানতের মেয়াদ। 120 মাসের অনধিক কালের জন্য আমানত নেয়া যেতে পারে।

(e) সুদ। এক বছরের কম সময়ের জন্য আমানতের উপর সুদের হার তুলনামূলক স্থানীয় আমানতের উপর দেয় সুদের হারের সমান হবে। এক বছর বা ততোধিক কালের জন্য আমানতের উপর সুদের হার তুলনামূলক স্থানীয় আমানতের উপর দেয় সুদের হারের 20 শতাংশের বেশি হবে। এক্ষেত্রে ছয় মাস অন্তরও সুদ দেয়া চলবে।

(f) মেয়াদ পূর্ণ হবার আগেই একাউণ্ট বন্ধ করে দেয়া। যদি একাউণ্ট খোলার এক বছরের মধ্যেই একাউণ্ট বন্ধ করে দেয়া হয় তাহলে তার উপর কোন সুদ দেয়া চলবে না। যদি এক বছর পরে একাউণ্ট বন্ধ করে দেয়া হয় তবে তার উপর যে সুদের হার প্রাপ্য ছিল তার চেয়ে 2 শতাংশ কম হারে সুদ দেয়া হবে।

(g) রেসিডেন্ট একাউন্টে রূপান্তর করা। যদি আমানতকারী ভারতে স্থায়িভাবে বসবাস করার জন্য ফিরে আসে তবে তার একাউন্টকে টাকায় রূপান্তরিত করা হবে এবং তা রেসিডেন্ট একাউন্ট নামে অভিহিত হবে।

(h) বিনিময় ঝুঁকি। এফসিএনআর একাউন্ট খোলা ও পরিচালনা সম্পর্কিত বিনিময় ঝুঁকি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া বহন করবে।

সাম্প্রতিক পন্থা

ভারতের বাসিন্দা নয় এমন ভারতীয়গণকে ভারতে বিনিয়োগ করার জন্য প্রেরণা দেয়ার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি আরো কয়েকটি পন্থা গ্রহণ করা হয়েছে। যথা, স্থানীয় আমানতের উপর যে হারে সুদ দেয়া হচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে সে সুদের হার 2 শতাংশ বেশি করা হয়েছে। এর ফলে তাদের আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। 1981-82 সনে এনআরআই ও এফসিএনআর একাউন্টে আমানত বৃদ্ধির পরিমাণ 243 কোটি টাকা। 1982-83 সনে এ বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় 550 কোটি টাকা। 1983-84 সনে (ডিসেম্বর 1984 সন পর্যন্ত) বর্ধিত অর্থের পরিমাণ 800 কোটি টাকা। আশা করা যায় এ বৃদ্ধির পরিমাণ 1984 সনের মার্চে 2695·13 কোটি টাকা হবে। তাছাড়া ইউটিআই ইউনিট, সরকারী সিকিউরিটি, ন্যাশনাল প্ল্যান সার্টিফিকেট ও সেভিংস সার্টিফিকেটেও তাদের বিনিয়োগের সুযোগ দেয়া হয়েছে। তারা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি এবং সীমিত দায়যুক্ত সরকারী সংস্থাগুলিতেও বিনিয়োগ করার অধিকারী। কোন কোম্পানি যদি নতুন শেয়ার বাজারে ছাড়ে, শর্ত সাপেক্ষ, তাতেও তারা বিনিয়োগ করতে পারে। ভারতে বাস করে না এমন কোন ভারতীয় বা ভারতে বাস করে না অথচ ভারতে তার উৎপত্তি এমন কোন ব্যক্তি যদি যে মূলধন সে ভারতে বিনিয়োগ করবে এবং এর উপর অর্জিত মুনাফা বা লভ্যাংশ উঠিয়ে নিয়ে যাবে না বলে চুক্তিবদ্ধ হয় তবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার কাছে আবেদন করলে তাকে যেকোন পাবলিক বা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি এবং পার্টনারসিপ ও প্রোপ্রাইয়েটরি সংস্থার শেয়ারে বিনিয়োগ করার অনুমোদন দেয়া হবে। তবে কোন অবাঞ্ছিত প্রকৃতির বিনিয়োগ করার অনুমতি দেয়া হবে না। তাকে স্টক এক্সচেঞ্জে যেসব কোম্পানির শেয়ারের উল্লেখ থাকবে, শর্ত সাপেক্ষ, তার ইকুইটি শেয়ার ও প্রেফারেন্স শেয়ারে এবং ডিবেঞ্চারে পোর্টফলিও ইনভেস্টমেণ্ট করার অনুমতিও দেয়া হবে।

পোর্টফলিও ইনভেস্টমেণ্ট স্কীমের ফলে স্থানীয় ভারতীয় শিল্পপতিদের মধ্যে দারুণ বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া তা লাঘব করার জন্য স্কীমটির কিছু পরিবর্তন করে। এর ফলে নির্দিষ্ট ব্যাঙ্কগুলি এনআরআইর তরফ থেকে বিনিয়োগকারী প্রতি এক শতাংশ পরিমাণ ইকুইটি শেয়ার ও রূপান্তরযোগ্য ডিবেঞ্চার ক্রয় করতে পারবে। তবে তা কোম্পানির মোট আদায়ীকৃত মূলধনের 5 শতাংশ ও প্রতি সিরিজ কনভার-টিবিল ডিবেঞ্চারের মোট আদায়ীকৃত মূল্যের 5 শতাংশের বেশি হতে পারবে না। ফলে স্থানীয় শিল্পপতিদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া আরো বৃদ্ধি পায়। এ প্রসঙ্গে এসকোর্টস লিমিটেড (Escorts Ltd.) ও ডিসিএম লিমিটেড (DCM Ltd.) এবং ইংল্যাণ্ডের ক্যাপারো গ্রুপ (Caparo Group)-এর বিবাদ ও তাদের আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক নয়।

মিস্টার স্বরাজ পল (Mr. Swraj Paul) একজন অনাবাসিক ভারতীয় শিল্পপতি। তাঁর ক্যাপারো গ্রুপ অব কোম্পানিজ এসকোর্টস লিমিটেড ও ডিসিএম লিমিটেড প্রত্যেকের 6·5 কোটি টাকার শেয়ার ক্রয় করে। এস-কোর্টস লিমিটেড এসব শেয়ার ক্যাপারো গ্রুপ অব কোম্পানিজ-এর নামে স্থানান্তরিত করতে অস্বীকৃত হয়। লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানি অব ইণ্ডিয়া (এলআইসি) এসকোর্টস লিমিটেডের একজন শেয়ারহোল্ডার। এলআইসি এসকোর্টস লিমিটেডের বোর্ড অব ডাইরেক্টরদের একটি জরুরী সভা ডাকার জন্য রেকুইজিসন দেয়। উদ্দেশ্য এর পনেরো জন সদস্যবিশিষ্ট বোর্ড থেকে আংশিক সময়ের জন্য নিযুক্ত নয় জন ডাইরেক্টরকে সরিয়ে তাঁদের জায়গায় পাবলিক আর্থিক সংস্থাগুলিতে পূর্ণ সময়ের জন্য নিযুক্ত নয় ব্যক্তিকে নিয়োগ করা। এসকোর্টস লিমিটেড এ সভার বৈধতা সম্বন্ধে বোম্বে হাই-কোর্টে আবেদন (writ petition) করে। বোম্বে হাইকোর্ট এসকোর্টস লিমিটেডের অনুকূলে রায় দেয়। হাইকোর্টের বক্তব্য, ফরিণ এক্সচেঞ্জ রেগুলেসনস এ্যাক্ট (এফ-এ-আর-এ)-এর 29 (1) (B) ধারা অনুযায়ী কোন এনআরআই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার পূর্ব অনুমোদন ব্যতীত কোন ভারতীয় কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করতে পারে না। এলআইসি বোর্ডের জরুরী সভার জন্য যে রেকুইজিসন দেয় তা অভিসন্ধিমূলক। এলআইসি একা বা অন্যান্য আর্থিক সংস্থাগুলির সঙ্গে সে যদি কোন কোম্পানিতে বিনিয়োগ করে বা কোন কোম্পানির 50 শতাংশের বেশি শেয়ারের মালিক

হয় তাহলেই তার সে কোম্পানির পরিচালনা অধিগ্রহণ করার ক্ষমতা জন্মায় না। কারণ এলআইসি এ্যাক্ট অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি নির্ধারণ স্তরে তাকে এ ক্ষমতা দেয়া হয়নি। এলআইসি যদি তার নিজস্ব বিনিয়োগের নিরাপত্তার জন্য এরূপ অধিগ্রহণ করে তবে তা বৈধ হতে পারে।

প্রতিক্রিয়া

বোম্বে হাইকোর্টের রায়ে স্বভাবতই স্থানীয় ভারতীয় শিল্পপতিগণ খুসি। তৎকালীন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য, এনআরআই স্কীমের পরিবর্তনের কোন ইচ্ছা সরকারের নেই। যাহোক, এলআইসির ব্যাপারটা সুপ্রীম কোর্টের বিচারের জন্য প্রেরিত হয়। মিস্টার স্বরাজ পল স্বভাবতই ক্ষুব্ধ। তাঁর মতে বোম্বে হাইকোর্টের রায়ের ফলে তিন শ্রেণী শেয়ারহোল্ডারের সৃষ্টি হয়েছে। যথা, অতিশয় অধিকারপ্রাপ্ত গোষ্ঠী,—অনুশাসকগণ ; দলিত গোষ্ঠী,—সাধারণ শেয়ারহোল্ডারগণ ; এবং দর্শক গোষ্ঠী,—পাবলিক আর্থিক সংস্থা-সমূহ। পাবলিক আর্থিক সংস্থাগুলি অধিকাংশ শেয়ারের মালিক হলেও তাদের ভূমিকা দর্শকের ভূমিকাতেই আবদ্ধ থাকবে। এ ব্যাপারে সাধারণের প্রতিক্রিয়া ঃ অযথা অর্থ ও সময়ের অপচয় এবং শিল্পে অস্থিরতার সৃষ্টি।

উপসংহার

অনাবাসিক ভারতীয়রা প্রচুর বিনিয়োগযোগ্য সম্পদের অধিকারী। এর পরিমাণ অনুমিত 50,000 কোটি টাকা। দারুণ বিপর্যয়ের তাড়নায় ভারত সরকারকে 5 বিলিয়ন এসডিআর (SDR) ঋণের জন্য ইন্টারন্যাশনাল মণিটারী ফাণ্ডের দ্বারস্থ হতে হয়। ভারত সরকার মনে করে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা পেলে অনাবাসিক ভারতীয়রা তাদের এ প্রচুর সম্পদ ভারতে বিনিয়োগ করতে উৎসাহী হবে। ভারত বৈদেশিক বিনিময় সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে পারবে এবং দেশীয় শিল্পগুলির দ্রুত উন্নয়ন সম্ভব হবে। স্থানীয় শিল্পপতিদের ধারণা এনআরআই স্কীম একটি রাজনৈতিক কৌশলমাত্র। পাবলিক আর্থিক সংস্থাগুলির সহায়তায় এক অর্থে অভারতীয় শিল্পপতিরা তাদের অপসারণে তৎপর হয়ে উঠেছে। 1974 সনে ঋণ-চুক্তির এক বিধান অনুযায়ী আর্থিক সংস্থাগুলিকে তাদের প্রদত্ত ঋণকে সংশ্লিষ্ট কোম্পানির ইকুইটি শেয়ারে রূপান্তরিত করার অধিকার দেয়া হয়েছে। এর পর থেকেই স্থানীয় শিল্পপতিদের মনে নানারূপ সংশয় দেখা দিয়েছে।

দেশত্যাগী এনআরআই-এর একাংশের হঠাৎ দেশের প্রতি দরদ ও সরকারের অকুণ্ঠ সমর্থন যেমন ভারতীয় শিল্পপতিদের আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে তেমনি সাধারণ মানুষের আশঙ্কা এ পথেই হয়তো একদিন বিদেশী শিল্পপতিদের অনুপ্রবেশ ঘটবে। অবশ্য জাতির এ সঙ্কট ও সন্ধিক্ষণে অনাবাসিক ভারতীয়দের আর্থিক সাহায্য থেকে দেশকে বঞ্চিত করার পিছনেও তেমন যুক্তি আছে, তা বলা চলে না। বর্তমান অবস্থায় অনাবাসিক ভারতীয়দের চলতি শিল্প সংস্থাগুলিতে বিনিয়োগের প্রেরণা না দিয়ে তাদের নতুন শিল্প গড়ে তোলার জন্য উৎসাহ দেয়া সঙ্গত। এ ব্যাপারে সরকারের দিক থেকে অনাবাসিক ভারতীয়দের সঙ্গে জয়েন্ট ভেনচারে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে। অনাবাসিক ভারতীয়দের বিনিয়োগে উৎসাহ দিয়ে সরকার যে 'ব্রেন ড্রেন'-কে উৎসাহ দিচ্ছে, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

16 শ্রমিক, বেকারত্ব ও শ্রমিক কল্যাণ

I. শ্রমিক

কৃষি শ্রমিক

এগ্রিকালচারেল লেবার এনকোয়ারী কমিটির (1950-51) মতে, "কৃষি শ্রমিক" বলতে সে ব্যক্তিকে বুঝায় সে পূর্ববর্তী বছর যে কয়দিন কৃষির কাজ করেছে তার অন্তত 50 শতাংশ দিন ভাড়া-মজুর রূপে কাজ করেছে। এগ্রিকালচারেল লেবার এনকোয়ারী কমিটির (1956-57) মতে তাকেই কৃষি শ্রমিকরূপে গণ্য করা হবে যার পূর্ববর্তী বছর আয়ের প্রধান স্থত্র ছিল কৃষিকার্য থেকে অর্জিত মজুরি।

বৈশিষ্ট্য

(i) কৃষি শ্রমিকেরা শিল্প শ্রমিকদের মত সংগঠিত নয়। ফলে তারা সঙ্ঘশক্তিতে দুর্বল।

(ii) তারা সাধারণত অদক্ষ, অজ্ঞ ও অত্যন্ত দরিদ্র। তারা আত্ম সচেতন এবং সমাজ সচেতন নয়। তাদের নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার সামর্থ্য কম।

(iii) কৃষি শ্রমিকদের যোগান চাহিদার তুলনায় অনেক বেশি। যার ফলে কৃষি বেকার ও ছদ্মবেশী কৃষি বেকারের আধিক্য দেখা যায়।

(iv) কৃষি শ্রমিকেরা তাদের জীবিকার জন্য একমাত্র কৃষির উপরই নির্ভর করে না। তাদের উপার্জনের বিকল্প পথ রয়েছে। শিল্প শ্রমিকদের ক্ষেত্রে বিকল্প উপার্জনের পথের স্থযোগ নেই।

(v) কৃষি শ্রমিক ও তার নিয়োগ-কর্তার মধ্যে প্রত্যক্ষ ও নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। শিল্প শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এরূপ প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ও নিবিড়তার স্থযোগ নেই বললেই চলে।

(vi) শিল্প শ্রমিকদের স্বার্থ নানাপ্রকার আইনকানুন দ্বারা স্থরক্ষিত। কৃষি শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এর অভাব রয়েছে। তাদের স্বার্থে যেসব আইনকানুন প্রণয়ন করা হয়েছে তাও যথাযথ কার্যকর করা হয় না। কৃষি শ্রমিকদের সাংগঠনিক দুর্বলতা এর অন্যতম কারণ।

সংখ্যা

1971 সনে কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা ছিল 4·75 কোটি বা মোট শ্রমশক্তির 26·33 শতাংশ। 1981 সনে (আসাম জম্মু ও কাশ্মীর বাদে) কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা 5·4 কোটি বা মোট শ্রমশক্তির 25·16 শতাংশ। অর্থাৎ, ভারতে 25 শতাংশেরও বেশি শ্রমিক কৃষির উপর নির্ভরশীল। বিহার, অন্ধ্র-প্রদেশ, কেরল ও তামিলনাড়ুতে কৃষি শ্রমিকদের সংখ্যা রাজ্যের মোট শ্রম-শক্তির যথাক্রমে 35·44 শতাংশ, 36·68 শতাংশ, 28·19 শতাংশ ও 31·45 শতাংশ। দিল্লী, নাগাল্যাণ্ড ও চণ্ডীগড়ে যথাক্রমে 0·86 শতাংশ, 1·81 শতাংশ ও 0·52 শতাংশ।

দারিদ্র্য

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া পরিচালিত ডেট এণ্ড ইনভেস্টমেণ্ট সার্ভেতে (1971-72) প্রকাশ, কৃষি শ্রমিক পরিবারদের 35·33 শতাংশ ঋণগ্রস্ত ও গড়ে প্রতি পরিবারের ঋণের পরিমাণ 161·96 টাকা। এদের অধিকাংশই লগ্নিকারবারীদের কাছে ঋণগ্রস্ত। রুরাল লেবার এনকোয়ারী (1974-75) সূত্রে প্রকাশ, 1974-75 সনে মোট কৃষি শ্রমিকদের 66 শতাংশ পরিবার ঋণগ্রস্ত। 1964-65 সনে এর পরিমাণ ছিল 61 শতাংশ। ঋণগ্রস্ত কৃষি শ্রমিক পরিবারদের গড় ঋণের পরিমাণ 1964-65 সনে ছিল 244 টাকা; 1974-75 সনে 584 কোটি টাকা। অর্থাৎ, দশ বছরে ঋণ বৃদ্ধির পরিমাণ 135 শতাংশ। 1974-75 সনে তাদের মোট ঋণের 48 শতাংশ সরবরাহ করেছে লগ্নিকারবারীরা। 1964-65-এর পরিমাণ ছিল 31 শতাংশ।

সরকারের ভূমিকা

কৃষি শ্রমিকদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার জন্য সরকার যেসব ব্যবস্থা নিয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য :

(i) ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ। মিনিমাম ওয়েজস এ্যাক্ট (1948) সরকারকে কৃষি শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করার ক্ষমতা দিয়েছে। তাদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে বটে, কিন্তু তা যথাযথ কার্যকর করা হচ্ছে বলা চলে না। কৃষিকার্যের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য, কৃষি শ্রমিক সংগঠনের অভাব, বেকার কৃষি শ্রমিকদের সংখ্যাধিক্য, জমির মালিকদের কায়েমী সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব ও কৃষি সম্পর্কে সরকারের

প্রশাসনিক আগ্রহ ও দৃঢ়তার অভাব এ শিথিলতার কারণ বলা যেতে পারে।

(ii) কৃষি শ্রমিকদের জীবনযাপনের মানের উন্নতি সাধনের জন্য কতিপয় নির্বাচিত জেলা ও অঞ্চল-ভিত্তিক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। যথা, স্মল ফার্মাস ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি, মার্জিনাল ফার্মাস এণ্ড এগ্রিকালচারেল লেবারার্স ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি প্রোগ্রাম প্রভৃতি।

(iii) উদ্বৃত্ত জমি, ভূদান থেকে প্রাপ্ত জমি ও খাস জমি জমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হচ্ছে যাতে তারা জমির মালিকানা পেয়ে নিজেদের জমি নিজেরাই চাষ-আবাদ করে স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করতে পারে। জমি পুনর্বণ্টনের সঙ্গে তাদের চাষ-আবাদের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সহজ শর্তে দেয়ার জন্য নানাপ্রকার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

(iv) গ্রামীণ শিল্পের উন্নয়ন ও প্রসার সাধন এবং রাস্তাঘাট নির্মাণ, ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন, পয়ঃপ্রণালীর উন্নয়ন, বনরোপণ প্রভৃতি কর্মসূচীর মাধ্যমে গ্রামীণ বেকারত্বের চাপ লাঘব করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে কৃষি শ্রমিক সমবায় সমিতি গঠনেও উৎসাহ দেয়া হচ্ছে।

(v) 20 দফা কর্মসূচী (জুলাই 1975) কৃষি শ্রমিকদের আর্থিক উন্নতির কর্মসূচী নিয়েছে। যথা, জমির উচ্চতম সীমা নির্ধারণ নীতি দ্রুত কার্যকর করা ও উদ্বৃত্ত জমি জমিহীন শ্রমিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া ; জমিহীন কৃষকদের বাসগৃহ নির্মাণের জন্য জমি দেয়া ও যে জমিতে তারা নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত বসবাস করছে সে জমির মালিকানা স্বত্ব তাদের দেয়া ; ঋণগ্রস্ত কৃষি শ্রমিক, গ্রামীণ শিল্পী ও ক্ষুদ্র কৃষকদের ঋণ থেকে মুক্ত করা এবং কৃষি শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ।

(vi) বণ্ডেড লেবার সিস্টেম (এ্যাবোলিশন) এ্যাক্ট 1976 অনুযায়ী বেগার শ্রমিক প্রথার বিলোপসাধন ও তাদের পুনর্বাসন।

শ্রমশক্তি ও কর্মসংস্থান

ধারণা

প্ল্যানিং কমিশন কর্তৃক গঠিত কমিটি অব এক্সপার্টস অন আনএমপ্লোয়-মেণ্ট এস্টিমেটস (ডাণ্টওয়ালা কমিটি) ও ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভে অর্গানাই-

জেশন (এন-এস-এস-ও) শ্রমশক্তি, কর্মসংস্থান ও বেকার সম্পর্কে যে সংজ্ঞা ও ধারণা রচনা করেছে তা আমাদের দেশে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বলে সরকারীরূপে গৃহীত হয়েছে। এ সংজ্ঞা ও ধারণা গুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা,

(i) প্রচলিত মর্যাদা ধারণা, (ii) সাপ্তাহিক মর্যাদা ধারণা, ও (iii) দৈনিক মর্যাদা ধারণা।

(i) প্রচলিত মর্যাদা ধারণা। এ ধারণার উদ্দেশ্য প্রচলিত কর্মে নিযুক্ত, বেকার বা সমীক্ষার বহির্ভূত শ্রমশক্তির কাজকর্মের মর্যাদার পরিমাপ করা। এ মর্যাদা এক সপ্তাহের অধিক কালের প্রসঙ্গে নির্ধারণ করা হয়। প্রচলিত মর্যাদা দীর্ঘকাল কর্মহীনতাকে বুঝায়। সংখ্যাগতভাবে তাকে গণনা করা হয়।

(ii) সাপ্তাহিক মর্যাদা ধারণা। এক্ষেত্রে কর্মমর্যাদা বিগত সাত-দিনের প্রসঙ্গে নির্ধারণ করা হয়। যে ব্যক্তি এ সাতদিনের মধ্যে অন্তত এক ঘণ্টা খেটে কিছু রোজগার করেছে তাকেই কর্মপ্রাপ্ত বলে ধরা হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি এ সময়কালীন এক ঘণ্টাও কাজে নিযুক্ত ছিল না, তবে কাজের চেষ্টা করেছে বা কাজের জন্য তাকে পাওয়া গিয়েছিল, তাকে কর্মহীন বলে ধরা হয়।

(iii) দৈনিক মর্যাদা ধারণা। এক্ষেত্রে একজন লোকের বিগত সাত-দিনের প্রতিদিনের কর্মমর্যাদা ধরা হয়। যে ব্যক্তি একদিনে কমপক্ষে এক ঘণ্টা কিন্তু চার ঘণ্টার কম কাজ করেছে তাকে অর্ধেক দিন কাজ করেছে বলে ধরা হয়। যদি সে একদিনে চার ঘণ্টা বা তার অধিককাল কাজ করে থাকে তবে তাকে গোটা দিনের জন্য কর্মে নিযুক্ত বলে ধরা হয়।

সাপ্তাহিক মর্যাদা ও দৈনিক মর্যাদার সঙ্গে যুক্ত বেকারত্ব দ্বারা আংশিক ও সাময়িক কর্মসংস্থানকে বুঝায়।

শ্রমশক্তির পরিমাপ

শ্রমশক্তি প্রচলিত মর্যাদায় অংশগ্রহণের হারের ভিত্তিতে পরিমাপ করা হয়।

প্রচলিত মর্যাদা ভিত্তিক শ্রমশক্তি

বয়সগোষ্ঠী	শ্রমশক্তি		
	198) মার্চ	1985 মার্চ	বার্ষিক বৃদ্ধি
(1)	(2)	(3)	(4)
	(মিলিয়ন)		(শতাংশ)
5+	268·05	302·29	2·43
15+	251·41	285·07	2·55
15-59	236·95	268·22	2·51

সূত্র : ষষ্ঠ পরিকল্পনা।

দ্রষ্টব্য : 1980 সনের মার্চে গ্রামীণ শ্রমশক্তি 215·93 মিলিয়ন (স্ত্রী 66·69 মিলিয়ন ও পুরুষ 149·24 মিলিয়ন)। শহরাঞ্চলে শ্রমশক্তি 52·12 মিলিয়ন (স্ত্রী 10·04 মিলিয়ন ও পুরুষ 42·08 মিলিয়ন)। মোট পুরুষ ও স্ত্রী শ্রমশক্তি যথাক্রমে 191·32 মিলিয়ন ও 76·73 মিলিয়ন। [ষষ্ঠ পরিকল্পনা]। বর্তমানে (1985) মোট শ্রমশক্তির সংখ্যা 284·2 মিলিয়ন। [ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক]

দেখা যাচ্ছে, ষষ্ঠ পরিকল্পনাকালীন শ্রমশক্তি 2·43 শতাংশ থেকে 2·55 শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে বলে ধরা হয়েছে। মোট শ্রমশক্তি বৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়াবে 3 কোটি 40 লক্ষ। 1981 সনে ভারতে কর্মরত জনসংখ্যা ছিল প্রায় 24·71 কোটি বা মোট জনসংখ্যার 37·55 শতাংশ।

উল্লিখিত অনুমিত শ্রমশক্তি ছাড়া জনসংখ্যার বেশকিছু অংশ সহকারী পেশায় আর্থিকভাবে যুক্ত। এদের সংখ্যা 1980 সনের মার্চে 2 কোটি 40 লক্ষ। এদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা 87 শতাংশ।

শ্রমশক্তির সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে শ্রমের গুণগত উন্নতিও লক্ষ্যণীয়। এন-এস-এস-এর 27 ও 32 রাউণ্ডের সমীক্ষায় দেখা যায়, শ্রমশক্তির শিক্ষাগত স্তর 1972-73 ও 1977-78 সনের মধ্যে গড়ে বার্ষিক প্রায় 1 শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। পুরুষ শ্রমশক্তির শিক্ষাগত স্তর বৃদ্ধির হার 46·3 শতাংশ থেকে 51·6 শতাংশ ; স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে 10·7 শতাংশ থেকে 15·5 শতাংশ।

II. বেকারত্ব

অনুমিত বেকারের সংখ্যা

মর্যাদার ধারণার ভিত্তিতে অনুমিত বেকারের সংখ্যা নিম্নরূপ।

1980 সনের মার্চে অনুমিত বেকারের সংখ্যা

ধারণা	বেকারের সংখ্যা মার্চ 1980		
	(5 +)	(15 +)	15-59
(1)	(2)	(3)	(4)
		(মিলিয়ন)	
প্রচলিত মর্যাদা	12·02	11·42	11·31
সাপ্তাহিক মর্যাদা	12·18	11·64	11·36
দৈনিক মর্যাদা	20·74	19·77	19·17

সূত্র : ষষ্ঠ পরিকল্পনা।

স্ত্রী বেকারের সংখ্যা পুরুষ বেকারের সংখ্যা অপেক্ষা অধিক।

প্রচলিত মর্যাদা ভিত্তিক বেকারের হার, 1977-78

ক্রমিক নং	বয়সগোষ্ঠী	গ্রামীণ	শহরাঞ্চল	পুরুষ	স্ত্রী	সমগ্র
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	5-14	3·05	8·46	2·53	5·17	3·54
2	15-29	6·02	17·63	6·81	11·51	8·20
3	30-44	1·74	3·03	0·73	4·86	1·98
4	85-59	1·14	1·71	0·50	3·18	1·24
5	60 +	0·64	1·66	0·48	2·00	0·78
6	সব বয়স	3·26	8·77	3·07	7·01	4·73

সূত্র : ষষ্ঠ পরিকল্পনা।

ষষ্ঠ পরিকল্পনার শেষ বছর (1985) কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা কি আকার ধারণ করবে তা নিম্নের তালিকা থেকে বুঝা যাবে।

1980 সনের মার্চ পর্যন্ত যারা দীর্ঘকাল যাবৎ বেকার রয়েছে তাদের সংখ্যা এবং 1980-85 সনে (ষষ্ঠ পরিকল্পনাকালীন) শ্রমশক্তির নীট বৃদ্ধি [প্রচলিত মর্যাদা ভিত্তিক]

বয়সগোষ্ঠী (1)	বেকার 1980 (2)	নীট বৃদ্ধি 1980-85 (3)	মোট (4)
	(মিলিয়ন)		
5+	12·02	34·24	46·26
15+	11·42	33·66	45·08
15-59	11·31	31·27	42·58

সূত্র : ষষ্ঠ পরিকল্পনা।

দেখা যাচ্ছে, 1985 সনে (ষষ্ঠ পরিকল্পনার শেষ বছর) কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা দাঁড়াবে 4 কোটি 50 লক্ষ। বর্তমান হারের ভিত্তিতে ষষ্ঠ পরিকল্পনাকালীন সংগঠিত সেক্টরে অতিরিক্ত 40-50 লক্ষ লোকের নিয়মিত কর্মসংস্থান হতে পারে। অর্থাৎ, বাকী প্রায় 4 কোটি লোকের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র হচ্ছে কৃষি, ক্ষুদ্রায়তন সেক্টর ও অন্যান্য অসংগঠিত কাজকর্ম। সুদূর ভবিষ্যতে মধ্য ও তৃতীয় সেক্টরে বেশকিছু সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থান হতে পারে বটে, কিন্তু সমস্যা বর্তমানে কিভাবে এ বিপুল সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায়।

শিক্ষিত বেকার

শিক্ষিত বেকার বলতে সে ব্যক্তিকে বোঝায় যে অন্তত ম্যাট্রিকুলেশন বা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করেছে। শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। 1980 সনের সুরুতে এদের সংখ্যা ছিল 3472 হাজার। 1985 সনের সুরুতে এদের সংখ্যা প্রায় 4657 হাজার দাঁড়াবে। 15-59 বয়স গোষ্ঠী ধরে বিচার করলে দেখা যায় বেকারের সংখ্যা মোট শ্রমশক্তির এক-দশমাংশ। অর্থাৎ, দশজন কর্মক্ষম ও কর্মে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের মধ্যে একজন শিক্ষিত বেকার। শিক্ষিত বেকার একটি বিশেষ জাতীয় সমস্যা। কারণ

কর্মরত ও কর্মহীন জনসংখ্যার বণ্টন, 1981

শ্রেণী (1)	সংখ্যা (2)	পুরুষ মোট পুরুষ জনসংখ্যার শতাংশ (3)	সংখ্যা (4)	স্ত্রী মোট স্ত্রী জনসংখ্যার শতাংশ (5)	সংখ্যা (6)	মোট জনসংখ্যার শতাংশ (7)
কর্মরত লোকসংখ্যা মোট (A+B)	1808	53·19	663	20·84	2471	35·55
A—মোট প্রধান কর্মীবৃন্দ	1741	51·22	460	14·46	2201	33·44
(i) কৃষক	762	22·42	152	4·78	914	13·89
(ii) কৃষি শ্রমিক	344	10·12	209	6·75	554	8·42
(iii) গৃহস্থ শিল্প	64	1·88	24	0·75	88	1·34
(iv) অন্যান্য কর্মীবৃন্দ	571	16·80	75	2·36	645	9·80
B—প্রান্তিক কর্মীবৃন্দ	67	1·97	204	6·41	271	4·12
C—মোট কর্মহীন জনসংখ্যা	1591	46·81	2519	79·19	4110	62·45
D—মোট জনসংখ্যা (A—B+C)	3399	100·00	3182	100·00	6581	100·00

সূত্র: 1981 সেনসাস। আসাম, জম্মু ও কাশ্মীর ধরা হয়নি।

তাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য দেশকে বহু অর্থ বিনিয়োগ করতে হয়। দেখা যায়, ম্যাট্রিকুলেশন এবং স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষিত বেকার গোষ্ঠীর প্রায় 40 শতাংশ ম্যাট্রিকুলেশন পাস। 15-29 বয়স গোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা সর্বাধিক। এর কারণ সম্ভবত চাকরির ক্ষেত্রে তাদের অভিজ্ঞতার অভাব ও তাদের অস্থায়ী চাকরী গ্রহণে অনিচ্ছা। 15-29 বয়স গোষ্ঠী শ্রমশক্তির 11·5 শতাংশ শিক্ষিত। কিন্তু এরা মোট বেকার সংখ্যার 33·2 শতাংশ। এর মধ্যে 23·8 শতাংশ মাধ্যমিক ও 9·4 শতাংশ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরভুক্ত। শিক্ষিত বেকারত্বের হার 7·75 শতাংশ। নিম্নের তথ্য থেকে তা বুঝতে পারা যাবে।

তরুণ শ্রমশক্তির বণ্টন ও বেকার (শিক্ষাস্তরের ভিত্তিতে)

শিক্ষাস্তর	শতকরা অংশ		বেকারের
	শ্রমশক্তি	বেকার	হার
(1)	(2)	(3)	(4)
		শতাংশ	
অশিক্ষিত	48·9	25·0	3·97
প্রাথমিক ও মধ্য	39·6	41·8	8·17
মাধ্যমিক	8·8	23·8	21·05
স্নাতক ও স্নাতকোত্তর	2·7	9·4	26·97
মোট	100·0	100·0	7·75

সূত্র ঃ ষষ্ঠ পরিকল্পনা।

শিক্ষিত বেকারদের মধ্যে 73·8 শতাংশ বা প্রায় তিন-চতুর্থাংশ পুরুষ। তাদের মধ্যে প্রায় 45 শতাংশ গ্রামের অধিবাসী।

32 রাউণ্ড এন-এস-এসের (1977-78) প্রাথমিক ফলাফলে প্রকাশ, প্রচলিত মর্যাদার বেকারত্বের বৃদ্ধির হার অশিক্ষিতদের ক্ষেত্রে 2·28 শতাংশ, প্রাথমিক স্তরে 3·61 শতাংশ, মাধ্যমিক স্তরে 15·15 শতাংশ এবং স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে 15·76 শতাংশ। এমপ্লোয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের সূত্রেও দেখা যায় যে, কর্মপ্রার্থীদের 50 শতাংশেরও বেশি শিক্ষিত। এ দ্বারা শিক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারার মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

বেকারত্বের কারণ

বেকারত্বের কারণ প্রধানত ঃ

(i) দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি।

(ii) শ্রমশক্তির পরিকল্পনার অভাব।

(iii) অনুপযুক্ত প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগ।

(iv) অনুন্নত কৃষি।

(v) পরিকল্পনার ব্যর্থতা।

(i) দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি

1960-70 সনে ভারতে গড় বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার 2·45 শতাংশ। শ্রমশক্তি বৃদ্ধির হার 1·9 শতাংশ। অপরদিকে কৃষিক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ স্বভাবতই সীমিত। শিল্প, বাণিজ্য ও তৃতীয় সেক্টরে কর্মসংস্থানের যে প্রসার সাধন ঘটেছে প্রয়োজনের তুলনায় তা অনেক কম। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, 1961-76 সন পর্যন্ত আধুনিক ফ্যাক্টারী সেক্টরে বিনিয়োগ ও উৎপাদন যথাক্রমে 139 শতাংশ ও 161 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র 71 শতাংশ। ক্ষুদ্রায়তন শিল্প সেক্টরে কর্ম-সংস্থানের অধিকতর সুযোগ রয়েছে, তবে সে ক্ষেত্রও অনুন্নত।

(ii) শ্রমশক্তি পরিকল্পনার অভাব

পরিকল্পনার লক্ষ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ; শ্রমশক্তির পূর্ণ ব্যবহার ও কর্মসংস্থান নয়। কর্মসংস্থান উন্নয়নের পার্শ্বফল ; কর্মসংস্থান-ভিত্তিক উন্নয়ন নয়। ফলে উন্নয়ন ঘটছে, বেকারের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর একটি পরিচয় শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি। 1985 সনের সুরুতে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় 47 লক্ষ। এর কারণ দেশের শিক্ষা প্রথা চাকরি-ভিত্তিক নয়। অর্থাৎ, সার্বিক পরিকল্পনের সঙ্গে শিক্ষা পরিকল্পনের সম্বন্ধ সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

(iii) অনুপযুক্ত প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগ

ভারতে শ্রমশক্তির অভাব নেই, অভাব মূলধন উপকরণের। সামাজিক দিক থেকে দেখতে গেলে সর্বাধিক প্রয়োজন সুলভ শ্রমশক্তির পূর্ণ ব্যবহার। অর্থাৎ, উৎপাদনের ভিত শ্রম-নিবিড় বা 'লেবার ইনটেনসিভ' হওয়া সঙ্গত, মূলধন-নিবিড় বা 'ক্যাপিটেল ইনটেনসিভ' নয়। কিন্তু অনেক সেক্টরই আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার উপযোগিতার দাবিতে বা হাওয়াতে বেশি পরিমাণ মূলধন উপকরণ ও কম পরিমাণ শ্রমশক্তি ব্যবহার করছে। শ্রমিকের পরিবর্তে

আধুনিক যন্ত্রপাতি ও অটোমেশনের প্রবর্তনের ফলে অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ আরো সীমিত হয়ে আসছে। দ্রুত উন্নয়ন ও মূলধন-ভিত গড়ে তোলার আগ্রহে সরকারও আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা আমদানি ও প্রয়োগ ব্যাপারে বৈদেশিক বিনিময়ের সুবিধা, অবক্ষয়ের সুবিধা প্রভৃতি দিয়ে সাহায্য করে যাচ্ছে। ফলে শ্রমিকদের স্বার্থ উপেক্ষিত হচ্ছে; বেকারের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। সম্প্রতি এও দেখা যাচ্ছে যে, যে সমস্ত কর্মী নিযুক্ত তাদের ওভার-টাইম, বোনাস ও অন্যান্য সুবিধা দিয়ে শ্রমিক অসন্তোষ এড়িয়ে যাওয়ার নীতির চেষ্টায় নতুন নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সীমাবদ্ধতার অপর কারণ সরকারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত শ্রমিক নীতি।

(iv) **অনুন্নত কৃষি**

ভারতের কৃষি অনুন্নত। গ্রামীণ ক্ষেত্রে সহযোগী শিল্পের অভাব। ভিত-কাঠামোরও অভাব। চাহিদার তুলনায় জমির যোগান কম। জমি বণ্টনও সুষম নয়। অথচ দেশের প্রায় 80 শতাংশ লোক গ্রামে থাকে। ফলে কৃষিতে বেকারের ছদ্মবেশে কর্মে নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(v) **পরিকল্পনার ব্যর্থতা**

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মডেলে ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োজনকে সময়োচিত গুরুত্ব দেয়া হয়নি। পরিকল্পন ও পরিকল্পনা রূপায়ণে ত্রুটি থাকার ফলে ভারতের ভিত-কাঠামো অনুন্নত, গ্রামীণ উন্নয়ন শ্লথ, কৃষি ও শিল্পে শ্রমশক্তির কম ব্যবহার, অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার, বিশেষত কৃষি ও শিল্প সেক্টরে, কম ও পরিকল্পনা রূপায়ণে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে আগ্রহের অভাব।

সমাধানের উপায়

1. শহরাঞ্চলের বেকারত্ব

(a) শিক্ষা প্রথা বৃত্তি-ভিত্তিক করা। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্র একমাত্র মেধাবী ছাত্রদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

(b) কম মূলধন-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতি গ্রহণে উৎসাহ দেয়ার জন্য রাজস্ব ও প্রযুক্তিবিদ্যা সম্পর্কিত সুযোগসুবিধা দেয়া।

(c) সাধারণত সেসব ক্ষেত্রেই বিনিয়োগে উৎসাহ দিতে হবে যেসব

ক্ষেত্রে বিনিয়োগ দ্রুত ফলপ্রসূ হবে। এর ফলে মূলধন দ্রুত আবর্তিত হতে থাকবে ; কর্মসংস্থানও ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবে।

(d) শিল্প বিকেন্দ্রীকরণ কার্যকর করতে হবে যাতে কর্মসংস্থান ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈষম্য লাঘব পায়।

(e) স্বনিযুক্ত কর্মসূচী উৎসাহের সঙ্গে কার্যকর করতে হবে।

2. গ্রামীণ বেকারত্ব

গ্রামীণ বেকারত্ব লাঘব করার একমাত্র পথ গ্রামীণ বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও সেজন্য বিরাট কার্যকর কর্মসূচী গ্রহণ ও রূপায়ণ এবং সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে 'কৃষি বিপ্লব' রূপায়িত করা। এ সম্পর্কে বিশেষভাবে যে সমস্ত বিষয় করণীয় সেগুলি হচ্ছে ভূমি স্বত্ব প্রথার সংস্কার ও জমির উন্নয়ন সাধন ; স্থানীয় মূলধন নির্মাণ প্রকল্প রূপায়ণ, যথা, ক্ষুদ্র ও মাঝারি সেচ, পরিবহন, গুদামঘর নির্মাণ প্রভৃতি ; অধিকতর শ্রম-নিবিড় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য ও বহুপ্রকার কৃষিদ্রব্য উৎপাদন করা ; বন, মৎস চাষ প্রভৃতি উৎপাদনশীল কাজকর্মের উন্নয়ন সাধন ; গ্রামীণ সামাজিক সেবার, যেমন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাসস্থান, উন্নতি সাধন এবং ক্ষুদ্রায়তন ও কৃষি-ভিত্তিক শিল্পের প্রসার ও উন্নয়ন সাধন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচী জাতীয় উন্নয়ন কর্মসূচীর অংশবিশেষ রূপে রচিত হওয়া সঙ্গত। জাতীয় স্তরের কর্মসূচীর (যেমন, জাতীয় ভিত-কাঠামো গড়ে তোলা) সার্থক রূপায়ণের ফলে গ্রামীণ উন্নয়নের পথ প্রশস্ত হবে ; উন্নয়নও দ্রুত বৃদ্ধি পাবে।

বেকারত্ব দূর করার জন্য যেকোন উন্নয়ন পদ্ধতিই গ্রহণ করা হোক না কেন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ছাড়া এ সমস্যা সমাধানের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হতে বাধ্য।

ষষ্ঠ পরিকল্পনায় কর্মসংস্থান নীতি

ষষ্ঠ পরিকল্পনায় যে কর্মসংস্থান নীতি গ্রহণ করা হয়েছে তার মূল উদ্দেশ্য প্রায়-বেকারত্ব ও দীর্ঘকালীন বেকারত্ব উভয়ই হ্রাস করা। কর্মসংস্থানের পথ সুগম করার উপায় যে কর্মসংস্থানমুখী অর্থনৈতিক উন্নয়ন ষষ্ঠ পরিকল্পনায় তা সমর্থিত হয়েছে। তবে এও বলা হয়েছে যে, সংযোজিত স্বল্পকালীন কর্মসংস্থান কর্মসূচীও গ্রহণ করা প্রয়োজন। কৃষি, অ-কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া

হয়েছে। কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করার জন্য ষষ্ঠ পরিকল্পনায় যে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে নিম্নে তা উল্লেখ করা হল।

(i) বর্তমানে ইনটিগ্রেটেড রুরাল ডেভেলপমেণ্ট প্রোগ্রাম দেশের সমস্ত ব্লকে প্রসারিত। এ প্রোগ্রামের ফলে ষষ্ঠ পরিকল্পনাকালীন (1980-85) প্রত্যেক ব্লকের 3000 দরিদ্র পরিবার কৃষি ও অ-কৃষি ক্ষেত্রে কাজের সুযোগ পাবে। দরিদ্র গ্রামবাসীদের উন্নত শ্রেণীর গোবাদি পশু, কৃষি যন্ত্রপাতি ও কৃষিকার্য করার উপকরণ দেয়া হবে। 1981-82 সনে দেশের 511 ব্লকে এ কর্মসূচী নেয়া হয়েছে। এর ফলে 1981-82 সনে 28 লক্ষ পরিবার উপকৃত হয়েছে। 1980-81 সনে এদের সংখ্যা ছিল 27 লক্ষ। অনুমিত হয় 1980-85 সনের মধ্যে 1 কোটি 50 লক্ষ পরিবার এ কর্মসূচী দ্বারা উপকৃত হবে ও দারিদ্র্য রেখার উপরে উঠে আসবে।

(ii) এক লক্ষাধিক জনসংখ্যা বিশিষ্ট শহরে দুগ্ধ সরবরাহ সুনিশ্চিত করার জন্য অপারেশন ফ্লাড-II ডেরি ডেভেলপমেণ্ট প্রজেক্ট এবং কালক্রমে ডেরি ফেডারেশন ও ডিস্ট্রিক্টস ইউনিয়ন গঠিত হবে। এর ফলে 80 লক্ষ দুগ্ধ উৎপাদনকারী পরিবার উপকৃত হবে। অন্যান্য দুগ্ধ উন্নয়ন পরিকল্পনার ফলে আরো 50 লক্ষ পরিবার উপকৃত হবে বলে আশা করা যায়।

(iii) আধুনিক কৃষি পদ্ধতিতে আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য ফিশ ফার্মাস ডেভেলপমেণ্ট এজেন্সিস মৎসজীবী পরিবারদের সাহায্য দেবে। বংশানুক্রমিক মৎসজীবী পরিবারদের ছাড়া অন্যান্য জমিহীন শ্রমিক পরিবারদেরও মাছ ধরার কৌশল সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া হবে।

(iv) খাদি ও গ্রামীণ ক্ষুদ্র শিল্প ক্ষেত্রে যে সমস্ত স্কীম নেয়া হয়েছে অনুমিত হয় এর ফলে অতিরিক্ত 90 লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত হবে।

(v) ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লোয়মেণ্ট প্রোগ্রাম দেশের সমস্ত ব্লকে কার্যকর করা হবে। এর উদ্দেশ্য কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা; অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য গ্রামীণ শ্রমশক্তির পরিকল্পিত ব্যবহার ও গ্রামীণ দরিদ্রদের মধ্যে অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সুষ্ঠু সরকারী বণ্টন। 1980-85 সনের মধ্যে স্ট্যাণ্ডার্ড পার্সন ইয়ার্স-এর ভিত্তিতে কর্মসংস্থান 3 কোটি 40 লক্ষ বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে ষষ্ঠ পরিকল্পনাকালীন যে অতিরিক্ত কর্মপ্রার্থী দেখা দেবে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ ঘটবে।

(vi) শহরাঞ্চলের দরিদ্র শ্রেণী সাধারণত অসংগঠিত শ্রমিক শ্রেণীভুক্ত।

এরা বছরে বেশ কিছুকাল বেকার থাকে। তাদের আয় বৃদ্ধি করার জন্য পরিবেশ বিশুদ্ধকরণ, বস্তি উন্নয়ন, বৃক্ষরোপন, দরিদ্রদের জন্য গৃহনির্মাণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

(vii) মিনিমাম নিডস প্রোগ্রামের বিভিন্ন কর্মসূচী (জল সরবরাহ, স্বাস্থ্য, সড়ক, প্রভৃতি) রূপায়ণের ফলে নির্মাণ শিল্পেও, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে, সরাসরি অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে।

(viii) ন্যাশনাল স্কীম অব ট্রেনিং রুরাল ইউথ ফর সেল্ফ্-এমপ্লোয়মেণ্ট প্রতি বছর 2 লক্ষ গ্রামীণ যুবককে প্রশিক্ষণ দেবে যাতে তারা ব্লক এজেন্সির সাহায্যে নিজেরাই নিজেদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে নিতে সমর্থ হয়।

(ix) মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, মধ্যপ্রদেশ ও কর্ণাটক গ্রামাঞ্চলের অদক্ষ শ্রমিকদের জন্য বিশেষ কর্মসংস্থান স্কীম চালু করেছে। অনেক রাজ্য সরকার শিক্ষিত বেকারদের উপকারের জন্য প্রশিক্ষণ, আর্থিক সাহায্য ও অন্যান্য প্রেরণা দিয়ে নানারকম স্কীম কার্যকর করেছে। এ সমস্ত কর্মসূচীকে আরো শক্তিশালী ও সম্প্রসারিত করা হবে।

(x) পরিকল্পনার কর্মসূচী অনুযায়ী তপশীলী জাতি ও তপশীলী উপ-জাতিদের বিভিন্ন আয় বৃদ্ধিমূলক বৃত্তির উন্নয়ন সাধন করতে হবে।

ষষ্ঠ পরিকল্পনায় এরূপ অভিমত ব্যক্ত হয়েছে যে, শিক্ষিত বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য পৃথক কর্মসূচী গ্রহণ করা সম্ভব নয়, সঙ্গতও নয়। শিক্ষিত বেকার সমস্যার গুরুত্ব সব রাজ্যে একরকম নয়। অতএব পরিকল্পনার মতে এ সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য বিকেন্দ্রী ব্যবস্থা নেয়ার কথা বলা হয়েছে।

ষষ্ঠ পরিকল্পনার মতে প্রাথমিক সেক্টরে কর্মসংস্থানের যে সুযোগ ঘটবে তা দ্বারা শিক্ষিত বেকাররা উপকৃত হবে। যেমন, কৃষি গবেষণা কাজে 32,000 শিক্ষিত লোক নিযুক্ত হবে। কেন্দ্রের কৃষি সেনসাস ও ফার্ম পরিচালন সম্পর্কে গবেষণা ইত্যাদি করার জন্য অতিরিক্ত প্রায় 34,000 শিক্ষিত লোকের দরকার হবে। অপারেশন ফ্লাড-II 1984-85 সনের মধ্যে 1,67,000 লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেবে যাদের অধিকাংশই হবে শিক্ষিত। তাছাড়া ডেরি, মৎস চাষ প্রভৃতি প্রকল্পের জন্য শিক্ষিত লোকের প্রয়োজন হবে। শিক্ষিত লোকদের মধ্যে ম্যাট্রিকুলেশন পাস লোকের সংখ্যাই বেশি। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় তাদের অ-করণীকের কাজ বৃত্তি হিসাবে

গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে এবং শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও উন্নয়নের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সম্পর্ক স্থাপনের উল্লেখ রয়েছে।

শিক্ষিত বেকার সমস্যা হ্রাস করার জন্য 1983 সনে কেন্দ্রীয় সরকার একটি স্ব-নিয়োগ স্কীম অনুমোদন করেছে। যেসব শিক্ষিত বেকারের বয়স 18-35 মধ্যে এবং যাদের নাম 1983 সনের 31 মার্চ এমপ্লোয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের নথি-ভুক্ত তারা এ স্কীমের সুবিধা পাবে। প্রারম্ভে যেসব শহরের লোকসংখ্যা 50,000 থেকে এক লক্ষ সেসব শহরের শিক্ষিত বেকারদেরই কেবল এ স্কীমের সুযোগ দেয়া হবে। এ স্কীম অনুযায়ী ব্যাঙ্কগুলি প্রত্যেক শিক্ষিত বেকারকে ব্যবসায়ের জন্য 25,000 টাকা ঋণ দেবে। অবশ্য আবেদনকারীকে প্রমাণ করতে হবে যে, সে এ টাকা অন্যকোন সূত্র থেকে সংগ্রহ করতে সমর্থ নয়। সরকার মূলধন ভরতুকি বাবদ ব্যাঙ্ক ঋণের 25% দেবে। এ স্কীমের ফলে 2 লক্ষ শিক্ষিত বেকার উপকৃত হবে।

III. শ্রমিক কল্যাণ

শ্রমিক আইন

শ্রমিক আইনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা শিল্প প্রসারের উপর নির্ভর করে। আমাদের দেশে শ্রমিক চেতনা, শ্রমিক স্বার্থের প্রতি রাষ্ট্রের কর্তব্য-বোধ ও ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশনের প্রতি বাধ্যবাধকতার ফলে অধুনা শ্রমিক আইনের গুরুত্ব যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। নিম্নে কতিপয় আইনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

ইণ্ডিয়ান ফ্যাক্টরীজ এ্যাক্ট, 1948

এ আইনের ফলে 1881 সন থেকে 1947 সন পর্যন্ত যে সমস্ত কারখানা আইন ছিল তা বাতিল হয়ে যায়। এ আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি, যথা,

(i) যে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানে 10 বা ততোধিক শ্রমিক নিযুক্ত রয়েছে ও শক্তির ব্যবহার করা হয় অথবা যে ক্ষেত্রে 20 বা ততোধিক শ্রমিক নিযুক্ত রয়েছে সে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এ আইন প্রযোজ্য হবে।

(ii) এ আইনে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও সাধারণ কল্যাণের জন্য নিম্নতম ব্যবস্থা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। যথা, শ্রমিক কল্যাণের জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জল, স্নানাগার প্রভৃতির ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতি 150 জন শ্রমিকের জন্য ফার্স্ট এড বক্স ও যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকের সংখ্যা 250

বেশি সে সমস্ত ক্ষেত্রে ক্যান্টিন রাখতে হবে। 150 জনের বেশি শ্রমিকের ক্ষেত্রে বিশ্রামাগার ও খাবার ঘর দিতে হবে এবং যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে 50 জন স্ত্রীলোক শ্রমিক রয়েছে সে সমস্ত ক্ষেত্রে ক্রেচের ব্যবস্থা করতে হবে।

(iii) শ্রমিকদের বয়সের যোগ্যতা ন্যূনতম 12 থেকে 14 করা হয়েছে। 14-15 বয়স্ক শ্রমিকদের নাবালকরূপে গণ্য করতে হবে।

(iv) সাবালক শ্রমিকদের কার্যকাল সপ্তাহে 48 ঘণ্টা ও দৈনিক 9 ঘণ্টা করা হয়েছে। স্প্রেড ওভার দৈনিক $10\frac{1}{2}$ ঘণ্টা নির্দিষ্ট হয়েছে।

(v) পূর্ণ মজুরিসহ ছুটির কাল নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে।

মিনিমাম ওয়েজেস এ্যাক্ট, 1948

যে সমস্ত শিল্পে শ্রমিকদের অতিশয় পরিশ্রম করতে হয় ও যে ক্ষেত্রে শ্রমিক শোষণের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে সে সমস্ত শিল্পে শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ করে দেয়ার জন্য এ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলিকে তাদের নিজস্ব এলাকাধীন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ করে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যে সমস্ত শিল্পের শ্রমিকেরা, করণীক সহ, এ আইনের সুবিধা পাবে তাদের নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। যথা, তামাক (বিড়ি তৈরি সহ), চালের কল, ময়দার কল, ডালের কল, চা, কফি, লাক্ষা উৎপাদন, চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য প্রস্তুত, রাস্তা নির্মাণ, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান, কৃষি শ্রমিক প্রভৃতি। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরির হার পর্যালোচনা করে দেখতে হবে। নতুন কর্মসংস্থান ক্ষেত্রে এ আইন প্রয়োগে মন্থরতা, মজুরির ন্যূনতম হার পরিবর্তনে বিলম্বন ও আইনটিকে কার্যকর করার প্রতি শিথিলতা এ আইনের উদ্দেশ্য সাধনের অন্তরায় হয়ে রয়েছে। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় এ সমস্ত বাধাবিঘ্ন দূর করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়ার প্রস্তাব রয়েছে।

ফেয়ার ওয়েজেস এ্যাক্ট, 1950

এ আইনের মূল বিধানগুলি নিম্নরূপ।

(i) ফেয়ার ওয়েজেস বা ন্যায্য মজুরির নিম্নতম সীমা নিম্নতম মজুরির সমান হবে। নিম্নতম মজুরির হার জীবনধারণের ন্যূনতম মানের উপযোগী হতে হবে। মজুরির উচ্চতম সীমা সংশ্লিষ্ট শিল্পের সামর্থ্যের উপর নির্ভর করবে। এ দু'-সীমার মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দ্বারা প্রকৃত মজুরি নির্ধারিত হবে।

(a) শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা।

(b) বর্তমান মজুরির হার।

(c) জাতীয় আয়ের পরিমাণ ও বণ্টন।

(d) জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্পটির স্থান।

(ii) মজুরির স্তর এমন হবে যাতে সংশ্লিষ্ট শিল্পটি তার উৎপাদন ও দক্ষতা বজায় রাখতে পারে। বিভিন্ন শিল্পের মজুরির মধ্যে এমন সমতা থাকা প্রয়োজন যাতে শ্রমিকদের মধ্যে মজুরির বৈষম্যের দরুন কোনপ্রকার অসন্তোষের সৃষ্টি না হয়।

(iii) নিয়োগ-কর্তা যদি কোন শ্রমিককে এমন কোন সুবিধা দেয় যা তার জীবনধারণের ব্যয় নির্বাহের সহায়ক ও যদি এ ব্যয় ন্যায্য মজুরি নির্ধারণ ব্যাপারে গৃহীত হয় তবে তার ন্যায্য মজুরি নির্ণয় কালে সে যেসব সুবিধা পাচ্ছে তা বিবেচনা করতে হবে।

(iv) ন্যায্য মজুরি সংশ্লিষ্ট শিল্পের প্রকৃতি ও অবস্থার ভিত্তিতে স্থির করা হবে।

(v) সম কার্য ও সম দক্ষতার ক্ষেত্রে পুরুষ ও স্ত্রী শ্রমিকদের মধ্যে শ্রম-মজুরি সম্পর্কে কোনপ্রকার বৈষম্য সৃষ্টি করা চলবে না।

(vi) ন্যায্য মজুরির হার জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সংশ্লিষ্ট শিল্পের সমৃদ্ধির সঙ্গে সমতা রেখে চলবে।

(vii) এ সম্পর্কে বিবাদ-বিসংবাদ মিটাবার জন্য সেণ্ট্রাল এপেলেট বোর্ড স্থাপন করা হবে।

কোল মাইনস লেবার ওয়েলফেয়ার ফাণ্ড এ্যাক্ট, 1947

এ আইন কয়লা খনির শ্রমিকদের উন্নত জীবনযাপন ও কল্যাণ সাধনের জন্য বিধিবদ্ধ হয়। দেশ থেকে যে কয়লা ও পোড়া পাথুরিয়া কয়লা রপ্তানি হয় তার উপর দেয় উৎপাদন শুল্ক থেকে যে অর্থ পাওয়া যাবে তা দিয়ে এ আইনে শ্রমিকদের কল্যাণমূলক ব্যয়ভার নির্বাহ করা হবে।

কোল মাইনস প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড এণ্ড বোনাস স্কীমস এ্যাক্ট, 1948

এ আইনের ফলে কেন্দ্রীয় সরকার কয়লার খনির শ্রমিকদের জন্য প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড ও বোনাস পরিকল্পনা গ্রহণ করার ক্ষমতা লাভ করেছে। এতে এমন নির্দেশ রয়েছে যে, প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের অর্থ হস্তান্তরিত, পরিবর্তন অথবা ক্রোক

করা চলবে না। বোনাস পরিকল্পনার ফলে কতগুলি শর্তে খনির প্রত্যেক কর্মচারী বোনাস পাবার অধিকারী বলে স্বীকৃত হয়েছে।

ডক ওয়ার্কার্স (রেগুলেশন অব এমপ্লোয়মেণ্ট) এ্যাক্ট, 1948

ডক শ্রমিকদের কাজের অনিয়মিত ধরন দূর করার জন্য এ আইন প্রণয়ন করা হয়। এতে বড় বড় বন্দর সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারকে ও অন্যান্য বন্দর সম্পর্কে রাজ্য সরকারগুলিকে ডক শ্রমিকদের নাম তালিকাভুক্ত ও তাদের কাজ নিয়ন্ত্রণ ও কাজের শর্ত ও অবস্থা সম্পর্কে পরিকল্পনা করার অধিকার দেয়া হয়েছে।

ডক ওয়ার্কার্স সেফ্‌টি, হেলথ এণ্ড ওয়েলফেয়ার স্কীম, 1961

এ স্কীম দেশের সব বন্দর ও ডকের উপর প্রযোজ্য। পোর্ট ট্রাস্ট ওয়েল-ফেয়ার ফাণ্ডস-এর সাহায্যে বন্দর শ্রমিকদের জন্য বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও রিক্রিয়েশনের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

মাইনস এ্যাক্ট, 1951

এ আইনে খনি শ্রমিকদের জন্য পানীয় জল, স্নানাগার, ফার্স্ট এড ও ক্রেচের ব্যবস্থা করার বিধান রয়েছে। যেসব খনিতে 500 বা ততোধিক শ্রমিক রয়েছে সেসব খনিতে যোগ্যতাসম্পন্ন চিকিৎসকের অধীনে একটি এ্যাম্বুলেন্স রুম রাখতে হবে। পূর্ববর্তী বছরের কোন একদিনও যদি 150 বা ততোধিক শ্রমিক নিযুক্ত থাকে তবে তাদের খাবার ঘর ও বিশ্রাম ঘরের ব্যবস্থা করতে হবে। যে ক্ষেত্রে 25 বা ততোধিক শ্রমিক নিযুক্ত সে ক্ষেত্রে ওয়ার্কসপ, মাল তোলার স্থান বা যে স্থানে শ্রমিকেরা কর্মে নিযুক্ত থাকে তার কাছাকাছি কোথাও খাবার ঘর ও বিশ্রামাগারের ব্যবস্থা থাকবে। যে ক্ষেত্রে 250 বা ততোধিক শ্রমিক নিযুক্ত সে ক্ষেত্রে ক্যান্টিন করতে হবে।

বাগান শিল্প

বাগান শিল্প ক্ষেত্রেও পানীয় জল, স্নানাগার প্রভৃতির ব্যবস্থা, চিকিৎসার সুবিধা, ক্যান্টিন, ক্রেচ ও রিক্রিয়েশনের ব্যবস্থা এবং ছাতা, কম্বল, রেনকোট প্রভৃতি দেয়ার আইনগত নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা ও শ্রমিক কল্যাণ

সামাজিক নিরাপত্তাঃ "সামাজিক নিরাপত্তা" বলতে সাধারণ নাগরিকদের সামাজিক ঝুঁকির নিরাপত্তাকে বুঝায়। সামাজিক নিরাপত্তার

উদ্দেশ্য, যে নাগরিক দেশের কল্যাণের জন্য কাজ করছে বা করবে তাকে কতিপয় ঝুঁকির হাত থেকে রক্ষা করা। যথা, বেকারত্ব, অসুস্থতা, বার্ধক্য-জনিত অক্ষমতা প্রভৃতি। এর ফলে কর্মীরা অনিশ্চয়তার হাত থেকে মুক্ত থাকে; নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে।

আমাদের দেশে সামাজিক নিরাপত্তা সম্পর্কিত যেসব আইন প্রণয়ন করা হয়েছে তার মধ্যে ওয়ার্কমেন'স কমপেনসেশন এ্যাক্ট, এমপ্লোয়িজ স্টেট ইনসিওরেন্স এ্যাক্ট, এমপ্লোয়িজ প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড এ্যাক্ট, গ্র্যাচুইটি, পেনসন ও মাতৃত্ব সম্পর্কীয় আইন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ওয়ার্কমেন'স কমপেনসেশন এ্যাক্ট, 1923

এ আইন একাধিকবার সংশোধিত হয়েছে। এ আইনে কর্মরত কোন শ্রমিক, যার মাসিক মজুরি 1000 টাকার অধিক নয়, দুর্ঘটনায় মারা গেলে বা চিরকালের মত পঙ্গু হয়ে পড়লে বা বৃত্তি সম্পর্কিত কোন প্রকার পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হলে সে ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে। এ আইন সম্বন্ধে মন্তব্য করা হয় যে, ক্ষতিপূরণ বাবদ দেয় সম্পূর্ণ অর্থই মালিককে বহন করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিকদের অশিক্ষা ও অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে মালিকেরা তাদের প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ থেকে বঞ্চিত করে থাকে বা যথাসময় তা দেয়া হয় না। দুর্ঘটনায় আহত শ্রমিকের চিকিৎসার দায়িত্ব মালিকের নেই; তার পুনর্বাসনের দায়িত্ব থেকেও মালিক মুক্ত। ক্ষতিপূরণের সব টাকা এককালীন শ্রমিককে দিয়ে দেয়া হয়। এর ফলে সে অর্থের অপচয় হওয়ার আশঙ্কা অমূলক নয়।

এমপ্লোয়িজ স্টেট ইনসিওরেন্স এ্যাক্ট, 1948

এ আইন প্রারম্ভে অনিত্যবহ কারখানা ছাড়া সমস্ত কারখানার উপর প্রযোজ্য হবে। এ সমস্ত কারখানার প্রত্যেক কর্মীকে, যার মাসিক আয় 400 টাকার (জানুয়ারী 1985 থেকে 1600 টাকা) অধিক নয়, বীমা করতে হবে। শ্রমিক বলতে করণীকদেরও বুঝাবে। এ পরিকল্পনা পরিচালনার দায়িত্ব এমপ্লোয়িজ স্টেট ইনসিওরেন্স কর্পোরেশন নামক একটি স্বায়ত্তশাসিত সংগঠনের উপর দেয়া হয়েছে। অনুরূপ একটি সংগঠন—মেডিক্যাল বেনিফিট কাউন্সিল—চিকিৎসার সুবিধা, সুবিধা প্রদানের জন্য প্রশংসাপত্র দেয়া প্রভৃতি সম্পর্কে কর্পোরেশনকে পরামর্শ দেবে। বীমাকারী ব্যক্তি বা তার পোষ্যর জন্য নিম্নলিখিত সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(i) অসুস্থতার সুবিধা, (ii) মাতৃত্বের সুবিধা, (iii) অকর্মণ্যতার সুবিধা, (iv) পোষ্যর সুবিধা, (v) চিকিৎসার সুবিধা ও (vi) অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার সুবিধা।

এই স্কীম মালিক ও কর্মীদের দেয় টাকা ছাড়াও দান, কৌতুক ও গ্র্যাণ্টসের টাকা দিয়ে পরিচালিত হবে। স্বাস্থ্য খাতে মোট ব্যয়ের এক-চতুর্থাংশ রাজ্য সরকারগুলি বহন করবে। যেক্ষেত্রে বীমাকৃত ব্যক্তির পরিবার বর্গকেও স্বাস্থ্য বীমার সুবিধা দেয়া হবে সেক্ষেত্রে এর পরিমাণ এক-পঞ্চমাংশ। 1980 সনের ডিসেম্বরের শেষে 408 কেন্দ্রে 60 লক্ষ শ্রমিক এ আইনের আওতায় আসে। 2 কোটি 70 লক্ষ লোক এ দ্বারা উপকৃত হয়েছে। মালিক ও কর্মীদের দেয় অংশ যথাক্রমে মজুরির 5 শতাংশ ও 2·25 শতাংশ। যেক্ষেত্রে কর্মীদের দৈনিক গড় মজুরি 6 টাকার কম। সেক্ষেত্রে তাদের অংশী হতে হবে না।

(i) অসুস্থতার সুবিধা : এ স্কীম অনুযায়ী যে ব্যক্তি বীমা করেছে সে যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে তবে তাকে সাময়িকভাবে নগদ টাকা দিয়ে সাহায্য করা হয়। এ সুবিধা 365 দিনের মধ্যে 56 দিনের বেশি দেয়া হয় না। এবং এর হার বীমাকারীর গড় মজুরির প্রায় অর্ধেকের মত। যেসব বীমা-কারী দীর্ঘকাল স্থায়ী রোগ দ্বারা আক্রান্ত (যেমন, কুষ্ঠ, মানসিক ব্যাধি) ও যারা দু'বছর ধরে চাকরিতে রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই তারা যে অসুস্থতার সুবিধা পেতে পারে তা নিঃশেষ হয়ে যাবার পরও তাদের 309 দিন নগদ টাকা পাওয়ার সুবিধা দেয়া হয়। অসুস্থতার সুবিধার পুরো হারেই এ সুবিধা দেয়া হয়।

(ii) মাতৃত্বের সুবিধা : বীমাকারীকে মাতৃত্বের সুবিধা বাবদ নগদ টাকা দিয়ে সাহায্য করা হয়। অবশ্য এজন্য তাকে উপযুক্ত প্রমাণপত্র দাখিল করতে হবে। মাতৃত্বের সুবিধার মেয়াদ অনধিক 12 সপ্তাহ।

(iii) কর্মহীন হয়ে পড়ার সুবিধা : কোন বীমাকারী পেশাগত কোন দৈহিক আঘাতজনিত কারণে অকর্মণ্য হয়ে পড়লে তাকে অকর্মণ্যতার সুবিধা দেয়া হয়। পেশাগত কোন রোগের কারণেও অকর্মণ্য হয়ে পড়লে বীমাকারী এ সুবিধা পেতে পারে। এসব ক্ষেত্রে সুবিধা পাওয়ার সময়কাল নির্দিষ্ট করে দেয়া নেই। স্থায়ী অকর্মণ্যতার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বীমাকারীকে তার জীবিত-কাল পর্যন্ত সুবিধা দেয়া হয়ে থাকে। কোন বীমাকারী যদি সাময়িকভাবে

অকর্মণ্য হয়ে পড়ে তবে তাকেও এ সাময়িক কালের জন্য এ সুবিধা দেয়া হয়।

(iv) পোষ্যের সুবিধা : বীমাকারীর কোন পেশাগত আঘাতের কারণে মৃত্যু ঘটলে তার পোষ্যদের এ সুবিধা দেয়া হয়। নির্দিষ্ট হারে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে এ বাবদ টাকা দেয়া হয়।

(v) চিকিৎসার সুবিধা : বীমাকারী ও তার পরিবার চিকিৎসার সুবিধা পেয়ে থাকে। এ সুবিধা দেয়ার জন্য রাজ্য বীমা হাসপাতাল স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া প্যানেল প্রথাও রয়েছে। অর্থাৎ, যেসব চিকিৎসকদের ক্লিনিকে চিকিৎসা করা হবে তাদের নামও প্যানেলভুক্ত করা হয়েছে। বীমাকারীরা এসব ক্লিনিকেও চিকিৎসা করাতে পারে। এর ফলে যেসব স্থানে রাজ্য বীমা হাসপাতাল স্থাপিত হয়নি সেসব স্থানেও চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে।

(vi) অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সুবিধা : বীমাকারীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য তার পরিবারের জীবিত বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে এ বাবদ আর্থিক সাহায্য দেয়া হয়ে থাকে।

মন্তব্য : এ আইন সম্বন্ধে বলা হয় : শ্রমশক্তির এক সীমিত অংশ এ আইনের সুবিধা পেয়ে থাকে, কৃষি শ্রমিক ও অসংগঠিত সেক্টরের কর্মীরা এ আইনের অন্তর্গত নয়, সামাজিক নিরাপত্তার যাবতীয় দিক, যেমন, বেকারত্বের ঝুঁকি, বার্ধক্যজনিত সমস্যা এ আইনের আওতায় আনা হয়নি। মালিকদের দেয় অর্থ যথারীতি ফাণ্ডে জমা না পড়লে শ্রমিকদের এ স্কীমের সুযোগ নিতে দেয়া হয় না। তাছাড়া ই-এস-আইর হাসপাতাল, ঔষধালয় এমনকি সাধারণ কাজকর্ম সম্পর্কেও শ্রমিকদের অসন্তোষ রয়েছে।

অন্যান্য আইন

1952 সনে এমপ্লোয়িজ প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডস এণ্ড ফ্যামিলি পেনসন এ্যাক্ট প্রবর্তিত হয়। 1972 সনে পেমেণ্ট অব গ্র্যাচুইটি এ্যাক্ট প্রণয়ন করা হয়। তাছাড়া 1971 সনে কোল মাইনস ফ্যামিলি পেনসন স্কীম ও এমপ্লোয়িজ ফ্যামিলি পেনসন স্কীম চালু করা হয়। ম্যাটারনিটি বেনিফিট এ্যাক্ট, 1961 মাতৃত্ব সংরক্ষণের সর্বভারতীয় রূপ দেয়ার জন্য বিধিবদ্ধ হয়। বিভিন্ন রাজ্যও শ্রমিক কল্যাণের জন্য বিবিধ আইন প্রণয়ন করে।

সাম্প্রতিক আইন

অসংগঠিত সেক্টরে শ্রমিক স্বার্থ ও কল্যাণের জন্য যেসব গুরুত্বপূর্ণ আইন করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখ্য কনট্রাক্ট লেবার (রেগুলেসন এণ্ড এবোলিশন) এ্যাক্ট। এ আইনের উদ্দেশ্য চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের চাকরির শর্তাদি নিয়ন্ত্রণ ও কোন কোন ক্ষেত্রে এ প্রথার বিলোপ সাধন করা। বণ্ডেড লেবার সিস্টেম (এবোলিশন) এ্যাক্ট দ্বারা বেগার শ্রমিক প্রথার বিলোপ সাধন করা হয়। যেসব বেগার ঋণের দায়ে আবদ্ধ তাদের ঋণমুক্ত করা হয়। বিড়ি ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার এ্যাক্ট দ্বারা বিড়ি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের কল্যাণ সাধন করা হয়েছে। তাছাড়া লৌহ আকরিক, ম্যাঙ্গানীজ আকরিক, লাইমস্টোন ও ডোলমাইট মাইনস এ্যাক্ট শ্রমিক কল্যাণের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে। সেল্স প্রোমোশন এমপ্লোয়িজ (কনডিশন্স অব সার্ভিস) এ্যাক্ট দ্বারা সেল্স প্রোমোশন কর্মীদের কাজের শর্তাদি নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। ইক্যুয়াল রেমুনারেশন এ্যাক্ট দ্বারা পুরুষ ও স্ত্রী শ্রমিকদের জন্য সম কাজে সম দক্ষতার জন্য সম বেতন চালু করা হয়। অন্যান্য আইনের মধ্যে রয়েছে ফ্যামিলি পেনসন স্কীম, এমপ্লোয়িজ ডিপোজিট লিঙ্কড ইনসিওরেন্স স্কীম ও ইণ্টার-স্টেট মাইগ্র্যাণ্ট ওয়ার্কমেন (রেগুলেশন অব এমপ্লোয়মেণ্ট এণ্ড কনডিশনস অব সার্ভিস) এ্যাক্ট। ভারতীয় সংবিধানের ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপিলস টু স্টেটস এ্যাক্ট (Art 43A) সংশোধন করা হয়েছে যাতে পরিচালনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণের পথ সুগম হয়। এর ফলে শ্রমিক ও পরিচালকদের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব বৃদ্ধি পাবে ও উভয়ে সম্মিলিতভাবে শিল্প ও শ্রমিক সমস্যা সমাধানে উৎসাহিত হবে।

ষষ্ঠ পরিকল্পনা ও শ্রমিক কল্যাণঃ প্রস্তাব

(i) শ্রমিক আইনগুলিকে যথাযোগ্যরূপে কার্যকর করা এবং স্টেট ইনসিওরেন্স স্কীম, এমপ্লোয়িজ প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ও ফ্যামিলি পেনসন স্কীমের সুবিধা যাতে আরো অধিক সংখ্যক কর্মীরা পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা।

(ii) রাজ্য সরকারগুলিকে কৃষি শ্রমিক, গ্রামীণ শিল্পী, হস্তচালিত তাঁত শিল্পী, মৎস চাষী, চর্ম শ্রমিক ও অন্যান্য অসংগঠিত গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলের শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

(iii) শ্রমিক শিক্ষা সম্পর্কিত কর্মসূচীর বিস্তার সাধন করতে হবে।

শ্রমিক শিক্ষার মাধ্যমে তাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করতে হবে ও দেশের সমস্যা সম্পর্কে উৎসাহিত করতে হবে।

(iv) স্ত্রী ও যুবক শ্রমিকদের শিক্ষাদানের জন্য বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে যাতে তারা দেশের কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে জীবনযাপন করতে পারে।

(v) সংগঠিত সেক্টরের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব দেয়া হবে।

(a) এমপ্লোয়িজ স্টেট ইনসিওরেন্স, এমপ্লোয়িজ প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ও ফ্যামিলি পেনসন স্কীমের উন্নতি সাধন।

(b) শিল্প পরিচালনায় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি।

(c) কর্মবিরতি এড়াবার উদ্দেশ্যে শিল্প বিরোধ মিটিয়ে ফেলার পদ্ধতিগুলি শক্তিশালী করে তোলা।

(vi) ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ ও প্রয়োজনমত এ সম্পর্কিত আইনের ধারার পরিবর্তন সাধন। লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণকে কেন্দ্র করে শ্রমিক ও পরিচালকদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিঘ্নিত না হয়।

(vii) অসংগঠিত ও সংগঠিত উভয় সেক্টরেই বৃত্তিগতভাবে আয়ের যথেষ্ট অসমতা রয়েছে। এ অসমতা দূর করার চেষ্টা করতে হবে। সেজন্য কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে "ইনটিগ্রেটেড টাইপ" জাতীয় অর্থনীতির কথা ভাবা যেতে পারে। উভয় সেক্টরেই মজুরি ও বেতনের হার মোটামুটিভাবে উৎপাদনশীলতার হারের সঙ্গে সমতা রক্ষা করে নির্ধারণ করতে হবে। আর্থিক সংস্থা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা কাজের নির্ধারিত মান ও গুণাগুণের ভিত্তিতে স্থির করা হবে।

সামাজিক নিরাপত্তা : মন্তব্য

সামাজিক নিরাপত্তা আইনের সুবিধা মোট শ্রমিক সংখ্যার সামান্য অংশই ভোগ করে। সামাজিক নিরাপত্তা আইনের বিধানগুলি এড়িয়ে যাবার বহু সুযোগসুবিধা নিয়োগকর্তাদের রয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা যে শ্রম দক্ষতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে এ উপলব্ধি শ্রমিক বা মালিক উভয়ের কারো মধ্যেই দেখা যায় না। অর্থাভাব ও সুপরিকল্পন এবং আইনের বিধানগুলিকে কার্যকর করার সরকারী প্রচেষ্টার অভাব সামাজিক নিরাপত্তার প্রসার সাধনের অন্তরায়।

17 শ্রমিক আন্দোলন

ইতিহাস

আধুনিক শ্রমিক আন্দোলন কারখানা শিল্পের সামাজিক প্রতিক্রিয়ার পরিচায়ক। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন প্রক্রিয়ার অনিবার্য শোষণ থেকে নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ভারতীয় শ্রমিকেরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে আন্দোলন সুরু করে। ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন এস্. এস্. বেঙ্গলী ও এন. এম. লোখান্দে। শ্রমিকদের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি 1874 ও 1875 সনে হাউজ অব কমনসের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এর ফলে 1875 সনে বোম্বে ফ্যাক্টারী কমিশন নিযুক্ত হয় ও এর সুপারিশক্রমে ফ্যাক্টারী এ্যাক্ট 1881 বিধিবদ্ধ হয়। এ আইন শ্রমিকদের দাবিদাওয়া পূরণে অসমর্থ হওয়াতে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। 1884 সনে দ্বিতীয়বার কমিশন নিযুক্ত হয়। এন. এম. লোখান্দে শ্রমিকদের বক্তব্য কমিশনের কাছে উপস্থিত করেন। 1890 সনে তাঁর নেতৃত্বে বোম্বে মিলহাণ্ড এসোসিয়েশন স্থাপিত হয়। এর মুখপত্র হয় প্রথম শ্রমিক সাময়িক পত্র "দীনবন্ধু"। পরবর্তী 20 বছর অনেক শ্রমিক সঙ্ঘ গঠিত হয়। এদের কার্যক্রম সেবা সঙ্ঘের অনুরূপ। দক্ষিণ ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের নেতা ছিলেন আই. এন. নায়ার।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (1914-18) ভারতের শিল্পবাণিজ্যের বিস্তার সাধন হয়। শিল্পপতিরা প্রচুর মুনাফা করতে সক্ষম হয়। কিন্তু শ্রমিক সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করে। উচ্চ মূল্যস্তর ও মুনাফার অনুপাতে তাদের মজুরি বৃদ্ধির অভাবই এর মূল কারণ। 1920 সনের জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট 97 ধর্মঘট হয়। এর মধ্যে মাত্র 37 ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ধর্মঘটের সাফল্যে শ্রমিকেরা অধিকতর উৎসাহিত হয়ে ওঠে।

1919 সনে ইণ্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন (আই-এল-ও) স্থাপিত হলে ভারত তার সদস্য হয়।

1920 সনে অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস-এর (এ-আই-টি-ইউ-সি) প্রথম অধিবেশন হয়। এটি ট্রেড ইউনিয়নগুলির কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ-আই-টি-ইউ-সির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের সংখ্যা ছিল

107। 1921 সনের পর অর্থনৈতিক মন্দার সঙ্গে সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে মন্দা দেখা দেয়।

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে কম্যুনিস্টদের প্রভাব এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। 1920 সনে ভারতে কম্যুনিজম আন্দোলনের অভ্যুত্থান ঘটে। 1924 সনে কানপুর ট্রায়েল-এ কম্যুনিস্ট আন্দোলন সর্বপ্রথম জনসাধারণের কাছে প্রকাশ পায়। 1931-34 সন পর্যন্ত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে কম্যুনিস্টদের প্রাধান্যে হ্রাস দেখা যায়। এর কারণ শ্রমিকদের মধ্যে একমাত্র যোগসূত্র ছিল তাদের শ্রেণী-সংগ্রামের আদর্শ। ফলে শিল্পে শান্তির সময় শ্রমিকদের মধ্যে একতাবোধের অভাব ঘটত। তাছাড়া অর্থাভাব, ধর্মঘটের প্রাদুর্ভাব ও ব্যর্থতা এবং মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ আন্দোলনও উল্লেখ্য। 1934 সনের পর কম্যুনিস্টদের প্রাধান্য আবার প্রকাশ পায়। এর কারণ অর্থনৈতিক মন্দা বৃদ্ধি, শ্রমিক বেতন হ্রাস ও মীরাট মামলার আসামীদের মুক্তি। 1934 সনের 23 জুলাই কম্যুনিস্ট পার্টি অবৈধ বলে ঘোষিত হয়। কম্যুনিস্টদের প্রাধান্যের ফলে 1929 সনে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন বিভিন্ন নেতৃত্বে বিভক্ত হয়ে পড়ে। বিভক্ত দলগুলিকে তাদের আদর্শ অনুযায়ী চার ভাগে ভাগ করা চলে। যথা, কম্যুনিস্ট, র‍্যাডিকেল, লিবারেলস ও অবশিষ্ট। 1938 ও 1940 সনে এ সমস্ত দলগুলিকে একীকরণের চেষ্টা করা হয় ও সময় বিশেষের জন্য এ প্রচেষ্টা সাফল্য লাভও করে। 1935-36 সনে বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় শ্রমিক আন্দোলনের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে (1939-45) সোভিয়েত ইউনিয়ন মিত্র শক্তির সঙ্গে যোগদান করাতে ও ব্রিটিশ শাসকদের নানাপ্রকার তৎপরতার জন্য শ্রমিক আন্দোলন প্রকট হয়ে উঠতে পারেনি। কম্যুনিস্টদের সঙ্গে মতবিরোধের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন আবার বিভক্ত হয়ে পড়ে।

1947 সনে কংগ্রেসের নেতৃত্বে ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (আই-এন্-টি-ইউ-সি) স্থাপিত হয়। 1948 সনে সোস্যালিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে হিন্দ মজদুর সভা (এইচ-এম-এস) গঠিত হয়। 1949 সনে অন্যান্য বামপন্থী দলের নেতৃত্বে ইউনাইটেড ট্রেডস ইউনিয়ন কংগ্রেস (ইউ-টি-ইউ-সি) গঠিত হয়। 1948 সনে ভারতে মোট ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা ছিল 2279 ও সদস্য সংখ্যা 24 লক্ষ।

বর্তমানে শ্রমিক আন্দোলনের পেছনে রয়েছে রাজনৈতিক দল। ইউনিয়ন গুলি তাদের "ফ্রণ্টাল অর্গানাইজেশন" রূপে কাজ করছে বললে অত্যুক্তি করা হয় না। শ্রমিকদের কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি এ সত্যতাই বহন করে। অধুনা চারটি কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংস্থা রয়েছে। যথা, আই-এন-টি-ইউ-সি, এ-আই-টি-ইউ-সি, এইচ-এম-এস ও ইউ-টি-ইউ-সি। ভারত সরকার তাদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিনিধিত্ব করার স্বীকৃতি দিয়েছে ও তাদের সঙ্গে শ্রমিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে থাকে। তাছাড়া রয়েছে ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ (বি-এম-এস), হিন্দ মজদুর পঞ্চায়েত ও সেণ্টার অব ইণ্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়নস (সি-আই-টি-ইউ)।

নিম্নে ট্রেড ইউনিয়নের অগ্রগতির একটি দিক দেখানো হল।

ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা ও সদস্য

বছর	রেজিষ্ট্রার্ড ইউনিয়নের সংখ্যা	হিসাবপত্র পেশ করে এমন ইউনিয়নের সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা যে সমস্ত ইউনিয়ন হিসাবপত্র পেশ করে (লক্ষ)
1973	23503	6402	43·77
1974	25056	5716	42·19
1975	25460	6097	45 69
1976	25665	6609	46·97

সূত্র : লেবার ব্যুরো।

1978* সনে ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা অনুমিত 31295, সদস্য সংখ্যা 56·89 লক্ষ। 1961-62 সনে মালিক সঙ্ঘের সংখ্যা ছিল 198, 1978 সনে অনুমিত 486। 1961-62 ও 1978 সনে মালিক সঙ্ঘের সদস্য সংখ্যা ছিল যথাক্রমে 18 হাজার ও 19 হাজার। 1961-62 সনে ট্রেড ইউনিয়ন ও

* অনুমিত। অন্ধ্রপ্রদেশ, আসাম, বিহার, জম্মু ও কাশ্মীর, কেরল, রাজস্থান. ত্রিপুরা ও পশ্চিম বাংলা বাদে।

সূত্র : ইণ্ডিয়া 1982।

সদস্য সংখ্যা ছিল যথাক্রমে 11416 ও 39·60 লক্ষ। ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা 1961-62 সন থেকে 1978 সনে প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে বটে, তবে এর অধিকাংশ অতি ক্ষুদ্র সংগঠন। গড়ে সদস্য সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে ও একই প্রতিষ্ঠানে একাধিক ইউনিয়ন গড়ে উঠেছে। ফলে অন্তঃদ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। মালিকদের সংগঠন সংখ্যা বৃদ্ধি ও তাদের মধ্যে অনেক বেশি একতাবোধ ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে আরো দুর্বল করে তুলেছে।

ট্রেড ইউনিয়নের উদ্দেশ্য ও ভূমিকা

ন্যাশনাল কমিশন অন লেবারের মতে ট্রেড ইউনিয়নের উদ্দেশ্য :

(i) শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করা।

(ii) চাকরির নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত করা।

(iii) চাকরির শর্ত ও কাজের পরিবেশের উন্নতি সাধন করা।

(iv) শ্রমিকদের চাকরির উন্নতির পথ সুগম ও তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

(v) তাদের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনের উন্নতি সাধন ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা।

(vi) শ্রমিক ও সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ যে এক ও অভিন্ন এ মনোভাব শ্রমিকদের মধ্যে জাগ্রত করা। মালিক শ্রেণীর মধ্যেও এ মনোভাব সৃষ্টি করা।

(vii) উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করার জন্য শ্রমিকদের পরিচালকদের সঙ্গে সর্বোতভাবে সহযোগিতা করা।

(viii) শ্রমিকদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কল্যাণ সাধনে ব্রতী হওয়া।

ট্রেড ইউনিয়নগুলির সামাজিক দায়িত্বও রয়েছে। যেমন, জাতীয় ঐক্য শক্তিশালী করে তোলা, বিভিন্ন স্তরে সামাজিক ও অর্থনৈতিক নীতি পরিকল্পন ও রূপায়ণে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা এবং ইউনিয়নের সদস্যদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ এবং জাতীয় দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা।

অসুবিধা

(i) অশিক্ষা। অশিক্ষার দরুন শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়নের যথার্থ সার্থকতা

বুঝতে পারে না। তারা রাজনৈতিক বা স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর ক্রীড়নক হয়ে পড়ে।

(ii) স্থিতির অভাব। শ্রমিকেরা অনেক ক্ষেত্রে স্থায়িভাবে কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকে না। তাদের এ স্থিতিশীলতার অভাবের জন্য ইউনিয়নের প্রতি তাদের আনুগত্যের অভাব ঘটে।

(iii) স্বল্প আয় ও ঋণ। সাধারণত শ্রমিকেরা অতিশয় দরিদ্র। তারা নানাভাবে মালিকদের কাছে ঋণাবদ্ধ হয়ে থাকে। ফলে তাদের মধ্যে সংগ্রামী মনোভাবের অভাব ঘটে।

(iv) অর্থাভাব। শ্রমিকেরা দরিদ্র। ইউনিয়নকে নিয়মিত চাঁদা দেয়া তাদের অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় না। ইউনিয়নগুলির ক্ষুদ্র আয়তন ও স্বল্প চাঁদার হারও তাদের অর্থাভাবের কারণ। ফলে অর্থাভাব ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের একটি মস্ত সমস্যা।

(v) প্রচার। প্রচারের অভাবের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন জনপ্রিয় ও শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারছে না। অজ্ঞতা ছাড়াও অর্থাভাব এর একটি কারণ।

(vi) শ্রেণী চেতনাবোধ। ভারতীয় শ্রমিকেরা বিদেশী শ্রমিকদের মত শ্রেণী সচেতন নয়। শ্রেণী চেতনাবোধের অভাবে তারা সংগ্রামী হয়ে উঠতে পারছে না।

(vii) ধর্মঘট। কারণে, অকারণে ধর্মঘট ও তার ব্যর্থতা শ্রমিকদের মধ্যে নৈরাশ্য সৃষ্টি করে; শ্রমিক আন্দোলন জনসাধারণের সমর্থন থেকে বঞ্চিত হতে থাকে। ইউনিয়নগুলি শ্রমিক কল্যাণের দিকটা সাধারণত উপেক্ষা করে চলে। যেমন, শিক্ষা, চিকিৎসা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি। ফলে ইউনিয়নের প্রতি শ্রমিকদের আনুগত্য নিবিড়তা লাভ করে না।

(viii) সাম্প্রদায়িকতা। সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতার মনোভাব তাদের সংহতি নষ্ট করে।

(ix) বহু ভাষা ও সংস্কৃতির আধিক্য। শ্রমিকেরা বিভিন্ন ভাষাভাষী ও তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতিও বিভিন্ন প্রকার। ফলে তারা হৃদয় দিয়ে পরস্পরকে গ্রহণ করতে পারে না। পারস্পরিক আত্মিক সম্বন্ধ বোধের অভাবে তাদের একতা নিবিড়তা লাভ করে না।

(x) দলাদলি। শ্রমিকদের মধ্যে দলাদলি কোথাও বা ব্যক্তি-ভিত্তিক কোথাও বা রাজনীতি-ভিত্তিক। ফলে একই শিল্প প্রতিষ্ঠানে একাধিক ইউনিয়ন গঠিত হয়েছে। সবাই মালিকদের স্বীকৃতি পাবার জন্য তাদের আনুগত্য স্বীকার করে চলছে। এ কারণে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইউনিয়ন গড়ে উঠেছে। অন্তঃদ্বন্দ্ব ও আন্তঃদ্বন্দ্ব শ্রমিক সংহতি নষ্ট করে চলেছে।

(xi) মালিকদের বৈরীভাব। সাধারণত মালিক শ্রেণী শ্রমিকশ্রেণীকে তাদের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ রূপে দেখতে প্রস্তুত নয়। অর্থাৎ, পরস্পর পরস্পরকে "শ্রেণী শত্রু" হিসাবে গণ্য করে। এর ফলে সহযোগিতা নয়; একে অপরের ধ্বংসের জন্য উদ্যত। অর্থপ্রাচুর্য ও সামাজিক প্রভাব প্রতিপত্তির সুযোগ নিয়ে মালিক শ্রেণী নানা উপায়ে শ্রমিক আন্দোলনের মূলে কুঠারাঘাত করার জন্য সচেষ্ট থাকে।

(xii) নেতৃত্ব। শ্রমিক নেতাগণ ব্যক্তিত্বের দিক দিয়ে সাধারণত দুর্বল। তাদের এ দুর্বলতার সুযোগ প্রতিপক্ষ গ্রহণ করে থাকে। নেতৃত্বের জন্য পরমুখাপেক্ষিতাও ইউনিয়নের সংগঠনকে দুর্বল করে তোলে। কারণ বহিরাগত নেতৃত্ব রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেয়, শিল্প প্রতিষ্ঠানের শান্তিশৃঙ্খলা বিঘ্নিত করে। সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের আশা-আকাঙ্ক্ষা তারা বুঝতে পারে না, বুঝতে চায়ও না। বস্তুত শ্রমিক কল্যাণ নয়, দলীয় কল্যাণ ব্রতে তারা উদ্বুদ্ধ। তা সত্ত্বেও বহিরাগত নেতৃত্ব অনেক ক্ষেত্রে অপরিহার্য। খনি, চা, ডক, বন্দর প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের মধ্যে এমন যোগ্য লোক খুব কমই আছে যারা শক্তিশালী ও সুচতুর মালিকদের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দিতে পারে। তাছাড়া রাজনৈতিক দলের সমর্থন থাকলে শ্রমিক সংগ্রাম আরো জোরদার হয়ে উঠতে পারে।

(xiii) জনসাধারণ। শ্রমিকদের দাবিদাওয়া সম্বন্ধে জনমত বিশেষ কোন আগ্রহ প্রকাশ করে না। কারণ শ্রমিকবিশেষের স্বার্থ ও জনসাধারণের স্বার্থ প্রায় সম্পূর্ণ বিপরীত। অথচ তাদের সংগ্রামের পেছনে জনসাধারণের সমর্থন থাকা প্রয়োজন।

(xiv) সরকারী নীতি। শ্রমিক আন্দোলন ঘটনা পরম্পরায় সরকার-বিরোধী আন্দোলনের অংশবিশেষরূপেও প্রকাশ পায়। ফলে শ্রমিক আন্দোলন সরকারের সমর্থন হারায়। অনেক ক্ষেত্রে আবার সরকারের অতি-

মাত্রায় শ্রমিক প্রীতি শ্রমিক আন্দোলনের সংগ্রামী ভাবকে দুর্বল করে তোলে।

(xv) বর্তমানে সুসংগঠিত শিল্প সেক্টরের শ্রমিকদের আর্থিক ও শ্রমিক কল্যাণগত অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। ফলে তাদের মধ্যে সংগ্রামী মনোভাব হ্রাস পেয়েছে।

প্রস্তাব

ট্রেড ইউনিয়ন সাধারণত সুসংগঠিত শিল্প সেক্টরেই নিবদ্ধ ও সুসংবদ্ধ। কার্যরত শ্রমিকদের প্রায় 30 শতাংশ সুসংগঠিত শিল্পগুলির সঙ্গে যুক্ত। ট্রেড ইউনিয়নের সুখ-সুবিধা প্রধানত তারাই ভোগ করে। বহু ইউনিয়ন, একই প্রতিষ্ঠানে একাধিক ইউনিয়ন ও একই ইউনিয়নের মধ্যে একাধিক গোষ্ঠী ও তাদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব কেবল যে শ্রমিক স্বার্থের পক্ষেই ক্ষতিকর তাই নয়, শ্রমিক-মালিকদের মধ্যে সহযোগিতা গড়ে ওঠার পথেও বাধাস্বরূপ। ট্রেড ইউনিয়নগুলি প্রতিষ্ঠান-ভিত্তিক না হয়ে কেন্দ্রীয় সংগঠনভুক্ত হওয়ার ফলে এবং তাদের নেতৃত্ব সাধারণত রাজনৈতিক দলের উপর থাকাতে শ্রমিক ও মালিকদের আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শ্রমিক সমস্যা নিষ্পত্তি করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে শ্রমিক অসন্তোষ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে গঠনমূলক শ্রমিকমুখী ও জাতীয়তাবাদী করে তোলার জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাব করা হয়ে থাকে।

(1) শ্রমিকেরা নিজেদের প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দল-মত নির্বিশেষে শ্রমিক স্বার্থে ইউনিয়ন গঠন করবে। বাইরের কোন প্রকার হস্তক্ষেপ ও কেন্দ্রীয় সংগঠন ছাড়াও ইউনিয়ন যে শ্রমিক স্বার্থের দিক থেকে অনেক বেশি কার্যকর হতে পারে তার সাম্প্রতিক ও প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত জাপানের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন।

(2) প্রত্যেক ট্রেড ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

(3) ইউনিয়ন গঠনের জন্য ন্যূনতম সদস্য সংখ্যা ও সদস্যদের চাঁদার হার আইন দ্বারা নির্দিষ্ট করে দিতে হবে।

(4) প্রয়োজনবোধে ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করে দেয়ার অধিকার থাকবে। যেমন, বার্ষিক হিসাবপত্র দাখিল না করা ; ভুল হিসাব-পত্র দাখিল করা বা নির্দেশ দেয়া সত্ত্বেও তা সংশোধন না করা বা সদস্য সংখ্যা ন্যূনতম সংখ্যার কম হয়ে যাওয়া।

(5) ইউনিয়নগুলির অভ্যন্তরীণ নেতৃত্ব শক্তিশালী করে তোলা। এ প্রসঙ্গে ন্যাশনাল কমিশন অন লেবারের সুপারিশগুলি অনুধাবনযোগ্য : (a) শ্রমিক শিক্ষা জোরদার করা। (b) ইউনিয়নের সংগঠন কাজে শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা। (c) ইউনিয়নের কার্য-নির্বাহক সদস্যদের মধ্যে বাইরের লোকদের সংখ্যার অনুপাত হ্রাস করা। (d) সংশ্লিষ্ট প্রাক্তন শ্রমিকদের শ্রমিক বলে গণ্য করা। (e) এমন প্রথা গড়ে তোলা যাতে একই সময় একই ব্যক্তি ইউনিয়ন ও কোন রাজনৈতিক দলের কর্মকর্তার পদ ধারণ করতে না পারে।

(6) আন্তঃইউনিয়ন দ্বন্দ্ব দূর করা ও সেজন্য অভ্যন্তরীণ নেতৃত্ব গড়ে তোলা যাতে বাইরের হস্তক্ষেপ ও রাজনীতিকে প্রতিহত করা যায়। (a) এজন্য যৌথ আলাপ-আলোচনার প্রথা জোরদার করে তোলা ও ইউনিয়ন যে শ্রমিকদের একমাত্র প্রতিনিধি তা প্রতিষ্ঠিত করা। (b) ইউনিয়ন-গুলির স্বীকৃতি পাওয়ার প্রথার উন্নতি সাধন করা। (c) লেবার কোর্টদের আন্তঃইউনিয়ন বিবাদ মিটিয়ে ফেলার ক্ষমতা দেয়া।

(7) ইউনিয়নের কাজকর্মের এরূপ প্রসার সাধন যাতে সদস্যদের মধ্যে ইউনিয়নের প্রতি আনুগত্য ও পরস্পরের প্রতি আত্মীয়তাবোধ বৃদ্ধি পায়।

(8) কাজ নয়, পুরো বেতন ; শিল্পে শান্তি নয়, বিরামহীন দাবির সংগ্রাম—এ মানসিকতা শ্রমিক স্বার্থবিরোধী, জাতীয় স্বার্থের ক্ষতিকর। ইউনিয়নগুলির সমূহ কর্তব্য এ ধ্বংসাত্মক মানসিকতা থেকে শ্রমিকদের মুক্ত করা, জাতির সার্বিক উন্নতির পথে কোন বাধা সৃষ্টি না করে শিল্পে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করা।

ষষ্ঠ পরিকল্পনার দৃষ্টিভঙ্গী

ষষ্ঠ পরিকল্পনা ট্রেড ইউনিয়নগুলির গঠনমূলক ভূমিকার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে।

(i) ইউনিয়নের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদ রোধ করা।

(ii) সমাজের প্রতি ইউনিয়নদের মূল্য ও দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা ও তাদের নিজেদের পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাস স্থাপন করা।

(iii) সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের কাজে শ্রমিকদের সক্রিয় অংশ-

গ্রহণ করা ও নিজেদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা যাতে তারা উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির দাবিতে বর্ধিত উৎপাদনের ভাগীদার হতে পারে।

(iv) ইউনিয়নগুলিকে তাদের সদস্যদের কল্যাণের স্বার্থে কল্যাণমূলক কর্মসূচী রূপায়ণের প্রতি আরো আগ্রহ দেখাতে হবে। যেমন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পন, সাংস্কৃতিক ও অবসর-বিনোদন কাজকর্ম।

(v) ইউনিয়নগুলির কর্তব্য সদস্যদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষা ও পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার উপযোগিতা এবং মিতব্যয়িতা ও সঞ্চয়ী হওয়ার স্বার্থকতা সম্বন্ধে শিক্ষা ও উৎসাহ দেয়া। এসব গঠনমূলক কাজের ফলে সদস্যরা যথেষ্ট উপকৃত হবে। ইউনিয়নের প্রতি তাদের আনুগত্য বৃদ্ধি পাবে। শ্রমিক জীবনের বাইরেও যে সমাজ জীবন আছে ও তাতে যে অখণ্ড সুস্থ জীবনের আস্বাদন রয়েছে সে সম্বন্ধে শ্রমিকদের চেতনা জাগানো ও সে পথের সঠিক নির্দেশ দেয়া। এসব কাজের জন্য সরকারী অর্থ সাহায্যের কথাও ষষ্ঠ পরিকল্পনায় স্বীকৃত হয়েছে।

ধ্বংসাত্মক কাজকর্মের ভেতর দিয়ে বা কাজে বিরত থেকে শ্রমমূল্য আদায় করার পদ্ধতি যে শ্রমিক স্বার্থ ও জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী এ চেতনার অভাবের ফলে দেশের অর্থনীতি দ্রুত উন্নয়নমুখী হতে পারছে না। মালিকদের অযোগ্যতা, অকর্মণ্যতা ও আগ্রাসী অর্থ লোভ দৃঢ় হস্তে দমন করতে না পারলে শ্রমিক চেতনা জাগ্রত করার চেষ্টা পুঁজিবাদের সমর্থনে প্রতিক্রিয়াশীল কৌশলরূপে ধিক্কৃত হবে।

উপসংহার

শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য যেসব পন্থা ও পদ্ধতি প্রচলিত তা যে বিশেষ স্বার্থকতা লাভ করেনি তার প্রমাণ শিল্প বিরোধের সংখ্যা ও গুরুত্ব বৃদ্ধি। স্বেচ্ছামূলকভাবে বিরোধ নিষ্পত্তি কার্যকর হচ্ছে না। বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য তাই সিদ্ধান্ত পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হচ্ছে। এর ফলে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক আরো তিক্ত হয়ে উঠছে। অধিকাংশ রাজ্যেই ইউনিয়নগুলির আইনগত স্বীকৃতি নেই। এর ফলে শিল্পে শান্তির জন্য মালিকদের স্বেচ্ছামূলক নিয়মানু-বর্তিতার নিয়মাবলীর উপর ইউনিয়নগুলিকে নির্ভর করতে হয়। রাজনৈতিক

প্রভাবের ফলে ইউনিয়নগুলি স্বাধীনভাবে শ্রমিক কল্যাণের জন্য কিছু ভাবতে বা কাজ করতে পারে না।

ভারত সরকার শ্রমিক সমস্যা লাঘব করার জন্য সম্প্রতি স্থির করেছে যে, শিল্প ও শ্রমিক সম্পর্কিত নিয়মানুবর্তিতার নিয়মাবলীকে আইনের সমর্থন দিতে হবে। ইউনিয়নগুলিকে স্বীকৃতি দান বিষয়টাও নিয়মানুবর্তিতার নিয়মাবলীর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে একটি কমপ্রিহেনসিভ বিল অন ইনডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস রচিত হয়েছে।

18 শিল্প সম্বন্ধ ও বিরোধ

শিল্প সম্বন্ধ

ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি ও গণতান্ত্রিক সংবিধানে শ্রমিক-মালিক বিরোধ অবশ্যম্ভাবী বলা চলে। তবে উন্নত গণতান্ত্রিক দেশগুলির ধর্মঘট ও লক-আউট করার গণতান্ত্রিক অধিকার এবং তার ফলাফল অনুন্নত দেশগুলির ধরন-ধারণের থেকে পৃথক। উন্নত দেশগুলির উৎপাদন ঘাটতি বা উৎপাদনশীলতা সমস্যা নয়; সমস্যা চাহিদার অভাব। অনুন্নত দেশগুলির সমস্যা এর বিপরীত। ফলে কোন শিল্প সংস্থায় একদিন ধর্মঘট বা লক-আউট হলে উৎপাদনের যে ক্ষতি হয় তা পূরণ করা সম্ভব হয় না; বরঞ্চ মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি পায়। এর ফলে শ্রমিক অসন্তোষ আরো বৃদ্ধি পায়, রাজনৈতিক দলগুলি আরো তৎপর হয়ে ওঠে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইউনিয়ন গড়ে ওঠে, শ্রমিক ঐক্য বিঘ্নিত হয়। ভারতে এর সুন্দর প্রতিফলন চোখে পড়ে। প্রসঙ্গক্রমে, ভারতে যেখানে ইউনিয়নের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, অতি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানেও ইউনিয়ন গঠিত হচ্ছে সেখানে উন্নত দেশগুলিতে ইউনিয়ন সম্পর্কে শ্রমিকদের আগ্রহ কমে আসছে। যুক্তরাজ্যে 1980 সন থেকে 1981 সনের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা 5·9 শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। সে দেশে ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যাও হ্রাস পেয়েছে। 1970 সনে ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা ছিল 543, 1980 সনে 438 ও 1981 সনে 421। ধর্মঘট ও লক-আউটের ফলে আমাদের দেশে উৎপাদনের ক্ষতির পরিমাণ নিম্নে তুলে ধরা হল।

ম্যানডেজ ক্ষতির পরিমাণ, 1971-81

বছর	ক্ষতির পরিমাণ (:মিলিয়ন ম্যানডেজ)
1971	16·5
1972	20·5
1973	20·6

বছর	ক্ষতির পরিমাণ (মিলিয়ন ম্যানডেজ)
1974	40·3
1975	21·9
1976	12·7
1977	25·3
1978	28·3
1979	44·4
1980	22·0
1981	23·0
1982 (অনুমিত)	80·0

সূত্র : ষষ্ঠ পরিকল্পনা।

1974 সন ছাড়া প্রথম ছয় বছর পর্যন্ত ম্যানডেজ ক্ষতির পরিমাণ 22 মিলিয়নের কম। 1974 সনে 40 মিলিয়ন ম্যানডেজ ক্ষতি হওয়ার কারণ প্রধানত রেল ধর্মঘট। 1975 সনে অভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা ঘোষিত হওয়ার ফলে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। শিল্প সম্বন্ধের পর্যালোচনার জন্য দ্বিপাক্ষিক ন্যাশনাল এপেক্স বডি এবং সপ্ কাউন্সিলস ও জয়েণ্ট কাউন্সিলস গঠিত হওয়ার ফলেও শ্রমিক অসন্তোষ হ্রাস পায়। 1977 সনে জরুরী অবস্থা তুলে নেয়ার পর আবার পূর্ব অবস্থা ফিরে আসে। 1979 সনে ম্যানডেজ ক্ষতির পরিমাণ 44 মিলিয়ন। 1982 সনে ম্যানডেজ ক্ষতির পরিমাণ 80 মিলিয়ন হবে বলে ধরা হয়েছে। 1983 সনের প্রথম তিন মাসে ম্যানডেজ ক্ষতির পরিমাণ 3,311,013, বিরোধের সংখ্যা 389, জড়িত হয়ে পড়া শ্রমিকের সংখ্যা 412,197। 1982 সনের প্রথম তিন মাসে এদের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে 16,576, 975,731 ও 4,65,923। 1983 সনের জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ধর্মঘট ও লক-আউটের দরুন অনুমিত 44·2 মিলিয়ন ম্যানডেজ ক্ষতি হয়েছে। এ সময়কালীন 1984 সনে ম্যানডেজ ক্ষতির পরিমাণ অনুমিত 30·8 মিলিয়ন। আবার এ সময়কালীন শিল্প বিরোধের সংখ্যা 1983 ও 1984 সনে ছিল যথাক্রমে 2353 ও 1884;

জড়িত শ্রমিক সংখ্যা যথাক্রমে 1,391,243 ও 1,418,304 [ইণ্ডিয়ান লেবার জার্ণাল, মার্চ, 1985]।

শিল্প বিরোধের কারণ

শিল্প বিরোধের উল্লেখ্য কারণগুলি :

(1) স্বল্প মজুরি ও ভাতা। যে অনুপাতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে সে অনুপাতের তুলনায় অনেক কম হারে মজুরি ও ভাতা বৃদ্ধি পায়। এর ফলে শ্রমিকদের মজুরি ও ভাতা বৃদ্ধির দাবি পূরণের জন্য মরিয়া হয়ে ধর্মঘটের আশ্রয় নিতে হয়। ধর্মঘট বা লক-আউটে সাধারণত মালিকদের স্বার্থ ব্যাহত হয় না। জাতির স্বার্থ ব্যাহত হয়। কারণ সরকারকে এ বিবাদ মিটিয়ে ফেলার জন্য মালিকদের দাম বৃদ্ধি করার অনুমতি দিতে হয়। কোথাও বা কর, অবক্ষয় প্রভৃতি ব্যাপারে অতিরিক্ত সুবিধাও অনুমোদন করতে হয়। ফলে মালিক লাভবান হয়। মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি পায়। শ্রমিকদের দুর্দশা আবার বৃদ্ধি পায়। আবার তারা ধর্মঘট বা মালিকেরা লক-আউটমুখী হয়।

(2) বোনাস। বোনাস বর্তমানে শ্রমিক, এমনকি সর্বশ্রেণীর কর্মীদের মজুরি বা বেতন পাওয়ার দাবির মতই দাবি হয়ে উঠেছে। লাভ-ক্ষতি নির্বিশেষে শিল্প সংস্থাগুলিকে আইনগত নির্দেশক্রমে বোনাস দিতে হয়। এর ফলে ও বোনাসের হারের উচ্চতম সীমা নির্ধারিত না হওয়ার কারণে বোনাসের দাবিকে কেন্দ্র করে প্রতি বছরই বোনাস-কালে ধর্মঘট ও লক-আউট ছড়িয়ে পড়ে।

(3) শ্রমিক পীড়ন। অনেক সময়ে অসঙ্গত কারণে শ্রমিক, বিশেষত নেতৃস্থানীয় শ্রমিকদের, চাকরি থেকে বরখাস্ত বা স্থানান্তরিত করা হয়। এ জাতীয় নির্দেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ফলে সংশ্লিষ্ট শিল্প সংস্থাটির শান্তি ও শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়। ফলে ধর্মঘট বা লক-আউট ঘটে।

(4) অন্যান্য কারণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : (a) নতুন দাবি নিয়ে আন্দোলন। যথা, ছুটি ও কাজের বোঝা কমান, মজুরির হারের পরিবর্তন, বাসস্থান, চাকরির নিরাপত্তা প্রভৃতি। (b) ইউনিয়নকে স্বীকৃতি দানের দাবি। (c) আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগের দরুন ছাঁটাই বা ছাঁটাইয়ের বা কর্মসংস্থানের ভবিষ্যৎ সুযোগ হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কা। (d) আইনে শ্রমিকদের যে সমস্ত অধিকার দেয়া হয়েছে কর্তৃপক্ষের তা মেনে না নেয়া বা

এড়িয়ে যাওয়া বা কার্যকর করতে বিলম্ব করা। অনেকসময় কর্তৃপক্ষ চুক্তিবদ্ধ শর্তও মানতে সম্মত হয় না। ফলে শ্রমিকেরা ধর্মঘটের পথ নেয়। (e) রাজনৈতিক দলের ডাকে সহানুভূতিসূচক ধর্মঘট, শিল্প রাষ্ট্রায়ত্তকরণের দাবি ও শ্রমিকদের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দুর্ব্যবহার প্রভৃতি কারণেও ধর্মঘট বা লক-আউট ঘটে থাকে।

সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা

শিল্প বিরোধ মিটাবার জন্য সরকার যেসব ব্যবস্থা নিয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য :

(i) ফ্যাক্টারীজ এ্যাক্ট, 1948 ও শ্রমিক আইন প্রণয়ন দ্বারা শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা ও কল্যাণ সাধন।

(ii) শ্রমিকদের মুনাফার অংশীদার করা, পরিচালনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণ, শ্রমিকদের বাসগৃহ নির্মাণে ভরতুকি দেয়া প্রভৃতি সম্পর্কিত স্কীম গ্রহণ।

(iii) বোনাস স্কীম চালু করা।

(iv) ইনডাস্ট্রিয়াল ডিসপুটস এ্যাক্ট, 1947 অনুযায়ী শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা।

(v) মালিক ও শ্রমিক উভয়ের দ্বারা গৃহীত কোড অব ডিসিপ্লিন (1958) চালু করা।

(vi) বিভিন্ন প্রকার সামাজিক নিরাপত্তা সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন। যথা, এমপ্লোয়িজ স্টেট ইনসিওরেন্স এ্যাক্ট 1948 ; এমপ্লোয়িজ প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড এণ্ড ফ্যামিলি পেনসন এ্যাক্ট, 1952 প্রভৃতি।

(vii) মিনিমাম ওয়েজেস এ্যাক্ট, 1948 দ্বারা ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা।

শিল্প বিরোধ মীমাংসার পদ্ধতি

শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য দু'টি পদ্ধতি প্রচলিত : (i) আইনগত পদ্ধতি, (ii) স্বেচ্ছামূলক পদ্ধতি।

আইনগত পদ্ধতির আওতায় আসে ইনডাস্ট্রিয়াল ডিসপুটস এ্যাক্ট ও শিল্প বিরোধ সম্পর্কিত অন্যান্য এ্যাক্ট। আইনগত পদ্ধতির চারটি প্রধান ধারা : (i) ওয়ার্কস বা জয়েন্ট কমিটি, (ii) মীমাংসা (কনসিলিয়েশন), (iii) সালিসি (আর্বিট্রেশন), (iv) সিদ্ধান্ত (এডজুডিকেশন)।

স্বেচ্ছামূলক পদ্ধতিতে রয়েছে ইউনিয়নগুলিকে স্বীকৃতি দেয়া, তাদের অভিযোগ শোনার জন্য পদ্ধতি স্থির করা, বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য বিষয়টি স্বেচ্ছামূলক সালিসিতে দেয়া, যুক্ত পরিচালনা কাউন্সিল গঠন করা প্রভৃতি।

ওয়ার্কস বা জয়েন্ট কমিটি

ইনডাস্ট্রিয়াল ডিসপুটস এ্যাক্ট 1947 অনুযায়ী যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে অন্তত 100 শ্রমিক রয়েছে সেসব ক্ষেত্রে পরিচালক ও শ্রমিকদের সমান সংখ্যক প্রতিনিধি নিয়ে ওয়ার্কস কমিটি গঠিত হয়। উদ্দেশ্য ঃ

(a) মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা।

(b) উভয়ের স্বার্থ যেখানে জড়িত সেখানে উভয়ের বক্তব্য রাখা।

(c) বক্তব্যে অমিল ঘটলে তা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা।

ওয়ার্কস কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করা বা না করা মালিকদের উপর নির্ভর করে।

1965-66 সনে ওয়ার্কস কমিটিগুলির মোট সংখ্যা ছিল 3133। 1974 সনে তা হ্রাস পেয়ে 752 হয়। 1982 সনের প্রারম্ভে এর সংখ্যা ছিল 574। ওয়ার্কস কমিটিগুলির প্রতি আগ্রহের অভাবের কারণ শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে সরাসরি কোন চুক্তি হওয়া কঠিন। তাছাড়া কমিটির সুপারিশ মালিকদের কাছে বাধ্যতামূলক নয়। ন্যাশনাল কমিশন অন লেবার ওয়ার্কস কমিটিগুলিকে কার্যকর করার জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশ করেছে।

(i) মালিকদের দিক থেকে ওয়ার্কস কমিটিগুলির সঙ্গে সহযোগিতা করা ও তাদের উপযোগিতা ও সুপারিশের উপর যথোচিত গুরুত্ব দেয়া।

(ii) শ্রমিক ইউনিয়নগুলির ওয়ার্কস কমিটিগুলিকে সমর্থন করা।

(iii) প্লান্ট্ স্তরে দ্বিপাক্ষিক প্রতিষ্ঠানগুলির কাজকর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন।

মীমাংসা

মীমাংসা বাধ্যতামূলক বা স্বেচ্ছামূলক হতে পারে। স্বেচ্ছামূলক মীমাংসা ব্যাপারে রাষ্ট্র পদ্ধতি স্থির করবে। বাধ্যতামূলক মীমাংসা ক্ষেত্রে রাষ্ট্র বিবদমান দলকে মীমাংসার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি করার জন্য বাধ্য করবে।

ইনডাস্ট্রিয়াল ডিসপুটস এ্যাক্ট 1947 অনুযায়ী জনকল্যাণমূলক সেবা (পাবলিক ইউটিলিটি সার্ভিস) সম্পর্কিত সব শিল্প বিরোধের ব্যাপারে বাধ্যতামূলক মীমাংসা পদ্ধতি প্রযোজ্য। অন্যান্য ক্ষেত্রে তা স্বেচ্ছামূলক। এ এ্যাক্ট অনুযায়ী বাধ্যতামূলক মীমাংসা পদ্ধতিটি এরূপ : প্রথমত কনসিলিয়েশন অফিসার মীমাংসকের কাজ করবেন। নিয়োগের চোদ্দ দিনের মধ্যে তাঁকে তাঁর কাজকর্মের ফলাফল সম্পর্কে সরকারের কাছে রিপোর্ট দিতে হবে। এ চোদ্দ দিনের মধ্যে তিনি বিবাদ নিষ্পত্তি করতে অসমর্থ হলে বিষয়টি বোর্ড অব কনসিলিয়েশনের কাছে পাঠান হবে। এ বোর্ড দু' থেকে চারজন সদস্য ও একজন চেয়ারম্যান নিয়ে গঠিত। বোর্ড তার নিয়োগের দু' মাসের মধ্যে সরকারের কাছে ফলাফল সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করবে।

ন্যাশনাল কমিশন অন লেবার-এর মতে মীমাংসা পদ্ধতিকে আরো কার্যকর করে তোলার জন্য মীমাংসার পরিবেশকে বাইরের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা প্রয়োজন। সেজন্য মীমাংসা পদ্ধতিকে প্রস্তাবিত ইনডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস কমিশনের অঙ্গীভূত করা সঙ্গত। তাছাড়া মীমাংসার কাজের সঙ্গে যুক্ত অফিসারেরা যাতে আরো ভালভাবে কাজ করতে পারেন সেজন্য তাঁদের যোগ্যতার মান নির্ধারণ ও যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ করা দরকার। অফিসারদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং তাঁদের পদমর্যাদা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করাও প্রয়োজন। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকেও তাঁদের মুক্ত রাখতে হবে।

সালিসি

স্বেচ্ছামূলকভাবে সালিসির আশ্রয় নেয়া মালিক বা শ্রমিক কারো কাছেই তেমন আকর্ষণীয় হয়ে ওঠেনি। এর কারণ সম্পর্কে ন্যাশনাল কমিশন অন লেবারের অভিমত, সালিসি ব্যর্থ হলে সহজেই সিদ্ধান্ত স্তরে অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য নিয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকাতে সালিসি পদ্ধতির গুরুত্ব কমে গেছে। শ্রমিক ও মালিক উভয়ের কাছে গ্রহণীয় এমন যোগ্য সালিসের সংখ্যাও কম। তাছাড়া শ্রমিক ও মালিক প্রতিনিধিদের যৌথ চুক্তি সমস্ত শ্রমিকদের মেনে নিতে বাধ্য করার মত শক্তিশালী স্বীকৃত ইউনিয়নের অভাব রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে আইনগত নানারকম বাধা থাকাতে সালিসি কার্যকর হয় না। সালিসের অ্যাওয়ার্ডের বিরুদ্ধে আপিল করার কোন আইনগত সুযোগ নেই। স্বেচ্ছামূলক সালিসি পদ্ধতির রীতিনীতি জটিল ও শ্রমিকদের কাছে তা ব্যয়বহুল।

সিদ্ধান্ত

ইনডাস্ট্রিয়াল ডিসপুটস এ্যাক্ট 1947 সিদ্ধান্ত পদ্ধতিকে তিন স্তরে ভাগ করেছে : (i) লেবার কোর্টস, (ii) ইনডাস্ট্রিয়াল ট্রাইবুনালস, (iii) ন্যাশনাল ট্রাইবুনালস।

(i) লেবার কোর্ট সাধারণত বর্তমান বা প্রাক্তন কোন হাইকোর্টের বিচারপতিকে নিয়ে গঠিত। এ কোর্ট নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দেয়ার অধিকারী : (a) স্ট্যাণ্ডিং অর্ডার্স অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের দেয়া আদেশের বৈধতার প্রশ্ন, (b) স্ট্যাণ্ডিং অর্ডার্সের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ। (c) কোন শ্রমিককে বরখাস্ত বা পুনরায় চাকরিতে বহাল করা বা যে শ্রমিককে অন্যায়-ভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে তাকে রিলিফ দান। (d) কোন চলতি সুবিধা বা বিশেষ সুযোগ প্রত্যাহার করা। (e) কোন ধর্মঘট বা লক-আউটের বৈধতা বা অবৈধতার প্রশ্ন। (f) ইনডাস্ট্রিয়াল ট্রাইবুন্যাল বা ন্যাশনাল ট্রাইবুন্যালের অধীন নয় এরূপ অন্যান্য বিষয়।

রাজ্য স্তরে যে সমস্ত লেবার কোর্ট রয়েছে উল্লিখিত বিষয়গুলি তাদেরও বিচার্য বিষয়। ইনডাস্ট্রিয়াল ডিসপুটস এ্যাক্ট 1947 অনুযায়ী লেবার কোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করার কোন বিধান নেই।

(ii) ইনডাস্ট্রিয়াল ট্রাইবুন্যাল হাইকোর্টের কোন বর্তমান বা প্রাক্তন বিচারপতিকে নিয়ে গঠিত। এর বিচার্য বিষয় : (a) মজুরি দেয়া, দেয়ার সময়কাল ও পদ্ধতি। (b) ক্ষতিপূরণমূলক ভাতা ও অন্যান্য ভাতা। (c) কাজের সময়সীমা ও বিশ্রাম। (d) মজুরিসহ ছুটি ও ছুটির দিন। (e) বোনাস, মুনাফার অংশ, প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড ও গ্র্যাচুইটি। (f) স্ট্যাণ্ডিং অর্ডার্স বহির্ভূত সিফ্‌ট ওয়ার্ক। (g) গ্রেড অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগকরণ। (h) নিয়মানুবর্তিতার নিয়মাবলী। (i) র‍্যাশনালাইজেসন। (j) শ্রমিক ছাঁটাই ও প্রতিষ্ঠানটির কাজকর্ম গুটিয়ে নেয়া।

সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট কালের জন্য ট্রাইবুন্যাল নিযুক্ত হয়। ট্রাইবুন্যাল নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিচার্য বিষয় নিষ্পত্তি করতে অসমর্থ হলে সরকার নতুন ট্রাইবুন্যাল নিযুক্ত করতে পারে। নতুন ট্রাইবুন্যাল আগের ট্রাইবুন্যালের অসমাপ্ত শুনানি থেকে কাজ সুরু করতে পারে অথবা বিষয়টি সম্বন্ধে আবার নতুন করে শুনানির ব্যবস্থা করতে পারে।

(iii) ন্যাশনাল ট্রাইবুন্যাল। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে বা যেক্ষেত্রে

একাধিক রাজ্যে অবস্থিত শিল্প সংস্থাগুলির স্বার্থ জড়িত সেক্ষেত্রে সরকার ন্যাশনাল ট্রাইবুন্যাল নিযুক্ত করতে পারে।

জনহিতকর প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত বিবাদের নিষ্পত্তির জন্য বিষয়টি সাধারণত ট্রাইবুন্যালের কাছে পাঠাতে হয়। অন্যান্য ক্ষেত্রে কোন বিবাদ উপস্থিত হলে নিষ্পত্তির জন্য বিষয়টি ট্রাইবুন্যালের কাছে পাঠান হবে কিনা তা সরকারের বিবেচনার উপর নির্ভর করে। ট্রাইবুন্যালের রায় সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়। সরকার জনস্বার্থে এর পরিবর্তন করতে বা তা বাতিল করে দিতে পারে। ট্রাইবুন্যালের রায়, পরিবর্তন সহ, সংসদে পেশ করতে হবে। রায় একবছর পর্যন্ত বলবৎ থাকে, তবে তার মেয়াদ তিনবছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা চলে।

উপসংহার

সিদ্ধান্ত পদ্ধতি শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক প্রীতিপূর্ণ করে তোলার ব্যাপারে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছে। এর মাধ্যমে শ্রমিকদের মজুরি, বোনাস, ভাতা, কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ প্রভৃতির যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছে। অপরদিকে, এ পদ্ধতি দ্বারা কোন বিবাদের নিষ্পত্তি করা বেশ সময় সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল। যেহেতু সরকার নিজেই ট্রাইবুন্যাল নিয়োগ করে সেহেতু এর নিরপেক্ষতা সম্পর্কেও প্রশ্ন করা হয়। দ্বিতীয়ত, বিবদমান যে পক্ষের অনুকূলেই সিদ্ধান্ত হোক না কেন উভয়ে উভয়ের বিরোধী হয়েই থাকে। অর্থাৎ, সিদ্ধান্ত দ্বারা স্থায়ী শিল্প-শান্তি আশা করা যায় না। তৃতীয়ত, সিদ্ধান্তের ফলে ইউনিয়নের বৃহত্তর আন্দোলন ব্যাহত হচ্ছে। তাছাড়া স্বেচ্ছামূলকভাবে শিল্প বিবাদের মীমাংসা ও কালেকটিভ বারগেনিং-এর ফলে সিদ্ধান্ত পদ্ধতির গুরুত্ব হ্রাস পাচ্ছে।

স্বেচ্ছামূলক ব্যবস্থা

স্বেচ্ছামূলক ব্যবস্থা দ্বারাও শিল্প বিরোধের নিষ্পত্তি ঘটে। যথা, নিয়মানুবর্তিতার নিয়মাবলী (কোড অব ডিসিপ্লিন)। 1958 সনে অনুষ্ঠিত লেবার কনফারেন্সে গৃহীত নিয়মানুবর্তিতার নিয়মাবলীর বৈশিষ্ট্য : (a) বিজ্ঞপ্তি না দিয়ে ধর্মঘট বা লক-আউট করা চলবে না। (b) ভয়ভীতি প্রদর্শন, পীড়ন ও শ্রমিকদের 'গো-স্লো' চলবে না। (c) কোন ব্যাপারেই একপেশে ব্যবস্থা নেয়া চলবে না। (d) সমস্ত বিবাদ সরকার কর্তৃক রচিত পদ্ধতিক্রমে নিষ্পত্তি করা হবে। (e) শ্রমিকদের সঙ্গে চুক্তি না করে কর্তৃপক্ষ তাদের

কাজের বোঝা বৃদ্ধি করতে পারবে না। (f) ট্রেড ইউনিয়নের উন্নতি-বিধানের জন্য কর্তৃপক্ষকে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে হবে। (g) যেসব অফিসারের অসঙ্গত কার্যকলাপের ফলে শ্রমিকেরা আইনবিরুদ্ধ কাজকর্ম করতে প্ররোচিত হবে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। (h) কাজের সময়ে শ্রমিকেরা ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কিত কাজকর্মে লিপ্ত হতে পারবে না। তাছাড়া তারা শান্তিভঙ্গ হতে পারে এমন কোন বিক্ষোভ প্রদর্শন বা কাজে যোগদান করতে পারবে না। (i) শ্রমিক, কর্তৃপক্ষ ও অফিসার প্রত্যেককেই নিয়মানুবর্তিতার নিয়মাবলী মেনে চলতে হবে। (j) ইউনিয়নগুলি শ্রমিকদের কাজে গাফিলতি, সম্পত্তির ক্ষতিসাধন, স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত, উপরওয়ালাদের আদেশ অমান্য করা প্রভৃতি কাজকে প্রশ্রয় দিতে পারবে না।

নিয়মানুবর্তিতার নিয়মাবলী পাবলিক সেক্টর কোম্পানি বা কর্পোরেশন, দেশরক্ষা, মন্ত্রণালয় ও রেলওয়েজ-এর, পোর্ট ও ডক ছাড়া, ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বীমা শিল্প, স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অয ইণ্ডিয়া এই নিয়মাবলী গ্রহণ করেছে।

দেশে জরুরী অবস্থাকালীন শিল্পে যাতে শান্তি অক্ষুণ্ণ থাকে সেজন্য 1962 সনে কেন্দ্রীয় মালিক ও শ্রমিক সংস্থাগুলি ইনডাস্ট্রিয়াল ট্রুস রেজোলিউসন গ্রহণ করে। রেজোলিউসনে এরূপ নির্দেশ রয়েছে যে, জরুরী অবস্থাকালীন উৎপাদন বিঘ্নিত করা বা উৎপাদনে শিথিলতা আনা চলবে না। বরঞ্চ উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ সর্বোচ্চ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হবে। 1963 সনের আগস্টে ট্রুস রেজোলিউসনের কাজকর্ম পর্যালোচনার জন্য যে স্ট্যাণ্ডিং কমিটি গঠন করা হয়েছিল তাকে সেণ্ট্রাল ইমপ্লিমেনটেসন এণ্ড ইভেল্যুয়েশন কমিটির সঙ্গে যুক্ত করে দেখা হয়েছে। কোড অব ডিসিপ্লিন ও ইনডাস্ট্রিয়াল ট্রুস রেজোলিউসন উভয়ই স্বেচ্ছামূলক সালিসি পদ্ধতি। উভয়ই মধ্যস্থতার মারফত বিরোধ নিষ্পত্তির উপর গুরুত্ব দিয়েছে।

ইনডাস্ট্রিয়াল ডিসপুটস এ্যাক্ট, 1947

1947 সনের 1 এপ্রিল থেকে এ আইন বলবৎ হয়। এ আইনের প্রধান ধারাগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হল।

(1) যে শিল্প প্রতিষ্ঠানে 100 জনের অধিক শ্রমিক রয়েছে সেক্ষেত্রে শ্রমিক ও কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিদের নিয়ে ওয়ার্কস কমিটি গঠন করা।

(2) কোনপ্রকার বিরোধ উপস্থিত হলে প্রারম্ভে সাধারণ সালিসি পন্থা অবলম্বন করা। মধ্যস্থতা করার জন্য সালিসি অফিসার নিযুক্ত করার ক্ষমতা রাজ্য সরকারদের থাকবে।

(3) এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে বিষয়টি কনসিলিয়েশন বোর্ডের কাছে পাঠান হবে। বোর্ডের চেয়ারম্যানকে বিবদমান পক্ষের সঙ্গে সম্পর্কহীন হতে হবে। চেয়ারম্যান ছাড়া দুজন বা চারজনকে সদস্য পদে গ্রহণ করা হবে।

(4) এ ক্ষেত্রেও প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার বিষয়টি ইনডাস্ট্রিয়াল ট্রাইবুন্যালের কাছে বিচারের জন্য পাঠাতে পারবে। ট্রাই-ব্যুনালের নির্দেশকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে কার্যকর করতে হবে।

(5) জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট করতে হলে শ্রমিকদের ধর্মঘট করার পূর্বে 6 সপ্তাহের মধ্যে ধর্মঘট করার কথা কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে। অন্যথা তা অবৈধ বলে বিবেচিত হবে। তেমনি শ্রমিকদেরও অনুরূপভাবে না জানিয়ে কর্তৃপক্ষ লক-আউট ঘোষণা করলে তা অবৈধ বলে ধার্য হবে।

(6) সালিসিকালীন ও সালিস শেষ হওয়ার সাত দিনের মধ্যে অথবা ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন থাকাকালীন এবং ট্রাইব্যুনালের কাজ শেষ হবার দু'মাসের মধ্যে অথবা মীমাংসা বা ব্যবস্থা সম্পর্কিত কোন মীমাংসা বা ব্যবস্থা কার্যকর করার সময়কালীন যদি কোন ধর্মঘট বা লক-অউট করা হয় তবে তা অবৈধ বলে ধার্য হবে।

1976 সনে ইনডাস্ট্রিয়াল ডিসপুটস এ্যাক্ট সংশোধিত হয়। এ সংশোধনের ফলে 'লে-অফ' বা ছাঁটাই করতে হলে মালিককে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে কারণ দেখিয়ে আগে অনুমোদন নিতে হবে। যে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানে 300 বা ততোধিক শ্রমিক নিযুক্ত কেবল সে সমস্ত প্রতিষ্ঠানেই এ বিধান প্রযোজ্য হবে।

মন্তব্য

শ্রমিক নেতারা ইনডাস্ট্রিয়াল ডিসপুটস এ্যাক্টকে সর্বতোভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। তাদের মতে বাধ্যতামূলক সালিসি শ্রমিকদের প্রাথমিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করার কৌশল মাত্র। এর ফলে শ্রমিকদের সঙ্ঘ-শক্তি দুর্বল হয়ে পড়বে ও তারা মালিকের ক্রীড়নক হয়ে উঠবে।

শ্রমিক-মালিক নীতি সম্বন্ধে সরকারের বক্তব্য, ভারতের সামাজিক ও সাংবিধানিক ভিত গণতন্ত্র; অর্থনীতির ভিত মিশ্র অর্থনীতি। এরূপ

সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রথায় জাতীয় স্বার্থে শ্রমিক-মালিক তথা সর্বশ্রেণীর, সর্বস্তরের মানুষের শান্তিপূর্ণভাবে পাশাপাশি বসবাস করা ও জাতীয় উন্নয়নে একতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে সর্বশক্তি দিয়ে কাজ করা কর্তব্য। দেশব্যাপী শ্রমিক অসন্তোষ প্রশমিত করতে হলে সালিসি ছাড়া দ্বিতীয় পথ নেই। বলা বাহুল্য, শ্রমিক-মালিক সংঘর্ষের ফলাফল শুধু তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, সমগ্র জাতির জীবন, আর্থিক ক্ষেত্রতো নিঃসন্দেহে, এর প্রভাবে নানা-ভাবে পীড়িত হয়ে ওঠে।

মালিকেরা এ আইনের বিরোধী। তাদের মতে, অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, ট্রাইব্যুনালের রায় শ্রমিক স্বার্থের পক্ষেই যায় যা শিল্পের বৃহত্তর স্বার্থের পরিপন্থী। তাছাড়া বিভিন্ন রাজ্যের ট্রাইব্যুনালের একই বিষয়ে বিভিন্ন বিচারফল নানাপ্রকার অসামঞ্জস্য সৃষ্টি করে।

ইনডাস্ট্রিয়াল ডিসপুটস এ্যাক্ট ফলপ্রসূ হচ্ছে না বলে অনেকেই মনে করেন। ন্যাশনাল কমিশন অন লেবার নতুন পদ্ধতি ও ব্যাপকতার পটভূমিতে শিল্প সম্পর্কিত আইন প্রণয়নে সচেষ্ট হয়। কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। কারণ কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংস্থাগুলি অনেক মৌল বিষয়ে একমত হতে অসমর্থ হয়। যেমন, বিবাদ নিষ্পত্তির পদ্ধতি ও রীতিনীতি, ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে স্বীকৃতি দেয়ার মাপকাঠি ও নিয়মকানুন, জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ও অত্যাবশ্যক শিল্প-গুলিতে ধর্মঘট করার অধিকার, শিল্প সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রণে সরকারের ভূমিকা প্রভৃতি।

ষষ্ঠ পরিকল্পনার মতে এরূপ অনিশ্চিত ও অস্থিতিপূর্ণ অবস্থা চলতে দেয়া সঙ্গত নয়। ট্রেড ইউনিয়নগুলির একটা বুঝাপড়ায় আসা উচিত। যেসব শ্রমিকেরা শ্রমিক আইনের অন্তর্ভুক্ত নয় সেসব শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও চাকরির নিরাপত্তা ও কাজের শর্তাদির উন্নতিবিধানের প্রশ্নটি রাখা হয়েছে।

শ্রমিক-মালিক বিরোধ ব্যাপারে জনমতকে কোন সময়ই প্রাধান্য দেয়া হয়নি। মালিকের মুনাফার প্রতি লোলুপতা ও শ্রমিকের রাজনৈতিক দল-গুলির হাতিয়ারের ভূমিকা সম্ভবত একমাত্র জনমতই রোধ করতে পারে। সরকারের প্রধান কর্তব্য, এ দ্বন্দ্বের বিরুদ্ধে জনমতের সাহায্য নেয়া।

শ্রমিক কল্যাণের প্রসার

প্রতিবন্ধী

প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের জন্য ডাইরেক্টর জেনারেল অব এমপ্লোয়মেণ্ট এণ্ড ট্রেনিং-এর অধীনে 11 কেন্দ্র কাজ করছে। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় এরূপ আরো কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে। অন্ধ, মূক ও বধির, মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের জন্য স্বেচ্ছামূলক সংস্থাগুলি যথেষ্ট যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে বটে, তবে প্রতিবন্ধী ও এ জাতীয় পঙ্গু ব্যক্তিদের একই শ্রেণীভুক্ত করে যথাযোগ্য কর্ম-ভিত্তিক স্থচী গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ইণ্টারন্যাশনাল ইয়ার ফর ডিসএবেল্ড পারসনস (1981)-এ বিষয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

এপ্রেনটিসসিপ ট্রেনিং

এপ্রেনটিসসিপ ট্রেনিং বিষয়টি 20-দফা কর্মস্থচীভুক্ত হয়েছে। এ কর্মস্থচী বর্তমানে তেমন কার্যকর হয়নি। কারণ যেসব প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে তা উচ্চমানের নয়। তাছাড়া প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের অভাবও রয়েছে। প্রশিক্ষণের মান নিম্ন এ কারণে যাতে কর্মসংস্থানের অভাব না ঘটে সেজন্য ষষ্ঠ পরিকল্পনায় এ বিষয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। যথা, ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ, হোষ্টেলের ব্যবস্থা, বৃত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি, দক্ষ তত্ত্বাবধান, শিল্পগুলির সঙ্গে অধিকতর যোগাযোগ স্থাপন প্রভৃতি। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের যাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ ঘটে সেজন্য যে শিল্প প্রতিষ্ঠানে তারা প্রশিক্ষণ নেবে সেখানেই তাদের কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন। অবশ্য এর বাইরেও কিছু সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে। এ স্কীম অধিকতর শিল্পে ছড়িয়ে দেয়ার প্রস্তাবও রাখা হয়েছে।

পরিচালনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণ

শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণ আধুনিক পরিচালনা ব্যবস্থার এক অপরিহার্য অঙ্গরূপে স্বীকৃত। পরিচালনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণের ফলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে তাদের আনুগত্য বৃদ্ধি পাবে। কর্তৃপক্ষের স্বার্থ ও তাদের স্বার্থ যে মূলত এক ও অভিন্ন সে বোধ তাদের ও কর্তৃপক্ষের উভয়ের মধ্যেই জাগ্রত হবে। শ্রমিকেরা পরিচালনার

জটিলতা সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতে পারবে। ফলে তারা যথেচ্ছভাবে কর্তৃপক্ষের সমালোচনা থেকে বিরত থেকে যৌথ সহযোগিতার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠানটিকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিতে সচেষ্ট হবে। সর্ববিষয়ে শ্রমিকেরা তাদের প্রস্তাবগুলি নীতি নির্ধারণ স্তরে রাখার সুযোগ পাবে। উভয় দ্বারা বিবেচিত ও গৃহীত নীতি রূপায়ণে শ্রমিকদের নৈতিক বাধ্যবাধকতা থাকবে। সর্বোপরি, এ সহযোগিতার ফলে শিল্পে শান্তি দেখা দেবে, কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পাবে, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ সুস্থ হয়ে উঠবে।

পদ্ধতি

অনেক পদ্ধতিতে শ্রমিকদের পরিচালনায় অংশগ্রহণ সম্ভব। যেমন, সহ-মালিকানা, প্রস্তাব রাখা, যুক্ত আলোচনা ও বোর্ড অব ডাইরেক্টরস-এ অংশগ্রহণ।

(i) সহ-অংশীদারত্ব। এ পদ্ধতিতে শ্রমিকরাও কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করে মালিকানার অংশীদার হয়। ফলে শ্রমিক-মালিক উভয়ই সহ-মালিক হয়। উভয়েই পরিচালনায় অংশগ্রহণের অধিকারী হয়। মালিকানায় স্থান পাওয়ার জন্য ও পরিচালনাভুক্ত হওয়ার ফলে শ্রমিকদের কাজকর্মে দায়িত্ববোধ ও প্রতিষ্ঠানটির প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধি পায়।

তবে এ পদ্ধতি বিশেষ কার্যকর হয়নি। কারণ শ্রমিকদের এমন সঙ্গতি নেই যে তারা কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করে মালিক স্তরে উন্নীত হতে পারে। তাছাড়া ধনী মালিকেরা পছন্দ করে না যে তারা মালিকের মর্যাদায় পরিচালনায় অংশগ্রহণ করুক।

(ii) প্রস্তাব রাখা। এ স্কীমে মালিকেরা কোম্পানির বিবিধ বিষয় সম্পর্কে শ্রমিকদের মতামত চাইতে পারে। শ্রমিকেরা এ ব্যাপারে যাতে উৎসাহিত হয় সেজন্য উত্তম প্রস্তাবের জন্য পুরস্কার দেয়ার ব্যবস্থাও করা যেতে পারে। এর ফলে শ্রমিকদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটবে। ধ্বংস নয়, গঠন ও গঠনে তাদের দান স্বীকৃতি পেলে তারা উৎসাহিত হবে ; পুরস্কার প্রাপ্তিতে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। তাদের উদ্ভাবন কোম্পানির উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে। আমাদের দেশে টাটা, ডি-সি-এম প্রভৃতি শিল্প সংস্থাগুলিতে এ পদ্ধতি প্রচলিত আছে।

(iii) যুক্ত-পরামর্শ। এ পদ্ধতিক্রমে যুক্ত কমিটি বা যুক্ত পরিচালনা কাউন্সিল গঠিত হয়। এতে শ্রমিক ও মালিক উভয়েরই সাধারণত সমান

সংখ্যক প্রতিনিধি থাকে। তারা শ্রমিক স্বার্থের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলাপ-আলোচনা করে। কমিটি বা কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত পরামর্শমূলক। কর্তৃপক্ষ তা গ্রহণ নাও করতে পারে। তবে যেহেতু তা শ্রমিক-মালিক প্রতিনিধিদের যুক্ত সিদ্ধান্ত সেহেতু সাধারণত এরূপ সিদ্ধান্ত বাতিল করে দেয়া হয় না।

(iv) বোর্ড অব ডাইরেক্টরস-এ অংশগ্রহণ। বোর্ড অব ডাইরেক্টরস কোম্পানির যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। শ্রমিকদের এতে অংশগ্রহণ করা মানে কোম্পানির সর্বোচ্চ স্তরের সঙ্গে যুক্ত হওয়া এবং নীতি ও সিদ্ধান্ত সম্পর্কে মালিকদের সঙ্গে সম দায়িত্ব নেয়া ও তা রূপায়ণে মালিকদেরই মত সমান আগ্রহযুক্ত হওয়া। এর ফলে তারা যে কোম্পানির অবিচ্ছেদ্য ও দায়িত্বপূর্ণ অংশ এ বাস্তবতা-বোধ তাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে এর ফলে শ্রমিকদের সংগ্রামী মনোভাব কমে আসে ও শ্রমিক নেতাদের মধ্যে মালিকানার মানসিকতা দেখা দেয়।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিতে বাধ্যতামূলকভাবে ও কতিপয় নির্ধারিত কেন্দ্রীয় পাবলিক সেক্টর সংস্থায় স্বেচ্ছামূলকভাবে শ্রমিক-ডাইরেক্টর স্কীম গৃহীত হয়েছে। 1975 সনে ম্যানুফ্যাকচারিং ও খনি শিল্পে এবং 1977 সনে পাবলিক সেক্টরের সওদাগরি ও সেবা সংস্থাগুলিতে শ্রমিকদের স্বেচ্ছামূলক-ভাবে পরিচালনায় অংশগ্রহণ করার স্কীমকে স্বীকার করে নেয়া হয়। এসব স্কীম 20 দফা-অর্থনৈতিক কর্মসূচীভুক্ত। মালিক, ট্রেড ইউনিয়ন, সরকার ও শিক্ষাব্রতীদের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত একটি 21 সদস্য বিশিষ্ট কমিটি পরিচালনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণের বিষয়টি সম্বন্ধে যে সমস্ত সুপারিশ করেছে তার মধ্যে তিন স্তরে শ্রমিকদের পরিচালনায় অংশগ্রহণের কথা বলা হয়েছে। স্তর তিনটি যথাক্রমে সপ্ ফ্লোর স্তর, প্লাণ্ট্ স্তর ও কর্পোরেট বা বোর্ড স্তর। কমিটি সংশ্লিষ্ট সংস্থাটির অর্থনৈতিক কাজকর্ম, নিয়োগ, কল্যাণ ও কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ সম্পর্কিত ব্যাপারে শ্রমিকদের অংশগ্রহণের সীমা বিস্তৃত করার সুপারিশ করেছে।

ট্রেড ইউনিয়নগুলির উৎসাহের অভাবের ফলে পরিচালনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণ বিষয়টি সার্থকতা লাভ করছে না। বস্তুত প্রধানত রাজনৈতিক কারণে শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে বুঝাপড়ার মনোভাবের তুলনায় শ্রেণী-শত্রু

ভাবটাই অধিক প্রকাশমান। উভয়ের লক্ষ্যের মিল যে কোথায় তা উভয়ের কেহই বুঝে উঠতে পারে না। আধুনিক পরিচালনায় অংশগ্রহণ করার মত শিক্ষাগত যোগ্যতাও শ্রমিকদের মধ্যে অভাব। সেজন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার প্রয়োজন। ষষ্ঠ পরিকল্পনার মতে ট্রেড ইউনিয়ন, মালিক ও সরকারের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত ত্রিপাক্ষিক পরামর্শ পদ্ধতি শক্তিশালী করে তোলা প্রয়োজন যাতে তাঁরা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শ্রমিক নীতি ও কর্মসূচী রচনা করতে ও তা বাস্তবে রূপ দিতে সমর্থ হয়।

রপ্তানি মূল্য বৃদ্ধির পরিমাণ

বছর	বেসরকারী খাতে মোট রপ্তানি (পুনঃরপ্তানি সহ) (কোটি টাকা)
1938-39	169·19
1945-46	265·53
1946-47	319·28
1948-49	422·22

কিন্তু রপ্তানি বাণিজ্যের প্রকৃত পরিমাণ 1938-39 সনের তুলনায় 1948-49 সনে 60 শতাংশ হ্রাস পায়।

(2) 1938-39 সনের তুলনায় কাঁচামাল ও তৈরী মাল রপ্তানির পরিবর্তিত গুরুত্ব নিম্নে দেখান হল।

মোট রপ্তানির শতাংশ

বিষয়	1938-39	1946-47	1947-48	1948-49
খাদ্য	23·3	18·6	19·1	20·9
কাঁচামাল	45·1	33·3	31·3	23·5
তৈরীমাল	30·0	46·7	48·8	55·0

(3) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ভারতের মোট রপ্তানির, পুনঃরপ্তানি সহ, 53·6 শতাংশ কমনওয়েলথ দেশগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। যুক্তরাজ্যের অংশ ছিল 34·3 শতাংশ, জাপানের 8·8 শতাংশ, যুক্তরাষ্ট্রের 8·4 শতাংশ।

4) রপ্তানির পাশাপাশি আমদানিও বৃদ্ধি পায়।

আমদানি (কোটি টাকা)

বছর	1938-39	1945-46	1946-47	1947-48	1948-49
মূল্য	152·34	244·45	244·43	389·62	518·00

আমদানির সূচক

(ভিত্তি 1927-28 = 100)

বছর	
1946-47	64·1
1947-48	77·0
1948-49	84·8

(5) অধিকতর পরিমাণ কাঁচামাল ও খাদ্যশস্য এবং অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণ তৈরী মাল আমদানি যুদ্ধোত্তর আমদানি বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য।

আমদানির উপকরণগত পরিবর্তন (শতকরা)

	1938-39	1946-47	1947-48	1948-49
খাদ্য	15·8	13·4	11·8	20·8
কাঁচামাল	21·8	26·0	23·1	23·3
তৈরী মাল	60·9	58·1	63·4	54·8

খাদ্যশস্য ও কাঁচামাল আমদানি বৃদ্ধির মূলে রয়েছে ভারত বিভাগ ও আশানুরূপ উৎপাদনের অভাব। অবশ্য শিল্প প্রসারও এর অন্যতম কারণ।

(6) যুদ্ধের পূর্বে ভারতে সাধারণত আমদানি অপেক্ষা রপ্তানি বেশি হত। যুদ্ধশেষে বিপরীত অবস্থা দেখা দেয়। নিম্নে সরকারী ও বেসরকারী খাতে পণ্যদ্রব্যের আমদানি-রপ্তানির বাণিজ্যের ফলাফল দেখানো গেল।

ব্যালেন্স অব ট্রেড (কোটি টাকা)

	1938-39	1945-46	1946-47	1947-48	1948-49
আমদানি	155·55	292·15	330·20	445·88	542·92
রপ্তানি	169·83	266·39	320·34	408·24	423·31
ব্যালেন্স	+14·28	−25·76	−9·86	−37·64	−119·61

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, 1945-46 সন থেকে 1948-49 সন পর্যন্ত দৃশ্যমান বহির্বাণিজ্যে ঘাটতি হয়। আমদানি বৃদ্ধির কারণ যুদ্ধকালীন সঞ্চিত চাহিদা, মুদ্রাস্ফীতি ও অপেক্ষাকৃত উচ্চ মূল্যস্তর, খাদ্যশস্য আমদানি বৃদ্ধি, ভারত বিভাগজনিত অর্থনৈতিক সমস্যা ও উন্নয়নের অভাব।

(7) মুদ্রামূল্য হ্রাস ও বহির্বাণিজ্য।

1949 সনের 19 সেপ্টেম্বর ভারত সরকার টাকার মূল্য হ্রাস করে। ফলে বহির্বাণিজ্যের আঙ্গিক পরিবর্তন সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ (কোটি টাকা)

বছর	পরিমাণ
1948-49	966·23
1949-50	1045·71
1950-51	1552·34

উপকরণগত পরিবর্তন (মোট রপ্তানির শতাংশ)

	1948-49	1949-50	1950-51
খাদ্য, পানীয় ও তামাক	20·9	24·5	22·0
কাঁচামাল ও কৃষিজাত দ্রব্য	23·5	22·0	21·5
সম্পূর্ণ বা প্রধানত তৈরী দ্রব্য	55·0	52·8	56·0

পূর্ববর্তী তিন বছরের তুলনায় 1950-51 সনে আমদানি 4·3 শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এর কারণ প্রধানত মূল্য বৃদ্ধি এবং খাদ্যদ্রব্য, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, ঔষধপত্র ও অন্যান্য অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির আমদানি। তৎকালীন ভারতের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে প্রথম তিনটি দেশ যথাক্রমে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান।

বহির্বাণিজ্যের ফলাফল পরপৃষ্ঠায় দেখানো গেল।

ব্যালেন্স অব ট্রেড

সরকারী ও বেসরকারী (কোটি টাকা)

	1948-49	1949-50	1950-51
আমদানি	542·92	560·07	565·46
রপ্তানি	423·31	483·62	586·88
ব্যালেন্স	−119·61	− 76·44	+21·42

মুদ্রামূল্য হ্রাসের পর (1950-51) বহির্বাণিজ্যের ঘাটতি দূর হয়।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালীন বহির্বাণিজ্যের গতি ও প্রকৃতি

1951-60 সন পর্যন্ত আমদানির মূল্য গড়ে 600 কোটি টাকার কিছু বেশি ছিল। 1961-66 সনে এ অবস্থার প্রথম পরিবর্তন সূচিত হয়। 1966 সনের 31 মার্চ রপ্তানির পরিমাণ প্রায় 806 কোটি টাকা হয়। 1966-67 সনে রপ্তানির পরিমাণ ছিল 1093·78 কোটি টাকা। সে বছর টাকার মূল্য হ্রাস করা হয়। তার পর থেকে রপ্তানি বৃদ্ধি পেতে থাকে। 1980-81 সনে এর পরিমাণ দাঁড়ায় 6701·71 কোটি টাকা ও 1981-82 সনে 7781 কোটি টাকা।

রপ্তানি যে কেবল বৃদ্ধি পেতে থাকে তা নয়, বিভিন্ন নতুন নতুন দ্রব্যও রপ্তানি তালিকাভুক্ত হতে থাকে। যেমন, মূলধন ও অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদি, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্যাদি, পোষাক-পরিচ্ছদ, রেশম, পশম ও রেওন বস্ত্র, মণিমুক্তা, হস্তজাত শিল্প দ্রব্যাদি, প্রোসেসড খাদ্যদ্রব্য ও সামুদ্রিক দ্রব্যাদি প্রভৃতি।

রপ্তানি বাণিজ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প এক নতুন গতির সঞ্চার করেছে। 1970-71 সনে ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদির রপ্তানির মূল্য ছিল 130 কোটি টাকা, 1980-81 সনে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় 900 কোটি টাকা। তাছাড়া চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্যাদির (জুতাসহ) রপ্তানি বৃদ্ধির পরিমাণ 84 কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 377 কোটি টাকা হয়। মণিমুক্তা ও দামী পাথরের রপ্তানি বৃদ্ধির মূল্যের পরিমাণ 42 কোটি টাকা থেকে 602 কোটি টাকা, তুলাজাত পরিচ্ছদের রপ্তানি বৃদ্ধির মূল্যের পরিমাণ 9 কোটি টাকা থেকে 378 কোটি টাকা ও মৎস্য রপ্তানি বৃদ্ধির মূল্যের পরিমাণ 30 কোটি টাকা থেকে 217 কোটি টাকা। এ সময়কালীন পাট দ্রব্য, তুলাবস্ত্র, চা, কফি, তামাক

ভারতের বহির্বাণিজ্য (কোটি টাকা)

বছর (এপ্রিল-মার্চ) (1)	আমদানি (2)	পণ্যদ্রব্য রপ্তানি (পুনঃরপ্তানি সহ) (3)	ব্যালেন্স অব ট্রেড (4)
1970-71	1634	1535	— 99
1975-76	5265	4043	—1222
1976-77	5074	5142	+ 68
1978-79	6814	5726	—1088
1979-80	8908	6459	—2449
1980-81	12524	6711	—5813
1981-82	13671	7803	—5868
1982-83	14360	8834	—5526
1983-84	15588	9727	—5861

সূত্র : ইণ্ডিয়া 1982 ও আর বি আই।

দেখা যাচ্ছে, 1970-71 সনে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে ঘাটতির পরিমাণ ছিল 99 কোটি টাকা। দশ বছরের মধ্যে (1980-81) ঘাটতির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় 5813 কোটি টাকা। 1981-82 সনে ঘাটতির পরিমাণে বিশেষ তারতম্য ঘটে না। সে বছর ঘাটতির পরিমাণ 5779 কোটি টাকা। 1983-84 সনে ঘাটতির পরিমাণ 5861 কোটি টাকা।

(2) আমদানি ও রপ্তানি উভয়ের পরিমাণই দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। অবশ্য আমদানির বৃদ্ধির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশি। 1970-71 সনে রপ্তানির পরিমাণ 1535 কোটি টাকা, আমদানির পরিমাণ 1634 কোটি টাকা। 1979-80 সন থেকে আমদানির পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। 1983-84 সনে এর পরিমাণ দাঁড়ায় 15588 কোটি টাকা। রপ্তানি বৃদ্ধির পরিমাণ সে তুলনায় স্থিতিপূর্ণ বলা যায়। 1979-80 সনে 6459 কোটি টাকা ও 1983-84 সনে 9727 কোটি টাকা।

(3) রপ্তানি ও আমদানি ক্ষেত্রে উপকরণগত পরিবর্তন লক্ষণীয়।

1965-66 সন পর্যন্ত মোট রপ্তানির 45-50 শতাংশ প্রধানত চা, পাটজাত ও তুলাজাত দ্রব্য-সামগ্রীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। 1965-66 সনের পর থেকে রপ্তানির উপকরণগত পরিবর্তন হতে থাকে। ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদি মোট রপ্তানির 10-12 শতাংশ অধিকার করে। চামড়াজাত দ্রব্য, তুলাজাত পরিচ্ছদ, মণিমুক্তা, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, উলের কার্পেট, লৌহ ও ইস্পাত প্রভৃতি রপ্তানি তালিকায় বর্ধিত পরিমাণে স্থান পেতে থাকে।

আমদানি ক্ষেত্রে কাঁচামাল ও মূলধন দ্রব্যের আমদানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিয়ন্ত্রণের দরুন ভোগ্যদ্রব্যের আমদানি হ্রাস পাচ্ছে।

রপ্তানির গড় সূচক সংখ্যা
(1968-69 = 100)

	1970-71		1979-80	
	রপ্তানি	আমদানি	রপ্তানি	আমদানি
1. খাদ্য	101	95	201	366
2. পানীয় ও তামাক	104	97	218	200
3. অপরিশোধিত পদার্থ ভক্ষণীয় নয়, জ্বালানি বাদে	104	95	217	225
4. খনিজ জ্বালানি ও লুব্রিক্যান্টস	104	80	787	728
5. পশুজ ও উদ্ভিজ্জ তৈল ও স্নেহজাতীয় পদার্থ	132	128	488	252
6. রাসায়নিক	92	110	196	265
7. ম্যানুফ্যাকচারড দ্রব্য	111	117	283	260
8. বিবিধ ম্যানুফ্যাকচারড দ্রব্য	108	117	240	508
9. যন্ত্রপাতি ও পরিবহন সরঞ্জাম	104	94	217	320

সূত্র: রিপোর্ট অন কারেন্সি এণ্ড ফিনান্স, আর-বি-আই, 1983-84।

ম্যানুফ্যাকচারড দ্রব্যাদি এবং যন্ত্রপাতি ও পরিবহন সংক্রান্ত সরঞ্জামের আমদানি বৃদ্ধি দেশে শিল্পের অগ্রগতির পরিচয়। খাদ্যের আমদানি হ্রাস পাচ্ছে। অর্থাৎ, দেশ খাদ্যে স্বয়ম্ভর হয়ে উঠছে। 1970-71 সনে ম্যানু-

ফ্যাকচারড দ্রব্যাদি এবং যন্ত্রপাতি ও পরিবহন সরঞ্জামের মোট আমদানির মূল্য ছিল 740 কোটি টাকা। 1977-78 ও 1978-79 সনে এর পরিমাণ (অনুমিত) যথাক্রমে 2083 কোটি টাকা 32712 কোটি টাকা। খাদ্য ও প্রধানত খাদ্যের জন্য ব্যবহৃত জীবন্ত পশুর আমদানির পরিমাণ 1970-71 সনে ছিল 272 কোটি টাকা, 1977-78 ও 1978-79 সনে যথাক্রমে 232 কোটি টাকা ও 246 কোটি টাকা (অনুমিত)।

(4) ভারতের বহির্বাণিজ্য প্রায় সব দেশের সঙ্গেই যুক্ত। এদের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানী, ইরান, ইটালি, জাপান, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র প্রধান। 1984 সনে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ভারতের বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ অনুমিত 3840 কোটি টাকা। 1985 সনে এর পরিমাণ 4620 কোটি টাকা করা হবে বলে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন উভয়ই সম্মত হয়েছে। অর্থাৎ, এক বছরে বৃদ্ধির পরিমাণ ঘটবে 20%।

(5) ভারতের ব্যালেন্স অব পেমেণ্টসের সামগ্রিক রূপ সাধারণত ঘাটতিমূলক হলেও কারেণ্ট একাউণ্টে উদ্বৃত্ত দেখা যায়।

(6) পৃথিবীর রপ্তানি বাণিজ্য ক্ষেত্রে ভারতের অংশ হ্রাস পাচ্ছে।

পৃথিবীর রপ্তানি বাণিজ্য (শতাংশ)

দেশ	1952	1965	1975	1981
জাপান	1·72	5·02	6·93	8·22
দক্ষিণ কোরিয়া	0·03	0·10	0·63	1·15
হংকং	0·67	0·67	0·74	1·18
ভারত	1·65	1·00	0·54	0·40

1952 সনে পৃথিবীর রপ্তানি বাণিজ্যে ভারতের অংশ ছিল 1·65 শতাংশ; 1981 সনে তা হ্রাস পেয়ে হয় 0·40 শতাংশ।

সাম্প্রতিক গতি

1979-80 সনে ভারতের বহির্বাণিজ্যের পণ্যদ্রব্য খাতে দারুণ অবনতি দেখা যায়। পূর্ববর্তী দু'বছরেও অবনতি দেখা গিয়েছিল। 1977-78 সনে

ঘাটতির পরিমাণ ছিল 621 কোটি টাকা। 1978-79 সনে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় 1088 কোটি টাকা। 1979-80 সনে তা আরো বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় 2262 কোটি টাকা। 1979-80 সনের বিপুল পরিমাণ ঘাটতির কারণ টাকার অঙ্কে আমদানির পরিমাণ রপ্তানি অপেক্ষা প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পায়। এর কারণ আন্তর্জাতিক বাজারে পেট্রোলিয়ম ও পেট্রোলিয়মজাত দ্রব্যাদির দাম প্রচণ্ড বৃদ্ধি। দাম বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও এসব দ্রব্য অধিকতর পরিমাণে আমদানি করতে হয়। 1979-80 সন থেকে 1980-81 সনের মধ্যে পেট্রোলিয়ম, অয়েল ও লুব্রিক্যাণ্টস (পি-ও-এল) আমদানির অংশ মোট আমদানির 36 শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 42 শতাংশ হয়। 1979-80 সনে মোট আমদানির পরিমাণ 9022 কোটি টাকা। 1980-81 সনে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় 12524 কোটি টাকা। 1979-80 সনে আমদানি 32 শতাংশ বৃদ্ধি পায়। 1980-81 সনে এ বৃদ্ধির পরিমাণ 39 শতাংশ। 1981-82 সনে আমদানি বৃদ্ধির হার হ্রাস পায়। 1980-81 সনে যেসব দ্রব্যের আমদানি বৃদ্ধি পায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য মূলধন দ্রব্য, সার, অ-লৌহ ধাতু, আহার্য তেল ও রাসায়নিক দ্রব্য।

1979-80 সনে মোট রপ্তানির (পুনঃরপ্তানি সহ) পরিমাণ 6425 কোটি টাকা। 1978-79 সনের তুলনায় এ বৃদ্ধির পরিমাণ 699 কোটি টাকা বা 12·2 শতাংশ। 1978-79 সনে এর পরিমাণ ছিল 5726 কোটি টাকা; বৃদ্ধির পরিমাণ 322 কোটি টাকা বা 6 শতাংশ ও 1977-78 সনে যথাক্রমে 5404 কোটি টাকা ও 258 কোটি টাকা বা 5 শতাংশ।

1979-80 সনে রপ্তানি বৃদ্ধির পরিমাণ আশানুরূপ না হওয়ার কারণ বেশ কয়েক বছর ধরেই আন্তর্জাতিক বাজারে উৎপাদনে মন্দা, মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি, কর্মসংস্থানের অভাব, আমদানি রপ্তানির উপর বিবিধ বিধিনিষেধের প্রয়োগের প্রভাব চলছিল। তাছাড়া দেশেও রপ্তানি দ্রব্যের উৎপাদন হ্রাস, উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাব ও মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব সক্রিয় ছিল।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 1978 সনে পৃথিবীর মোট রপ্তানির মূল্য 16·2 শতাংশ বৃদ্ধি পায়; 1979 সনে এ বৃদ্ধির পরিমাণ 25·7 শতাংশ। কিন্তু ভারতের রপ্তানি মূল্য বৃদ্ধির পরিমাণ যথাক্রমে 10·6 শতাংশ ও 14·0 শতাংশ। অন্য কথায়, পৃথিবীর মোট রপ্তানিতে ভারতের অংশ বছরের পর

বছর হ্রাস পেয়েছে। 1976 সনে এর অবনতির পরিমাণ 0·62 শতাংশ, 1978 সনে 0·58 শতাংশ ও 1979 সনে 0·52 শতাংশ।

ভারতের বাণিজ্য-শর্তের অবনতিও উল্লেখ্য। 1975-76 সনে নীট বাণিজ্য-শর্ত 70 নেমে আসে। 1977-78 সনে তা বৃদ্ধি পেয়ে 95 হয়। কিন্তু 1977-78 সনে তা আবার হ্রাস পেয়ে 90 হয়।

আমদানি (কোটি টাকা)

দ্রব্য	1978-79	1979-80	1980-81 (অনুমিত)
ভোগ্য দ্রব্য	86·9	105·8	100·4
কাঁচামাল ও তৈরী			
মধ্য দ্রব্য : প্রধানত			
(i) পেট্রোলিয়াম			
তৈল ও লুব্রিক্যান্টস	1686·9	3332·8	5293·0
(ii) সার ও রাসায়নিক দ্রব্য	876·8	1208·8	1403·7
মূলধন দ্রব্য	1306·0	1458·4	1910·2

সূত্র : ইণ্ডিয়া 1982।

1981 সনে পৃথিবীর রপ্তানির মূল্য 2 শতাংশ হ্রাস পায়। 1982 ও 1983 সনে 7·2 ও 2·4 শতাংশ হ্রাস পায়। 1982-83 সনে ভারতের রপ্তানির পরিমাণ 8834 কোটি টাকা। পৃথিবীর রপ্তানিতে ভারতের অংশ 1980, 1981 ও 1983 সনে যথাক্রমে 0·4, 0·5 ও 0·6 শতাংশ।

ব্যালেন্স অব ট্রেডের অবনতির কারণ

ব্যালেন্স অব ট্রেডের ক্রমাগত ঘাটতির কারণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে ক্রমাগত আমদানি বৃদ্ধি। অপরদিকে, দেশীয় বাজারের ক্রমবর্ধমান চাহিদার জন্য রপ্তানি বৃদ্ধির হার অপেক্ষাকৃত হ্রাস পায়। 26 বছর ক্রমাগত ঘাটতির পর 1972-73 সনে রপ্তানি বৃদ্ধির ফলে ব্যালেন্স অব পেমেণ্টস-এ উদ্বৃত্ত দেখা দেয়। 1976-77 সনে উদ্বৃত্তের পরিমাণ 68·46 কোটি টাকা। উদ্বৃত্তের কারণ রপ্তানি বৃদ্ধি ও আমদানির পরিমাণ কিছুটা হ্রাস। পরবর্তী বছর

থেকে আবার ঘাটতি সুরু হয় ও তার পরিমাণ ক্রমেই বিপুল আকার ধারণ করতে থাকে। 1980-81 সনে রপ্তানি বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়ার কারণ খরা, উৎপাদনশীলতা হ্রাস, রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ভিত-কাঠামোর অভাব ও অভ্যন্তরীণ মুদ্রাস্ফীতি। দেশীয় বাজারের অতি প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটাবার জন্য বর্ধিত দামে ও অধিক পরিমাণে আমদানি করতে হয়। ফলে ঘাটতির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া পৃথিবীব্যাপী মন্দা, বৈদেশিক বিনিময়ে স্থিতির অভাব ও উন্নত দেশগুলির সংরক্ষণ নীতি ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধির অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। সরকার কর্তৃক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে 1981-82 সনে ঘাটতির পরিমাণ কিছুটা হ্রাস পেয়ে 5779 কোটি টাকা হয়। 1980-81 সনের তুলনায় তা প্রায় 34 কোটি টাকা কম। পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় 1980-81 সনে রপ্তানি বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল 4 শতাংশ। যেখানে 1981-82 সনে এ বৃদ্ধির পরিমাণ 16 শতাংশ। এ অবস্থা নিঃসন্দেহে সাফল্যের পরিচায়ক। অপরদিকে 1980-81 সনের তুলনায় 1981-82 সনে আমদানি বৃদ্ধির পরিমাণ 8·3 শতাংশ। 1979-80 ও 1980-81 পর পর দু'বছর আমদানি বৃদ্ধির পরিমাণ যথাক্রমে 32·4 শতাংশ ও 38·8 শতাংশ।

ওয়াল্ড ব্যাঙ্কের মন্তব্য

ওয়াল্ড ব্যাঙ্কের এক রিপোর্টে প্রকাশ, 1982-83 সনের তুলনায় 1984-85 সনে ভারতের রপ্তানি বৃদ্ধির পরিমাণ অকিঞ্চিৎকর। 1982-83 সনে রপ্তানির পরিমাণ ছিল 11,109 মিলিয়ন ডলার, 1984-85 সনে এর পরিমাণ 11,467 মিলিয়ন ডলার। এ সময়কালীন আমদানি বৃদ্ধির পরিমাণ 16,174 মিলিয়ন ডলার থেকে 16,365 মিলিয়ন ডলার। আমদানি নিয়ন্ত্রণাধীন থাকার ফলে আমদানির পরিমাণ সামান্যমাত্র বৃদ্ধি পেয়েছে।

ষষ্ঠ পরিকল্পনার প্রথম চার বছর ভারতের ঋণ গ্রহণের পরিমাণ 16·5 বিলিয়ন ডলার। এর মধ্যে প্রায় 5 বিলিয়ন ডলার পূর্ববর্তী ঋণের সুদ বাবদ দিয়ে দিতে হয়। ওয়াল্ড ব্যাঙ্কের মতে ভারতকে যদি তার জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার 5 শতাংশ রাখতে হয় তবে তাকে 1989-90 সনের মধ্যে আমদানির পরিমাণ বর্তমান স্তরের দ্বিগুণ করতে হবে।

ওয়াল্ড ব্যাঙ্কের রিপোর্টে আরো প্রকাশ যে, রপ্তানি ও বিদেশ থেকে অনাবাসিক ভারতীয়দের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ দ্বিগুণ হলেও ভারতকে তার

ব্যালেন্স অব পেমেণ্টস-এর ঘাটতি মিটাবার জন্য 32·8 বিলিয়ন ডলার ঋণ নিতে হবে। এর অর্ধেকের বেশি ঋণ নিতে হবে বাণিজ্যিক শর্তে, অর্থাৎ, উচ্চ সুদে ও কঠিন শর্তে।

প্রসঙ্গক্রমে ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক উল্লেখ করেছে, গত পাঁচ বছরে অনাবাসিক ভারতীয়দের বিদেশীয় একাউণ্টে আমানতের পরিমাণ 3 বিলিয়ন ডলার। কিন্তু এ আমানত নির্ভরযোগ্য নয়। কারণ স্বল্প নোটিশে আমানতকারী তা তুলে নিতে পারে। আই-এম-এফ-এর ঋণ ও অনাবাসিক ভারতীয়দের আমানত না পাওয়া গেলে এ সময় ভারতের বৈদেশিক কারেন্সির রিজার্ভ শূন্য হয়ে পড়ত। এ পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের রপ্তানির পরিমাণ দ্বিগুণ হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু গত পাঁচ বছরের রপ্তানির চিত্র আদৌ আশাপ্রদ নয়। পণ্যদ্রব্য রপ্তানির পরিমাণ 1979-80 সনে 7,948 মিলিয়ন ডলার ও 1984-85 সনে 8,560 মিলিয়ন ডলার।

1973 ও 1980 সনের মধ্যে টাকার প্রকৃত কার্যকর বিনিময় মূল্য বার্ষিক 3 শতাংশ হ্রাস পায়। এর ফলে, তাছাড়া বিদেশে চাহিদার উন্নতি হওয়ার দরুন এবং ভারত সরকারের রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য নানাপ্রকার প্রেরণা দেয়া ও অভ্যন্তরীণ চাহিদা নিয়ন্ত্রণের কারণে রপ্তানির পরিমাণ 1972-73 সনে 2·5 বিলিয়ন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 1980-81 সনে 8·5 বিলিয়ন হয়। তার পর থেকে রপ্তানির পরিমাণ প্রায় এ স্তরেই স্থিতিশীল রয়েছে।

1980 সনে 1 ডলারের মূল্য ছিল 8 টাকা। এর পর থেকে টাকার মূল্য হ্রাস পেতে থাকে ও 1 ডলারের মূল্য 12 টাকায় এসে দাঁড়ায়। তা সত্ত্বেও বহির্বাণিজ্যে উন্নতি ঘটেনি।

ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের মতে শিল্প উৎপাদনের বার্ষিক বৃদ্ধির হার 7 শতাংশ রাখতে হলে আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। এজন্য বার্ষিক কমপক্ষে 9 শতাংশ হারে রপ্তানি বৃদ্ধি করতে হবে। আমদানি হ্রাস করতে হলে নিয়ন্ত্রণের আশ্রয় নিতে হবে। স্বভাবতই ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক তার বিপরীত মত পোষণ করে। ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের মতে ভারতের পক্ষে আগামী পাঁচ বছর রপ্তানিভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তোলা সঙ্গত। তা যদি করা হয় তবে ভারতের অর্থনীতির প্রতিক্ষেত্রে অভাবনীয় পরিবর্তন দেখা দেবে ; দ্রুত অর্থনীতিক বৃদ্ধি সম্ভব হবে।

বহির্বাণিজ্যের দিক

ইউরোপিয়ান কমন মার্কেটভুক্ত (ই-সি-এম) দেশগুলি সমষ্টিগতভাবে ভারতের বৃহত্তম বাজার। 1977-78 সনে ভারতের মোট রপ্তানিতে ই-সি-এমের অংশ ছিল 25·7 শতাংশ। 1978-79 সনে এ অংশের পরিমাণ 27·4 শতাংশ। 1979-80 সনের তুলনায় 1980-81 সনে ই-সি-এমের রপ্তানির পরিমাণ 18·4 শতাংশ হ্রাস পায় (1735 কোটি টাকা থেকে 1415 কোটি টাকা)। 1978-79 সনে ই-সি-এম থেকে আমদানির পরিমাণ 563 কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়, যা সে বছর মোট আমদানি বৃদ্ধির প্রায় তিন-চতুর্থাংশ।

ভারতের বহির্বাণিজ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকারী ই-এস-সি-এ-পি। 1977-78 সনে এদের আমদানির পরিমাণ ছিল 1456 কোটি টাকা বা ভারতের মোট আমদানির 24·2 শতাংশ ও রপ্তানির পরিমাণ 12·65 কোটি টাকা বা দেশের মোট রপ্তানির 23·4 শতাংশ। 1978-79 সনে আমদানি ক্ষেত্রে এদের পরিমাণ 1479 কোটি টাকা বা 21·8 শতাংশ ও রপ্তানি ক্ষেত্রে 1481 কোটি টাকা বা 25·9 শতাংশ। ই-এস-সি-এ-পির ক্ষেত্রে 1980-81 সনে 1979-80 সনের তুলনায় রপ্তানি 4·8 শতাংশ হ্রাস পায় (1659 কোটি টাকা থেকে 1580 কোটি টাকা)।

সম্প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতের অন্যতম বৃহৎ বাজার হয়ে উঠেছে। 1980-81 সনে এ দেশ ভারতীয় দ্রব্যের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ক্রেতা রূপে দেখা দেয়। 1979-80 সনে সোভিয়েত ইউনিয়নে ভারতের রপ্তানির পরিমাণ ছিল 638·17 কোটি টাকা, 1980-81 সনে 1226·29 কোটি টাকা। অর্থাৎ, এক বছরে সে দেশে ভারতের আমদানির পরিমাণ 92 শতাংশেরও অধিক বৃদ্ধি পায়। ভারতের মোট আমদানিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশ 1979-80 সনে ছিল 9·8 শতাংশ, 1980-81 সনে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় 18·2 শতাংশ। 1980-81 সনে ভারতে রপ্তানিকারক দেশগুলির মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারী দেশ যথাক্রমে যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইরান। অন্যান্য প্রথম সারির রপ্তানিকারক দেশগুলির মধ্যে রয়েছে যুক্তরাজ্য, পশ্চিম জার্মানী, জাপান, সৌদি আরবিয়া, কুয়াট ও ইউ-এ-ই। বর্তমানে (1984) ভারতের বহির্বাণিজ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের স্থান প্রথম।

1980-81 সনে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি ও আফ্রিকাতে ভারতের রপ্তানি বৃদ্ধি এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। 1979-80 সনের তুলনায় 1980-81 সনে আফ্রিকাতে রপ্তানি বৃদ্ধির পরিমাণ 23 শতাংশেরও অধিক। অন্যদিকে এ সময়কালীন পশ্চিম ইউরোপ ও এশিয়াতে রপ্তানি হ্রাসের পরিমাণ যথাক্রমে 16 শতাংশ ও 4·7 শতাংশের বেশি। যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি বৃদ্ধির পরিমাণ সামান্য মাত্র।

আমদানি ক্ষেত্রে দেখা যায় সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে 1977-78 ও 1978-79 সনে আমদানির পরিমাণ মোটামুটি 650 কোটি টাকা থেকে 660 কোটি টাকাতে আবদ্ধ ছিল। উত্তর আমেরিকা (যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা) থেকে 1977-78 ও 1978-79 সনে আমদানির পরিমাণ যথাক্রমে 937 কোটি টাকা ও 999 কোটি টাকা বা মোট আমদানির যথাক্রমে 15·6 শতাংশ ও 14·7 শতাংশ। অপরদিকে, রপ্তানির পরিমাণ 1977-78 ও 1978-79 সনে যথাক্রমে 720 কোটি টাকা ও 817 কোটি টাকা বা মোট রপ্তানির যথাক্রমে 13·3 শতাংশ ও 14·3 শতাংশ। সম্প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতের বহির্বাণিজ্যের প্রধানতম অংশীদার রূপে দেখা দিয়েছে। ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে আমদানি-রপ্তানির মোট পরিমাণ প্রায় 3000 কোটি টাকা। সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ভারত যা আমদানি করে তার প্রায় 85 শতাংশ পেট্রোলিয়াম ও অপরিশোধিত তেল।

ভারতের রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্যে ই-এফ-টি-এ দেশগুলির অংশ মোটামুটি 2 থেকে 3 শতাংশের মধ্যে আবদ্ধ ছিল।

ভারতে প্রধান আমদানি ও রপ্তানিকারক দেশ

	আমদানিকারক দেশ (লক্ষ টাকা)		রপ্তানিকারক দেশ (লক্ষ টাকা)	
দেশ	1979-80	1980-81	1979-80	1980-81
ইউ-এস-এস-আর	63817	122629	82232	101371
ইউ-এস-এ	80674	74333	100879	151861
জাপান	64345	59781	62016	74878
ইরান	—	—	62749	133890

সূত্র : ইণ্ডিয়া 1982।

বহির্বাণিজ্য নীতি, 1979-80

1979 সনের মেতে বহির্বাণিজ্য সম্পর্কে নতুন নীতি ঘোষণা করা হয়। 1978 সনের এপ্রিলে যে নীতি ঘোষণা করা হয় তার মৌল কাঠামো অক্ষুণ্ণ রাখা হয়। রপ্তানি বৃদ্ধি ও উৎপাদনের ভিত শক্তিশালী করে তোলার জন্য কতিপয় ক্ষেত্রে আমদানির উপর নিয়ন্ত্রণ বিধি শিথিল করা হয়। অবশ্য লক্ষ্য রাখা হয় যাতে দেশীয় শিল্পের ক্ষতি সাধন না হয়।

রপ্তানি নীতি, 1979-80

1979-80 সনের রপ্তানি নীতির বৈশিষ্ট্যের মধ্যে দেখা যায়ঃ

(i) দ্রুত ও ক্রমাগত রপ্তানি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা।

(ii) কতিপয় অতি প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্যের রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ যাতে অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি এ সমস্ত পণ্যদ্রব্যের অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

(iii) অনেক পণ্যদ্রব্য ওপেন জেনারেল লাইসেন্সের (ও-জি-এল) অধীনে নিয়ে আসা হয়।

(iv) অভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদার অভাব মিটাবার জন্য 1979 সনের জুলাইতে ন্যাপথা, বিটিউমেন ও এস্‌ফাল্ট রপ্তানি নিষিদ্ধ করা হয়। 1980 সনের জানুয়ারীতে অশোধিত লৌহ ও ফেব্রুয়ারীতে মেষ ও ছাগলের মাংস ও তাদের নাড়িভুঁড়ি রপ্তানি নিষিদ্ধ করা হয়।

(v) রপ্তানি শুল্ক নমনীয় করা হয় যাতে ভারতীয় পণ্যদ্রব্য আন্তর্জাতিক বাজারে সাফল্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে সমর্থ হয়।

(vi) বহুপ্রকার রপ্তানি বৃদ্ধি স্কীম গ্রহণ করা হয়। যথা, নগদ ক্ষতি-পূরণ দেয়ার ব্যবস্থা, ড্রব্যাক ক্রেডিট, শুল্ক ছাড়, রপ্তানির জন্য প্রদত্ত ক্রেডিটের উপর কম হারে স্থদ ও রেজিষ্ট্রার্ড রপ্তানিকারক ও রপ্তানি গৃহগুলির আমদানি লাইসেন্সের স্থবিধা অক্ষুণ্ণ রাখা।

(vii) মূল্য সংযোজিত (ভ্যালু এডেড) তৈরী চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য রপ্তানিতে বিশেষ উৎসাহ দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। রপ্তানি ব্যাপারে সামাজিক ব্যয়ভার হ্রাস করা ও সেসব দ্রব্য রপ্তানিতে উৎসাহ দেয়া যেসব দ্রব্যের প্রসার সাধন ও দীর্ঘকাল পর্যন্ত স্থায়িত্বের সম্ভাবনা আছে।

আমদানি নীতি, 1979-80

1979-80 সনের আমদানি নীতির বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি এইরূপ।

(i) বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের উপর থেকে আমদানি নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা নীতি অব্যাহত রাখা হয়। 1978-79 সনে 534 পণ্যদ্রব্য ওপেন জেনারেল লাইসেন্সের আওতায় ছিল। 1979-80 সনে 702 পণ্যদ্রব্যকে এর আওতায় আনা হয়। এ অতিরিক্ত সংখ্যার প্রায় 80 শতাংশ মূলধন দ্রব্য। 1978-79 সনে 252 মূলধন দ্রব্য ওপেন জেনারেল লাইসেন্সের আওতায় ছিল। 1979-80 সনে এদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে 385 করা হয়।

(ii) ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থাগুলিকে উন্নয়নমূলক কাজে উৎসাহিত করা হয়। এসব শিল্প সংস্থা যাতে রপ্তানি ব্যবসায় নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে ও তাদের উৎপাদনের অন্তত কিছু অংশ রপ্তানি করতে উৎসাহ বোধ করে সেজন্য স্বয়ংক্রিয়'লাইসেন্স নীতিকে বিন্যস্ত করা হয়।

(iii) প্রকৃত ব্যবহারকারীদের শিল্প সম্পর্কিত কতিপয় উপকরণ আমদানি করার অধিকার দেয়া হয়। অবশ্য এসব উপকরণ রপ্তানি দ্রব্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করতে হবে। যেসব প্রকৃত ব্যবহারকারী তাদের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি দেশীয় উৎপাদকদের কাছ থেকে ক্রয় করে থাকে তাদের ক্ষেত্রে অবশিষ্ট 10 শতাংশ কোনপ্রকার পূর্বশর্ত ছাড়াই আমদানি করার অধিকার দেয়া হয়। তবে এর পরিমাণ 1 কোটি টাকার বেশি হতে পারবে না।

(iv) অনুমোদিত অতিরিক্ত লাইসেন্স স্কীম অনুযায়ী রপ্তানি গৃহগুলির উপর এরূপ নির্দেশ ছিল যে তারা 2 লক্ষ টাকার বেশি দামের কোন দ্রব্য আমদানি করতে পারবে না। এ বিধি-নিষেধ পরিবর্তন করে দামের পরিমাণ 5 লক্ষ টাকা করা হয়। অবশ্য সমস্ত আমদানিকৃত দ্রব্যাদি রপ্তানি দ্রব্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করতে হবে।

(v) শুল্ক ছাড় স্কীমের প্রসার সাধন দ্বারা অনেক তৈরী দ্রব্য, কাঁচামাল ও উপকরণ এ স্কীমভুক্ত করা হয়।

(vi) নানাপ্রকার রপ্তানি প্রকল্পকে চিহ্নিত ও শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। যেমন, টরনকি প্রকল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং সেবা, পরামর্শ সেবা ও অসামরিক নির্মাণ চুক্তি। এসব প্রস্তাবিত প্রকল্পের অনুমোদন যাতে দ্রুত পাওয়া যেতে পারে সেজন্য ইনডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেণ্ট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার অন্তর্গত একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ অব ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউসন স্থাপন করা হয়।

(vii) বিদেশ থেকে যেসব ভারতবাসীরা দেশে ফিরে এসেছে তারা যাতে তাদের বিদেশীয় অর্থের সঞ্চয় থেকে দেশে শিল্প গড়ে তুলতে পারে

সেজন্য তাদের বেশকিছু বিশেষ সুবিধা দেয়া হয়। যথা, তাদের ক্ষেত্রে দেশীয় ছাড়পত্র ছাড়া 25 লক্ষ টাকা পর্যন্ত মূলধন দ্রব্য আমদানি করার অনুমতি দেয়া হয়। তাছাড়া তাদের এক বছরের জন্য 5 লক্ষ টাকার মূল্য পর্যন্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ আমদানি করার অধিকার দেয়া হয়।

বহির্বাণিজ্য নীতি, 1980-81

1980-81 সনের বহির্বাণিজ্য নীতিতে মূল কাঠামোর বিশেষ কোন পরিবর্তন করা হয়নি। কারণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন অব্যাহত রাখার জন্য বহির্বাণিজ্য নীতির স্থিতিশীলতা অপরিহার্য বলে স্বীকৃত হয়। 1979-80 সনের নীতিতে যে সমস্ত পরিবর্তন সাধন করা হয় তার উদ্দেশ্য প্রধানত শিল্প ভিতের বিস্তার সাধন যাতে মুদ্রাস্ফীতির প্রকোপ রোধ করা সম্ভব হয় ও ভারতীয় রপ্তানি দ্রব্য প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব বাজারের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলাত পারে।

রপ্তানি নীতি, 1980-81

1980-81 সনের বহির্বাণিজ্যের মূল নীতি, গত তিন বছরে ঘাটতির পরিমাণ বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে দ্রুত ও ক্রমাগত রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য যাবতীয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া। দেশীয় বাজারের চাহিদা বিবেচনা করে কেবল কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য ছাড়া রপ্তানির উপর থেকে বিধিনিষেধ তুলে নেয়া হয়।

আমদানি নীতি, 1980-81

1980-81 সনের আমদানি নীতিতে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে রয়েছে ঃ

(i) আর-ই-পি লাইসেন্স বহির্ভূত নির্বাচিত কয়েকটি দ্রব্যকে আমদানি শুল্ক থেকে মুক্ত করা।

(ii) আর-ই-পি লাইসেন্স বহির্ভূত আমদানির উপর নিয়ন্ত্রণ আরো লাঘব করা। এ উদ্দেশ্যে শপিং তালিভুক্ত নয় এমন দ্রব্য আমদানি করার অনুমতি দান।

(iii) যন্ত্রপাতির অংশবিশেষ ও কতিপয় নির্দিষ্ট শ্রেণীর বস্ত্র শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানির উপর বিধিনিষেধ লাঘব করা।

(iv) ওপেন জেনারেল লাইসেন্স অনুযায়ী ব্যবহারকারীরা যাতে

আমদানি নীতি, 1983-84

1983-84 সনের আমদানি নীতির উদ্দেশ্য রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য অধিকতর উৎসাহ দেয়া, আমদানি হ্রাসের জন্য সম্ভাব্য সমস্ত প্রকার চেষ্টা করা, দেশীয় শিল্পোন্নয়নে সাহায্য করা এবং দেশের শ্রম ও কৃষি সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার। অন্যান্য উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি সাধন, বিশেষত যা রপ্তানি বৃদ্ধির সহায়ক, শক্তি সংরক্ষণ, বহির্বাণিজ্য সম্পর্কিত রীতিনীতি সহজ ও বিন্যস্তকরণ এবং বিভিন্ন স্তরে নিয়ন্ত্রণ নীতির পরিবর্তন সাধন।

আমদানির সুযোগ বৃদ্ধির জন্য 144 নতুন দ্রব্যকে ওপেন জেনারেল লাইসেন্সভুক্ত করা হয়। এর ফলে ইলেকট্রোনিক শিল্প, মৎস ও মাংস, প্রোসেসিং, চশমার ফ্রেম তৈরি, মুক্তা, পোষাক-পরিচ্ছদ ও হোসিয়ারী শিল্প উপকৃত হবে।

দেশীয় শিল্পের স্বার্থরক্ষার জন্য কয়েকটি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। যেমন, ওপেন জেনারেল লাইসেন্স থেকে 38 দ্রব্য সরিয়ে আনা হয়েছে। যথা, এলুমিনিয়াম, টিউব, লোহার ক্ষুদ্রাংশ, এয়ার ও গ্যাস কম্প্রেসারস, এয়ার কনডিসনিং ও রেফ্রিজারেসন কমপ্রেসার্স। তাছাড়া 40 কাঁচামাল সীমিত অনুমোদনযোগ্য বা নিষিদ্ধ তালিকায় দেয়া হয়েছে, 13 মূলধন দ্রব্য ওপেন জেনারেল লাইসেন্স থেকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে এবং প্রধানত মুদ্রণ যন্ত্রপাতি ও পাট শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় 14 মূলধন বিষয়ক দ্রব্য নিষিদ্ধ তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। বস্তুত অধিকাংশ দ্রব্যের ক্ষেত্রেই রপ্তানির উপর কোন নিয়ন্ত্রণ বিধি নেই। ইক্ষু ও খান্দসারী উপর থেকেও নিয়ন্ত্রণ তুলে নেয়া হয়েছে। বাসমতি চাল ছাড়া অন্যপ্রকার চাল রপ্তানি নিষিদ্ধ করা হয়।

যেসব শিল্প একক সম্পূর্ণভাবে রপ্তানি-ভিত্তিক সেসব ক্ষেত্রে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, জেনারেটিং সেট এবং সরাসরি ব্যবহারযোগ্য ও প্যাকিং-এর জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী আমদানি করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। মধ্য দ্রব্য ম্যানুফ্যাকচার করার জন্য শুল্ক ছাড় স্কীমে আরো দ্রব্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। শুল্কমুক্ত স্কীমেরও প্রসার সাধন করা হয়েছে। যেসব রপ্তানিকারক নতুন বাজারে অথবা নতুন দ্রব্য রপ্তানি করতে পারবে তাদের অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণ দ্রব্য আমদানি করার অধিকার দেয়া হয়েছে।

আমদানি হ্রাস করার জন্য কয়েকটি পন্থা গ্রহণ করা হয়েছে। যথা, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম তৈরি করার উপর আরোপিত নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা

হয়েছে যাতে দেশীয় উপকরণের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। কয়েকপ্রকার ইস্পাত আমদানি করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। দেশীয় উৎপাদন এ চাহিদা মিটাতে অসমর্থ হলে এর সুযোগ নেয়া যাবে।

আমদানি-রপ্তানি নীতি (1985-88)

1985 সনের 12 এপ্রিল ভারত সরকার 1985 সনের এপ্রিল থেকে 1988 সনের মার্চ পর্যন্ত অর্থাৎ, একাদিক্রমে তিন বছরের জন্য আমদানি-রপ্তানি নীতি ঘোষণা করেছে। একাদিক্রমে তিন বছরের জন্য আমদানি-রপ্তানি নীতি এর আগে কখনও ঘোষিত হয়নি। প্রতি বছর নতুন করে আমদানি-রপ্তানি নীতি ঘোষিত হয়ে থাকে। তবে লাইসেন্স প্রথা প্রতি বছর পরিবর্তন করার নীতি অপরিবর্তিত রাখা হয়। স্বয়ংক্রিয় লাইসেন্স ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করা হয় ও স্বয়ংক্রিয় অনুমোদিত তালিকাভুক্ত অধিকাংশ পণ্যদ্রব্যকে ওপেন জেনারেল লাইসেন্স (ওজিএল)-এ সরিয়ে আনা হয়। ওজিএল-এ পণ্যদ্রব্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্য আমদানির উপর বাধানিষেধ লাঘব করা। অপর উদ্দেশ্য আমদানি সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ। লাইসেন্স দেয়া পদ্ধতিও সহজ করা হয়েছে।

ওজিএল-এর মূলধন দ্রব্যের তালিকায় 201 শিল্প যন্ত্রপাতি স্থান পেয়েছে। উদ্দেশ্য বিদেশী যন্ত্রপাতির অভাবে যাতে শিল্প আধুনিকীকরণ ও রপ্তানি-ভিত্তিক উৎপাদন ব্যাহত না হয়। এর ফলে অটোমোবাইলস, ইলেকট্রোনিকস, পাট শিল্প, চামড়া শিল্প, প্রভৃতি বিশেষ উপকৃত হবে।

নতুন নীতিক্রমে কয়েকটি শিল্পকে ওজিএল থেকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। যথা, ম্যাগনেটিক রোটামিটারস, রঙীন দূরদর্শন তৈরি করার জন্য টেসটিং জিগস, ফটো কম্পোজিং টাইপ সেটিং যন্ত্রপাতি ও ব্যবস্থা এবং কতিপয় উপযোগী দ্রব্য, যেমন কী বোর্ডস, এডিটিং টার্মিনালস, স্ক্রিম পেপার প্রোসেসারস লাইন প্রিণ্টার্স ও ঘড়ি শিল্পের জন্য গিয়ার হপার।

ক্যানেলাইজেসন নীতি ও আমদানি করার পদ্ধতির পরিবর্তন করা হয়েছে। ক্যানেলাইজেসনের তালিকা থেকে বেশকিছু সংখ্যক পণ্যদ্রব্যকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। 33 ক্ষুদ্র পণ্যদ্রব্যকে এ প্রথার বাইরে নিয়ে আসা হয়েছে।

এ নীতির অপর একটি বৈশিষ্ট্য ম্যানুফ্যাকচারার-রপ্তানিকারকদের জন্য আমদানি-রপ্তানি পাস বই স্কীমের প্রবর্তন যাতে তারা রপ্তানি দ্রব্য উৎপাদন করার জন্য আমদানিকৃত উপকরণের সুবিধা বিনা শুল্কে পেতে পারে। এ স্কীম 1985 সনের পহেলা অক্টোবর থেকে কার্যকর হবে। এর মেয়াদ আমদানি ক্ষেত্রে 18 মাস, রপ্তানি ক্ষেত্রে 27 মাস।

যেসব রপ্তানিকারকদের রপ্তানির পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরে অন্তত এক কোটি টাকা ছিল তাদের নিজস্ব অতিরিক্ত লাইসেন্সের বিরুদ্ধে তাদের সমর্থক ম্যানুফ্যাকচারারদের ব্যবহারের জন্য বণিক গৃহগুলির ক্ষেত্রে 25 লক্ষ টাকা ও রপ্তানি গৃহগুলির ক্ষেত্রে 10 লক্ষ টাকার মূল্য পর্যন্ত টেকনিক্যাল ডিসাইনস, ড্রইংস ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক দ্রব্য আমদানি করার অনুমতি দেয়া হয়।

কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর বক্তব্য, নতুন আমদানি-রপ্তানি নীতির প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ :

(i) আমদানি-রপ্তানি নীতিতে ধারাবাহিকতা ও স্থিতিশীলতা রক্ষা করা।

(ii) উৎপাদন বৃদ্ধি সহজসাধ্য করার জন্য বৈদেশিক উপকরণসমূহ সহজলভ্য করা।

(iii) রপ্তানি-ভিত্তিক উৎপাদনের ভিত শক্তিশালী করা ও রপ্তানি বৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া।

(iv) আমদানির সম্ভাব্য সর্বপ্রকার সঞ্চয় সাধন, দেশজ উৎপাদনকে সমর্থন জ্ঞাপন ও আমদানি পরিবর্ত ক্ষেত্রের উৎকর্ষ সাধন।

(v) প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়ন সাধন ও উৎপাদন আধুনিকীকরণ।

উপসংহার

নতুন আমদানি-রপ্তানি নীতিকে বণিক ও শিল্প সমাজ স্বাগত জানিয়েছে। তারা মনে করে আমদানির উপর থেকে বাধাবিঘ্ন লাঘব করার ফলে উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে। আমদানি-পরিবর্ত প্রচেষ্টায় অধিকতর উৎসাহের সঞ্চার হবে। আমদানি-রপ্তানি পাস বই স্কীম প্রবর্তিত হওয়ার ফলে রপ্তানি-ভিত্তিক উৎপাদকেরা বিদেশী উপকরণের অধিকতর সুযোগ গ্রহণ করতে সমর্থ হবে। বণিক ও শিল্প সমাজ আশা করে অচিরেই বহির্বাণিজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে অবাধ বাণিজ্যের

রূপ নেবে। আমদানি-রপ্তানি নীতির মেয়াদ এককালীন তিন বছর হওয়াতে শিল্প সমাজ মনে করে এর ফলে তাদের পক্ষে আগাম পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

সমাজতন্ত্রের সমর্থকদের মতে, মিশ্র অর্থনীতির আড়ালে ভারতের অর্থ-নীতি পুঁজিতন্ত্রের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। 1985-88 আমদানি-রপ্তানি নীতি এ বাস্তবতার বলিষ্ঠ সূচক।

স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া (এস-টি-সি-আই)

1956 সনে এস-টি-সি-আই ভারতীয় কোম্পানিজ এ্যাক্টে রেজিষ্ট্রীকৃত হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য দেশের রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসার সাধন ও অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমদানি করা। ক্ষুদ্রায়তন সেক্টর যাতে রপ্তানি বাণিজ্য অংশগ্রহণ করতে পারে সেজন্য তাদের নানাভাবে সাহায্য করাও এর উদ্দেশ্য।

এস-টি-সি-আই-এর কাজকর্ম উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। 1982-83 সনে এর ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল 1832 কোটি টাকা। 1983-84 সনে এর পরিমাণ 2193 কোটি টাকা; বৃদ্ধির পরিমাণ 20 শতাংশ।

এস-টি-সি-আই-এর অধীনে তিনটি সংগঠন রয়েছেঃ (1) ক্যাজু কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া, (2) প্রজেক্টস এণ্ড ইকুউপমেণ্ট কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া ও (3) স্টেট কেমিক্যালস এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া।

ক্যাজু কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া কাঁচা কাজু বাদাম বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরবরাহ করার এজেন্সি রূপে 1970 সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর হেড কোয়ার্টার্স কোচিন ও রেজিষ্ট্রার্ড অফিস দিল্লীতে অবস্থিত। কাজু বাদাম রপ্তানি ব্যাপারে এর উদ্যোগ রয়েছে। বিদেশী বাজারে ভারতের কাজু বাদামের স্থিতি আনা ও বিদেশে কাজু বাদামের জন্য নতুন বাজার খোলা ব্যাপারে এর সাফল্য উল্লেখযোগ্য। 1981 সনের এপ্রিল-ডিসেম্বরে এর ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ 18·93 কোটি টাকা। এ কর্পোরেশনটির দুটো অফিস রয়েছে। একটি প্যারিসে, অপরটি ন্যু-ইয়র্কে। এ দুটোর অফিস ভারতীয় কাজু দ্রব্যের প্রচারের কাজ করে থাকে।

প্রজেক্ট এণ্ড ইকুউপমেণ্ট কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া 1971 সনে রেজিষ্ট্রি-কৃত হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য ইঞ্জিনিয়ারিং সরঞ্জাম ও প্রকল্প রপ্তানি ব্যাপারে

20 দাম বৃদ্ধি ও দাম নীতি

দাম বৃদ্ধির গতি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (1939-45) থেকে ভারতে যে দাম বৃদ্ধি স্বরু হয়েছে প্রথম পরিকল্পনাকাল ছেড়ে দিলে তা অব্যাহত রয়েছে বলা চলে।

পাইকারী দামের গড় সূচক সংখ্যা

(আগস্ট 1939 = 100)

বিষয়	1947-48	1948-49	1949-50	1950-51	1947-48 সনের তুলনায় 1950-51 সনে দাম বৃদ্ধি (শতাংশ)
খাদ্যদ্রব্য	306·1	382·9	391·3	416·4	26·4
শিল্প কাঁচামাল	377·5	448·8	471·7	523·1	27·8
তৈরী দ্রব্য	286·4	346·1	347·2	354·2	19·1
সমস্ত দ্রব্য	308·2	376·2	385·4	409·7	24·8

সূত্র : রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, রিপোর্টস অন কারেন্সি এণ্ড ফিনান্স।

দেখা যাচ্ছে, 1947-48 সনের তুলনায় 1950-51 সনে পাইকারী দাম বৃদ্ধির পরিমাণ 24·8 শতাংশ।

পাইকারী দামের সূচক সংখ্যা

(আগস্ট 1939 = 100)

বিষয়	1950-51	1955-56	1950-51 সনের তুলনায় 1955-56 সনে পরিবর্তন (শতাংশ)
খাদ্যদ্রব্য	416·4	313·2	−24·8
শিল্প কাঁচামাল	323·1	419·7	+19·6
তৈরী দ্রব্য	354·2	372·9	+5·0
সমস্ত দ্রব্য	409·7	366·3	−12·0

সূত্র : আর-বি-আই।

পাইকারী দামের সূচক সংখ্যা

(1952-53 = 100)

বিষয়	1955-56	56-57	57-58	58-59	59-60	60-61	55-56 সনের তুলনায় 1960-61 সনের দাম বৃদ্ধি (শতাংশ)
খাদ্যদ্রব্য	86·6	102·3	106·4	115·2	119·0	120·0	27·8
শিল্প কাঁচামাল	99·0	116·0	116·5	115·5	123·7	145·4	31·9
তৈরী দ্রব্য	99·6	105·6	108·2	108·1	111·3	122·8	18·8
সমস্ত দ্রব্য	92·5	105·3	108·4	112·9	117·1	124·9	25·9

সূত্র: আর-বি-আই।

প্রথম পরিকল্পনাকালীন পাইকারী দাম হ্রাস পায়। 1950-51 সনের তুলনায় 1955-56 সনে 12 শতাংশ দাম হ্রাস পায়। এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, 1951 সনের মাঝামাঝি দামের স্থচক গড়ে 456·9 স্তরে পৌঁছায়। 1950 সনের মাঝামাঝি দামের স্থচক গড়ে ছিল 393·4। 1951 সনে দাম বৃদ্ধির কারণ প্রধানত কোরিয়ার যুদ্ধ। 1952 সনে দাম হ্রাস পায়। এর উল্লেখযোগ্য কারণ অনুকূল আবহাওয়াজনিত কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কোরিয়ার যুদ্ধের কারণে কোন কোন দ্রব্য অতিরিক্ত পরিমাণ মজুত করে রাখা ও যুদ্ধ বিরতির পরে এসব দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস। তাছাড়া সরকারের মুদ্রা সঙ্কোচন নীতিও উল্লেখ্য।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালীন প্রায় প্রতি বছরই দাম বৃদ্ধি পেতে থাকে।

1955-56 সনের তুলনায় 1960-61 সনে পাইকারী দাম বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় 30 শতাংশ। 1955 সনের মে থেকে 1960 সনের জুনের মধ্যে জোয়ার, চাল, ও গমের খুচরো দাম বৃদ্ধির পরিমাণ যথাক্রমে 150 শতাংশ, 54 শতাংশ ও 52 শতাংশ। এরূপ দাম বৃদ্ধির কারণ ঘাটতি ফিনান্স ও টাকার সরবরাহ বৃদ্ধি, অপরদিকে উৎপাদন ক্ষেত্রে সঙ্কট। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালীন জনসাধারণের হাতে টাকা সরবরাহের পরিমাণ 42 শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

তৃতীয় পরিকল্পনাকালীন তৈরী দ্রব্য ও খাদ্যদ্রব্যের পাইকারী দাম যথাক্রমে 18 শতাংশ ও 40 শতাংশ বৃদ্ধি পায়। সাধারণ দাম বৃদ্ধির পরিমাণ 32 শতাংশ।

পাইকারী দামের সূচক সংখ্যা

(1952-53 = 100)

বিষয়	1960-61	1965-66	1960-61 সনের তুলনায় 1965-66 সনে দাম বৃদ্ধি (শতাংশ)
খাদ্য দ্রব্য	120·0	168·8	40
শিল্প কাঁচামাল	145·4	189·7	30
তৈরী দ্রব্য	123·9	145·4	18
সমস্ত দ্রব্য	124·9	165·1	32

সূত্র: আর-বি-আই।

তৃতীয় পরিকল্পনাকালীন টাকার সরবরাহ ও ঘাটতি ফিনান্সের অবস্থা নিম্নরূপ : জনসাধারণের হাতে টাকার সরবরাহ বৃদ্ধির পরিমাণ 45 শতাংশ, মোট টাকা সরবরাহ বৃদ্ধির পরিমাণ 58 শতাংশ ও ঘাটতির পরিমাণ 385 কোটি টাকা। 1961-62 সনে ঘাটতি ফিনান্সের পরিমাণ ছিল 184 কোটি টাকা। এরূপ অবস্থার প্রধান কারণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, অ-উন্নয়নমূলক খাতে ব্যয় বৃদ্ধি, নিয়ন্ত্রণ তুলে নেয়া, ভারী শিল্পের উপর বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও খাদ্যশস্যের বাজারে উদ্বৃত্তের পরিমাণ হ্রাস।

পাইকারী দামের সূচক সংখ্যা

(1961-62 = 100)

বিষয়	1969-70	70-71	71-72	72-73	73-74	69-70 সনের তুলনায় 73-74 দামবৃদ্ধি (শতাংশ)
খাদ্যদ্রব্য	199·8	199·8	216·5	250·1	321·7	61·0
শিল্প						
কাঁচামাল	185·8	191·0	178·5	236·4	322·6	73·6
তৈরী দ্রব্য	142·8	154·5	165·1	172·4	215·6	50·0
সমস্ত দ্রব্য	175·7	186·0	192·3	218·5	284·4	62·0

সূত্র : আর-বি-আই।

তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনার কাল 1966-67, 1967-68 ও 1968-69। এ সময়কালীন দেখা যায় 1965-66 সনের তুলনায় 1968-69 সনে খাদ্য-দ্রব্য, শিল্প কাঁচামাল ও তৈরী দ্রব্যের দাম যথাক্রমে 35·8 শতাংশ, 18·0 শতাংশ ও 13·5 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সাধারণ দাম বৃদ্ধির পরিমাণ 25·6 শতাংশ। জনসাধারণের হাতে টাকা সরবরাহের বৃদ্ধির পরিমাণ 21·3 শতাংশ ও মোট টাকা সরবরাহের বৃদ্ধির পরিমাণ 30 শতাংশ। ঘাটতি ফিনান্সের পরিমাণ 1965-66 সনে ছিল 358 কোটি টাকা। পরবর্তী বছর এর চাপ হ্রাস পায়। ঘাটতি ফিনান্সের পরিমাণ 1966-67, 1967-68 ও 1968-69 সনে যথাক্রমে 227 কোটি টাকা, 228 কোটি টাকা ও 277 কোটি টাকা। এ সময়-

কালীন দাম বৃদ্ধির কারণের মধ্যে রয়েছে নিয়ন্ত্রণ তুলে নেয়া ও তুলাবস্ত্র, কয়লা, চিনি, বনস্পতি প্রভৃতি দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি করার অনুমতি দান। কতিপয় কৃষিদ্রব্যের ন্যূনতম দামও বৃদ্ধি করা হয়। 1966 সনের জুনে টাকার মূল্য হ্রাস করা হয়। এর ফলেও দাম বৃদ্ধি পায়। চতুর্থ পরিকল্পনা-কালীন দাম বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে।

1979-80 সনের তুলনায় 1973-74 সনে খাদ্যদ্রব্য, শিল্প কাঁচামাল ও তৈরী দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির পরিমাণ যথাক্রমে 61·0 শতাংশ, 73·6 শতাংশ ও 50 শতাংশ। সমস্ত দ্রব্যের গড় দাম 62·0 শতাংশ বৃদ্ধি পায়। দেখা যাচ্ছে, দাম বৃদ্ধি ব্যাপারে চতুর্থ পরিকল্পনাকালীন রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। মোট টাকা সরবরাহ ক্ষেত্রেও দেখা যায়, 1969-70 সনের তুলনায় 1973-74 সনে মোট টাকা সরবরাহের পরিমাণ 4450 কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। যেখানে টাকার সরবরাহের বৃদ্ধির হার গড় বার্ষিক 13·2 শতাংশ সেখানে কৃষি, খাদ্যশস্য ও শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধির হার যথাক্রমে 3·0, 2·8, ও 4·1 শতাংশ। বলা বাহুল্য, টাকার সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধিই দাম বৃদ্ধির প্রধানতম কারণ। স্পেকুলেশন ও কালো বাজারের ভূমিকাও অস্বীকার করা যায় না।

পঞ্চম পরিকল্পনাকালীন দেখা যায়, 1974-75 সনে পাইকারী দামের সূচক সংখ্যা 313। 1973-74 সনে সূচক সংখ্যা ছিল 254। 1974 সনের জানুয়ারী থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মুদ্রাস্ফীতির হার গড়ে মাসে প্রায় 2·3 শতাংশ। এ সময় দ্রুত দাম বৃদ্ধির কারণ ক্রমাগত টাকার সরবরাহ বৃদ্ধি, কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে আশানুরূপ উৎপাদন না হওয়া, খাদ্য, সার ও পেট্রোলিয়ামের আমদানির দাম বৃদ্ধি ও স্পেকুলেশন।

1974 সনের সেপ্টেম্বর থেকে দাম হ্রাস পেতে থাকে। এর কারণ সরকারের দাম বৃদ্ধি রোধ করার জন্য কঠোর রাজস্ব ও আর্থিক নীতি গ্রহণ। যথা, মহার্ঘ ভাতা নগদ টাকায় না দেয়া, লভ্যাংশ বণ্টনের উচ্চতম সীমা নির্ধারণ করে দেয়া ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার ক্রেডিট সঙ্কোচন নীতি গ্রহণ। কালোবাজারী, আড়তদারী, চোরাই লেনদেন প্রভৃতি কাজের বিরুদ্ধে কিছুটা কঠোর ব্যবস্থা নেয়া।

1976 সনের মার্চের শেষ সপ্তাহ থেকে আবার দাম বৃদ্ধি সুরু হয়।

1976-77 (মার্চ-মার্চ) দাম বৃদ্ধির পরিমাণ 11·6 শতাংশ। এ সময় চিনে-বাদাম, বাদাম তেল, কাঁচা তুলা ও গুড়ের দাম বৃদ্ধির হার সর্বাধিক।

1976-77 (জুন-জুন) সনের তুলনায় 1977-78 (জুন-জুন) সনে সাধারণ দাম স্তর হ্রাস পায়। সমস্ত দ্রব্যের পাইকারী দাম সূচক (1970-71 = 100) সংখ্যা 1977 সনের জুনের শেষে ছিল 188·8 ; 1978 সনের জুনের শেষে হয় 185·8। অর্থাৎ, এ সময়কালীন সূচক সংখ্যা 1·6 শতাংশ হ্রাস পায়। এ সময় 1976 ও 1977 সনের মধ্যে সূচক সংখ্যার বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল 8·6 শতাংশ।

পাইকারী দামের সূচক সংখ্যা

(1970-71 = 100)

বিষয়	1977 সনের 25 জুনের তুলনায় 1978 সনের 24 জুনে পরিবর্তিত অবস্থা (শতাংশ)	1976 সনের 26 জুনের তুলনায় 1977 সনের 25 জুনে পরিবর্তিত অবস্থা (শতাংশ)
I. প্রাথমিক দ্রব্যাদি	− 2·1	+ 15·0
II. জ্বালানি, শক্তি ও লুব্রিক্যাণ্টস	+ 4·0	+ 1·2
III. ম্যানুফ্যাকচারড দ্রব্যাদি	− 2·4	+ 5·3
IV. সমস্ত দ্রব্য	− 1·6	+ 8·6

সূত্র: আর-বি-আই।

এ সময় দামস্তর নিম্নমুখী হওয়ার প্রধান কারণ প্রাথমিক ও ম্যানুফ্যাকচারড দ্রব্যাদির দাম হ্রাস। 1977-78 সনে প্রধান প্রধান শস্যের উৎপাদন রেকর্ড পরিমাণ বৃদ্ধি পায় ও খাদ্যের মজুত ভাণ্ডার শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তুলা, পাট, ইক্ষুর উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া বণ্টন ব্যবস্থার উন্নতি, যথাসময় দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যাদি আমদানি ও দেশীয় চাহিদা মিটাবার জন্য কতিপয় দ্রব্যের উপর রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি কারণেও দাম বৃদ্ধি হ্রাস পায়।

1979-80 (জুলাই-জুন) সনে দাম বৃদ্ধির পরিমাণ ও ব্যাপকতা আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। 1979 সনের 30 জুন সমস্ত দ্রব্যের পাইকারী দাম স্থচক (1970-71 = 100) ছিল 204·1। 1980 সনের 28 জুনে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় 251·1। অর্থাৎ, স্থচক বৃদ্ধির পরিমাণ 23·0 শতাংশ। 1978-79 সনে এ সময়কালীন স্থচক বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল 9·7 শতাংশ। প্রধানত 18 দ্রব্যের ক্ষেত্রেই দাম বৃদ্ধি ঘটে। এদের মধ্যে রয়েছে চাল, অশোধিত পেট্রোলিয়াম, কয়লা, পেট্রোল, ডিজেল, চিনি, গুড় ও সার।

পাইকারী দামের সূচক সংখ্যা
(1970-71 = 100)

বিষয়	1978 সনের জুনের শেষের তুলনায় 1979 সনের জুনের শেষে পরিবর্তিত অবস্থা (শতাংশ)	1979 সনের জুনের শেষের তুলনায় 1980 সনের জুনের শেষে পরিবর্তিত অবস্থা (শতাংশ)
I. প্রাথমিক দ্রব্যাদি	+ 6·4	+ 17·1
II. জ্বালানি, শক্তি ও লুব্রিক্যাণ্টস	+ 6·4	+ 38·1
III. ম্যানুফ্যাকচারড দ্রব্যাদি	+ 13·8	+ 24·6
IV. সমস্ত দ্রব্য	+ 9·7	+ 23·0

সূত্র : আর-বি-আই।

পরের পৃষ্ঠায় 1971 সন থেকে 1984 সন পর্যন্ত পাইকারী দামের স্থচক সংখ্যা দেখানো হল।

দাম বৃদ্ধির কারণ

(1) জনসংখ্যা বৃদ্ধি, উৎপাদনে শিথিলতা ও আয়ের অসম বণ্টন। জনসংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে সে হারে উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে না। ভারতে জনসংখ্যার গড় বার্ষিক বৃদ্ধির হার 1960-70 সনে 2·3 শতাংশ; 1970-81

পাইকারী দামের সূচক সংখ্যা (নতুন সিরিজ)

(1970-71 = 100)

বছর	সমস্ত পণ্যদ্রব্য	প্রাথমিক দ্রব্য	জ্বালানি শক্তি, আলো ও লুব্রিক্যাণ্টস	ম্যানুফ্যাকচারড দ্রব্যাদি		
				খাদ্যদ্রব্য	পানীয় তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য	বস্ত্র
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
1971*	105·0	101·0	108·4	116·3	106·6	108·8
1972	113·0	106·6	119·0	142·6	110·8	111·7
1973	131·6	131·7	133·8	167·0	118·2	127·4
1974	169·2	172·8	163·1	184·6	142·3	156·3
1975	175·8	171·5	173·1	188·3	160·7	150·9
1976	172·4	161·5	171·7	180·0	168·7	150·6
1977	185·4	182·8	179·4	190·1	168·9	169·6

* নয় মাসের গড়।

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা থেকে)

বছর	সমস্ত পণ্য দ্রব্য	প্রাথমিক দ্রব্য	জ্বালানি শক্তি, আলো ও লুব্রিক্যাণ্টস	ম্যানুফ্যাকচারড দ্রব্যাদি		
				খাদ্যদ্রব্য	পানীয় তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য	বস্ত্র
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
1978	185·0	181·7	177·9	160·5	177·1	176·7
1979	206·0	196·3	203·5	191·8	183·5	197·0
1980	246·8	227·8	248·6	293·7	203·8	210·1
1981	277·1	259·8	269·0	309·9	217·4	290·2
1982	284·7	270·0	269·3	262·0	216·0	229·1
1983	307·9	296·1	288·2	285·1	238·4	244·1
1984*	333·8	321·6	313·6	322·3	252·0	271·2

* সাময়িক। 1985 সনের প্রথম দু'মাসের সমস্ত পণ্যদ্রব্যের সূচক সংখ্যা যথাক্রমে 338·8 ও 338·7।

সূত্র : ইণ্ডিয়ান লেবার জার্নেল, মে 1985।

সনে 2·1 শতাংশ। এ সময়কালীন কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির হার প্রতি ক্ষেত্রে 1·9 শতাংশ। খাদ্যশস্যের অভাব লাঘব করার জন্য 1974 ও 1981 সনে খাদ্যশস্য আমদানির পরিমাণ যথাক্রমে 5261 ও 1523 হাজার এমটি। এর সঙ্গে জড়িত আয় বণ্টনে অসমতা ও খাদ্যদ্রব্যের উপর ব্যয়ের আধিক্য।

(2) চলতি দামে আয় বৃদ্ধি। চলতি দামে জনপ্রতি আয় বৃদ্ধির হার 1975-76 সনে 2·1 শতাংশ; 1977-78 সনে 9·5 শতাংশ ও 1979-80 সনে 8·0 শতাংশ। আয় বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে চাহিদার উপর চাপ সৃষ্টি হয়। দাম বৃদ্ধি পায়।

(3) মুদ্রাস্ফীতি। ভারতে গড় বার্ষিক মুদ্রাস্ফীতির হার 1960-70 সনে 7·1 শতাংশ; 1970-81 সনে 8·1 শতাংশ। মুদ্রাস্ফীতির কারণ বিনিয়োগ বৃদ্ধি, সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি ও তা মিটাবার জন্য ঘাটতি ফিনান্সের আশ্রয় গ্রহণ করা। অর্থাৎ, বাজারে অতিরিক্ত টাকার সরবরাহ।

(4) কালো বাজার। মুদ্রাস্ফীতি, কর ফাঁকি দেয়ার সুযোগ, জিনিস-পত্রের অপ্রতুলতা, চোরাই কারবার, মজুতদারী প্রভৃতি সমাজবিরোধী কাজ-কর্মের প্রতি সরকারের উদাসীনতা। কালো বাজারে শত শত কোটি টাকার লেনদেনের ফলে জিনিসপত্র আরো দুর্মূল্য হয়ে ওঠে।

(5) পরোক্ষ কর ও উৎপাদনশীলতার সঙ্গে সম্পর্কহীন মজুরি বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি জনিত দাম বৃদ্ধি।

(6) বণ্টন। অতি প্রয়োজনীয় দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ ও নিয়ন্ত্রিত মূল্যে তা দুর্বল শ্রেণীর মানুষদের কাছে পৌঁছে দেয়ার সরকারী ব্যর্থতা।

(7) বিদেশের উপর নির্ভরশীলতা। ভারত তার বহির্বাণিজ্যের ক্রম-বর্ধমান ঘাটতি মিটাবার জন্য বিদেশের মুখাপেক্ষী। তাছাড়া উন্নয়নের জন্যও সে আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থাগুলির, বিশেষত ইণ্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেণ্ট এসোসিয়েশন-এর, উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল। আন্তর্জাতিক মন্দা, মূদ্রাস্ফীতি, রাজনীতি ও আর্থিক সংস্থাগুলির ঋণদান নীতির পরি-বর্তনের সঙ্গে ভারতের অর্থনীতির নিবিড় সংযোগ থাকাতে উৎপাদন ব্যাহত হয়, দাম বৃদ্ধি পায়; উন্নয়নের গতিও স্থিতিসম্পন্ন হয় না।

সরকারের দাম নীতি

সরকারের দাম নীতির মূল স্বীকৃতি, জনসংখ্যা ও আয় বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে চাহিদা বৃদ্ধি; অর্থাৎ, দাম বৃদ্ধি। চাহিদা বৃদ্ধির দীর্ঘকালীন সমস্যার

সমাধানের পথ চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন। সেজন্য প্রয়োজন উৎপাদন বৃদ্ধি এবং চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে দ্রব্য ও সেবার—বিশেষত অতি প্রয়োজনীয় ভোগ্যদ্রব্য, কাঁচামাল ও উপকরণ—উপযুক্ত সরবরাহ। পরিকল্পিত উৎপাদন লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী ও প্রকল্পগুলিকে কার্যকরভাবে রূপায়িত করা। শক্তি ও পরিবহণের অভাবের ফলে যাতে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যাহত না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা। বিভিন্ন স্তরের কাজকর্ম যথাযথভাবে অগ্রসর হচ্ছে কি না তা তত্ত্বাবধান করা দরকার যাতে যেকোন ক্ষেত্রে যেকোন সমস্যাই দেখা দিক না কেন তা দ্রুত সমাধান করা চলে।

এসব মৌল ধারণার ভিত্তিতে দাম স্থিতিশীল করার জন্য প্রয়োজনীয় সেক্টরগুলিতে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

(i) কৃষি। খাদ্য ও খাদ্যদ্রব্যের চাহিদার গুরুত্ব সর্বাধিক। অন্য কথায়, কৃষি ও কৃষি সম্পর্কিত দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ ও স্থিতিশীলতার উপর দামের স্থিতিশীলতা বিশেষ নির্ভরশীল। কৃষি উৎপাদন অনিশ্চিত, অথচ কৃষিদ্রব্যের চাহিদা স্থিতিশীল। এ নিয়মিত সঙ্কট থেকে মুক্ত থাকার জন্য যতটা সম্ভব অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলা দরকার। খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে 15 মিলিয়ন টনের এক মজুত ভাণ্ডার গঠন করা অতি প্রয়োজনীয় বলে স্বীকৃত হয়েছে।

প্রধান প্রধান কৃষিদ্রব্যের সংগ্রহ বা সমর্থন দাম এগ্রিকালচারেল প্রাইসেস কমিশনের সুপারিশক্রমে নির্ধারিত হয়। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রযুক্তিবিদ্যা আধুনিকীকরণ ও প্রতিষ্ঠানগত উন্নয়ন সাধনের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

(ii) শিল্প। শিল্পজাত ভোগ্যদ্রব্য ও শিল্প উপকরণের দাম নিয়ন্ত্রণ করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে পাবলিক সেক্টরের শিল্পের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখার বিষয়টিও উপেক্ষিত হয়নি। পাবলিক ও প্রাইভেট উভয় সেক্টরই যাতে স্বল্প ব্যয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারে সেজন্য আধুনিক পরিচালন পদ্ধতি, মজুত-মাল নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি ক্ষেত্রের উৎকর্ষ সাধনের কথা বলা হয়েছে। বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানগুলিকে ব্যয় হ্রাস করার সুযোগ দেয়ার জন্য সম্ভাব্য ক্ষেত্রে তাদের আয়তন বৃদ্ধি করার অনুমতি দেয়াও নীতিরূপে গৃহীত হয়েছে। দেশীয় শিল্পগুলিকে প্রতিযোগিতামূলক করে তোলার জন্য

অতিরিক্ত সংরক্ষণের সুবিধা দান নীতির পর্যালোচনাও সঙ্গত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

(iii) যেসব দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিশীল সেসব দ্রব্যের উৎপাদন সামান্য হ্রাস পেলেও তাদের দাম অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া এসব দ্রব্য প্রধানত কৃষি-ভিত্তিক। এদের দাম মরসুমের পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। এ ক্ষেত্রে সরকারী বণ্টন ব্যবস্থার এক বিরাট ভূমিকা রয়েছে। পাবলিক বণ্টন প্রথার অন্যতম উদ্দেশ্য দ্বৈত দাম ব্যবস্থার প্রচলন। যে দ্রব্য সরকার বণ্টন করবে তার দাম খোলা বাজারের দাম অপেক্ষা কম হবে। ফলে দুর্বল শ্রেণীভুক্ত লোকেরা কোন কোন দ্রব্য কম দামে ক্রয় করার সুযোগ পাবে। উৎপাদকদেরও এতে অসুবিধার কারণ ঘটবে না। কারণ অবশিষ্টাংশ তারা অনেক বেশি দামে খোলা বাজারে বিক্রয় করতে পারবে। সরকারী বণ্টন ব্যবস্থা কার্যকর করতে হলে উৎপাদন, সংগ্রহ, পরিবহন ও ষ্টোরেজের মধ্যে সুষ্ঠু সংযোজনার প্রয়োজন। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, তবে কার্যকর করা সহজ নয়। যাহোক খাদ্যশস্য, চিনি, আহার্য তেল, কেরোসিন, কয়লা, নিয়ন্ত্রিত মূল্যে কাপড়, চা, কফি, সাবান, দিয়াশলাই, শিশুদের জন্য লেখার খাতা প্রভৃতি দ্রব্যগুলিকে অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যরূপে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এ সমস্ত দ্রব্য সম্পর্কে সরকারী বণ্টন ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

(iv) ভোগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ। ভোগকারীরা যাতে উৎকৃষ্ট মানের অন্তত অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি ন্যায্য দামে ও প্রয়োজনীয় পরিমাণে পেতে পারে সে সম্বন্ধে আইনের সাহায্য নেয়া এবং সংযোজিত দাম নীতির উপযোগিতার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য স্বেচ্ছামূলক সংগঠনগুলির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এ ধরনের সংগঠন শহর ও গ্রাম উভয় ক্ষেত্রেই গড়ে তোলার প্রয়োজন রয়েছে। পঞ্চায়েতগুলির ভোগকারীদের স্বার্থ সম্পর্কে গ্রামীণ মানুষদের মধ্যে চেতনাবোধ জাগাবার দায়িত্ব রয়েছে।

(v) চাহিদা ও যোগান এবং দামের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলিকে সতর্ক করে দেয়ার প্রথা প্রবর্তন করার কথা বলা হয়েছে। এজন্য বিভিন্ন স্তরে সংযোজন প্রয়োজন। এ প্রথার গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। দামের তথ্যের ভিত্তিতে দ্রুত যথোচিত ব্যবস্থা নেয়ার উপর

সমগ্র বিষয়টির উপযোগিতা নির্ভর করবে। এ গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর দরকার যারা তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, সরবরাহ ও আইনগত বিধানগুলি কার্যকর করতে সক্ষম হবে।

সাম্প্রতিক মুদ্রাস্ফীতি

1981 সনের এপ্রিলে মুদ্রাস্ফীতির বার্ষিক হার ছিল 17·3 শতাংশ। 1982 সনের জানুয়ারীতে তা হ্রাস পেয়ে 5·9 শতাংশ হয়। দু'বছর আগে, অর্থাৎ, 1980 সনের জানুয়ারীতে মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল অনেক বেশি, 22·7 শতাংশ। 1982 সনের ফেব্রুয়ারীতে মুদ্রাস্ফীতির হার হ্রাস পেয়ে হয় 3·1 শতাংশ। 1981 সনের ফেব্রুয়ারীতে এর হার ছিল 16·2 শতাংশ। 1981 সনের সেপ্টেম্বর থেকে 1982 সনের জানুয়ারী পর্যন্ত সাধারণ পাইকারী দাম সূচক 3·5 শতাংশ হ্রাস পায়। কিন্তু 1981 সনের এপ্রিল থেকে আগস্ট পর্যন্ত সাধারণ পাইকারী দাম সূচক 9·0 শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

1982-83 সনে মুদ্রাস্ফীতির হার 2·8 শতাংশ। কিন্তু 1983-84 সনে মুদ্রাস্ফীতির হার ঊর্ধ্বমুখী হতে থাকে। বর্তমানে তা দশমিকের ঘরে।

কারণ

1979-80 সন থেকে মুদ্রাস্ফীতি আবার বৃদ্ধি পাবার কারণ প্রধানত :

(i) 1979-80 সনের দারুণ খরার ফলে কৃষি উৎপাদন ভীষণভাবে ব্যাহত হয়।

(ii) অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়াম-ভিত্তিক দ্রব্যাদির আমদানির দাম বৃদ্ধি।

(iii) পেট্রোলিয়াম-ভিত্তিক দ্রব্যাদি ও সারের প্রশাসনিক দাম বৃদ্ধি।

(iv) গম, চাল প্রভৃতি শস্য ও ইক্ষু প্রভৃতি দ্রব্যের সরকারী ক্রয় দাম বৃদ্ধি।

(v) পরিবহণ ও শক্তি সরবরাহে বাধা।

(vi) গুড়, চিনি, কেরোসিন, সিমেণ্ট প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব।

(vii) বিগত কয়েক বছর ধরে বাজারে কারেন্সির পরিমাণ বৃদ্ধি।

(viii) 'আসাম আন্দোলন'-এর ফলে উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে পেট্রোলিয়াম-ভিত্তিক দ্রব্যাদি সহ অন্যান্য দ্রব্যের পরিবহণে বাধা সৃষ্টি।

(ix) ষষ্ঠ পরিকল্পনার প্রথম চার বছর অর্থ বিনিয়োগ লক্ষ্য সীমায় পৌছিয়েছে বা অধিক মাত্রায় পৌছিয়েছে বলা যায়, কিন্তু কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে কতিপয় দ্রব্যের উৎপাদন লক্ষ্য সীমায় পৌছাতে সক্ষম হয়নি। ফলে বাজারে টাকার অতিরিক্ত সরবরাহ ঘটেছে।

(x) কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে কোন কোন দ্রব্য উৎপাদনে স্থিতিশীলতার অভাব। তাছাড়া সরকার কর্তৃক অপরিকল্পিতভাবে দাম ও পণ্যদ্রব্যের উপর কর বৃদ্ধির ফলেও মুদ্রাস্ফীতি ঘটেছে।

(xi) সম্প্রতি কালোবাজারীদের ফটকাবাজী কাজকর্মে অধিকতর উৎসাহের ফলে বাজারে কালো টাকার সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে।

কতিপয় প্রস্তাব

মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য নিম্নলিখিত পন্থা অবলম্বনের কথা বলা হয়ে থাকে।

(i) নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ন্যায্য দামে ও সরকারের উদ্যোগে এসব দ্রব্য বণ্টনের সুব্যবস্থা।

(ii) টাকা ও ক্রেডিটের প্রসার নিয়ন্ত্রণ। অপর দিকে ব্যাঙ্ক আমানত একীভূত করা ও ক্রেডিট প্রবাহ অগ্রাধিকার ও উৎপাদনশীল সেক্টরে সুনিশ্চিতকরণ।

(iii) ব্যাঙ্ক ক্রেডিট ও আমানত সম্পর্কিত সুদ কাঠামোর পুনর্বিন্যাস এবং ব্যাঙ্ক রেটের হার বৃদ্ধি করা।

(iv) পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও পরিকল্পনার রূপায়ণের মধ্যে ব্যবধান দূর করা। ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রায় উপনীত হওয়া পরিকল্পনার সাফল্য বুঝায় না। প্রকৃত সাফল্য নির্ভর করে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রায় পৌছাবার উপর। মুদ্রাস্ফীতি, ক্রমাগত মূলধন উৎপাদন অনুপাত বৃদ্ধি ও শ্রমের উৎপাদনশীলতা হ্রাস পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ওভার-ড্রাফট ও মুদ্রাস্ফীতি

কেন্দ্রীয় সরকার তার বাজেটের ঘাটতি মিটাবার জন্য ঋণ গ্রহণ করে ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার শরণাপন্ন হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া নতুন কারেন্সি ছাপিয়ে এ ঘাটতি মিটাবার জন্য সাহায্য করে। রাজ্য সরকারগুলি তাদের ঘাটতি বাজেট মিটাবার জন্য অতিরিক্ত কর ধার্য করে,

কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে অতিরিক্ত সাহায্য নেয় ও প্রয়োজনবোধে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার কাছ থেকে ওভার-ড্রাফট নেয়।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট 1934 [S17(5)] অনুযায়ী রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া 90 দিনের মধ্যে পরিশোধনীয় শর্তে রাজ্য সরকারগুলিকে আগাম দিতে পারে। এরূপ আগাম দু'রকম হতে পারে।

(i) স্বাভাবিক ওয়েজ এণ্ড মিনস এ্যাডভান্স। এ প্রক্রিয়ায় আগাম নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারকে কোন কোলাটারেল সিকিউরিটি জমা দিতে হয় না। আগামের পরিমাণ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া কর্তৃক নির্ধারিত হয়। এর উচ্চতম সীমা সাধারণত সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারকে যে নিম্নতম পরিমাণ অর্থ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার কাছে গচ্ছিত রাখতে হয় তার তিনগুণ।

(ii) বিশেষ ওয়েজ এণ্ড মিনস এ্যাডভান্স। এ প্রক্রিয়ায় রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকারের সিকিউরিটির বিরুদ্ধে আগাম দেয়া হয়। এর পরিমাণ সাধারণত স্বাভাবিক ওয়েজ এণ্ড মিনসের দ্বিগুণ হয়ে থাকে। স্বাভাবিক ও বিশেষ ওয়েজ এণ্ড মিনস আগামের উপর ব্যাঙ্ক রেটের 1 শতাংশ কম হারে সুদ দিতে হয়।

এছাড়া 'অননুমোদিত আগাম'-ও দেয়া হয়। এরূপ ওভার-ড্রাফটকে অনুমোদিত আগাম বলার কারণ ঋণগ্রহীতা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সঙ্গে এ ব্যাপারে কোন পূর্ব চুক্তিতে আবদ্ধ হয়নি। এরূপ আগামের কথা তখনই ওঠে যখন ঋণগ্রহীতার স্বাভাবিক বা বিশেষ ওয়েজ এণ্ড মিনস অনুযায়ী আগাম পাবার আর কোন সম্ভাবনা নেই। অথবা এও হতে পারে যে, ঋণগ্রহীতার পক্ষে 90 দিনের মধ্যে আগাম পরিশোধ করা সম্ভব নয়।

কেন্দ্রীয় সরকারের ঘাটতি ব্যয়ের মত ওভারড্রাফটও দাম বৃদ্ধির সহায়ক। কারণ উভয় ক্ষেত্রেই অতিরিক্ত টাকার সরবরাহ ঘটে। ঘাটতি ব্যয় প্রক্রিয়ায় শুরুতে কেন্দ্রীয় সরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়াকে ট্রেজারী বিল ইস্যু করে স্বল্পমেয়াদী ঋণ নেয়। পরে ট্রেজারী বিলগুলিকে দীর্ঘ-মেয়াদী সিকিউরিটিতে রূপান্তরিত করে নেয়া হয়। কিন্তু রাজ্য সরকারগুলির ক্ষেত্রে ওভার-ড্রাফটের টাকা পরিশোধ করতেই হবে। সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার যদি তা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয় তবে কেন্দ্রীয় সরকারকে তা পরিশোধ করতে হবে।

যেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারকে ওভার-ড্রাফট পরিশোধের দায়িত্ব নিতে হয় সেক্ষেত্রে সে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের পরিকল্পনা স্কীমে প্রাপ্য কেন্দ্রীয় অর্থ সাহায্য থেকে তা কেটে রাখে। অথবা এ টাকা সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের কেন্দ্রের কাছে প্রাপ্য কর ও গ্র্যাণ্টস-ইন-এডের অংশের বিরুদ্ধে আগাম বলে ধরে নেয়া হয়। অনেক সময় কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলিকে তাদের অনুমোদিত আগাম মিটিয়ে ফেলার জন্য ওয়েজ এণ্ড মিনস রূপে অর্থ সাহায্য দিয়ে থাকে। এ উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইণ্ডিয়ার কাছে এড হক ট্রেজারী বিল ইস্যু করে। অর্থাৎ, শেষপর্যন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাজ্য সরকারগুলির ওভার-ড্রাফটের ভার কেন্দ্রীয় সরকারকে বহন করতে হয়। এ ঋণের ভার কেন্দ্রীয় সরকারের খাতে এড হক ঋণ রূপে দেখানো হয়।

1982-83 সনে রাজ্যগুলির ওয়েজ এণ্ড মিনস এ্যাডভান্স মিটাবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার তাদের মোট 1743·46 লক্ষ টাকা ঋণ বাবদ দিয়েছে।*

সাম্প্রতিক সরকারী নির্দেশনা

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী কর্তৃক 1985 সনের জুলাই মাসে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে প্রকাশ, রাজ্যগুলির ওভার-ড্রাফটের পরিমাণ 1984-85 সনের প্রারম্ভে ছিল 530 কোটি টাকা, ক্রমে তা বৃদ্ধি পেয়ে 1985 সনের জানুয়ারীতে দাঁড়ায় 1460 কোটি টাকা। পরে আরো বৃদ্ধি পেয়ে 1985 সনের 28 জুন এর পরিমাণ হয় 1808 কোটি টাকা। এ পরিপ্রেক্ষিতে ওভার-ড্রাফট নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ফলে ওভার-ড্রাফটের পরিমাণ 932 কোটি টাকায় নেমে আসে।

অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেন, 1985 সনের 28 জুনের ওভার-ড্রাফটের (1808 কোটি টাকা) 90 শতাংশ মধ্যমেয়াদী ঋণে রূপান্তরিত করা হবে। এ ঋণ বার্ষিক 8 শতাংশ সুদে 4 বছরে পরিশোধনীয়। ওভার-ড্রাফটের উপর দেয় সুদের হার বার্ষিক 13 শতাংশ। অর্থমন্ত্রী আরো জানান যে, রাজ্যগুলিকে আথিক নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলতে ও ফাণ্ড বিষয়ান্তরে প্রেরণ না করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্ল্যানিং কমিশন রাজ্য পরিকল্পনার বিনিয়োগ সম্পদ সেক্টর-ভিত্তিক বণ্টন করে দেবে। তিনি বলেন, রাজ্য সরকারগুলি যদি আর্থিক নিয়মানুবর্তিতা না মেনে ফাণ্ড বিষয়ান্তরে ব্যয় করে তবে কেন্দ্রীয়

* নংটি রাজ্য ওভারড্রাফটের তালিকায় রয়েছে : (কোটি টাকা) পশ্চিম বাংলা (133·20), কেরল (127·17), বিহার (119·02)। সর্বাপেক্ষা কম আসাম (3·18)। (ফেব্রুয়ারী 17, 1984)।

সরকার পরবর্তী তিন মাসে তার দেয় অর্থ থেকে সে অর্থ উদ্ধার করে নেবে। রাজ্যগুলির উন্নয়নমূলক কাজকর্ম যাতে অর্থাভাবে ব্যাহত না হয় সেজন্য চলতি বছর (1985-86) রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রীয় অর্থসাহায্য বাবদ 6000 কোটি টাকা দেয়া হবে। গত বছরের তুলনায় এ অর্থসাহায্যের পরিমাণ 39 শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। বাজার ঋণের পরিমাণও গত বছরের তুলনায় 20 শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। সাধারণত এ বৃদ্ধির পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় 10 শতাংশ হয়ে থাকে।

রাজ্য সরকারগুলির বক্তব্য, সাধারণভাবে রাজ্যগুলির আর্থিক দুর্গতির কারণ কর্মচারীদের বেতন ও মহার্ঘ ভাতা (কোন কোন রাজ্যে কেন্দ্রীয় হারে) বৃদ্ধি এবং খরা-বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক কারণে অর্থব্যয়।

এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলির ওভারড্রাফট পাবার সুবিধা বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ঘাটতি ব্যয় ও দাম

ঘাটতি ব্যয়

প্ল্যানিং কমিশন প্রথম পরিকল্পনায় ঘাটতি ব্যয়ের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন, ঘাটতি ব্যয় হচ্ছে বাজেট ঘাটতি দ্বারা স্থূল জাতীয় ব্যয় বৃদ্ধি। অন্য কথায় বলা যায়, সরকার কর, সরকারী উদ্যোগ, জন ঋণ, আমানত ও ফাণ্ড এবং অন্যান্য সূত্র থেকে যে আয় করে তার চেয়ে সে বেশি ব্যয় করে। এ অতিরিক্ত ব্যয় বাবদ যে ঘাটতি হয় তা মিটাবার সূত্র (i) নগদ ব্যালেন্স ব্যবহার করা, (ii) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া থেকে ঋণ নেয়া, (iii) কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কগুলি থেকে ঋণ নেয়া, এবং (iv) নতুন কারেন্সি নোট ছাপানো।

স্পষ্টতই ঘাটতি বাজেটে রয়েছে মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা। তা সত্ত্বেও উন্নতিশীল দেশে ঘাটতি বাজেট সৃষ্টি ও তার ব্যয় মিটাবার জন্য ঘাটতি ব্যয়ের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। কারণ ঘাটতি ব্যয় সঞ্চয়কে সক্রিয় করে তোলে। তাছাড়া ঘাটতি ব্যয় সামাজিক প্রতিষ্ঠানগত বাধা-বিঘ্নকে নমনীয় করে তুলতে পারে এবং মূলধন গঠনের হার, সঞ্চয়ের হার ও বিনিয়োগের হারকে দ্রুত বৃদ্ধি করতে পারে। অবশ্য সবকিছুই নির্ভর করে ঘাটতি বাজেটের উদ্দেশ্যের উপর। ঘাটতি বাজেট বা ঘাটতি ব্যয় যদি উৎপাদনমুখী হয়, মুদ্রাস্ফীতি যদি সহনশীল হয় তাহলে ঘাটতি ব্যয়

সমূহ যত সমস্যাই সৃষ্টি করুক না কেন, ভবিষ্যতের স্বার্থে অবাঞ্ছিত হওয়ার কোন কারণ নেই।

দাম বৃদ্ধি

প্রথম পরিকল্পনায় ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হয়েছিল মোট ব্যয়ের 14 শতাংশ বা 290 কোটি টাকা। কিন্তু মোট ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় 17 শতাংশ বা 333 কোটি টাকা। টাকার সরবরাহ পরিকল্পনার শেষ বছর (1955-56) সবিশেষ বৃদ্ধি পায়। বৃদ্ধির পরিমাণ 10·8 শতাংশ। তা সত্ত্বেও দামের উপর এর প্রভাব তেমন উল্লেখ্য নয়। 1951-52 সনে পাইকারী দাম সূচক (1950-51 = 100) ছিল 105·5 ; 1954-55 সনে 87·2 ও 1955-56 সনে 82·7। এর কারণ খাদ্যশস্য ও কাঁচামালের আমদানি বৃদ্ধি।

দামের উপর ঘাটতি ব্যয়ের তেমন কোন প্রভাব না পড়াতে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ঘাটতি ব্যয় সম্পর্কে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়নি। বরঞ্চ ঘাটতি ব্যয়ের প্রতি দুর্বলতাই দেখা যায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মোট ব্যয়ের 25 শতাংশ বা 1200 কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয় বাবদ ধরা হয়। মোট ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় 954 কোটি টাকা বা মোট ব্যয়ের 20·4 শতাংশ। টাকার সরবরাহ বৃদ্ধির পরিমাণ গড়ে বার্ষিক 6 শতাংশ। ফলে পাইকারী দাম সূচক বৃদ্ধি পেতে থাকে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় ঘাটতি ব্যয় সম্পর্কে আগ্রহ কমে আসে। মোট ব্যয়ের 7·4 শতাংশ বা 550 কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয় বাবদ ধরা হয়। কিন্তু ঘাটতি ব্যয়ের যথার্থ পরিমাণ দাঁড়ায় মোট ব্যয়ের 13·3 শতাংশ বা 1133 কোটি টাকা। 1965-66 সনে অর্থাৎ, এক বছরে ঘাটতি ব্যয় মিটাবার জন্য 398 কোটি টাকা সংগ্রহ করতে হয়। টাকায় সরবরাহ ক্রমাগতই বৃদ্ধি পেতে থাকে। বৃদ্ধির হার গড়ে বার্ষিক 11·4 শতাংশ। 1963-64 সনে টাকার সরবরাহ বৃদ্ধির হার 12·2 শতাংশ। তৃতীয় পরিকল্পনায় পাইকারী দাম বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় 32 শতাংশ (1961-62 = 100)।

1966-69 সনে তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এ সময়-কালীন ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হয়েছিল মোট ব্যয়ের 5 শতাংশ বা 335 কোটি টাকা। প্রকৃত ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় 676 কোটি টাকা বা মোট ব্যয়ের 10·1 শতাংশ। টাকার সরবরাহের বৃদ্ধির হার গড়ে

বার্ষিক 9 শতাংশ। 1966-67 ও 1967-68 সনে দাম স্থচক বৃদ্ধির পরিমাণ যথাক্রমে 13·9 শতাংশ ও 11·6 শতাংশ।

চতুর্থ পরিকল্পনায় ঘাটতি বাজেট সম্পর্কে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়। এর পরিমাণ ধরা হয় মোট ব্যয়ের 5·3 শতাংশ বা 450 কোটি টাকা। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় 2060 কোটি টাকা বা মোট ব্যয়ের 12·7 শতাংশ। টাকার সরবরাহ বৃদ্ধির হার গড়ে বার্ষিক 15 শতাংশ; 1973-74 সনে বৃদ্ধির হার 18·7 শতাংশ। দাম স্থচক বৃদ্ধি পেতে থাকে।

চতুর্থ পরিকল্পনায় বিরাট মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। এ পরিপ্রেক্ষিতে পঞ্চম পরিকল্পনা রচিত হয়। পঞ্চম পরিকল্পনায় ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হয় মোট ব্যয়ের 3·7 শতাংশ বা 1354 কোটি টাকা। কিন্তু এর প্রকৃত পরিমাণ দাঁড়ায় 3560 কোটি টাকা বা মোট ব্যয়ের 9·2 শতাংশ। টাকার সরবরাহ বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে। 1978-79 সনে এ বৃদ্ধির পরিমাণ 18·9 শতাংশ হয়। পরিকল্পনার প্রথম দু'বছর পাইকারী মূল্য স্থচক 25 শতাংশেরও বেশি বৃদ্ধি পায়। পরবর্তী সময় দামস্তর মোটামুটি স্থিতিশীল থাকে। এর কারণ প্রধানত বহির্বাণিজ্যে অনুকূল অবস্থা ও আবশ্যিক দ্রব্যাদির আমদানি বৃদ্ধি। 1979-80 সনে পাইকারী দাম স্থচক বৃদ্ধি পেয়ে 11·2 শতাংশ হয়। টাকার সরবরাহের বৃদ্ধির পরিমাণ 13 শতাংশ; জাতীয় উৎপাদন হ্রাসের পরিমাণ 4 শতাংশ।

ষষ্ঠ পরিকল্পনায় ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হয় মোট ব্যয়ের 5·12 শতাংশ বা 5000 কোটি টাকা।

উপসংহার

ঘাটতি ব্যয়ের সঙ্গে মুদ্রাস্ফীতির নিবিড় সম্পর্ক অস্বীকার করা চলে না। তবে মুদ্রাস্ফীতির একমাত্র কারণ যে ঘাটতি ব্যয় এ ধারণাও ঠিক নয়। বরঞ্চ মুদ্রাস্ফীতির কারণেও ঘাটতি ব্যয়ের আশ্রয় নেয়া হয়ে থাকে। ঘাটতি ব্যয়ের সুফল নির্ভর করে অতিরিক্ত ব্যয়ের উদ্দেশ্য, পরিমাণ, উৎপাদন, সরকারী বণ্টন, নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি বিষয়ে নীতি প্রণয়ন ও রূপায়ণের কার্যকারিতার উপর। কোন একটি ক্ষেত্রে যদি শিথিলতা ঘটে তবে মুদ্রাস্ফীতির দুষ্টচক্রে আবদ্ধ হয়ে পড়ার আশঙ্কা অমূলক নয়। আমাদের দেশে ঘাটতি ব্যয়ের সমস্যার মূল কারণ এ শিথিলতা ও অসতর্কতা।

21। পরিবহণ

রেলপথ

অগ্রগতি

ভারতে 1853 সনে প্রথম রেলপথ চালু হয়। প্রথম রেলগাড়িটি বোম্বের বোরাই বন্দর থেকে যাত্রা করে থানা পর্যন্ত যায়। এর দূরত্ব মাত্র 34 কিলো-মিটার। এ প্রচেষ্টা সার্থক হওয়ার ফলে বেসরকারী বিনিয়োগকারীরা, বিশেষত গ্যারেন্টি রিটার্ন স্কীমে আকৃষ্ট হয়ে, রেলপথ নির্মাণে অর্থ বিনিয়োগ করতে সুরু করে। তাদের মূল উদ্দেশ্য অবশ্য ভারতের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে ইংরেজদের প্রায় একচেটিয়া অধিকারকে অধিকতর শক্তিশালী করে তোলা। কলকাতা, বোম্বে ও মাদ্রাজ বন্দর থেকে রেলপথ নির্মাণ করে দেশের অভ্যন্তর পর্যন্ত তা প্রসার করা হতে থাকে। 1857 সনে সিপাহী বিদ্রোহের অভিজ্ঞতার ফলে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে কিছু কিছু রেলপথ নির্মিত হয়। তাছাড়া বন্দরগুলির সঙ্গে যুক্ত রেলপথগুলির মধ্যে সংযোগ সাধন করে একটি সর্বভারতীয় রেলপথ নির্মাণের কাজও সুরু হয়। রেল পরিবহণের ফলে কম ব্যয়ে ভারী দ্রব্যসামগ্রী সুদূরে পাঠান সহজ হয়। ঘাটতি অঞ্চলে দ্রুত ও সময়মত খাদ্যশস্য পাঠানো সম্ভব হওয়ার ফলে দুর্ভিক্ষের প্রভাব হ্রাস পায়। জনবসতির নিকটবর্তী অঞ্চলে শিল্প গড়ে উঠতে থাকে।

1981 সনের 31 মার্চ ভারতীয় রেলপথের দৈর্ঘ্য ছিল 61240 কিলো-মিটার। ভারত এশিয়ার বৃহত্তম রেলপথের অধিকারী। পৃথিবীর বৃহত্তম রেলপথগুলির মধ্যে ভারতের স্থান চতুর্থ। 1981 সনের 31 মার্চ ভারতীয় রেলপথের মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল 7448·4 কোটি টাকা। কর্মীর সংখ্যা 15 লক্ষ। তাছাড়া অস্থায়ী কর্মীর সংখ্যা 2·65 লক্ষ। 1980-81 সনে ভারতীয় রেলপথ 3612 মিলিয়ন যাত্রী ও 220 মিলিয়ন টন মাল বহন করেছে। প্রতিদিন প্রায় 11000 ট্রেন চলাচল করে। স্টেশনের সংখ্যা 7035। যাত্রী ও মাল চলাচলের জন্য নিযুক্ত রয়েছে 10908 লোকমোটিভ, 38327 কোচ ও 800946 ওয়াগন। ভারতীয় রেলপথ ভারতের বৃহত্তম সরকারী সংস্থা।

রেলপথের আধুনিকীকরণের কাজ এগিয়ে চলছে। 1950-51 সনের তুলনায় 1980-81 সনে বিদ্যুৎযুক্ত পথের দৈর্ঘ্য 14 গুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। 1972 সন থেকে স্টিম লোকমোটিভ তৈরি বন্ধ হয়ে গেছে। অধুনা ইলেকট্রিক ও ডিজেল লোকমোটিভ তৈরি হচ্ছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (1950-51) থেকে শুরু করে 1980-81 সন পর্যন্ত ডিজেল লোকমোটিভের সংখ্যা 141 গুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে (17 থেকে 2403)। ইলেকট্রিক লোকমোটিভের বৃদ্ধির সংখ্যা 14 গুণেরও বেশি (72 থেকে 1036)। 1980-81 সনে ডিজেল ও ইলেকট্রিক লোকমোটিভ যুক্তভাবে মোট মাল পরিবহনের 91 শতাংশ বহন করেছে। সিগন্যালিং ও টেলিকমিউনিকেশন আধুনিকীকরণ হয়েছে।

রেলপথের অগ্রগতি—I

বছর	পথের দৈর্ঘ্য (কিমি)		
	বৈদ্যুতিক	বৈদ্যুতিক নয়	মোট
1950-51	388	53,208	53,596
1970-71	3,706	56,084	59,790
1978-79	4,723	56,064	60,777
1979-80	4,820	56,113	60,933
1980-81	5,345	55,895	61,240

সূত্র: ইণ্ডিয়া 1982।

1950-51 সনের তুলনায় যাত্রী ও মাল পরিবহণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে 181 ও 137 শতাংশ।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 1950-51 সনের তুলনায় 1980-81 সনে কোচ ও ওয়াগনের সংখ্যার বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ। কিন্তু লোকমোটিভের সংখ্যা মাত্র 33 শতাংশের মত বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিদেশী সরঞ্জাম ও স্টোরসের জন্য ভারতীয় রেলপথের মুখাপেক্ষিতা হ্রাস পাচ্ছে। 1950-51 সনে অতিরিক্ত মোট সরঞ্জাম ও স্টোরেজের 23 শতাংশ বিদেশ থেকে আমদানি করা হত। 1980-81 সনে এর পরিমাণ হ্রাস পেয়ে 9·6 শতাংশ হয়।

রেলপথের অগ্রগতি—II

বছর	লোকমোটিভের সংখ্যা				কোচের সংখ্যা	ওয়াগনের সংখ্যা
	স্টিম	ডিজেল	ইলেকট্রিক	মোট		
1950-51	8,190	17	72	8,209	19,628	2,05,596
1970-71	9,387	1,160	602	11,158	35,145	3,83,990
1978-79	8,082	2,126	945	11,153	37,642	4,01,880
1979-80	7,856	2,243	974	11,068	38,166	4,05,183
1980-81	7,469	2,403	1,036	10,908	38,327	4,00,946

সূত্র: ইণ্ডিয়া 1982।

রেলপথ খাতে ব্যয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রথম পরিকল্পনায় ব্যয়ের পরিমাণ 423·73 কোটি টাকা। পঞ্চম পরিকল্পনায় এর পরিমাণ 1489·53 কোটি টাকা।

যাত্রীদের সুবিধার ব্যবস্থা

1985-86 সনের রেল বাজেটে দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের কাছ থেকে উপার্জিত অর্থের পরিমাণ ধরা হয়েছে প্রায় 1476 কোটি টাকা ও উচ্চতর শ্রেণীর যাত্রীদের কাছ থেকে প্রায় 169 কোটি টাকা। 1950-51 সনে দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ ছিল 84·47 কোটি টাকা। দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সংখ্যাও সর্বাধিক। তাছাড়া রেলপথের আয়ের প্রধান সূত্র দ্বিতীয় শ্রেণী যাত্রীদের কাছ থেকে অর্জিত ভাড়া। সঙ্গত কারণেই তারা রেলপরিবহণে অধিকতর সুব্যবস্থা আশা করতে পারে। তাদের সুবিধার জন্য সব মেল ও এক্সপ্রেস ট্রেনে টু-টিয়ার ও থ্রি-টিয়ার স্লিপার কোচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া প্রতি স্টেশনে অপেক্ষাগার ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। 3007 স্টেশন ও 74 জোড়া ট্রেনে ক্যাটারিঙের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। অনেক ট্রেনে সস্তা দামে খাবারের প্যাকেটও দেয়া হয়ে থাকে।

1983-84 সনের বাজেটে রেলমন্ত্রী 'নির্বিঘ্নতা, নিরাপত্তা ও সময়ানুবর্তিতা'-র ডাক দিয়েছেন। এর সাফল্যের সমর্থনে তিনি বলেন, 1981 সনের এপ্রিল-ডিসেম্বরে যেখানে রেলপথের দুর্ঘটনার সংখ্যা ছিল 644, 1982 সনের এপ্রিল-ডিসেম্বরে তা 26 শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। অবস্থার আরো উন্নতি সাধনের জন্য রেলমন্ত্রী তাঁর নিজের তত্ত্বাবধানে একটি সেণ্ট্রাল সেফ্টি কমিটি গঠন করেছেন। অকেজো রেলপথ, লোকমোটিভ, কোচ ও ওয়্যাগনের পরিবর্তে নতুনের ব্যবস্থা করা ও রেল সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়ার উপরও গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

সময়ানুবর্তিতার অভাব ভারতীয় রেলপথের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। জাতীয় জরুরী অবস্থাকালীন (1976) সময়মত রেল চলাচলের কোন ব্যতিক্রম দেখা যেত না। পরবর্তীকালে অবস্থার দ্রুত অবনতির ফলে যাত্রীদের অশেষ দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। রেল কর্তৃপক্ষ এ বিষয় সম্পর্কে সতর্ক ও তৎপর রয়েছে বলে দাবি করা হয়।

ট্রেনে যাত্রীদের আধিক্য অপর এক সমস্যা। যাত্রী চাপ লাঘব করার

জন্য আরো কোচ তৈরি করার কারখানা স্থাপনের চেষ্টা চলছে। বর্তমানে দু-ইঞ্জিন দিয়ে ট্রেন চালানো, স্টিম ইঞ্জিনের পরিবর্তে ডিজেল ও ইলেকট্রিক ইঞ্জিনের ব্যবহার, চলতি ট্রেনগুলির যাত্রী পরিবহণ ক্ষমতা বৃদ্ধি, কোচের আয়তন বৃদ্ধি, ডবল ডেকার কোচের প্রবর্তন প্রভৃতি পন্থা গ্রহণ করে যাত্রীদের ভিড়ের চাপ হ্রাস করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

বিনা টিকিটে ভ্রমণকারী রেলযাত্রীর সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি রেল কর্তৃপক্ষের কাছে এক বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে রেলের আয় কমছে। যারা টিকিট কেটে চলাচল করে তাদের দুর্ভোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। যাত্রী ভাড়া বৃদ্ধির চাপ একমাত্র তাদেরই পোহাতে হয়। 1982-83 সনে বিনা টিকিটে যাত্রীর সংখ্যা 22·80 লক্ষ।

সমস্যা

(i) আর্থিক অনটন। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় রেলপথের জন্য 5100 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। রেল মন্ত্রণালয়ের মতে তাদের প্রয়োজন-ভিত্তিক চাহিদার হিসাবে এ অর্থ অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর, 50 শতাংশও নয়। 40 নতুন রেলপথ নির্মাণের কাজ চলছে। এ সমস্ত প্রকল্পের কাজ শেষ করতে 870 কোটি টাকা দরকার (চলতি দামে)। অথচ এজন্য মাত্র 70 কোটি টাকা বরাদ্দ করা সম্ভব হয়েছে। গেজ পরিবর্তনকরণ প্রকল্পের জন্য দরকার প্রায় 600 কোটি টাকা। বরাদ্দ করা হয়েছে মাত্র 50 কোটি টাকা। অপর দিকে, কর্মীদের কল্যাণ ও সুযোগসুবিধা বৃদ্ধির জন্য 1983-84 সনে ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হয়েছে 167·77 কোটি টাকা। 1982-83 সনে এর পরিমাণ ছিল 148·79 কোটি টাকা।

(ii) রেলপথগুলি একাধিক গেজসম্পন্ন হওয়ার ফলে এক গেজ থেকে অন্য গেজে মাল চালনা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে যে শুধু মালই আটকে থাকে তা নয়, ওয়াগন-ব্রেকারদেরও প্রশ্রয় দেয়া হচ্ছে।

(iii) স্টিম ইঞ্জিন অর্থনৈতিক দিক থেকে সমর্থনীয় নয়। সবদিক থেকে বিবেচনা করলে ইলেকট্রিক ইঞ্জিনের প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক। উন্নত দেশ-গুলিতে ইলেকট্রিক ইঞ্জিনের গুরুত্ব অনেক বেশি। সুইজারল্যাণ্ডে প্রায় 99 শতাংশ ইঞ্জিনই বিদ্যুৎ চালিত। আমাদের দেশে এর সংখ্যা 7·8 শতাংশ মাত্র।

(iv) যাত্রী ও মাল চলাচলের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে অথচ সে তুলনায়

কোচ, ওয়াগন ও রেলপথ বৃদ্ধি পাচ্ছে না। পূজা প্রভৃতি উপলক্ষে যাত্রীদের ভিড়ের চাপ লাঘব করার মত পর্যাপ্ত ব্যবস্থারও অভাব।

যাত্রী চলাচল বৃদ্ধি

বছর	যাত্রী কিলোমিটার (বিলিয়ন)
1965-66	96·3
1968-69	106 9
1973-74	135·6
1974-75	126·3
1975-76	148 8
1976-77	163·8
1977-78	176·7
1979-80	192·9

সূত্র :. ষষ্ঠ পরিকল্পনা।

মাল চলাচল বৃদ্ধি

বছর	নীট মেট্রিক টন কিলোমিটার (বিলিয়ন)
1965-66	116·9
1969-70	128·2
1973-74	122·4
1977-78	162·7
1978-79	154·8
1979-80	154·5

সূত্র : ষষ্ঠ পরিকল্পনা।

(v) ভাড়া ও মাস্থল প্রায় প্রতি বছরই বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু সে তুলনায় যাত্রী ও মাল পরিবহণের সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি পাচ্ছে না। মাস্থল নীতির স্থিরতার অভাবে দীর্ঘকালীন বিনিয়োগ পরিকল্পনা বিঘ্নিত হচ্ছে।

(vi) অসাধুতা। কনট্রাক্ট দেয়া, ওয়াগন বণ্টন, কয়লার ওয়াগন অন্য পথে পরিচালিত করা, রিজার্ভেশনের জন্য ঘুষ নেয়া প্রভৃতি অসাধুতা রেল-পথের প্রশাসনের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ষষ্ঠ পরিকল্পনায় রেলপথ

রেলপথের উন্নয়নের জন্য ষষ্ঠ পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

(i) রেলপথকে তার নিজস্ব সম্পদের উপর নির্ভর করতে হবে। উন্নয়নের পথে যেসব অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত বাধা রয়েছে তা দূর করার জন্য তৎপর হতে হবে। এজন্য প্রযুক্তিবিদ্যা ও পরিচালন আধুনিকীকরণ, উন্নততর শিল্প সম্পর্ক স্থাপন, রেলপথের আইনশৃঙ্খলার উন্নতি সাধন, শক্তি সরবরাহ সুনিশ্চিতকরণ ও অধিকতর দক্ষতার সঙ্গে ওয়াগনের ব্যবহার প্রভৃতির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

(ii) 1984-85 সনে রেলপথে মোট 220 বিলিয়ন এমটি কিলোমিটার মাল চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে।

(iii) সম্পদের সীমাবদ্ধতা হেতু যাত্রী পরিবহণের তুলনায় মাল পরিবহণে যথেষ্ট অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(iv) রেলপথগুলির সড়ক পরিবহণের পক্ষে সম্ভব এমন স্বল্প দূরত্বগত ব্যবধান ছাড়া অন্য সবরকম ক্ষেত্রে মাল পরিবহণ করার মত সামর্থ্য অর্জন করতে হবে। ইতিমধ্যে স্বল্প দূরত্বগত পরিবহণ সহ বিক্ষিপ্ত মাঝারি দূরত্ব-গত যাত্রী পরিবহণের দায়িত্ব সড়ক পরিবহণের উপর ছেড়ে দিয়ে অন্যান্য প্রকার পরিবহণের উপর নিজস্ব সামর্থ্য কেন্দ্রীভূত করতে হবে।

(v) শক্তির অভাবের কথা বিবেচনা করে ষষ্ঠ পরিকল্পনায় বিভিন্ন প্রকার পরিবহণের, বিশেষত রেলপথ ও সড়ক, মধ্যে নিবিড় সংযোগ সাধনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে যাতে বর্তমান রেল ওয়াগন-গুলিকে প্রধানত দূরপথে ব্যবহার করা সম্ভব হয়।

(vi) রেলপথ ক্রমেই একটি বিরাট ও জটিল সংস্থার আকার ধারণ করছে। এজন্য আধুনিক পরিচালনা পদ্ধতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে মাসুল নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কম্পিউটারেরর সাহায্য নেয়া বিশেষ প্রয়োজন।

(vii) রেলযাত্রী ও রেল মাসুলের হার বিজ্ঞানসম্মত করা প্রয়োজন যাতে রেল পরিবহণ সম্পদ সৃষ্টির সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছাতে ও ভরতুকিমুক্ত হতে পারে।

বিনিয়োগ ও কর্মসূচী

ষষ্ঠ পরিকল্পনায় রেলপথের জন্য মোট 5100 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। অবশ্য বিনিয়োগের পরিমাণ 6572 কোটি টাকা।

কর্মসূচী ঃ

(i) 1,00,000 ওয়াগন, 5680 কোচ, 390 ই-এম-ইড ও 780 ডিজেল বা বিদ্যুৎচালিত লোকমোটিভ ক্রয় করা।

(ii) 14,000 কিলোমিটার রেলপথ আবার চালু করা।

(iii) চাকা ও চাকার আলের সরবরাহ বৃদ্ধি করার জন্য ব্যাঙ্গালোরের কাছে একটি নতুন চাকা ও চাকার আলের কারখানা স্থাপন করা হবে। রক্ষণাবেক্ষণের উন্নতির জন্য ওয়ার্কসপগুলির আধুনিকীকরণের কর্মসূচী নেয়া হবে।

(iv) 2800 কিলোমিটার রেলপথ বিদ্যুৎযুক্ত করা হবে।

1985-86 সনের রেল বাজেটে বলা হয়েছে, 1600 কিমি রেলপথে শক্তি সঞ্চার করা হচ্ছে, 700 কিমি নতুন লাইন বসানো হচ্ছে, 1500 কিমির গেজ রূপান্তরকরণের কাজ চলছে। 3600 কিমি রেলপথে দ্বিতীয় লাইন বসাবার কাজ সমাপ্তির মুখে।

সড়ক

সড়ক পরিবহণে যাত্রীর সংখ্যা ও মাসুল প্রচুর বৃদ্ধি পেয়েছে।

সড়ক পথে পরিবহণ

বছর	যাত্রী (বিলিয়ন পি-কে-এম'এস)	মাসুল (বিলিয়ন টি-কে-এম'এস)
1950-51	23	5·5
1960-61	57	35·0
1970-71	169	66·0
1973-74	208	67·0
1977-78	250	77·0
1978-79	270	81·0

সূত্র : ষষ্ঠ পরিকল্পনা।

1961 সনে সড়ক পথের মোট দৈর্ঘ্য ছিল 7,26,727 কিলোমিটার, 1979 সনে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় 16,04,110 কিলোমিটার। এ অনুপাতে জাতীয় রাজপথের দৈর্ঘ্য তেমন বৃদ্ধি পায়নি। 1961 সনে জাতীয় রাজপথের দৈর্ঘ্য ছিল 23,798 কিলোমিটার। 1979 সনের মধ্যে এর দৈর্ঘ্য 5540 কিলোমিটার বৃদ্ধি পেয়ে মোট 29,338 কিলোমিটার হয়। জাতীয় রাজপথ মোট সড়কের দৈর্ঘ্যের 5 শতাংশের মত। কিন্তু মোট সড়ক পরিবহণে জাতীয় রাজপথের অংশ 25 থেকে 30 শতাংশ। জাতীয় রাজপথের গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে ষষ্ঠপরিকল্পনায় এর সর্বাধিক উন্নতি সাধনের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে জাতীয় রাজপথের ব্যবস্থায় যে সমস্ত ত্রুটিবিচ্যুতি রয়েছে তা দূর করার কথাও বলা হয়েছে। উন্নয়নের ব্যাপারে উত্তর-পূর্ব অঞ্চলকে প্রাধান্য দেয়ার কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া ভৌগোলিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ সড়ক, কেন্দ্রীয় সাহায্যপ্রাপ্ত আন্তঃরাজ্য সড়ক ও যে সমস্ত সড়কের অর্থনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে সে সমস্ত সড়ক এবং সীমান্ত অঞ্চলের সড়ক সংযোগ প্রথার উন্নতি সাধনের কথাও বলা হয়েছে।

ষষ্ঠ পরিকল্পনায় রাজ্যস্তরে মিনিমাম নিডস প্রোগ্রাম অনুযায়ী গ্রামীণ সড়ক নির্মাণের কর্মসূচী গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। তাতে 1500 ও ততোধিক জনসমষ্টি বিশিষ্ট গ্রামে সারা বছর পরিবহণোপযোগী লিঙ্ক সড়ক তৈরি করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। 1000-1500 জনসমষ্টি বিশিষ্ট গ্রামগুলির

50 শতাংশ গ্রামে 10 বছরের মধ্যে এরূপ সড়ক তৈরি করার উল্লেখও রয়েছে। পাহাড়, উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল, মরুভূমি ও উপকূল অঞ্চলে যেখানে লোকবসতি বিরল সেখানে কয়েকটি গ্রামকে একক রূপে ধরে সড়ক নির্মাণ করা হবে। এরূপ লিঙ্ক সড়ক 20,000 গ্রামে নির্মাণ করা যাবে বলে আশা করা যায়।

যান্ত্রিক সড়কের প্রসার লাভ ঘটেছে। 1950-51 সনে যাত্রী পরিবহণ ক্ষেত্রে যান্ত্রিক সড়কের অংশ 26 শতাংশ ছিল; বৃদ্ধি পেয়ে 1977-78 সনে 59 শতাংশ হয়। মাল পরিবহণ ক্ষেত্রেও সড়ক পরিবহণের অংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। 1950-51 সনে এর অংশ ছিল 11 শতাংশ; বৃদ্ধি পেয়ে 1977-78 সনে 32 শতাংশ হয়েছে।

অ-যান্ত্রিক সড়ক গ্রামাঞ্চলের পরিবহণের বৈশিষ্ট্য। এর উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। শক্তির অভাবের দরুন পশুচালিত (বিশেষত মহিষ) যানের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ বৃদ্ধি পেয়েছে। এদের আধুনিকী-করণের প্রয়োজনীয়তাও স্বীকৃত হয়েছে।

বর্তমানে 55·5 শতাংশ যাত্রী পরিবাহক যান্ত্রিক সড়ক যান পাবলিক সেক্টরভুক্ত। এদের অধিকাংশই লোকসানে চলছে। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় তা রোধ করার জন্য বিবিধ পন্থা গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। সড়ক পথে মাল চলাচলের পরিবহণ প্রধানত প্রাইভেট সেক্টরভুক্ত। আন্তঃরাজ্যে অবাধ মালচলাচলের জন্য জাতীয় পারমিটের সংখ্যা 8,300 থেকে বৃদ্ধি করে 16,000 করা হয়েছে।

উত্তর ও উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলের সড়ক পরিবহণের উন্নয়নের জন্য 1960 সনে বর্ডার রোড়স অর্গানাইজেসন গঠিত হয়। এ সংস্থা পৃথিবীর উচ্চতম সড়ক নির্মাণ করতে সমর্থ হয়েছে। এ সড়কটি হিমাচল প্রদেশের মনালি থেকে কাশ্মীরের লিহ পর্যন্ত বিস্তৃত।

সড়ক উন্নয়নের জন্য প্রথম তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ব্যয়ের পরিমাণ মোট 1,134,86 কোটি টাকা। চতুর্থ ও পঞ্চম পরিকল্পনায় ব্যয়ের পরিমাণ যথাক্রমে 826·94 ও 1348 কোটি টাকা। ষষ্ঠ পরিকল্পনার সড়ক উন্নয়নের জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সেক্টরে ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ যথাক্রমে 2609 ও 830 কোটি টাকা।

সমস্যা

সড়ক পরিবহণ সম্পর্কে যেসব সমস্যার উল্লেখ করা হয় তার মধ্যে রয়েছে নানাবিধ করের চাপ বৃদ্ধি ; বহু চেক-পোস্ট স্থাপন যার ফলে চলাচলই শুধু বিলম্ব হচ্ছে তা নয়, দুর্নীতিও আশ্রয় পাচ্ছে ; পারমিট প্রথায়ও জটিলতা রয়েছে যার ফলে পারমিট বের করা অযথা সময় সাপেক্ষ ও দুর্নীতিমূলক ; তেল, টায়ার প্রভৃতির দাম বৃদ্ধি ও সড়কগুলির দুরবস্থার জন্য রক্ষণাবেক্ষণের বর্ধিত ব্যয় সহ মোট পরিবহণ ব্যয় বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। অথচ সে অনুপাতে যাত্রীভাড়া বা মাসুল বৃদ্ধি পায়নি ফলে সড়ক পরিবহণ ক্ষেত্রে নতুন বেসরকারী বিনিয়োগ আশানুরূপ নয়। মোটর ভিহিকল এ্যাক্ট মূলত সড়ক ও রেলপথের মধ্যে প্রতিযোগিতা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রণীত হয়েছিল। সড়ক ও সড়ক পরিবহণের বর্তমান বিস্তৃতি এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে সড়ক পরিবহণের যে গুরুত্ব তার পরিপ্রেক্ষিতে এ এ্যাক্টের পরিবর্তন প্রয়োজন।

অভ্যন্তরীণ জল পরিবহণ

ভারতের প্রধান নদীগুলির মোট দৈর্ঘ্য প্রায় 5200 কিলোমিটার। এর মধ্যে মাত্র 1700 কিলোমিটার পথে নৌচলাচল হয়ে থাকে। খালপথের দৈর্ঘ্য 4300 কিলোমিটার। 485 কিলোমিটার পথ যন্ত্রচালিত নৌচলাচলের উপযোগী। এর মধ্যে মাত্র 331 কিলোমিটার নৌচলাচলে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

অভ্যন্তরীণ জল পরিবহণ অপেক্ষাকৃত সুলভ। উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে অন্য ধরনের পরিবহণ ব্যবস্থার সুযোগ কম থাকাতে সেখানে জল পরিবহণ ব্যবস্থার গুরুত্ব অসীম বলা চলে। 1975 সনে জলপথে 16 মিলিয়ন এমটি মাল যন্ত্রচালিত যানে চলাচল করে। অর্থাৎ, দেশের স্থল ও জলপথে মোট মাল চলাচলের 0·4 শতাংশ।

অভ্যন্তরীণ জল পরিবহণ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সেক্টরে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ শেষ হয়েছে। যথা, আসামের পাণ্ডু ও যোগীগোপাতে আন্তঃবন্দর নির্মাণ এবং রাজাবাগান ডকইয়ার্ড ও কুলপি ওয়ার্কসপের উন্নয়ন প্রভৃতি।

অভ্যন্তরীণ জল পরিবহণ রাজ্য তালিকাভুক্ত। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় অভ্যন্তরীণ

জল পরিবহণের উন্নয়নের জন্য 45 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। রাজ্য ক্ষেত্রে বরাদ্দের পরিমাণ 27 কোটি টাকা।

অভ্যন্তরীণ জলপথে পরিবহণে সবচেয়ে বড় অসুবিধা এপথে দ্রুত পরিবহণ সম্ভব নয়। তাছাড়া নৌচলাচলের সুবিধা কতিপয় নির্দিষ্ট অঞ্চলে আবদ্ধ থাকার ফলে ও সেচের জন্য জল প্রায় সারা বছর সরবরাহ করার দরুন নৌচলাচল ব্যাহত হয়। এসব সত্ত্বেও দেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চল, কেরল, গোয়া এবং কৃষ্ণা ও গোদাবরী বদ্বীপে অভ্যন্তরীণ জল পরিবহণের গুরুত্ব রয়েছে।

জাহাজ পরিবহণ

ভারতের বহির্বাণিজ্যে জাহাজের এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। দেশের সমুদ্রপথে পরিবহণে জাহাজ টনেজের পরিমাণ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালীন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। 1980 সনের 1 এপ্রিল 319 জাহাজের ওভারসিজ টনেজের মোট পরিমাণ ছিল 5·3 মিলিয়ন জি-আর-টি। 1981 সনের 31 মার্চ ভারতের অপারেশন টনেজের পরিমাণ ছিল 58·89 লক্ষ জি-আর-টি। 1947 সনে এর পরিমাণ ছিল মাত্র 1·92 লক্ষ জি-আর-টি। উন্নতিশীল দেশগুলির মধ্যে ভারতের বাণিজ্য জাহাজের সংখ্যা সর্বাধিক। শিপিং টনেজে ভারতের স্থান পৃথিবীতে পঞ্চদশ।

ভারতীয় ওভারসিজ টনেজ

1 এপ্রিল	জাহাজের সংখ্যা	স্থূল রেজিষ্টার্ড টনেজ (মিলিয়ন)
1956	36	0·24
1961	75	0·55
1966	122	1·22
1974	214	2·83
1980	319	5·29

সূত্র: ষষ্ঠ পরিকল্পনা।

5000 কিলোমিটারবিশিষ্ট উপকূল অঞ্চলে জাহাজ শিল্পের উন্নয়নের যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এ ক্ষেত্রে তেমন উন্নয়ন ঘটেনি, বরঞ্চ অবনতিই দেখা যায়।

উপকূল শিপিং টনেজ

1 এপ্রিল	জাহাজের সংখ্যা	মোট জি-আর-টি (মিলিয়ন)
1956	90	0·24
1961	97	0·31
1966	99	0·32
1974	60	0·26
1980	56	0·25

সূত্র: ষষ্ঠ পরিকল্পনা।

এ অবনতির কারণ অত্যধিক পরিবহণ ব্যয়, বন্দরে বিলম্বন, পরিবহণ গতির মন্থরতা, মাল নাবাবার-ওঠাবার যান্ত্রিক সুবিধার অভাব প্রভৃতি। উপকূল পরিবহণ অভ্যন্তরীণ পরিবহণ প্রথার সহায়ক এবং এতে প্রতি একক পরিবহণে কম শক্তির ব্যবহার হয়। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে উপকূল পরিবহণ প্রথার দ্রুত উন্নয়ন প্রয়োজন।

ষষ্ঠ পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় ক্ষেত্রে জাহাজ শিল্পের জন্য 720 কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে। 705 কোটি টাকা শিপিং ডেভেলপমেন্ট ফাণ্ড কমিটিকে ঋণ ও ভরতুকি বাবদ দেয়া হবে যাতে ভারতীয় শিপইয়ার্ড থেকে জাহাজ ক্রয় ও বিদেশ থেকে গৃহীত ঋণের চুক্তিক্রমে কাজ করা সম্ভব হয়। প্রশিক্ষণ ও জাহাজ কর্মীদের কল্যাণের জন্যও প্রয়োজনীয় অর্থব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে। জাহাজ শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলি যাতে জাহাজ ক্রয় করতে পারে সেজন্য 35·10 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় অতিরিক্ত 2 মিলিয়ন জি-আর-টি সংগ্রহ করার প্রস্তাব রয়েছে।

বর্তমানে আমাদের দেশে 63 শিপিং কোম্পানি আছে। এদের মধ্যে 17 সম্পূর্ণভাবে উপকূল বাণিজ্য, 40 বহির্বাণিজ্য ও বাকী 6 উভয়ের সঙ্গে

(ii) পরিবহণের বর্ধিত চাহিদা মিটাবার জন্য অধিকতর পরিবহণ ক্ষমতা সৃষ্টি করতে হবে।

(iii) যতটা সম্ভব শক্তির, বিশেষত ডিজেল, সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

(iv) বিভিন্ন পরিবহণ ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার যাতে সম্ভব হয় সেজন্য পরিবহণ ক্ষেত্রে যথাসাধ্য সংযোজনার ব্যবস্থা করতে হবে।

(v) যে সমস্ত পরিবহণ প্রকল্পের কাজ চলছে তাদের কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে।

(vi) উৎপাদন ক্ষমতার সম্ভাবনার পূর্ণ সুযোগ নেয়ার জন্য পরিবহণ ক্ষেত্রের চলতি সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার প্রয়োজন।

(vii) সরকারী পরিবহণ মুনাফা-ভিত্তিক করতে হবে যাতে তারা ভরতুকিমুক্ত ও জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির সহায়ক হয়।

(viii) সুদূর ও বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে, যেমন উত্তর-পূর্ব অঞ্চল, পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

22 ব্যাঙ্কিং ও কারেন্সি

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া (আর-বি-আই/ব্যাঙ্ক/রিজার্ভ ব্যাঙ্ক)

আর-বি-আই ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। 1934 সনে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এ্যাক্ট অনুযায়ী ব্যাঙ্কটি প্রতিষ্ঠিত হয়। 1935 সনের 1 এপ্রিল থেকে বেসরকারী শেয়ারহোল্ডার ব্যাঙ্করূপে ব্যাঙ্কটি কাজ সুরু করে।

ব্যাঙ্কের সাধারণ তত্ত্বাবধান ও পরিচালনার দায়িত্ব সেণ্ট্রাল বোর্ড অব ডিরেক্টরস-এর উপর ন্যস্ত। তাছাড়া উপদেষ্টারূপে কয়েকটি লোক্যাল বোর্ড রয়েছে। আর-বি-আই নিম্নলিখিত কাজ করার অধিকারী হয়।

(1) সরকার, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, ব্যাঙ্ক বা যে কোন ব্যক্তির কাছ থেকে বিনা সুদে আমানত গ্রহণ।

(2) প্রকৃত ব্যবসায় সংক্রান্ত লেনদেন থেকে উদ্ভূত 90 দিনের মধ্যে দেয় বিল অব এক্সচেঞ্জ ক্রয়, বিক্রয় ও পুনর্বাটা করা। কৃষি বিল যা সাময়িক কৃষিকার্য বা শস্য বাজারকরণ সম্পর্কে ইস্যু করা হয়েছে, তার দেয় সময় 9 মাস করা হয়।

(3) সিডিউল্ড ব্যাঙ্কগুলির কাছে 1 লক্ষ টাকার সম পরিমাণ ষ্টার্লিং ক্রয়-বিক্রয় করা চলবে।

(4) যুক্তরাজ্যে বা তার যে কোন স্থানে যে বিল অব এক্সচেঞ্জ কাটা হবে তা ক্রয়, বিক্রয় ও পুনর্বাটা করা চলবে। এ সম্পর্কে যে লেনদেন হবে তা সিডিউল্ড ব্যাঙ্কের সঙ্গে করতে হবে।

(5) দেশীয় রাজ্য, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক ও প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ককে ঋণ ও আগাম দেয়া চলবে। এ অর্থ চাহিদামাত্র বা নির্দিষ্ট সময়, 90 দিনের অধিক নয়, উত্তীর্ণ হওয়া মাত্র পরিশোধ করতে হবে। এ ঋণ বা আগামের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় সিকিউরিটি রাখতে হবে।

(6) 90 দিনের মধ্যে পরিশোধনীয় শর্তে স্থানীয় সরকারকে ওয়েজ এণ্ড মিনস সম্পর্কিত আগাম দেয়া যেতে পারে।

(7) ভারত সরকার ও যুক্তরাজ্যের নির্দিষ্ট পরিমাণ সিকিউরিটি ক্রয় ও বিক্রয় করা যেতে পারে।

(8) ভারত সরকার, স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের এজেন্টরূপে স্বর্ণ ও রৌপ্য ক্রয় ও বিক্রয়, সরকারী ঋণ পরিচালনা ইত্যাদি করতে পারবে।

(9) অন্যান্য দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সঙ্গে এজেন্সি-চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারবে।

(10) সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক অন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছ থেকে এক মাসের অনধিককালের জন্য ঋণ গ্রহণ করতে পারবে।

(11) আর-বি-আই-এর নোট ইস্যু করার একচেটিয়া অধিকার থাকবে।

(12) কর্তব্যের স্বার্থে তার যে কোন কাজ করার অধিকার থাকবে।

(13) আর-বি-আই যাতে মুদ্রা আমদানি বিল বাটা করতে সক্ষম হয় সেজন্য যেসব ব্যবসায় সংক্রান্ত হুণ্ডি ভারতে লেখা হয় ও যা ভারতে দেয় তা ক্রয়, বিক্রয় ও পুনর্বাটা করতে পারবে।

(14) ওপেন মার্কেট অপারেশনের কাজ পরিচালনা করা চলবে।

আর-বি-আই নিম্নলিখিত কাজ করার অধিকারী নয়।

(1) দাবিদাওয়া বুঝে পাওয়া ছাড়া কোনপ্রকার বাণিজ্যমূলক কাজে নিযুক্ত হওয়া অথবা পরোক্ষভাবে কোন ব্যবসায় বা শিল্প সংস্থার স্বার্থের সঙ্গে জড়িত হওয়া।

(2) নিজের বা অন্য কোন ব্যাঙ্কের বা কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করা ও তাদের শেয়ারের বিরুদ্ধে ঋণ দেয়া।

(3) স্থাবর সম্পত্তির বিরুদ্ধে আগাম দেয়া অথবা তা ক্রয় করা (কাজ-কর্ম পরিচালনার জন্য নিজস্ব গৃহ প্রভৃতি নির্মাণ ছাড়া)।

(4) আমানতের উপর সুদ দেয়া।

(5) চাহিদামাত্র পরিশোধনীয় নয় এমন বিল ইস্যু করা।

সাম্প্রতিক কাজকর্ম

উল্লিখিত কাজকর্ম ছাড়া সম্প্রতি আর-বি-আই নিম্নলিখিত কাজকর্মও করে থাকে।

(i) সরকারের ব্যাঙ্কার। সরকারের ব্যাঙ্কাররূপে আর-বি-আই সরকারের হিসাবরক্ষক। (a) সে সরকারের ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত লেনদেন

করে থাকে। (b) ট্রেজারী বিল পরিচালনা ও নতুন ঋণপত্র ইস্যু করে থাকে। রাজ্য সরকারগুলিও নতুন ঋণপত্র ইস্যু করা ব্যাপারে আর-বি-আই প্রদত্ত সুযোগসুবিধা গ্রহণ করে থাকে। (c) প্রয়োজনানুসারে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে ট্রেজারী বিল বিক্রয় ও টাকার বাজারের অতিরিক্ত অর্থ তুলে আনার কাজে সাহায্য করে থাকে। রাজ্য সরকার, ব্যাঙ্ক ও অনুমোদিত সংস্থাগুলির জন্যও ট্রেজারী বিল পুনর্বাটা করে থাকে। (d) কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলিকে 90 দিনের মধ্যে পরিশোধনীয় শর্তে ওয়েজ এণ্ড মিনস আগাম দিয়ে থাকে। (e) ব্যাঙ্কিং ও ফিনান্স সংক্রান্ত বিষয় ছাড়া বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যাপারে, পরিকল্পনা ও সম্পদ সংগ্রহসহ, সরকারের উপদেষ্টারূপে কাজ করে থাকে।

(ii) ব্যাঙ্কগুলির ব্যাঙ্কার ও তত্ত্বাবধায়ক। ব্যাঙ্কিং রেগুলেশন এ্যাক্ট, 1949-এ কমার্সিয়াল ও সমবায় ব্যাঙ্কগুলির তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের জন্য আর-বি-আই-এর হাতে প্রচুর ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এ এ্যাক্ট অনুযায়ী প্রত্যেক সিডিউল্ড ব্যাঙ্ককে আর-বি-আই-এর কাছে তাদের চাহিদা দায়ের 5 শতাংশ ও মেয়াদী দায়ের 2 শতাংশ নগদ টাকায় রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বর্তমানে ব্যাঙ্কগুলিকে তাদের মোট আমানত দায়ের 8 শতাংশ রিজার্ভরূপে আর-বি-আই-এর সঙ্গে রাখতে হচ্ছে। অবশ্য এজন্য ব্যাঙ্কগুলি তাদের দুঃসময়ে আর-বি-আইর কাছ থেকে ঋণ পাওয়ার বা বিল অব এক্সচেঞ্জ পুনর্বাটা করার সুযোগ পাচ্ছে।

ব্যাঙ্কগুলির তত্ত্বাবধায়ক ও নিয়ামকরূপে আর-বি-আই ব্যাঙ্কের শাখা-অফিস খোলা, সম্পত্তির নিরাপত্তা, কাজকর্মের পদ্ধতি ও পরিচালনা এবং ব্যাঙ্ক একীকরণ, পুনর্গঠন ও বিলোপন প্রভৃতি বিষয় তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

(iii) ফরিন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভের রক্ষক। আর-বি-আই-এর অন্যতম প্রধান কাজ টাকার বহির্মূল্য রক্ষা করা। এ উদ্দেশ্যে দেশের সমগ্র ফরিন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভ আর-বি-আই-এর হাতে কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে। টাকার বহির্মূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য তার বৈদেশিক বিনিময় লেনদেন করার অধিকার রয়েছে। তাছাড়া তাকে সিডিউল্ড ব্যাঙ্কগুলির কাছে বা তাদের কাছ থেকে কমপক্ষে 1 লক্ষ টাকার বিনিময় মূল্যের বৈদেশিক বিনিময় ক্রয়-বিক্রয় করার ক্ষমতাও দেয়া হয়েছে। বৈদেশিক বিনিময়ের রক্ষক হিসাবে

আর-বি-আই দেশের বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ বিধির প্রশাসনিক কাজ করে থাকে।

(iv) আর-বি-আই-এর প্রধান কাজ অর্থ সংক্রান্ত নীতি রচনা ও কার্যকর করা।

(v) উন্নয়নমূলক কাজকর্ম। জনসাধারণের মধ্যে ব্যাঙ্কিং অভ্যাস বৃদ্ধি, কৃষি-ঋণের প্রসার, বহির্বাণিজ্য ও শিল্পোন্নয়নের জন্য ক্রেডিটের ব্যবস্থা করা আর-বি-আই-এর দায়িত্ব।

(vi) তত্ত্বাবধায়ক। তত্ত্বাবধায়করূপে আর-বি-আইকে যে সমস্ত কাজ-কর্ম করতে হয় তার মধ্যে রয়েছে ; (a) আবেদনকারীকে ব্যাঙ্কিং ব্যবসায় করার লাইসেন্স মঞ্জুর করার পূর্বে তার যোগ্যতা নিরূপণ করা। (b) ব্যাঙ্কিং রেগুলেশন এ্যাক্ট, 1949-এর বিধানগুলি যথাযথ কার্যকর করা হচ্ছে কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্য ব্যাঙ্কগুলির কাজকর্ম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা। (c) তাদের বিনিয়োগের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা যাতে অযৌক্তিক বিনিয়োগের ফলে অর্থের অপচয় না হয়। (d) প্রত্যেকটি ব্যাঙ্ক ও অনুমোদিত আর্থিক সংস্থা ক্রেডিট বাবদ কি পরিমাণ অর্থ মঞ্জুর করেছে সে সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করা ও আবেদনক্রমে তাদের সে সম্পর্কে সংবাদ সরবরাহ করা। (e) আর-বি-আই-এর সম্পূর্ণ মালিকানা ও সহকারীরূপে ডিপোজিট ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন গঠিত হয়েছে। কর্পোরেশনের উদ্দেশ্য কালক্রমে সমস্ত কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কগুলিকে বীমাকৃত ব্যাঙ্করূপে রেজেষ্ট্রি করে নেয়া যাতে সমস্ত ব্যাঙ্ক আমানতকারীরা তাদের আমানত সম্পর্কে একই রকম সংরক্ষণের সুবিধা পেতে পারে।

কৃষিঋণ বিভাগ

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার একটি কৃষিঋণ বিভাগ গঠন করতে হয়। বিভাগটির কাজ ঃ

1. কৃষিঋণ সম্বন্ধে যাবতীয় সমস্যা বিচার বিবেচনা করার জন্য বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ করা ও তাঁদের সঙ্গে ভারত সরকার, স্থানীয় সরকার, রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানের পরামর্শ করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া।

2. কৃষিঋণের ব্যাপারে আর-বি-আইর কাজকর্মের সঙ্গে রাজ্য সমবায়

ব্যাঙ্ক বা অন্য যেসব ব্যাঙ্ক বা প্রতিষ্ঠান যারা কৃষিঋণ সম্পর্কিত কাজকর্মে নিযুক্ত রয়েছে তাদের সংযোগ সাধন।

কৃষিকার্যে প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ সম্পর্কে আর-বি-আইর দায়িত্ব জরুরী প্রয়োজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তার পক্ষে কৃষকদের পরোক্ষে ঋণ দেয়ার জন্য আগাম দেয়া সম্ভবপর নয় বলে ধরা হয়েছে।

আর-বি-আই-এর কৃষিঋণ বিভাগের গঠনতন্ত্র ও কাজকর্ম বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ কর্তৃক বিশেষভাবে সমালোচিত হয়েছে। এর সাময়িক ও জরুরী ঋণ সংস্থান ব্যবস্থা কৃষি শিল্পের আর্থিক প্রয়োজনের স্বল্পাংশই মিটাতে সক্ষম। এ প্রসঙ্গে অনেকে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্কগুলির নীতি অবলম্বনের পক্ষপাতী। ভারতের কৃষকদের আর্থিক প্রয়োজনের পরিধি ও গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে গেলে স্বীকার করা অসঙ্গত নয় যে, আর-বি-আই-এর পক্ষে পরোক্ষে নিয়মিত ও বৃহদায়তন ঋণের ব্যবস্থা করা যুক্তিযুক্ত নয়। বরঞ্চ এর জন্য পৃথক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা প্রয়োজন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এ প্রতিষ্ঠানকে বা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সময়বিশেষে পরোক্ষে বা অপরোক্ষে সাহায্য করবে। পরবর্তীকালে এ যুক্তি গৃহীত ও কার্যকর করা হয়। বর্তমানে ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফর এগ্রিকালচার এণ্ড রুর্যাল ডেভেলপমেণ্টকে (এনবিএআরডি) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার কৃষিঋণ বিভাগের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

আর-বি-আই রাষ্ট্রায়ত্তকরণ

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়াকে রাষ্ট্রায়ত্তকরণের উদ্দেশ্যে 1948 সনে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া (ট্রানসফার টু পাবলিক ওনারসিপ) এ্যাক্ট প্রণীত হয়। এ এ্যাক্ট 1949 সনের 1 জানুয়ারী থেকে কার্যকর হয়। এর বিধানগুলির মধ্যে রয়েছে:

(i) 1949 সনের 1 জানুয়ারী থেকে ব্যাঙ্কের মূলধনের সমস্ত শেয়ার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে হস্তান্তরিত হয়েছে বলে ধরা হবে।

(ii) শেয়ার-হোল্ডারদের ক্ষতিপূরণ বাবদ 100 টাকার আদায়ী শেয়ারের জন্য 118 টাকা 10 আনা দিতে হবে।

(iii) ক্ষতিপূরণ আংশিক বার্ষিক শতকরা 3 টাকা হার সুদযুক্ত প্রমিসরি নোটে ও আংশিক নগদ টাকায় দিতে হবে।

(iv) ব্যাঙ্ক পরিচালনার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ সাপেক্ষ

সেণ্ট্রাল বোর্ডের হস্তেই ন্যস্ত থাকবে। বোর্ডে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন গভর্নর, দু'জন ডেপুটি গভর্নর ও কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক মনোনীত দশজন ডিরেক্টর ও একজন সরকারী অফিসার থাকবে। ডিরেক্টররা চার বছরের জন্য নিযুক্ত হবে। দিল্লী, বোম্বে, কলকাতা ও মাদ্রাজে আগের মতই একটি করে লোক্যাল বোর্ড থাকবে। প্রত্যেক লোক্যাল বোর্ড পাঁচজন মনোনীত সদস্য নিয়ে গঠিত হবে। এঁরা আঞ্চলিক অর্থনৈতিক এবং সমবায় ও দেশীয় রাজ্যগুলির স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করবে।

নোট ইস্যু প্রথা

ভারতে কারেন্সি নোট ইস্যু করার একমাত্র অধিকার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার। অবশ্য এক টাকার নোট ও মুদ্রা এবং তার নিম্ন মূল্যের মুদ্রা ইস্যু করার দায়িত্ব রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার নয়। ভারত সরকারের ফিনান্স ডিপার্টমেণ্টের উপর এ দায়িত্ব ন্যস্ত।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট, 1934 অনুযায়ী আনুপাতিক রিজার্ভ প্রথা অনুযায়ী নোট ইস্যু করা হত। এ প্রথা অনুযায়ী রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার মোট সম্পত্তির অন্তত 40 শতাংশ স্বর্ণমুদ্রা ও বুলিয়ন বা ষ্টার্লিং সিকিউরিটি দ্বারা গঠিত হবে। এতে স্বর্ণের পরিমাণ 40 কোটি টাকা হওয়া চাই। অবশিষ্ট 3/5 অংশ গঠিত হবে টাকা মুদ্রায়, ভারত সরকারের টাকা সিকিউরিটি এবং অনুমোদিত বিল অব এক্সচেঞ্জ ও প্রমিসরি নোটে। অবশ্য টাকা সিকিউরিটি সাধারণত 1/4 অংশ বা 50 কোটি টাকার মধ্যে যা অপেক্ষাকৃত বেশি তার অধিক হতে পারবে না।

1956 সনে ন্যূনতম রিজার্ভ প্রথা গ্রহণ করা হয়। কারণ প্রথমত, উন্নয়নের জন্য অধিক পরিমাণ কারেন্সির প্রয়োজন অনুভূত হয়। তাছাড়া আনুপাতিক রিজার্ভ প্রথায় অর্থনৈতিক প্রয়োজনানুসারে কারেন্সি ইস্যু করার পথে কাঠামোগত নানা বাধা ছিল। দ্বিতীয়ত, উন্নয়নের উদ্দেশ্যে স্বর্ণ ও বৈদেশিক বিনিময় সম্পদ সংরক্ষণের প্রয়োজন ছিল।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া (সেকেণ্ড এমেণ্ডমেণ্ট) এ্যাক্ট 1957 অনুযায়ী রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া কর্তৃক রক্ষিত স্বর্ণমুদ্রা, স্বর্ণ বুলিয়ন ও বৈদেশিক সিকিউরিটির মোট মূল্য কোন সময়ই 200 কোটি টাকার কম হওয়া চলবে না। এর মধ্যে স্বর্ণের মূল্য কমপক্ষে 115 কোটি টাকা হওয়া চাই ও বাকী 85 কোটি টাকা বৈদেশিক সিকিউরিটিতে রাখতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের

পূর্ব অনুমতি সাপেক্ষ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া বৈদেশিক সিকিউরিটি রক্ষার শর্ত বাতিল করে দিতে পারে।

ব্যাঙ্কিং কোম্পানিজ এ্যাক্ট, 1949

1938 সনে দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি ব্যাঙ্ক কাজকর্ম গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। এর ফলে একটি সর্বাঙ্গীণ ব্যাঙ্কিং কোম্পানি এ্যাক্ট-এর প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হয়। 1939 সনে ব্যাঙ্ক বিলের একটি খসড়াও তৈরি করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সুরু হওয়ার দরুন এ ব্যাপারে আলোচনা স্থগিত রাখা হয়। 1944 সনে আইন পরিষদে একটি নতুন ব্যাঙ্কিং বিল উত্থাপন করা হয়। কিন্তু তা কার্যকর করার কোন ব্যবস্থা করা হয় না। 1946 সনে নতুন করে আরেকটি বিল উত্থাপন করা হয়। তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থার কারণে তাও পরিত্যক্ত হয়। 1948 সনের 22 মার্চ গণপরিষদে নতুন একটি বিল উত্থাপন করা হয়। সিলেক্ট কমিটি কর্তৃক সংশোধিত হওয়ার পরে এ বিলটি পাস হয় ও ব্যাঙ্কিং কোম্পানিজ এ্যাক্ট, 1949 নামে অভিহিত হয়। এর প্রধান বিধানগুলি, যথা:

(1) ব্যাঙ্কিং বলতে বুঝাবে ঋণ দেয়া বা বিনিয়োগ করার উদ্দেশ্যে জনসাধারণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ করা। এ আমানত চাহিদা মাত্র বা অন্যভাবে দেয় ও চেক, ড্রাফট, আজ্ঞাপত্র দ্বারা বা অন্যপ্রকারে উঠানো চলবে।

(2) ভারতের কোন প্রদেশ ছাড়া অন্য কোন স্থানে সংগঠিত ব্যাঙ্কিং কোম্পানির আদায়ী মূলধন ও রিজার্ভের মোট মূল্য অন্তত 15 লক্ষ টাকা হওয়া চাই। এরূপ কোম্পানির যদি বোম্বে বা কলকাতা অথবা এ দু' স্থানেই ব্যবসায়ের স্থান বা একাধিক স্থান থাকে তাহলে এর পরিমাণ 20 লক্ষ টাকা হতে হবে। অ-ভারতীয় এরূপ কোম্পানি এ আইনের শর্তাদি তখনই পূর্ণ করেছে বলে ধরা হবে যখন উহা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সঙ্গে নগদ টাকায় বা অনুমোদিত সিকিউরিটিতে নিম্নতম দেয় অর্থ গচ্ছিত রাখবে। অন্য কোন ব্যাঙ্কিং কোম্পানির, অর্থাৎ, যে কোম্পানি ভারতে সংগঠিত, আদায়ী মূলধন ও রিজার্ভের মোট মূল্য এর কম হতে পারবে না। যদি এর একাধিক প্রদেশে ব্যবসায় থাকে তবে—

(a) 5 লক্ষ টাকা। যদি এর মধ্যে কোন স্থান বোম্বে সিটি বা কলকাতা বা উভয়ই হয় তবে এর পরিমাণ 10 লক্ষ টাকা।

(b) যদি এর সব ব্যবসায়ের স্থান একই প্রদেশে হয় এবং যার একটিও বোম্বে সিটি বা কলকাতায় অবস্থিত নয়, তাহলে এর প্রধান ব্যবসায়ের কেন্দ্রের জন্য 1 লক্ষ টাকা ও যে জেলাতে প্রধান কেন্দ্র অবস্থিত সে জেলার অন্য প্রত্যেকটি ব্যবসায় কেন্দ্রের জন্য 10 হাজার টাকা ও সে জেলার বাইরে কিন্তু সে প্রদেশের অন্তর্গত অন্য প্রতিটি ব্যবসায় কেন্দ্রের জন্য 25 হাজার টাকা। তবে মোট মূল্য 5 লক্ষ টাকার বেশি হবে না।

(c) যদি এর ব্যবসায়ের স্থান একটি মাত্র হয় তবে 50 হাজার টাকার বেশি নয়।

(d) যদি এর সব ব্যবসায়ের স্থান একই প্রদেশে সীমাবদ্ধ থাকে ও এক বা একাধিক স্থান বোম্বে সিটি বা কলকাতা হয় তবে 5 লক্ষ টাকা এবং বোম্বে সিটি বা কলকাতার বাইরে প্রত্যেকটি ব্যবসায়ের স্থানের জন্য 25 হাজার টাকা। কিন্তু মোট মূল্য কোন ক্রমেই 10 লক্ষ টাকার অধিক হতে পারবে না।

(3) ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের ধরন বলতে বুঝাবে অবলিখন পরিচালন এবং কোন কোম্পানি, কর্পোরেশন বা এসোসিয়েশনের শেয়ার, ষ্টক বা ডিবেঞ্চারে অংশগ্রহণ ও ইস্যু করা।

(4) রক্ষিত বা ক্রীত সিকিউরিটির অর্থ পাওয়া বা অপরের জন্য কোন বাণিজ্যে নিযুক্ত হওয়া অথবা দ্রব্য ক্রয় বা বিক্রয় বা দ্রব্যের পরিবর্তে দ্রব্য বিনিময় ছাড়া কোন ব্যাঙ্কিং কোম্পানি পরোক্ষে বা অপরোক্ষে কোন দ্রব্য ক্রয় বা বিক্রয় বা দ্রব্যের পরিবর্তে দ্রব্য বিনিময় ব্যবসায়ে নিযুক্ত হতে পারবে না।

(5) ভারতের কোন প্রদেশেই কোন কোম্পানি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া প্রদত্ত লাইসেন্স ছাড়া কোন ব্যাঙ্কিং কাজকর্ম করতে পারবে না।

(6) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া যে কোন সময় বা কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে যে কোন ব্যাঙ্কিং কোম্পানির হিসাবপত্র পরীক্ষা করে দেখতে পারবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার রিপোর্ট বিবেচনার পর সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কিং কোম্পানির বক্তব্য শুনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীচীন মনে করলে ব্যাঙ্কটিকে নতুন আমানত গ্রহণ না করতে বা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়াকে এর কাজকর্ম গুটিয়ে ফেলার আবেদনের জন্য নির্দেশ দিতে পারে। প্রত্যেক ব্যাঙ্কিং কোম্পানিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার কাছে মাসিক রিটার্ন দাখিল

করতে হবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ব্যাঙ্কিং কোম্পানিগুলিকে তার কাছে প্রতি ছ' মাস অন্তর শিল্প, বাণিজ্য বা ব্যবসায়ে তাদের দাদন ও বিনিয়োগের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কিত তথ্যাদি পাঠাবার নির্দেশ দিতে পারে।

(7) নন-সিডিউল্ড ব্যাঙ্ককে নিজের সঙ্গে নগদ টাকায় রিজার্ভ বা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সঙ্গে তার মেয়াদী দায় ও চাহিদা দায়ের যথাক্রমে 2 শতাংশ ও 5 শতাংশ অর্থ ব্যালেন্স হিসাবে রাখতে হবে। সিডিউল্ড ব্যাঙ্ককেও তার মেয়াদী ও চাহিদা দায়ের বিরুদ্ধে সমহারে অর্থ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে ব্যালেন্স হিসাবে রাখতে হবে। তাছাড়া সিডিউল্ড ও নন সিডিউল্ড উভয় প্রকার ব্যাঙ্ককেই তাদের মেয়াদী ও চাহিদা দায়ের কম-পক্ষে 20 শতাংশ নগদ টাকায়, স্বর্ণে বা অনুমোদিত সিকিউরিটিতে রাখতে হবে। পরবর্তীকালে ব্যাঙ্কিং কোম্পানিজ এ্যাক্ট ব্যাঙ্কিং রেগুলেশন এ্যাক্ট নামে অভিহিত হয়।

মন্তব্য

ব্যাঙ্কিং কোম্পানিজ এ্যাক্ট, 1949 ব্যাপকতা ও কার্যকারিতায় পূর্ববর্তী সমস্ত সম্পর্কিত আইনকে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে। এ আইনে আমানতকারীদের স্বার্থ অধিকতর নিরাপদ হয়েছে। বৈদেশিক ব্যাঙ্কগুলি নানা অসঙ্গত সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। নন-সিডিউল্ড ব্যাঙ্কগুলির উপর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে তোলা হয়েছে।

ব্যাঙ্কিং কোম্পানিজ (এমেণ্ডমেণ্ট) এ্যাক্ট

ব্যাঙ্কিং কোম্পানিজ এ্যাক্ট, 1949, 1950, 1956, 1959, 1960 ও 1962 সনে সংশোধিত হয়।

1950 সনের সংশোধিত আইনে ব্যাঙ্কিং কোম্পানিগুলিকে একীভূত করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে। এই আইনের ফলে 1949 সনের ব্যাঙ্কিং কোম্পানিজ এ্যাক্টের বিধানগুলি, জম্মু ও কাশ্মীর ছাড়া, ভারতের সর্বত্র প্রয়োগ করা সম্ভব হয়েছে।

1956 সনের সংশোধিত আইনে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়াকে ব্যাঙ্কের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের কাজকর্ম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার ও সিডিউল্ড ব্যাঙ্কগুলির বোর্ড অব ডাইরেক্টারস-এর সভাতে যোগদান করার জন্য পর্যবেক্ষক নিযুক্ত করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া এ সংশোধিত

আইন দ্বারা ব্যাঙ্কগুলিকে বিদেশে সহযোগী কোম্পানি গঠন করার সুযোগ দেয়া হয়েছে।

1960 সালের ব্যাঙ্কিং কোম্পানিজ (সেকেণ্ড এমেণ্ডমেণ্ট) এ্যাক্ট-এ ব্যাঙ্কিং কোম্পানিজ এ্যাক্ট, 1949-এর 44A ধারা সংশোধন করা হয় যাতে ব্যাঙ্কগুলি কোম্পানিজ এ্যাক্ট, 1956-এর 396 ধারার বাধ্যতামূলক সংমিশ্রণ-এর সুযোগ গ্রহণ করতে পারে।

1960 সনে মহারাষ্ট্রের লক্ষ্মী ব্যাঙ্ক ও কেরলের পলাই সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক কাজকর্ম গুটিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে সরকার কর্তৃক ডিপোজিট ইনসিওরেন্স কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কর্পোরেশন 1962 সনের পহেলা জানুয়ারী থেকে কার্যকর হয়। 1962 সনের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এমেণ্ডমেণ্ট এ্যাক্ট-এ সিডিউল্ড ব্যাঙ্কগুলিকে তাদের চাহিদা ও মেয়াদী দায়ের 25 শতাংশ তরল সম্পদরূপে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়। ব্যাঙ্কিং কোম্পানিজ (এমেণ্ডমেণ্ট) এ্যাক্ট 1962-এর পরে যেসব ভারতীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয় তাদের ন্যূনতম গৃহীত মূলধনের পরিমাণ 5 লক্ষ টাকা নির্দিষ্ট করা হয়। পূর্বে এর পরিমাণ ছিল 50 হাজার টাকা।

ব্যাঙ্কিং লজ (এমেণ্ডমেণ্ট) এ্যাক্ট, 1983

ব্যাঙ্কিং লজ (এমেণ্ডমেণ্ট) এ্যাক্ট, 1983, 1984 সনের ফেব্রুয়ারী থেকে বলবৎ হয়।

ব্যাঙ্কিং রেগুলেশন এ্যাক্ট, 1949 (পূর্বতন ব্যাঙ্কিং কোম্পানিজ এ্যাক্ট 1949)-এর বিভিন্ন ধারা এ এমেণ্ডমেণ্ট দ্বারা সংশোধন করা হয়। তাছাড়া কয়েকটি নতুন ধারাও এতে যুক্ত হয়। যথা—

(i) কোন ব্যাঙ্কিং কোম্পানির চেয়ারম্যানের পদ শূন্য থাকলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া সে পদে চেয়ারম্যান নিয়োগ করতে পারবে।

(ii) চেয়ারম্যান ও পূর্ণ সময়ের জন্য নিযুক্ত ডাইরেক্টর ছাড়া অন্য কোন ডাইরেক্টর কোন ব্যাঙ্কিং কোম্পানিতে একাদিক্রমে আট বছরের বেশি সে পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবে না।

(iii) প্রত্যেক নন-সিডিউল্ড ব্যাঙ্ককে তাদের চাহিদা ও মেয়াদী দায়ের ন্যূনতম 3 শতাংশ ক্যাশ রিজার্ভ বা নগদ তহবিলরূপে ভারতে রাখতে হবে।

(iv) কোন ব্যাঙ্কিং কোম্পানি নিজে বা অন্যকারো পক্ষ থেকে এমন কোন কোম্পানিকে ঋণ বা আগাম দিতে পারবে না যে কোম্পানিতে ব্যাঙ্কিং

কোম্পানিটির বা তার সহযোগী বা হোল্ডিং কোম্পানির কোন ডাইরেক্টর ডাইরেক্টর, ম্যানেজিং এজেন্ট, ম্যানেজার, কর্মচারী অথবা জামিনদাররূপে যুক্ত রয়েছে অথবা উহাতে তার বিশেষ স্বার্থ রয়েছে। অবশ্য ব্যাঙ্কিং কোম্পানিটির নিজস্ব সহযোগী কোম্পানি অথবা সরকারী কোম্পানি অথবা যে কোম্পানি কোম্পানি এ্যাক্টের 25 ধারা অনুযায়ী রেজিষ্ট্রিকৃত সেগুলি এ সংশোধিত ধারার আওতায় আসবে না। পাবলিক সেক্টরের ব্যাঙ্কগুলি সম্পর্কে এ বিধানের কিছুটা ব্যতিক্রম রাখা হয়েছে।

ব্যাঙ্কিং লজ (এমেণ্ডমেণ্ট) এ্যাক্ট, 1984

ব্যাঙ্কিং লজ (এমেণ্ডমেণ্ট) বিল 1984 সনের আগস্টে রাজ্যসভাতে গৃহীত হয়। পূর্বে উহা লোকসভার অনুমোদন লাভ করে। এ বিল এ্যাক্টে পরিণত হওয়ার ফলে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার কর্মীদের বোনাস পাওয়ার ব্যাপারে অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক কর্মীদের সমস্তরে নিয়ে আসা হয়। উল্লেখ্য, স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার কর্মীদের বছরে দু'বার বোনাস দেয়া হত। এ এ্যাক্টে তার পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

অর্থ সম্পর্কিত

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার অর্থ সম্পর্কিত সংক্ষেপে "ক্রেডিটের নিয়ন্ত্রিত প্রসার" বলা চলে। যুগপৎ ক্রেডিটের প্রসার ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য দাম বৃদ্ধি সংযত করা অথচ উৎপাদনশীল কাজকর্ম যাতে ক্রেডিটের অভাবে ব্যাহত না হয় তা সুনিশ্চিত করা। 1952 সন থেকে এ নীতি অনুসৃত হয়ে আসছে। এ নীতি রূপায়ণের জন্য আর-বি-আই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অধিকারে ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যেসব পদ্ধতি আছে তা সূক্ষ্মভাবে প্রয়োগ করে যাচ্ছে।

ব্যাঙ্ক রেটের সাহায্যে ক্রেডিট পাওয়ার ও ক্রেডিট গ্রহণজনিত উৎপাদন ব্যয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করা যায়। আর-বি-আই ব্যাঙ্ক রেট প্রয়োগ-দ্বারা ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণে বিশেষ উৎসাহী নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, 1974 সনে ব্যাঙ্ক রেট 9 শতাংশ করা হয়। 1981 সনের আগস্টে তা বৃদ্ধি করে 10 শতাংশ করা হয়। অর্থাৎ, প্রায় 7 বছর পর ব্যাঙ্ক রেটের পরিবর্তন করা হয়।

আর-বি-আই ওপেন মার্কেট অপারেশনের সাহায্য প্রায়ই গ্রহণ করে থাকে। উহা যে পরিমাণ সিকিউরিটি বিক্রয় করে তা অপেক্ষা বেশি পরিমাণ সিকিউরিটি ক্রয় করে। সিকিউরিটি ক্রয় করার আধিক্যের কারণ জনঋণ

গ্রহণের জন্য সরকার যে প্রচুর পরিমাণে সিকিউরিটি বাজারে ছেড়েছে তার চাহিদা ও দাম স্থিতিশীল রাখা।

আর-বি-আই প্রায়ই ক্যাশ রিজার্ভের অনুপাত পরিবর্তন করে থাকে। 1973 সনের জুনে ক্যাশ রিজার্ভের অনুপাত 3 শতাংশ থেকে 5 শতাংশ করা হয়। সে বছরের সেপ্টেম্বরেই আবার তা পরিবর্তন করে 7 শতাংশ করা হয়। পরে তা হ্রাস করে মোট আমানতের 4 শতাংশ করা হয়। 1976 সনের নভেম্বরে ক্যাশ রিজার্ভের অনুপাতের হার বৃদ্ধি করে 6 শতাংশ করা হয়। তারপর ধাপে ধাপে 9 এপ্রিল 1982 সনে তা 7·25 শতাংশ করা হয়। 1982 সনের জুনে তা কমিয়ে 7 শতাংশ ও পরে 1983 সনের 27 মে 7·5 শতাংশ ও 29 জুলাই 8 শতাংশ করা হয়। অনুমিত হয় যে, ক্যাশ রিজার্ভের পরিমাণ 1 শতাংশ বৃদ্ধি করলে ক্রেডিটের পরিমাণ 100 কোটি টাকা হ্রাস পায়। ক্যাশ রিজার্ভের অনুপাত বৃদ্ধির প্রবণতা দ্বারা এই প্রমাণিত হয় যে, ব্যাঙ্ক সম্প্রতি ক্রেডিট সঙ্কোচন নীতি গ্রহণ করেছে।

স্ট্যাটুটারী লিকিউডিটির অনুপাতের (অর্থাৎ, কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কগুলিকে তাদের মোট আমানতের যে অংশ ক্যাশ রিজার্ভরূপে বাধ্যতামূলকভাবে নিজেদের কাছে রাখতে হয়) ঊর্ধ্বমুখী পরিবর্তন ঘটেছে। ব্যাঙ্কিং রেগুলেশন এ্যাক্ট অনুযায়ী ব্যাঙ্কগুলিকে নগদ টাকা, স্বর্ণ অথবা কোনপ্রকার দায়গ্রস্ত নয় এমন অনুমোদিত সিকিউরিটিতে মোট চাহিদা ও মেয়াদী আমানতের অন্তত 20 শতাংশ তরল সম্পদরূপে রাখতে হয়। 1962 এ এ্যাক্টের সংশোধন করে ক্যাশ রিজার্ভের পরিমাণ 25 শতাংশ করা হয় ও আর-বি-আইকে প্রয়োজনমত এর পরিমাণ নির্ধারণ করার ক্ষমতা দেয়া হয়। আর-বি-আই-এর পরিমাণ 25 শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে 1972 সনের নভেম্বরে 30 শতাংশ, 1978 সনে 34 শতাংশ ও 1981 সনে 35 শতাংশ করে। ক্রমাগত এ বৃদ্ধির উদ্দেশ্য ব্যাঙ্কগুলির ক্রেডিট দেয়ার ক্ষমতা হ্রাস করে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করার প্রচেষ্টা ও ব্যাঙ্কগুলিকে অধিক পরিমাণ অনুমোদিত সিকিউরিটি ক্রয় করার জন্য প্ররোচিত করা।

ব্যাঙ্কিং রেগুলেশন এ্যাক্টে আর-বি-আইকে সিলেকটিভ ক্রেডিট কণ্ট্রোল-এর অধিকার দেয়া হয়েছে। আর-বি-আই ব্যাঙ্কগুলিকে নির্বাচিত সিকিউরিটির বিরুদ্ধে ক্রেডিট দেয়ার ব্যাপারে ন্যূনতম মার্জিন নির্ধারণ করে দিচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ক্রেডিট দেয়ার উচ্চতম সীমা নির্দিষ্ট করে

দিচ্ছে। আবার কোন কোন আগামের ক্ষেত্রে সুদের হারের পার্থক্য করার অনুমতি দিচ্ছে। বর্তমানে খাদ্যশস্য, তুলা ও কার্পাস, তৈলবীজ ও তেল, বনস্পতি, চিনি, গুড় এবং সুতী বস্ত্র (সুতাসহ), দ্রব্যের উপর সিলেকটিভ ক্রেডিট কণ্ট্রোল প্রয়োগ করা হচ্ছে।

আমাদের দেশে ক্রেডিট পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব সম্বন্ধে প্রথম ধারণা প্রথম পরিকল্পনায় সূচিত হয়। এরই ফলে 1970 সনের এপ্রিলে আর-বি-আই-এর অঙ্গীভূতরূপে "ক্রেডিট প্ল্যানিং সেল" প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সেলের উদ্দেশ্য দাম স্থিতিশীল রাখার জন্য টাকার যোগান ও ক্রেডিটের প্রসার নিয়ন্ত্রণ ; দুর্বল ক্ষেত্রে ও খাদ্য সংগ্রহ, সার বণ্টন, রপ্তানির উন্নয়ন প্রভৃতি ব্যাপারে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ক্রেডিট দেয়া ; আর্থিক উন্নয়নের জন্য জাতীয় পরিকল্পনায় গৃহীত অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিভিন্ন পাবলিক ও প্রাইভেট সেক্টরভুক্ত শিল্প এবং গ্রাম, অঞ্চল ও অনুন্নত জেলাগুলিতে অধিকতর পরিমাণে ক্রেডিট দেয়া সম্পর্কিত পরিকল্পন।

ক্রেডিট পরিকল্পনার সাফল্য উল্লেখ্য নয়। আশানুরূপ সাফল্য না হওয়ার কারণ ব্যাঙ্কগুলির প্রায় 75 শতাংশ সম্পদ পরিকল্পনা অনুযায়ী উন্নয়ন কাজে পাওয়া যায় না। প্রাইভেট সেক্টরভুক্ত মধ্য ও বৃহৎ শিল্পগুলিকে এবং পাইকারী ব্যবসায়ীদের ব্যাঙ্ক ক্রেডিট দেয়া ব্যাপারে কম অগ্রাধিকার দেয়ার উপর জোর দেয়ার ফলে ক্রেডিট পরিকল্পনা নীতি বিপরীত ফল প্রদর্শন করেছে। তাছাড়া উৎপাদন ও বণ্টনের সঙ্গে ক্রেডিট যুক্তকরণের প্রক্রিয়ার অভাব এবং ব্যাঙ্কগুলির নিজস্ব ক্রেডিট বাজার, পারফরম্যানস বাজেট ও জেলা ক্রেডিট পরিকল্পনার মধ্যে সংযোজনের অভাবও এ অসাফল্যের অন্যতম কারণ।

1983 সনে তেজী সময়কালীন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া কর্তৃক ঘোষিত নীতিও "দামের স্থিতিসহ উন্নয়ন" এ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। খাদ্য ও রপ্তানি ক্রেডিটের বিরুদ্ধে রিফিনান্সের পরিমাণ যথাক্রমে 100 শতাংশ ও 125 শতাংশ করা হয়েছে। খাদ্য ক্রেডিটের বিরুদ্ধে রিফিনান্সের পরিমাণ বৃদ্ধি করে 3,300 কোটি টাকা করা হয়। এর উদ্দেশ্য পরোক্ষে ব্যাঙ্ক সিকিউরিটির পরিমাণ হ্রাস করা। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার অভিমত, ব্যাঙ্কগুলি তাদের আমানত বৃদ্ধি করবে ও সে টাকা থেকে খাদ্য নয় এমন দ্রব্যাদির ক্রেডিটের চাহিদা মিটাবে।

সাম্প্রতিক নীতি

1983 সনের এপ্রিলের শেষাশেষি যে ক্রেডিট নীতি ঘোষণা করা হয় তার প্রধান লক্ষ্য ছিল রিজার্ভ অর্থের দ্রুত বৃদ্ধির ফলে যে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় তার প্রভাব হ্রাস করা। এ উদ্দেশ্যে যে সমস্ত পন্থা অবলম্বন করা হয় তা নিম্নরূপ।

(i) ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও 7 শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে 8 শতাংশ করা হয়। এ বৃদ্ধি দু-কিস্তিতে করা হয়: 28 মে থেকে 7·5 শতাংশ ও 30 জুলাই থেকে 8 শতাংশ। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সঙ্গে ব্যাঙ্কগুলিকে যে আইন নির্দিষ্ট ন্যূনতম 3 শতাংশ ক্যাশ ব্যালেন্স রাখতে হয় 10 শতাংশ বর্ধিত ক্যাশ রিজার্ভ রেশিওর অধীনে অতিরিক্ত ক্যাশ ব্যালেন্স সহ তার অতিরিক্ত রক্ষিত ক্যাশ ব্যালেন্সের উপর সুদের হার 1 মে থেকে 8 শতাংশের স্থানে 9 শতাংশ করা হয়।

(ii) 1983 সনের 1 জুলাই থেকে ব্যাঙ্কগুলিকে অনাদায়ী খাদ্য ক্রেডিটের 2,500 কোটি টাকার পরিবর্তে 2,800 কোটি টাকার উপর 100 শতাংশ রিফিনান্স দেয়া হয়।

(iii) নতুন 20-দফা কর্মসূচীর সমর্থনে ও ক্রেডিট নীতি দ্বারা বণ্টন কার্যক্রমকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে সুদের কাঠামোর পরিবর্তন করা হয়। যথা, সারের খুচরো ব্যবসায়, বীজ উৎপাদন ও বণ্টনের কাজে নিযুক্ত সংস্থা এবং পেশাদার বা স্বনিযুক্ত তপশীলী জাতি, তপশীলী উপজাতি ও স্ত্রীজাতি।

1983 সনের 27 আগস্ট থেকে সিডিউল্ড কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কগুলির ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও 8 শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে 8·5 শতাংশ করা হয়।

1983 সনের অক্টোবরে মুদ্রানীতি সম্পর্কিত যেসব পন্থা গ্রহণ করা হয় তার মধ্যে উল্লেখ্য—

(i) অনাদায়ী খাদ্য ক্রেডিট যার উপর 100 শতাংশ রিফিনান্স দেয়া হত 1983 সনের 25 নভেম্বর থেকে তার পরিমাণ 2800 কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি করে 3300 কোটি টাকা করা হয়।

(ii) রপ্তানি ক্রেডিট বৃদ্ধি করার জন্য এর রিফিনান্সের প্রসার সাধন করা হয়। 1983 সনের 25 নভেম্বর থেকে ব্যাঙ্কগুলিকে 1982 সনের

মাসিক গড় স্তরের উপর রপ্তানি ক্রেডিট বৃদ্ধির 125 শতাংশ রিফিনান্সের সুবিধা দেয়া হয়।

(iii) পূর্বে স্বল্পমেয়াদী কৃষিঋণের উপর সুদের হার ঋণের পরিমাণের সঙ্গে পরিবর্তিত হত। এর পরিবর্তন সাধন করা হয়।

কৃষিদের জন্য স্বল্পমেয়াদী ঋণ	সুদের হার (বার্ষিক শতাংশ)	
	1983 সনের 20 অক্টোবরের পূর্বে সুদের হার	পরিবর্তিত হার
1. 5,000 টাকা পর্যন্ত	11·5	11·5
2. 5,000 টাকার বেশি ও 10,000 টাকা পর্যন্ত	14·0 অনধিক	12·5
3. 10,000 টাকার বেশি ও 25,000 টাকা পর্যন্ত	14·0 অনধিক	14·0 অনধিক
4. 25,000 টাকার বেশি	16·5 অনধিক	16·5 অনধিক

সূত্র: রিপোর্ট অন কারেন্সি এণ্ড ফিনান্স 1983-84, Vol. I, p. 140, আর-বি-আই।

(iv) পরিবহণ চালনায় যারা ছুটো যানের মালিক তাদের ক্ষেত্রে সুদের হার 12·5 শতাংশ করা হয়। পূর্বে এর হার ছিল একটি যানের মালিকের ক্ষেত্রে 12·5 শতাংশ ও ছুই বা ততোধিক যানের মালিকদের ক্ষেত্রে 15·0 শতাংশ।

(v) কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির এজেন্সিরূপে যারা সরকার নির্ধারিত সমর্থন দামে ডাল ও তৈলবীজ সংগ্রহ কাজে নিযুক্ত তাদের ক্ষেত্রে সুদের হার 15·0 শতাংশ করা হয়। পূর্বে তৈলবীজ ক্ষেত্রে সুদের হার ছিল 16·5 শতাংশ।

বলা বাহুল্য, নতুন 20 দফা কর্মসূচীর সমর্থনে এসব সুদের হারের পরিবর্তন করা হয়।

1984 সনের 27 জানুয়ারী থেকে ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও নীট চাহিদা ও মেয়াদী দায়ের 8·5 শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে 9 শতাংশ করা হয় এবং 1984 সনের 4 ফেব্রুয়ারী থেকে তা কার্যকর হয়।

1984 সনের 30 এপ্রিল 1984-85 সনের প্রথমার্ধের ক্রেডিট নীতি ঘোষণা করা হয়। 1983-84 সনের ক্রেডিট নীতির পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় যে, 1983-84 সনে M_3 17 শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া প্রাথমিক অর্থ বৃদ্ধির পরিমাণ অত্যধিক বলে ধরা হয়েছে যার ফলে মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা আশঙ্কাজনকরূপে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ আশঙ্কার বিশেষ কারণ 1984-85 সনে খাদ্যশস্যের সার্বিক বৃদ্ধির হার 1983-84 সনের তুলনায় কম হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া সর্বোচ্চ পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপন্ন হওয়া সত্ত্বেও 1983-84 সনে পাইকারী দাম প্রায় 9 শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এ অবস্থায় 1984-85 সনে সামগ্রিক তারল্য (M_3) বৃদ্ধির পরিমাণ ও রিজার্ভ অর্থ সৃষ্টির হার হ্রাস করা অনিবার্য হয়ে ওঠে।

এ পটভূমিতে 1984-85 সনের ক্রেডিট নীতিতে নিম্নলিখিত পরিবর্তন সাধন করা হয়।

(i) স্ট্যাটুটারী লিকিউডিটি রেশিও মোট চাহিদা ও মেয়াদী দায়ের 35 শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে 36 শতাংশ করা হয়। দু' কিস্তিতে এ বৃদ্ধি সম্পন্ন হয়। প্রথম, 35·5 শতাংশ ; 1984 সনের 28 জুলাই থেকে এ হার কার্যকর করা হয়। দ্বিতীয়, 36 শতাংশ ; 1984 সনের 1 সেপ্টেম্বর থেকে এ হার কার্যকর করা হয়। স্বল্পকালীন জরুরী পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার জন্য ব্যাঙ্কগুলিকে স্বেচ্ছামূলক রিফিনান্স দেয়ার নীতি অক্ষুণ্ণ রাখা হয়। স্ট্যাটুটারী লিকিউডিটি রেশিওর পরিবর্তনের ফলে প্রাথমিক অর্থ প্রজনন বৃদ্ধি না করে গুরুত্বপূর্ণ পাবলিক সেক্টরে বিনিয়োগ সম্পদ সরবরাহ বৃদ্ধি সম্ভব হয়।

(ii) 10 শতাংশ বর্ধিত ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও অনুযায়ী ব্যাঙ্কগুলির কাছে 1980 সনের 31 অক্টোবর যে অতিরিক্ত নগদ টাকা ধরা ছিল স্থিরীকৃত হয় যে, 1984 সনের 29 সেপ্টেম্বর ও 1984 সনের 27 অক্টোবর দুটি সমান কিস্তিতে তার এক-পঞ্চমাংশ ছেড়ে দেয়া হবে। এর পরিমাণ দাঁড়াবে 372 কোটি টাকা। পরিবর্তিত অবস্থাতে এ অর্থ ছেড়ে দেয়ার সময়কাল

পরিবর্তন করে যথাক্রমে 1984 সনের 27 অক্টোবর ও 1 ডিসেম্বর করা হয়।

(iii) কোন ব্যাঙ্ক যদি এককভাবে বা অন্যান্য ব্যাঙ্কের সঙ্গে যুক্তভাবে তিন বছরের অধিককাল সময়ের জন্য কোন প্রাইভেট সেক্টরের ঋণগ্রহণ-কারীকে 50 লক্ষ টাকার অধিক অথবা পাবলিক সেক্টরভুক্ত বা রপ্তানি-ভিত্তিক প্রাইভেট সেক্টরভুক্ত ম্যানুফ্যাকচারিং সংস্থাকে 1 কোটি টাকা ব্যক্তিগত মেয়াদী ঋণ দিতে চায় তবে তাকে পূর্বে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার অনুমোদন নিতে হবে। পরবর্তী সময়ে প্রতিক্ষেত্রের জন্য এ ঋণদানের পরিমাণ 1 কোটি টাকা করা হয়।

1984-85 সনের ক্রেডিট নীতির অন্যান্য উল্লেখ্য বিষয়ের মধ্যে রয়েছে, তপশীলী জাতি ও তপশীলী উপজাতি যাতে সহজে ব্যাঙ্ক ক্রেডিট পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা, ক্ষুদ্র সরবরাহকারী শিল্পগুলি যাতে বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প সংস্থাগুলি থেকে তাদের প্রাপ্য সহজে পেতে পারে তা সুনিশ্চিত করা এবং গৃহনির্মাণের জন্য অর্থসাহায্য করা।

উপসংহার

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থনীতি সাফল্য অর্জন করেছে বলা চলে না। বিশেষত মুদ্রাস্ফীতিজনিত দাম বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এর সাফল্য আদৌ উল্লেখযোগ্য নয়। এর কারণ প্রধানতঃ (a) নন-ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে সৃষ্ট ক্রেডিটের উপর আর-বি-আই-এর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সীমিত, (b) আর-বি-আই-এর ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণ পন্থার কার্যকারিতার সীমাবদ্ধতা, (c) ক্ষুদ্র কৃষি, গ্রামীণ শিল্পী ও অন্যান্য গ্রামীণ দুর্বল শ্রেণীদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ক্রেডিট দেয়ার নির্দেশ থাকার ফলে অর্থ সংক্রান্ত নীতিতে নানাপ্রকার জটিলতা সৃষ্টি ও (d) যথাযথ পরি-সংখ্যানের ও সতর্ককরণ প্রথার অভাব। এ প্রসঙ্গে ষষ্ঠ পরিকল্পনার অভিমত: (a) অর্থসংক্রান্ত বিষয় ও ক্রেডিটের গতিপ্রকৃতির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং টাকার যোগান বৃদ্ধি ও জাতীয় আয় বৃদ্ধির পারস্পরিক যুক্তিসঙ্গত সম্বন্ধ কোন কারণে ব্যাহত হলে অবিলম্বে তা সংশোধনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ। (b) সুদের হারের স্তর ও ধরন সর্বদা পর্যালোচনার মধ্যে রাখা। (c) মূলধনের উপর চাপ হ্রাস করার জন্য শ্রমভিত্তিক শিল্পের উপর অধিকতর গুরুত্ব দেয়া। (d) উচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রের এবং দরিদ্র ও দুর্বল

শ্রেণীদের স্বার্থ যাতে অতি উচ্চ সুদের হারের ফলে ব্যাহত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা।

টাকার বাজার

ভারতীয় টাকার বাজার সুসংবদ্ধ নয়। নিম্নে এর কতিপয় বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা গেল :

(i) অসংবদ্ধতা। টাকার বাজার বিভিন্ন অংশে বিভক্ত ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক অতিশয় দুর্বল, অসংলগ্ন ও অপ্রীতিপ্রদ। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক-রূপে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অবস্থার উন্নতি ঘটেছে। ব্যাঙ্কিং রেগুলেশন এ্যাক্ট, 1949 বিধান অনুযায়ী সব শ্রেণীর ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার কাছে সমভাবে গৃহীত হচ্ছে। টাকার বাজারের সুসংগঠিত সেক্টর বর্তমানে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। সমবায় ব্যাঙ্কগুলিও তার কাছ থেকে পুনর্বাটা ও ঋণ পাবার সুবিধা গ্রহণ করছে।

সংগঠিত টাকার বাজারের পাশাপাশি অসংগঠিত টাকার বাজারও বিদ্যমান। একের সঙ্গে অপরের সম্বন্ধের অভাব রয়েছে। অসংগঠিত সেক্টর নন-ব্যাঙ্ক ও মহাজনী কারবারীদের নিয়ে গঠিত। এরা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

(ii) সুদের হারের বৈষম্য। দেশের বিভিন্ন টাকার বাজারে পৃথক পৃথক সুদের হার দেখা যায়। এর ফলে সিকিউরিটির দামের ওঠানামা ঘটে ; ব্যবসা-বাণিজ্যেও এর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। আবার একই কেন্দ্রে কল রেট, হুণ্ডি রেট, ব্যাঙ্ক রেট, বাজার রেট-এ পার্থক্য দেখা যায়। এর কারণ মূলধনের গতিশীলতার অভাব।

(iii) ঋতু বিশেষে চাহিদার পরিবর্তন। নভেম্বর থেকে জুন পর্যন্ত শস্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে প্রেরণের জন্য প্রচুর টাকার প্রয়োজন হয়। এ সময় টাকার চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন সুদের হারও বৃদ্ধি পায়। অপর-দিকে জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত অর্থের চাহিদা অত্যন্ত হ্রাস পায়। ফলে সুদের হারও অত্যন্ত কম হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া তেজীর সময় টাকার যোগান বৃদ্ধি ও মন্দার সময় টাকার যোগান হ্রাস করে সুদের হারের সমতা রক্ষা করার চেষ্টার ফলে এ অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে।

(iv) সুসংগঠিত বিল বাজারের অভাব। ফলে বিভিন্ন ক্রেডিট

এজেন্সিগুলিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সঙ্গে যুক্ত করা সম্ভব হয়ে উঠছে না। ভারতীয় টাকার বাজারে স্বল্পমেয়াদী সম্পদের, যথা, বিল অব এক্সচেঞ্জ, ট্রেজারী বিল বা স্বল্পমেয়াদী সরকারী বণ্ড, অভাব। তাছাড়া এ সব স্বল্পমেয়াদী সম্পদ লেনদেন করার জন্য সরকার ও ব্যাঙ্কিং প্রথার মধ্যে কোন তৃতীয় সংস্থা নেই, যেমন রয়েছে লণ্ডনের টাকার বাজারে ডিসকাউন্ট হাউসগুলি ও বিল ব্রোকাররা।

(v) সুসংগঠিত ব্যাঙ্কিং প্রথার অভাব। ভারতের ব্যাঙ্কিং প্রথা বর্তমানেও সুসংগঠিত নয়। কতিপয় বৃহৎ শহরে ব্যাঙ্কগুলির কেন্দ্রীভূত। তাছাড়া বহুপ্রকার ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা ও অনেক ক্ষেত্রে তাদের কাজকর্মের মধ্যে পার্থক্য ও সামগ্রিক সংযোজনার অভাব, মূলধনের গতিশীলতার মন্থরতা, বিভিন্ন সুদের হার, দারিদ্র্য, অজ্ঞতা ও দূরত্ব বশতঃ ব্যাঙ্কিং প্রথার প্রতি সাধারণ মানুষের আগ্রহের অভাব প্রভৃতি কারণে ভারতের ব্যাঙ্কিং প্রথা সুসংগঠিত হয়ে উঠতে পাচ্ছে না। এসব কারণে ভারতীয় টাকার বাজার বৈদেশিক ধনসম্পদকে আকর্ষণ করতে তেমন সমর্থ নয়। এ অসমর্থতা দুষ্ট-চক্রের মত তার অনুন্নত অবস্থার একটি কারণ।

বিল বাজার

ভারতের বিল বাজার আদৌ সুসংগঠিত নয়। বিলের সংখ্যার স্বল্পতা, বাজার হুণ্ডি লেখা ত্রুটিপূর্ণ, নানা ভাষায় হুণ্ডি লেখা, বিভিন্ন প্রকার চলতি নিয়ম, জনসাধারণের বিল সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রভৃতি কারণে বিল বাজার অনুন্নত। ক্যাশ-ক্রেডিট প্রথার অত্যধিক প্রচলনও এর অন্যতম কারণ।

1952 সনের 16 জানুয়ারী রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিল বাজার সংগঠনের জন্য এক পরিকল্পনা ঘোষণা করে। এ পরিকল্পনা সঙ্গে সঙ্গেই কার্যকর হয়। এ পরিকল্পনার মূল বিষয়গুলি (i) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সিডিউল্ড ব্যাঙ্কের মুদ্দতী প্রমিসোরি নোট অথবা ভারতে লেখা ও দেয় এবং দেয়ার তারিখ থেকে 90 দিনের মধ্যে প্রদেয় বিলের বিরুদ্ধে আগাম দিতে পারে। (ii) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সিডিউল্ড ব্যাঙ্কগুলিকে চাহিদা ঋণ হিসাবে আগাম দিতে পারে। তবে এজন্য তাদের চাহিদা প্রমিসোরি নোট, তৎসহ ঋণগ্রহীতাদের মুদ্দতী প্রমিসোরি নোট, দাখিল করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে সিডিউল্ড ব্যাঙ্কগুলিকে ঋণগ্রহীতাদের কাছ থেকে ঋণ, ওভার-ড্রাফট ও ক্যাশ-ক্রেডিটের বিরুদ্ধে

প্রাপ্ত চাহিদা প্রমিসোরি নোটগুলিকে 90 দিন মেয়াদযুক্ত মুদ্দতী প্রমিসোরি নোটে রূপান্তরিত করতে হতে পারে। (iii) ব্যাঙ্কগুলি সাধারণত ঋণ, ওভার-ড্রাফট ও ক্যাশ-ক্রেডিট খাতে বারংবার আংশিকভাবে অর্থ প্রদান করে। ক্যাশ-ক্রেডিট ও ওভার-ড্রাফটের উপরও বারংবার টাকা উঠানো চলে। সেজন্য চলতি ঋণ, ক্যাশ-ক্রেডিট ও ওভার-ড্রাফট একাউণ্টগুলিকে হু'ভাগে ভাগ করা দরকার। এক ভাগে থাকবে আরো টাকা উঠাবার বা টাকা পরিশোধের সুযোগ দেয়ার জন্য বর্তমানের ন্যায় চাহিদা প্রমিসোরি নোট। অপর ভাগ ঋণগ্রহীতাদের তিন মাসের কম সময়ের জন্য যে পরিমাণ টাকার দরকার তার সম পরিমাণ টাকা দিয়ে গঠিত হবে। এ অর্থ 90 দিনের মেয়াদযুক্ত মুদ্দতী প্রমিসোরি নোটে রূপান্তরিত করা হবে। এ সম্পর্কে ঋণ গ্রহণ নীতি নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। (iv) দ্রুত বিল বাজার গঠন করার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক রেটের 1/2 শতাংশ কম হারে সুদ নেবে। অবশ্য সুদের হার বৃদ্ধি করার ক্ষমতা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের থাকছে। (v) আপাতত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সিডিউল্ড ব্যাঙ্কগুলিকে এক সঙ্গে ন্যূনতম 25 লক্ষ টাকা পর্যন্ত দাদন দিতে স্বীকৃত থাকবে। তবে প্রত্যেকটি বিলের মূল্য অন্তত 1 লক্ষ টাকা হবে।

1970 সনে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া একটি নতুন বিল মার্কেট স্কীম চালু করে। এ স্কীম অনুযায়ী ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে দ্রব্য বিক্রয় সম্পর্কিত স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং বিল অব এক্সচেঞ্জের প্রবর্তন করা হয়। এর মেয়াদ 90 দিন, বিশেষ ক্ষেত্রে 120 দিন পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লাইসেন্স প্রাপ্ত সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক কর্তৃক গৃহীত বিলের বিরুদ্ধে রিফিনান্স করবে। বিল দেয়ার সময় থেকে 90 দিনের মধ্যে পরিশোধনীয় বিলের বিরুদ্ধে রিফিনান্স করা চলবে। রপ্তানি বিল সম্পর্কে এর মেয়াদ 180 দিন পর্যন্ত হতে পারবে। আমদানি বিল ও ইনডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেণ্ট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার কাছে প্রদত্ত পুনর্বাটার জন্য অনুমোদিত বিলগুলিও এ স্কীমের আওতায় আসবে। প্রথমাবস্থায় এ স্কীম বোম্বে, কলকাতা, মাদ্রাজ ও দিল্লীতে কার্যকর হবে।

1952 সনের বিল মার্কেট স্কীমে কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কগুলিকে তাদের ঋতুগত চাহিদা মিটাবার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করার সুযোগ দেয়া হয়েছিল। 1970 স্কীমে ব্যাঙ্কগুলি তাদের উদ্বৃত্ত ফাণ্ড

বিল বাজারে বিনিয়োগ ও বিল বাজার থেকে ঋণ গ্রহণ করার উভয় সুযোগই পেয়েছে। নতুন বিল মার্কেট স্কীম কার্যকর করার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার নির্দেশে ব্যাঙ্কগুলি 1970 সনের এপ্রিল থেকে ক্যাশ-ক্রেডিটের উপর অতিরিক্ত চার্জ ধার্য করে যাতে ক্যাশ-ক্রেডিটের ব্যবহার কমে আসে ও বিল বাজার গড়ে উঠতে পারে। ব্যাঙ্কগুলিকেও বিলের বিরুদ্ধে ঋণ দেয়ার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে। এর ফলে ঋণগ্রহীতাদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করতে হবে; ঋণদাতা ব্যাঙ্কগুলিও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাদের দেয়া ঋণের টাকা ফেরৎ পাবে। ব্যাঙ্ক ও বিল বাজারের মধ্যে দ্রুত টাকার আদান-প্রদান সম্ভব হবে।

1971 সনের অক্টোবর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া এক বিজ্ঞপ্তি দ্বারা পুনর্বাটা পদ্ধতি সহজ করে তোলে। এরূপ বলা হয়েছে যে, যেসব বিলের মূল্য 2 লক্ষ টাকার অধিক শুধু সেসব বিলই পুনর্বাটার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার কাছে পেশ করা চলবে। অন্যান্য বিলের ক্ষেত্রে তা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার এজেন্টরূপে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কে রাখলেই চলবে। ব্যাঙ্কের বোম্বে, কলকাতা, মাদ্রাজ ও নিউ দিল্লীর অফিসের মত হায়দ্রাবাদ, পাটনা, নাগপুর কানপুর ও বাঙ্গালোর এবং পরবর্তীকালে (1975, 1 এপ্রিল) আমেদাবাদ অফিসকেও বিল পুনর্বাটা করার সুযোগ দেয়া হয়। বিজ্ঞপ্তিতে এরূপও বলা হয় যে, যেসব বিলের মূল্য 1000 টাকার কম সেসব বিল পুনর্বাটার জন্য গৃহীত না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

ভারতে বিল বাজারের ভবিষ্যৎ কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কগুলির বিল পুনর্বাটা করার প্রতি আগ্রহ প্রকাশের উপর অনেকটা নির্ভর করে। এ প্রসঙ্গে ক্রেডিট সম্পর্কিত সংবাদ সরবরাহ করার উপযুক্ত ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণ: কারণ

1969 সনের 19 জুলাই 14 ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়। পরে 1980 সনের 15 এপ্রিল আরো 6 ব্যাঙ্ককে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়। ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত করার কারণ:

(1) বেসরকারী ব্যাঙ্কগুলি মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিল। ফলে তাদের হাতে আর্থিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হচ্ছিল।

(2) বেসরকারী ব্যাঙ্কগুলি জনসাধারণের, বিশেষত গ্রামীণ, ক্ষুদ্র শহর ও নিম্ন আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে, সঞ্চয় সংগ্রহ ব্যাপারে সাফল্য অর্জন করতে ব্যর্থ হয়।

(3) বেসরকারী ব্যাঙ্কগুলির কর্মক্ষেত্র শহরাঞ্চলে, বিশেষত বৃহৎ শহর-গুলিতে, নিবদ্ধ ছিল। দেশের 5·75 লক্ষ গ্রামের মধ্যে মাত্র 5 হাজারের মত গ্রাম ব্যাঙ্কের সুবিধা পেত। 1969 সনে আমেদাবাদ, বোম্বে, কলকাতা, দিল্লী ও মাদ্রাজ এ পাঁচটি শহরে ব্যাঙ্কগুলির 14·5 শতাংশ শাখা-অফিস ছিল। ব্যাঙ্ক আমানতের 44·2 শতাংশ ও ব্যাঙ্ক ক্রেডিটের 59·9 শতাংশ এ পাঁচটি বৃহৎ শহরের সঙ্গে জড়িত ছিল।

(4) বেসরকারী ব্যাঙ্কগুলি প্রধানত শিল্প ও বাণিজ্যের জন্য ঋণ দিত। 1968 সনে শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে সিডিউল্ড ব্যাঙ্কগুলির আগামের পরিমাণ তাদের মোট প্রদত্ত আগামের 86·7 শতাংশ। কৃষির, উদ্ভিজ্জ শিল্পসহ, অংশ ছিল মাত্র 2·2 শতাংশ।

(5) বেসরকারী ব্যাঙ্কগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সর্বোচ্চ মুনাফা করা। সমাজকল্যাণ বা দুর্বল শ্রেণীর উন্নতির প্রতি তাদের কোন আগ্রহ ছিল না। 1967 সনে মোট একাউন্ট হোল্ডারদের মাত্র 1 শতাংশ ব্যাঙ্ক ক্রেডিটের সুবিধা পেয়েছে। এ রকম অভিযোগও করা হয় যে, ব্যাঙ্কের ডিরেক্টররা যেসব কোম্পানির সঙ্গে কোন না কোন ভাবে যুক্ত ছিল সেসব কোম্পানি-গুলিকেই ব্যাঙ্কের ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া হত। কোন কোন ক্ষেত্রে কালোবাজারের ও মজুতদারির উদ্দেশ্যেও ঋণ দেয়া হত।

(6) বেসরকারী ব্যাঙ্কগুলির মুনাফার পরিমাণ অত্যধিক। 1969 সনে এদের মোট মুনাফার পরিমাণ 44·9 কোটি টাকা। এ মুনাফালব্ধ অর্থ পরিকল্পিত বিনিয়োগ কর্মসূচী রূপায়ণে ব্যয়িত হত না। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনে বেসরকারী ব্যাঙ্কগুলির ভূমিকা আদৌ সন্তোষজনক ছিল না।

উদ্দেশ্য

ব্যাঙ্কিং কোম্পানিজ (একুইজিসন এণ্ড ট্রান্সফার অব আণ্ডারটেকিংস) এ্যাক্ট 1970-র প্রস্তাবনায় ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রায়ত্তকরণের উদ্দেশ্য অর্থনীতির উচ্চতা নিয়ন্ত্রণ করা ও ক্রমে ক্রমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথের বাধাবিঘ্ন দূর করা। অর্থাৎ,

1. ব্যাঙ্ক আমানত জাতীয়করণ এবং পরিকল্পিত ও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে উৎপাদন বৃদ্ধি ও সমাজ কল্যাণের জন্য তা বিনিয়োগ করা।

2. জাতীয় সম্পদের বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারের আর্থিক ও সামাজিক নীতি রূপায়িত করা।

3. ক্ষুদ্র কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প ও স্ব-নিযুক্ত ব্যক্তিদের সহজ শর্তে ব্যাঙ্ক ক্রেডিট পাওয়ার পথ সুগম করা।

4. শিল্পোন্নয়ন ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করার চেষ্টা করা।

5. নতুন ও প্রগতিশীল উদ্‌যোগ শ্রেণী গড়ে তোলা।

6. অনুৎপাদনমূলক কার্যক্রম ও স্পেকুলেশনের উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্ক ক্রেডিটের বিনিয়োগ লাঘব করা।

7. ব্যাঙ্ক পরিচালনার কাজে সুদক্ষ কর্মীদল গঠন করার জন্য সঠিক ও সুস্থ পরিবেশ গড়ে তোলা।

মূল্যায়ন

রিজিওন্যাল রুরাল ব্যাঙ্কগুলিকে বাদ দিলে পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্কের বর্তমান সংখ্যা 28 (ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ও তার 7 সহকারী ব্যাঙ্ক সহ)। ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণের ফলে সরকার জাতীয় ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণের অধিকারী হয়েছে। বর্তমানে কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কগুলির মোট আমানত ও ক্রেডিটে পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্কগুলির অংশ প্রতিক্ষেত্রে 91 শতাংশ হয়েছে। ফলে পরিকল্পিত বিনিয়োগ সম্ভব হচ্ছে, দুর্বল শ্রেণীরা ব্যাঙ্ক ক্রেডিট সহজ শর্তে পাবার সুবিধা ভোগ করছে, গ্রামীণ অঞ্চলের সঞ্চয় বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং শহর ও গ্রামের সুদূর প্রান্তেও ব্যাঙ্কিং কাজকর্ম প্রসারিত হচ্ছে। কিন্তু এর পাশাপাশি যে সমস্যাগুলি প্রকট হয়ে উঠেছে তা উপেক্ষণীয় নয়।

সমস্যাগুলি, প্রথমত, ব্যাঙ্কিং প্রথা তার প্রতিযোগিতার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে আমলাতন্ত্রের রূপ ধারণ করেছে। কাজে শিথিলতা, অদক্ষতা, অসাধুতা ও অপচয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যাঙ্ক পরিচালনা অতি ব্যয়বহুল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দ্বিতীয়ত, ব্যাঙ্ক পরিচালন, নীতি নির্ধারণ, ক্রেডিট মঞ্জুরকরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব দেখা দিয়েছে।

তৃতীয়ত, ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণ সমাজতন্ত্রের পথে একটি বলিষ্ট পদক্ষেপ জনসাধারণকে এ প্রচার দ্বারা প্রভাবিত করা হয়েছিল। বেসরকারী মালিকানার পরিবর্তে সরকারী মালিকানায় ভাল বেতন, সুযোগসুবিধা ও

চাকরির নিরাপত্তা থাকা সত্ত্বেও ব্যাঙ্কের মত অতি গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরেও কর্মী বিক্ষোভ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

চতুর্থত, দুর্বল শ্রেণীদের প্রায় ঢালাও আগাম দেয়া ও সাধারণত রাজনৈতিক কারণে ঋণের টাকা উদ্ধার না করার ফলে অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। ব্যাঙ্কের মুনাফায়ও সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

পঞ্চমত, গ্রামীণ আমানতের অধিকাংশ শহরে বিনিয়োগ করার ফলে আঞ্চলিক বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্রামীণ ধনী সম্প্রদায় ও শহরের বৃহৎ শিল্পপতিরা ব্যাঙ্ক ক্রেডিটের সুবিধা গ্রহণের যে সুযোগ পেয়ে থাকে গ্রামীণ দরিদ্র শ্রেণী ও শহরের ক্ষুদ্র শিল্প তা থেকে বঞ্চিত। তার ফলে গ্রামীণ ক্ষেত্রে আয় ও সম্পদ বণ্টনে অসমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে ; শহরে মুষ্টিমেয় শিল্পপতি আর্থিক ক্ষেত্রে একছত্রপতি হয়ে উঠছে।

পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় গ্রামীণ ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের বিস্তার আশানুরূপ নয়। 1982 সনের জুনে ব্যাঙ্কের গ্রামীণ শাখা-অফিসের সংখ্যা 20,398। প্রতি 10,000 গ্রামীণ অধিবাসীর জন্য একটি শাখা-অফিস ধরে হিসেব করলে আরো 37,000 শাখা-অফিসের প্রয়োজন। ব্যাঙ্কের প্রসার ক্ষেত্রেও আঞ্চলিক বৈষম্য লক্ষণীয়। আসাম, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, অরুণাচল প্রদেশ ও মিজোরাম ব্যাঙ্কিঙের সুবিধা থেকে অনেক পিছিয়ে আছে। মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবাংলা ও তামিলনাড়ুতে ব্যাঙ্কগুলি প্রধানত বড় বড় শহরে অবস্থিত। গ্রামীণ ক্ষেত্রে ক্রেডিট-আমানতের অনুপাত 1969 সনে ছিল 37 শতাংশ। 1981 সনের জুনে তা বৃদ্ধি পেয়ে 57·7 শতাংশ হলেও জাতীয় গড়ের অনুপাতে (67 শতাংশ) তা কম। অবশ্য এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, গ্রামীণ শাখা-অফিসগুলি গ্রামীণ সঞ্চয় সংগ্রহ ব্যাপারে ও স্বল্প সঞ্চয়ীদের সঞ্চয়ে উৎসাহ দিতে বেশ কিছুটা সমর্থ হয়েছে। যেসব রাজ্য গ্রাম ও কিছুটা শহর ভিত্তিক সেসব রাজ্যে ক্রেডিট-আমানতের অনুপাত শিল্পে উন্নত রাজ্যগুলির তুলনায় কম। কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কগুলির অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ প্রায় 50 শতাংশ। কিছুটা ঋণগ্রহীতাদের আর্থিক দুর্দশার কারণে, কিছুটা রাজনৈতিক চাপে এ অনাদায়ী অর্থ আদায় করা কঠিন হয়ে উঠেছে। ফলে আগামের আবর্তনের পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে এবং ব্যাঙ্ক ও ভবিষ্যৎ ঋণগ্রহীতা উভয়েরই সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কিঙের সাম্প্রতিক অগ্রগতি

1979-80 (জুন-জুন) সনে ব্যাঙ্কিং সেক্টরের উল্লেখযোগ্য ঘটনা আমানত ও ব্যাঙ্ক ক্রেডিট উভয়েরই বৃদ্ধির হারে অবনতি ও ব্যাঙ্কের বিনিয়োগ বৃদ্ধি। 1978-79 সনে মোট আমানত বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল 5,359 কোটি টাকা বা 23·0 শতাংশ। 1979-80 সনে তা হ্রাস পেয়ে 4,612 কোটি টাকা বা 16·1 শতাংশ হয়। ব্যাঙ্ক ক্রেডিটের বৃদ্ধির পরিমাণ 1978-79 সনে ছিল 3,621 কোটি টাকা বা 22·5 শতাংশ। 1979-80 সনে তা হ্রাস পেয়ে 2,366 কোটি টাকা বা 12·0 শতাংশ হয়। কিন্তু ব্যাঙ্কের বিনিয়োগ বৃদ্ধির পরিমাণ 1978-79 ও 1979-80 সনে ছিল যথাক্রমে 1,837 কোটি টাকা ও 2,436 কোটি টাকা। 1980 সনের 27 জুন বিনিয়োগ-আগামের অনুপাত ছিল 35·5 শতাংশ। 1979 সনে এ সময় এর অনুপাত ছিল 32·7 শতাংশ। 1979-80 সনে ব্যাঙ্কগুলির হাতে নগদ টাকা ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সঙ্গে গচ্ছিত টাকার পরিমাণ 469 কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়। পূর্ববর্তী বছর এ বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল 827 কোটি টাকা। 1979-80 সনে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার কাছে তাদের ঋণের পরিমাণ 117 কোটি টাকা হ্রাস পায়। 1978-79 সনে এ ঋণ বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল 324 কোটি টাকা।

1979-80 সনে ব্যাঙ্ক আমানতের বৃদ্ধির হারের অবনতির কারণ প্রধানত (i) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া কর্তৃক ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণ। (ii) প্রাথমিক স্তরে টাকা সৃষ্টির গতির মন্থরতা, বিশেষত 1979-80 সনের শেষাশেষি।

ব্যাঙ্ক ক্রেডিটের বৃদ্ধির হার হ্রাস পাওয়ার কারণ 1979-80 সনে খাদ্য ক্রেডিটের পরিমাণ 586 কোটি টাকা হ্রাস। 1978-79 সনে এ বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল 471 কোটি টাকা। অপর দিকে 1979-80 সনে খাদ্য নয় এমন খাতে ক্রেডিট বৃদ্ধির পরিমাণ 17·7 শতাংশ। 1978-79 সনে এর পরিমাণ ছিল 23·3 শতাংশ।

1981 সনের 30 জুন 185 সিডিউল্ড কমার্সিয়াল ও 4 নন-সিডিউল্ড কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক ছিল। 185 সিডিউল্ড কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কের মধ্যে 130 (102 রিজিওন্যাল রুরাল ব্যাঙ্কসহ) পাবলিক সেক্টরভুক্ত ছিল। কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে মোট ব্যবসায়ের 90 শতাংশ পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্কগুলির নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল।

পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার স্থান সর্বাগ্রে। এ ব্যাঙ্কের শাখা-অফিসের সংখ্যা 6,000 অধিক ও আমানতের পরিমাণ 10,000 কোটি টাকার উপর। ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া প্রদত্ত আগামের পরিমাণ 7,500 কোটি টাকা। মূল ষ্টেট ব্যাঙ্কের সঙ্গে 7 ব্যাঙ্ককে যুক্ত করা হয়েছে। যুক্তভাবে এ ব্যাঙ্ক দেশের মোট ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের প্রায় 25 শতাংশ কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্কিঙের মোট ব্যবসায়ের প্রায় 45 শতাংশ তাদের হাতে। পাবলিক সেক্টরভুক্ত অন্যান্য 20 ব্যাঙ্ককে "রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক" বলা হয়। কারণ রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়ার আগে তারা প্রাইভেট সেক্টরভুক্ত ছিল। এদের মধ্যে 14 ব্যাঙ্ককে 1969 সনের 19 জুলাই ও অপর 6 ব্যাঙ্ককে 1980 সনের 15 এপ্রিল রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়।

ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত করার ফলে ব্যাঙ্কগুলির কাজকর্মের দক্ষতার কিছুটা অবনতি ঘটলেও সামগ্রিকভাবে ব্যাঙ্কের কাজকর্মের প্রসার সাধন হয়। 1969 সনের 30 জুন কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কগুলির মোট শাখা-অফিসের সংখ্যা ছিল 8,262। 1981 সনের 30 জুন তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় 35,707 ও 1983 সনের 30 জুন এর সংখ্যা হয় 42,079 ও 1984 সনের মার্চের শেষে এর সংখ্যা দাঁড়ায় 44,583। 1969 সনের জুনে গড়ে প্রতি 65,000 লোকের জন্য ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল একটি; 1981 সনের নভেম্বরে গড়ে প্রতি 19,000 লোকের জন্য একটি ব্যাঙ্ক হয়েছে।

নতুন শাখা অফিস খোলার ব্যাপারে গ্রামীণ বা প্রায় শহরাঞ্চলে, বিশেষত যেসব অঞ্চলে ব্যাঙ্ক ছিল না, অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। 1969 সনের 30 জুন ব্যাঙ্কগুলির গ্রামীণ শাখা-অফিসের সংখ্যা ছিল 1,860; 1981 সনের 30 নভেম্বর এর সংখ্যা হয় 18,768। 1984 সনের মার্চে এর সংখ্যা দাঁড়ায় 24,770 ও প্রায়-শহরাঞ্চলে 9,209। বর্তমানে ব্যাঙ্কগুলির শাখা-অফিসের 50 শতাংশের বেশি গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত।

1981 সনের 30 জুন রিজিওন্যাল রুরাল ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল 102। 1983 সনের ডিসেম্বরের শেষাশেষি এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় 150। সে সময় এদের মোট আমানতের পরিমাণ প্রায় 677·85 কোটি টাকা। অনাদায়ী আগামের পরিমাণ প্রায় 750·84 কোটি টাকা। দীর্ঘকাল যাবৎ অনাদায়ী আগামের পরিমাণ প্রায় 191·72 কোটি টাকা।

1982 সনের 1 এপ্রিল থেকে 1985 সনের 31 মার্চ এ তিন বছরের জন্য শাখা-অফিস খোলার লাইসেন্স দেয়া সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য গ্রামাঞ্চলে বা গ্রাম অনুরূপ অঞ্চলে ব্যাঙ্কের প্রসার সাধন।

ব্যাঙ্কের কাজকর্মের উন্নতির জন্য গৃহীত "এরিয়া এপ্রোচ" ধারণাকে বাস্তব রূপ দেয়ার জন্য 1969 সনে "লিড ব্যাঙ্ক স্কীম" গ্রহণ করা হয়।

ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত করার পর সিডিউল্ড ব্যাঙ্কগুলির আমানতের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। 1969 সনে 30 জুন এসব ব্যাঙ্কের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল 4,646 কোটি টাকা। চলতি দামে জাতীয় আয়ের প্রায় 15·5 শতাংশ। 1981 সনের 30 জুন এর পরিমাণ ছিল 40,184 কোটি টাকা বা চলতি দামে জাতীয় আয়ের প্রায় 34·9 শতাংশ।

1983-84 (এপ্রিল-মার্চ) সনে সিডিউল্ড কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কগুলির কাজ-কর্মের বৈশিষ্ট্য, দ্রুত আমানত বৃদ্ধি ও ক্রেডিট প্রসারে অবনতি। ক্রেডিট প্রসারে অবনতির কারণ প্রধানত ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও দু' শতাংশ বৃদ্ধি ও 1983 সনের 12 নভেম্বর থেকে 10 শতাংশ বর্ধিত ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও ধার্য। 1982-83 সনের তুলনায় 1983-84 সনে সিডিউল্ড কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কগুলির হাতে নগদ টাকা ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার কাছে গচ্ছিত টাকার পরিমাণ দু'গুণ বৃদ্ধি পায়।

1983-84 (এপ্রিল-মার্চ) সনে সিডিউল্ড কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কগুলির মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় 9,179 কোটি টাকা। এর আগে মোট আমানত কখনও এ সীমায় পৌঁছাতে পারেনি। 1982-83 ও 1981-82 সনে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 7,625 কোটি টাকা ও 5,745 কোটি টাকা। 1983-84 সনে মোট আমানতের বৃদ্ধির হার 17·4 শতাংশ এবং 1982-83 ও 1981-82 সনে যথাক্রমে 17·4 শতাংশ ও 15·1 শতাংশ। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, চাহিদা আমানতের তুলনায় মেয়াদী আমানতের পরিমাণ অনেক বেশি। 1983-84 সনে মেয়াদী আমানতের বৃদ্ধির পরিমাণ 7,808 কোটি টাকা। 1982-83 সনে এ বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল 6,024 কোটি টাকা। 1983-84 ও 1982-83 সনে চাহিদা আমানতের বৃদ্ধির পরিমাণ যথাক্রমে 1,371 কোটি টাকা ও 1,601 কোটি টাকা। 1983-84 সনে দ্রুত আমানত বৃদ্ধির কারণ জাতীয় আয় বৃদ্ধি, রিজার্ভ অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি, অনাবাসিক ভারতীয়দের আমানত বৃদ্ধি ও ব্যাঙ্ক ক্রেডিটের প্রসার।

সিডিউল্ড কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক—ভারতে ব্যবসা (কোটি টাকা)

মার্চের শেষ শুক্রবার	1971	1976	1980	1981	1982	1983†	1984*
ব্যাঙ্কের সংখ্যা	73	82	136	165	187	210	227
ব্যাঙ্কিং প্রথায় দায়		651	1,109	1,752	1,747	2,247	2,800
অন্যান্যদের কাছে দায়		14,724	33,345	39,793	45,846	54,173	65,569
মোট আমানত	5,906	14,155	31,759	37,988	43,733	51,3[illegible]8	60,537
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ	368	798	739	589	831	815	1,336
হাতে নগদ টাকা ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সঙ্গে গচ্ছিত ব্যালেন্স	364	912	4,250	4,858	5,671	6,086	8,709
ব্যাঙ্কিং প্রথায় সম্পদ		448	779	1,207	1,310	1,949	2,239
বিনিয়োগ		4,607	10,624	13,186	15,141	18,334	21,290
ব্যাঙ্ক ক্রেডিট	4,684	10,877	21,537	25,371	29,681	35,493	40,997
ক্যাশ-আমানত অনুপাত	6·2	6·4	13·4	12·8	13·0	11·9	14·4
বিনিয়োগ-আমানত অনুপাত	23·1	32·5	33·4	34·7	34·6	35·7	35·2
ক্রেডিট-আমানত অনুপাত	79·3	76·8	67·8	66·8	67·9	69·1	67·7

† মার্চ 31, 1983। * আংশিক পরিশোধিত।

সূত্র: রিপোর্ট অন কারেন্সি এণ্ড ফিনান্স 1983-84, P-51, আর-আইবি।

পূর্ব পৃষ্ঠায় সিডিউল্ড কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কগুলির ভারতে ব্যবসার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হল।

ব্যাঙ্কগুলি সরকারী ও অন্যান্য অনুমোদিত সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করে থাকে। তারা ঋণ ও আগামও দিয়ে থাকে। পর পর কয়েকবার ষ্ট্যাটুটারী লিকিউডিটি রেশিওর উর্ধ্বমুখী পরিবর্তনের ফলে সরকারী ও অন্যান্য অনুমোদিত সিকিউরিটিতে ব্যাঙ্কগুলির বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। 1970 সনের মার্চের শেষাশেষি এ ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল 1,227 কোটি টাকা, বৃদ্ধি পেয়ে 1982 সনের মার্চের শেষাশেষি দাঁড়ায় 15,560 কোটি টাকা। 1983 (31 মার্চ) ও 1984 (মার্চের শেষাশেষি)-এর পরিমাণ যথাক্রমে 18,824 কোটি টাকা ও 21,868 কোটি টাকা।

আগামের পরিমাণও উল্লেখ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। 1969 সনের 30 জুন সিডিউল্ড কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কগুলির আগামের পরিমাণ ছিল 3,599 কোটি টাকা, বৃদ্ধি পেয়ে 1982 সনে মার্চের শেষাশেষি দাঁড়ায় 29,682 কোটি টাকা। এ সময়কালীন পাবলিক সেক্টরভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির আগামের পরিমাণ 3,017 কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 27,107 কোটি টাকা হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রাষ্ট্রায়ত্ত করার আগে ব্যাঙ্ক ক্রেডিটের ক্ষেত্রে প্রাইভেট সেক্টরের বৃহৎ ও মধ্য শিল্প এবং পাইকারী ব্যবসায়ের অংশ ছিল মোট প্রদত্ত ক্রেডিটের 78 শতাংশেরও অধিক। 1980 সনের জুনের মধ্যে তা 44 শতাংশে নেমে আসে। 1983 ও 1984 সনের মার্চের শেষাশেষি সিডিউল্ড কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কগুলির আগামের পরিমাণ যথাক্রমে 35,493 কোটি টাকা ও অনুমিত 40,997 কোটি টাকা। এ আগামের প্রায় 90 শতাংশ পেয়ে থাকে চিনি, তুলা ও কার্পাস এবং খাদ্যশস্য।

1984-85 সনের প্রথম তিন মাসে ব্যাঙ্ক ক্রেডিটের প্রসারের পরিমাণ 2,061 কোটি টাকা! 1983-84 সনে এ সময়কালীন ক্রেডিট প্রসারের পরিমাণ ছিল মাত্র 513 কোটি টাকা। 1984-85 সনের আলোচ্য সময়-কালীন খাদ্য ও অ-খাদ্য উভয় ক্ষেত্রেই ব্যাঙ্ক ক্রেডিটের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়—খাদ্য ক্ষেত্রে বৃদ্ধির পরিমাণ 1,216 কোটি টাকা ও অ-খাদ্য ক্ষেত্রে 845 কোটি টাকা। 1983-84 সনে এ সময়কালীন খাদ্য ক্ষেত্রে ক্রেডিট বৃদ্ধির পরিমাণ 624 কোটি টাকা ও অ-খাদ্য ক্ষেত্রে বৃদ্ধির পরিবর্তে হ্রাসের পরিমাণ 111 কোটি টাকা।

ব্যাঙ্ক ক্রেডিটের যথোপযুক্ত ব্যবহারের উদ্দেশ্যে 1965 সনে কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প, সড়ক পরিবহন, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এসব ক্ষেত্রের ঋণগ্রহীতারা যাতে অধিক পরিমাণে ও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ঋণ পেতে পারে সেজন্য পাবলিক সেক্টর-ভুক্ত ব্যাঙ্কগুলি একটি স্কীম রচনা করেছে। 1969 সনের জুনের শেষাশেষি এ জাতীয় ক্ষুদ্র ঋণগৃহীতাদের সংখ্যা ছিল 2·60 লক্ষ আর 1981 সনের জুনের শেষাশেষি 135·74 লক্ষ। এ সময়কালীন এদের অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 449 কোটি টাকা ও 8,840 কোটি টাকা।

সম্প্রতি গৃহীত এক নীতি অনুযায়ী পাবলিক সেক্টরভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিকে অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে 1985 সনের মার্চের মধ্যে তাদের মোট ক্রেডিটের 40 শতাংশ বিনিয়োগ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর 1985-86 সনের বাজেট বক্তৃতায় প্রকাশ পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্কগুলি এ লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছে। 1969 সনে ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণের সময় অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে আগামের পরিমাণ 15 শতাংশেরও কম ছিল।

কৃষিক্ষেত্রে পাবলিক সেক্টরভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির আগাম দেয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। 1979 সনের 30 জুন এ আগামের পরিমাণ 2,221·78 কোটি টাকা বা মোট অনাদায়ী ঋণের 14·6 শতাংশ ও একাউণ্টের সংখ্যা ছিল 68·71 লক্ষ। 1981 সনের 30 জুন এর পরিমাণ যথাক্রমে 3,866·92 কোটি টাকা 15·9 শতাংশ ও 96·12 লক্ষ। 1982 সনের ডিসেম্বরে কৃষিক্ষেত্রে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া (সহযোগী ব্যাঙ্কগুলি সহ), রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য সিডিউল্ড কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কগুলির সরাসরি ঋণমঞ্জুরের পরিমাণ 4,67,874 লক্ষ টাকা, অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ 4,06,054 লক্ষ টাকা ও একাউণ্টের সংখ্যা 1,05,13,370।

সমাজের দুর্বল শ্রেণীদের স্বল্প সুদে ঋণ দেয়ার জন্য 1972 সনে একটি স্কীম নেয়া হয়। এ স্কীম অনুযায়ী পাবলিক সেক্টরভুক্ত ব্যাঙ্কগুলি শিল্পে অনুন্নত জেলাগুলিতে অবস্থিত নির্দিষ্ট শ্রেণীর ঋণগৃহীতাদের উৎপাদনশীল কাজের জন্য স্বল্প সুদে (শতকরা 4 টাকা) ঋণ দিয়ে থাকে। 1981 সনের 31 ডিসেম্বর এরূপ ক্ষেত্রে অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ ছিল 192·49 কোটি টাকা। ঋণগ্রহীতাদের সংখ্যা 25·10 লক্ষ।

কৃষি ও সমাজের দুর্বল শ্রেণীরা যাতে সহজে ব্যাঙ্ক থেকে ক্রেডিট পেতে পারে সেজন্য নিম্নলিখিত পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে।

(i) ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফর এগ্রিকালচারেল এণ্ড রুরাল ডেভেলপমেণ্ট গঠন করার জন্য আইন প্রণয়ন করা হয়েছে ও ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক নামে একটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ঋনদান নীতি নির্ধারণ ও পরিকল্পনা অথবা কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প, কুটির ও গ্রামীণ শিল্প, হস্তশিল্প এবং অন্যান্য গ্রামীণ কারুশিল্প ও সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক কাজকর্মের ক্ষেত্রে যাতে কোনপ্রকার ক্রেডিট সঙ্কট সৃষ্টি হতে না পারে সে সম্পর্কে তত্ত্বাবধানের জন্য এ ব্যাঙ্ক শীর্ষ ব্যাঙ্করূপে কাজ করবে।

(ii) 20-দফা কর্মসূচীর ধারাক্রমে পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্কগুলি 1980 সনের 31 ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট 53·43 লক্ষ একাউণ্টে 1,728 কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে। নতুন 20 দফা কর্মসূচীতে এ পরিকল্পনা রূপায়ণের উপর আরো জোর দেয়া হয়েছে।

পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্কগুলি ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে জাতীয় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কম সুদে ক্রেডিট দেয়ার ব্যবস্থা করেছে। অনেক ব্যাঙ্ক এদের কারিগরি সাহায্য দেয়ার জন্য "সেল" গঠন করেছে। ব্যাঙ্কগুলির উপর নির্দেশ রয়েছে যে, 1985 সনের মার্চের মধ্যে তাদের মোট আগামের কমপক্ষে 12·5 শতাংশ ক্ষুদ্র শিল্প ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে হবে। 1980 সনের জুন পর্যন্ত ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে 2,618 কোটি টাকা আগাম দেওয়া হয়েছে। 1981 সনের জুন পর্যন্ত এর পরিমাণ 3,347 কোটি টাকা।

রপ্তানি বাণিজ্যে ও সিডিউল্ড কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কগুলির আগামের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। 1977 সনের ডিসেম্বরের শেষাশেষি এ আগামের পরিমাণ ছিল 1,177 কোটি টাকা; 1981 সনের সেপ্টেম্বরে এর পরিমাণ অনুমিত 1,736 কোটি টাকা।

বিভিন্ন স্কীম

ব্যাঙ্কিং সেক্টরে যেসব স্কীম চালু রয়েছে তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও কাজকর্মের বিবরণ নিম্নে দেয়া হল।

ক্রেডিট অথরাইজেসন স্কীম (সি-এ-এস)

এ স্কীম 1965 সনে প্রবর্তন করা হয়। স্কীমটি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার ব্যাঙ্ক ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণ করার একট বিশেষ হাতিয়ার। এর ফলে ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে উৎপাদনের প্রয়োজন-ভিত্তিক ক্রেডিট বণ্টন করা সহজ হয়েছে।

1980 সনের জুনের শেষাশেষি এ স্কীমে 1,093 ক্ষেত্রে ঋণ দেয়া হয়।

1979 ও 1978 সনে এর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে 979 ও 1,059। 1980 সনের 1,093 ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে 192 ঋণগ্রহীতা পাবলিক সেক্টরভুক্ত। 1979 সনের জুনের শেষাশেষি পাবলিক সেক্টরভুক্ত ঋণগ্রহীতার সংখ্যা ছিল 187। 1984 সনের মার্চের শেষাশেষি 751 ক্ষেত্রে ঋণ দেয়া হয়। 1983 সনের মার্চের শেষাশেষি এর সংখ্যা ছিল 881। কার্যকর মূলধনের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার পূর্ব অনুমোদনের পরিমাণের সীমা 3 কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি করে 4 কোটি টাকা করার ফলেই এর সংখ্যা হ্রাস পায়।

ক্রেডিট বণ্টনের মোট সীমার শতাংশ

ক্রেডিটের প্রকৃতি	31 মার্চ 1982	31 মার্চ 1983	31 মার্চ 1984
1. কার্যকর মূলধন	88·6 (91·9)	92·5 (95·3)	92·1 (94·6)
2. বাকীতে যন্ত্রপাতি বিক্রয়	2·6 (1·1)	1·5 (0·6)	1·4 (0·5)
3. মেয়াদী ঋণ	8·8 (7·0)	6·0 (4·1)	6·5 (4·9)
মোট নির্দিষ্ট সীমা (শতাংশ)	100·0 (100·0)	100·0 (100·0)	100·0 (100·0)
মোট নির্দিষ্ট সীমা (কোটি টাকা)	14765 741*	15541 9091	17251 10620

দ্রষ্টব্য: কার্যকর মূলধনের মধ্যে রয়েছে ক্যাশ-ক্রেডিট ও ওভারড্রাফটস, যেসব বিল ক্রয় ও বাদের বিরুদ্ধে বাটা দেয়া হয়েছে এবং রপ্তানি ক্রেডিট। বন্ধনীতে পাবলিক সেক্টরের এককের শতাংশ দেখানো হয়েছে।

সূত্র: রিপোর্ট অন কারেন্সি এণ্ড ফিনান্স, 198-384, Vol. 1, আরবিআই।

1984 সনের মার্চের শেষাশেষি ক্রেডিটের পরিমাণের যে সীমা নির্ধারণ করা হয়েছিল বৃত্তির ভিত্তিতে তার বণ্টন বিশ্লেষণ করা হলে দেখা যাবে যে, তাতে শিল্পের অংশ ছিল সর্বাধিক (58·0 শতাংশ); এর মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং, রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও বস্ত্র শিল্পের অংশই প্রায় অর্ধেক। দ্বিতীয় স্থান বাণিজ্যের (38 8 শতাংশ); কৃষি ও সংশ্লিষ্ট কাজকর্মের স্থান সর্বনিম্নে (3.2 শতাংশ)। পাবলিক সেক্টর ক্ষেত্রে শিল্পের অংশ ছিল 38·9 শতাংশ;

বানিজ্যের অংশ 58·1 শতাংশ। এর মধ্যে খাদ্যশস্য সংগ্রহের অংশ 41·0 শতাংশ। কৃষি ও সংশ্লিষ্ট কাজকর্মের অংশ 3·0 শতাংশ।

1983 সনের জুলাইতে আরবিআই সি-এ-এস-এর কাজকর্মের পর্যালোচনা করার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত করে। আরবিআই কমিটির সুপারিশগুলি মোটামুটি গ্রহণ করে নেয় এবং তা 1984 সনের 1 এপ্রিল থেকে কার্যকর করে। এর ফলে সি-এ-এস-এর মাধ্যমে দ্রুত ফাণ্ড ছেড়ে দেয়া সহজ হচ্ছে।

ডিফারেন্সাল রেট অব ইনটারেস্ট (ডি-আর-আই)

এ স্কীম 1972 সনে প্রবর্তন করা হয়। 1980 সনের ফেব্রুয়ারীতে ভারত সরকার কর্তৃক স্কীমটি সংশোধিত হয়। এ সংশোধনের ফলে ব্যাঙ্কগুলি সংমিশ্রন ঋণ রূপে 6,500 কোটি টাকা পর্যন্ত আগাম দেয়ার অধিকারী হয়। ক্ষুদ্র শিল্প, কারুশিল্পী প্রভৃতি ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে এ সুযোগ দেয়া হবে। এ ঋণ দেয়ার ব্যাপারে কার্যকর মূলধন ও মেয়াদী ঋণের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হবে না।

এ স্কীমে 1981 সনের ডিসেম্বরের শেষাশেষি 20·25 লক্ষ একাউন্টে গড়ে 880 টাকা আগাম দেয়া হয়েছিল। 1982 সনে এ সময়কালীন 33·44 লক্ষ একাউন্টে গড়ে 932 টাকা আগাম দেয়া হয়েছিল। অনাদায়ী আগামের পরিমাণ 1982 সনে 54 কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে 312 কোটি টাকা হয়। তপশীলী জাতি ও তপশীলী উপজাতিদের অগ্রাধিকার লক্ষণীয়। 1981-82 (ডিসেম্বর-ডিসেম্বর) সনে এদের একাউন্টের সংখ্যা 13·76 লক্ষ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 16·36 লক্ষ হয়। অনাদায়ী আগাম বৃদ্ধির পরিমাণ 123 কোটি টাকা থেকে 154 কোটি টাকা। 1982 সনের ডিসেম্বরে মোট আগামের 49·6 শতাংশ দেয়া হয় তপশীলী জাতি ও উপজাতিদের যেখানে অনুপাতের লক্ষ্য ছিল 40 শতাংশ। 1982 সনের শেষাশেষি পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্কগুলি তাদের মোট আগামের 1·17 শতাংশ ডি-আর-আই স্কীমে আগাম দেয়; লক্ষ্যসীমা ছিল 1 শতাংশ।

পার্থক্যমূলক সুদে (ডি-আর-আই)

পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্কগুলি কর্তৃক প্রদত্ত আগাম

ডিসেম্বরের শেষাশেষি	ঋণগ্রহীতাদের একাউন্টের সংখ্যা (হাজার)	অনাদায়ী আগাম (কোটি টাকা)	পূর্ববর্তী বছরের শেষে প্রদত্ত মোট আগামে ডি-আর-আই আগামের শতাংশ
(1)	(2)	(3)	(4)
1972	26	0·87	0·02
1975	465	20·99	0·31
1978	1620	90·00	0·74
1979	2076	139·80	0·98
1980	2510	193·56	1·04
1981	2925	257·50	1·17
1982	3344	311·50	1·17

সূত্র: রুর‍্যাল প্ল্যানিং এণ্ড ক্রেডিট ডিপার্টমেন্ট, আর-বি-আই।

পার্টিসিপেশন সার্টিফিকেট স্কীম (পি-সি-সি)

এ স্কীম অনুযায়ী সুদের সর্বোচ্চ হার 10 শতাংশ রাখা হয়। 1978 সনের ডিসেম্বরের শেষাশেষি যেসব পার্টিসিপেশন সার্টিফিকেট ইস্যু করা বাকী থাকে তাদের মোট পরিমাণ 455 কোটি টাকা। কিন্তু 1979 সনের মের শেষাশেষি তা বৃদ্ধি পেয়ে 646 কোটি টাকা হয়। 1979 সনের ডিসেম্বরে এর পরিমাণ হ্রাস পেয়ে 445 কোটি টাকা হয় ও 1980 সনের জুনের শেষাশেষি তা আরো হ্রাস পেয়ে 306 কোটি টাকা দাঁড়ায়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া পার্টিসিপেশন সার্টিফিকেট স্কীমকে সি-আর-আর ও এস-এল-আর-এর অধীনে নিয়ে আসার দরুনই এ স্কীমে অনাদায়ী আগামের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে।

এক্সপোর্ট ক্রেডিট (ইনটারেস্ট সাবসিডিজ) স্কীম, 1968

এ স্কীম রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া কর্তৃক গৃহীত। যেসব ব্যাঙ্ক সুবিধা-জনক হারে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য রপ্তানি ক্রেডিট দিয়ে থাকে তাদের এর ফলে সুদের খাতে আয়ের যে ক্ষতি হবে তার আংশিক ক্ষতিপূরণের উদ্দেশ্যে এ স্কীম গ্রহণ করা হয়েছে। মার্কেটিং ডেভেলপমেন্ট এ্যাসিস্ট্যান্স থেকে দেয় এ সুদ ভরতুকির হার বার্ষিক 1·5 শতাংশ। তাছাড়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ক্রেডিটের ধরন অনুযায়ী 3/2/1½ শতাংশ হারে বিশেষ ভরতুকিও দিয়ে থাকে।

1979-80 (জুলাই-জুন) সনে মোট 14·78 কোটি টাকার সুদ ভরতুকি বাবদ মিটানো হয়েছে। এর মধ্যে প্রি-সিপমেন্ট ক্রেডিটের পরিমাণ 8·28 কোটি টাকা ও পোস্ট-সিপমেন্ট ক্রেডিটের পরিমাণ 6·50 কোটি টাকা। এ স্কীমের সুরু থেকে 1981 সনের 30 জুন পর্যন্ত মোট 87·06 কোটি টাকা ভরতুকি বাবদ বণ্টন করা হয়েছে। 1983 84 (জুন-জুন) সনে 80 লক্ষ টাকা বিশেষ ভরতুকি ও 18·56 কোটি টাকা সাধারণ ভরতুকি দেয়া হয়েছে।

ডিউটি ড্রব্যাক স্কীম 1976

যেসব রপ্তানিকারকেরা ব্যাঙ্ক থেকে বহির্বাণিজ্যের শুল্ক বিভাগের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আমদানি ও আবকারী শুল্ক ফেরৎ সংক্রান্ত প্রভিসোন্যাল এনটাইটেলমেণ্ট অর্ডারস-এর বিরুদ্ধে 90 দিনের মেয়াদে সুদবিহীন ঋণের সুযোগ গ্রহণ করে থাকে এ স্কীমে তাদের সুবিধা দেয়া হয়। যেসব ব্যাঙ্ক রপ্তানিকারকদের শুল্ক ড্রব্যাকের দাবির চূড়ান্ত হিসাবনিকাশ না হওয়া পর্যন্ত তাদের সুদবিহীন ঋণ দিয়ে থাকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া তাদের সুদ-বিহীন রিফিনান্স করে থাকে। 1980 সনের 30 জুন আরবিআই 27 ব্যাঙ্ককে 1980 সনের 31 অক্টোবর পর্যন্ত মোট 17·20 কোটি টাকা রিফিনান্স দিয়েছে। 1980 সনের 30 জুন এ স্কীমে অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ ছিল 4·69 কোটি টাকা। 1983 সনের 1 নভেম্বর থেকে 31 মার্চ 1984 সন পর্যন্ত 30 ব্যাঙ্ককে 18·02 কোটি টাকা পর্যন্ত রিফিনান্স মঞ্জুর করা হয়। 1984 সনের জুনের শেষাশেষি অনাদায়ী আগামের পরিমাণ 1·36 কোটি টাকা।

রিফিনান্স ফর ইমপোর্ট অব ক্যাপিট্যাল গুডস

1978 সনের এপ্রিলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া এ স্কীমটি গ্রহণ করে। এ স্কীম অনুযায়ী আর-বি-আই সেসব ব্যাঙ্ককে রিফিনান্স দেয়ার ব্যবস্থা করে

যারা আমদানিকৃত মূলধন দ্রব্যের বৈদেশিক বিনিময়ের ব্যয়ভার বহন করার জন্য আমদানিকারকদের টাকার অঙ্কে 10 বছর মেয়াদী ঋণ দেয়। এজন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ককে বার্ষিক 11 শতাংশ সুদ আদায় করতে হবে। কিন্তু রিফিনান্সের সুদের হার হবে ব্যাঙ্ক রেটের সমান; অর্থাৎ, বার্ষিক 9 শতাংশ। এ স্কীমে 1978 সনের এপ্রিল থেকে 1980 সনের 30 জুন পর্যন্ত 24 ব্যাঙ্ককে রিফিনান্স বাবদ মোট 117·41 কোটি টাকা দেয়া হয়েছে। 1980 সনের 30 জুন পর্যন্ত দেয় রিফিনান্সের পরিমাণ 52·18 কোটি টাকা। 1980 সনের 1 জুলাই থেকে এ স্কীম বাতিল করে দেয়া হয়।

এক্সপোর্ট ক্রেডিট এণ্ড গ্যারেন্টি কর্পোরেশন লিমিটেড (ই-সি-জি-সি)

1980 সনের 30 জুন ই-সি-জি-সি যে সংখ্যক পলিসি ও গ্যারেন্টি ইস্যু করে তার সংখ্যা ছিল 8,695। 1979 সনে এ সময় তাদের সংখ্যা ছিল 8,678। 1979-80 (জুলাই-জুন) সন পর্যন্ত 5,265·6 কোটি টাকার ঝুঁকি নেয়া হয়েছিল। এর মধ্যে বীমা পলিসি ও অন্যান্য স্কীমে রপ্তানি ঝুঁকি নেয়ার মূল্যের পরিমাণ 882·7 কোটি টাকা। অবশিষ্ট 4,382 9 কোটি টাকা আর্থিক সাহায্য স্কীমের আওতায় রপ্তানি ঋণ ও অন্যান্য ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত সুবিধা দান সম্পর্কিত। 1979 সনে ঝুঁকি নেয়ার মোট পরিমাণ ছিল 4,408·9 কোটি টাকা। এর মধ্যে রপ্তানি ঝুঁকির পরিমাণ 818·1 কোটি টাকা ও আর্থিক গ্যারেন্টির পরিমাণ 3,590·8 কোটি টাকা।

1979-80 সনে ই-সি-জি-সি দুটি নতুন স্কীম গ্রহণ করে। যথা, এক্সচেঞ্জ ফ্লাকচুয়েশন রিস্ক (বিড) কভার স্কীম ও এক্সচেঞ্জ ফ্লাকচুয়েশন রিস্ক (কনট্রাক্ট) কভার স্কীম। স্কীম দুটির উদ্দেশ্য বৈদেশিক বিনিময়ের হারের ওঠানামাজনিত ক্ষতির বিরুদ্ধে বীমা প্রথার প্রচলন করা। প্রথম স্কীমটির উদ্দেশ্য রপ্তানিকারকদের 'বিড' দাখিল করার তারিখ থেকে চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করার তারিখ পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালে বৈদেশিক বিনিময় হারের ওঠানামাজনিত ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা। দ্বিতীয় স্কীমটির উদ্দেশ্য চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করার তারিখ থেকে 15 বছরের অনধিক কাল পর্যন্ত ক্রেতার কাছ থেকে প্রাপ্য টাকার বৈদেশিক বিনিময়ের হারের ওঠানামাজনিত ক্ষতিপূরণ করা। 1980 সনের 2 আগস্ট থেকে এ স্কীম দুটো চালু করা হয়।

ডিপোজিট ইনসিওরেন্স এণ্ড ক্রেডিট গ্যারেন্টি কর্পোরেশন (ডি-আই-সি-জি-সি) 1971

ডি-আই-সি-জি-সির সাম্প্রতিক কাজকর্মে দেখা যায় 1979 সনের জুনের শেষাশেষি বীমাকৃত ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল 978। 1984 সনের জুনের শেষাশেষি এদের সংখ্যা দাঁড়ায় 1,773। এদের মধ্যে 84 কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক, 159 রিজিওন্যাল রুরাল ব্যাঙ্ক ও 1530 সমবায় ব্যাঙ্ক। 1979 সনের 1 সেপ্টেম্বর থেকে এ স্কীমের সুবিধা গুজরাট রাজ্যের 230 সমবায় ব্যাঙ্ককে দেয়ার ফলেই প্রধানত এ সংখ্যা বৃদ্ধি সম্ভব হয়। 1980 সনের জুনের শেষাশেষি 12 রাজ্যে ও 3 ইউনিয়ন টেরিটোরিতে অবস্থিত সমবায় ব্যাঙ্ক-গুলিও এ স্কীমের অধীনে আসে। 1 জুলাই 1980 সন থেকে তামিলনাড়ুর 145 সমবায় ব্যাঙ্কও এ স্কীমভুক্ত হয়। বর্তমানে (1984 জুন) 14 রাজ্যের ও 3 ইউনিয়ন টেরিটোরির সমবায় ব্যাঙ্কগুলির আমানত এ স্কীমভুক্ত। 89 সমবায় ব্যাঙ্ক এখন পর্যন্ত এ স্কীমের বাইরে রয়েছে।

আমানত বীমার কাজকর্মের পরিচিতি

সেপ্টেম্বরের শেষ শুক্রবার	সম্পূর্ণভাবে সংরক্ষিত একাউন্টের সংখ্যা (লক্ষ)	একাউন্টের সংখ্যা (লক্ষ)	বীমাকৃত আমানত (কোটি টাকা)	মোট প্রিমিয়ামযোগ্য আমানত (কোটি টাকা)
1971	2,99	3,10	4,224	6,801
1976	7,18	7,30	11,827	16,588
1980*	12,74	12,85	24,234	32,570
1981†	13,65	13,77	25,859	35,004
1982†	15,81	15,98	31,774	42,360
1983@	17,85	18,15	37,746	50,797

* 1 জুলাই। † জুনের শেষ শুক্রবার। @ অনুমিত।

সূত্র: রিপোর্ট অন কারেন্সি এণ্ড ফিনান্স 1983-84, Vol. II, p. 85, আরবিআই।

1980 সনের 1 জুলাই থেকে আমানতকারী প্রতি বীমার সীমা ব্যাঙ্ক প্রতি 20,000 টাকা থেকে বৃদ্ধি করে 30,000 টাকা করা হয়েছে। বীমার প্রিমিয়ামের হার প্রতি 100 টাকায় 4 পয়সা অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। 1983 সনের জুনের শেষাশেষি বীমাকৃত আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় 37,746 কোটি টাকা এবং সম্পূর্ণভাবে সুরক্ষিত একাউন্টের সংখ্যা 1,785 যা মোট আমানত একাউন্টের 98·3 শতাংশ।

1971-1981 (জুন) পর্যন্ত 14 কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক ও 12 সমবায় ব্যাঙ্কের মোট আমানত বীমার দাবির পরিমাণ 3·22 কোটি টাকা। এ সময়কালীন কমার্সিয়াল ও সমবায় ব্যাঙ্কগুলির কাছ থেকে ঋন পরিশোধ বাবদ যে অর্থ পাওয়া যায় তার পরিমাণ যথাক্রমে 83 লক্ষ টাকা ও 19 লক্ষ টাকা।

কর্পোরেশনটির ক্রেডিট সম্পর্কিত তিনটি গ্যারেন্টি স্কীম আছে। যথা, স্মল লোনস গ্যারেন্টি স্কীম, ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশনস গ্যারেন্টি স্কীম ও সার্ভিস কোঅপারেটিভ সোসাইটিস গ্যারেন্টি স্কীম। 1979 সনের জুনের শেষাশেষি এ তিনটি স্কীমে মোট ঋনদানের পরিমান 2,164·72 কোটি টাকা। 1980 সনের জুনের শেষাশেষি তা বৃদ্ধি পেয়ে 2,469·83 কোটি টাকা হয়। অর্থাং, এ সময়কালীন ঋন দানের পরিমাণ 14·1 শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এর মধ্যে কৃষিদের অংশ 63·4 শতাংশ, পরিবহণ চালকদের 13·5 শতাংশ ও খুচরো ব্যবসায়ীদের অংশ 11·4 শতাংশ।

1980 সনের জুনের শেষাশেষি 75 কর্মরত কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কের প্রত্যেকটি ও 59 রিজিওন্যাল রুরাল ব্যাঙ্ক স্মল লোনস গ্যারেন্টি স্কীমে অংশ-গ্রহণ করে। কর্পোরেশন গ্যারেন্টি বাবদ মোট প্রদত্ত ঋণের 99·5 শতাংশ এ স্কীমের মারফত দেয়া হয়েছে।

ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশন গ্যারেন্টি স্কীমে 17 স্টেট ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশনের সবকয়টি ও তামিলনাড়ু ইনডাস্ট্রিয়াল ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অংশগ্রহণ করেছে। সার্ভিস কোঅপারেটিভ সোসাইটিস গ্যারেন্টি স্কীমে যেকোন সিডিউল্ড কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক, রিজিওন্যাল রুরাল ব্যাঙ্ক ও সমবায় ব্যাঙ্ক-এর (প্রাথমিক সমবায় ব্যাঙ্ক ছাড়া) যোগদান করার অধিকার আছে। 1979-80 সন পর্যন্ত 61 সিডিউল্ড কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক, 28 রিজিওন্যাল রুরাল ব্যাঙ্ক ও 35 সমবায় ব্যাঙ্ক এ স্কীমে যোগদান করেছে।

স্কীম তিনটির কাজকর্মের অগ্রগতির পরিচয় পরের পৃষ্ঠায় দেয়া গেল।

ক্রেডিট দান
(কোটি টাকা)

	জুন মাসের শেষ শুক্রবার			
স্কীম	1972	1978	1979	1980
A. স্মল লোনস গ্যারেন্টি স্কীম 1971	205·71	1706·29	2154·45	2459·24
B. ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশনস গ্যারেন্টি স্কীম 1971	2·56	8·66	9·38	10·21
C. সার্ভিস কোঅপারেটিভ সোসাইটিস গ্যারেন্টি স্কীম 1971	0·12	0·22	0·89	0·43
মোট (A+B+C)	208·39	1715·17	2164·72	2469·88

* অনুমিত।

সূত্র: রিপোর্ট অন কারেন্সি এণ্ড ফিনান্স, আর-বি-আই, Vol. II 1979-80।

নন-ব্যাঙ্কিং কোম্পানিগুলির নিয়ন্ত্রণ

নন-ব্যাঙ্কিং কোম্পানিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রাইজ, চিটস এণ্ড মনি সার্কুলেশন স্কীমস (ব্যানিং) এ্যাক্ট 1978 প্রবর্তিত হয়। এ এ্যাক্ট 1978 সনের ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হয়। এ এ্যাক্ট দ্বারা রাজ্য সরকারগুলিকে চিট ফাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা দেয়া হয়। এজন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া মডেল রুলস প্রণয়ন করে বিভিন্ন রাজ্য সরকার ও ইউনিয়ন টেরিটোরিগুলির কাছে তা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করে।

চিট ফাণ্ডস এ্যাক্ট, 1982। এ এ্যাক্টের প্রধান উদ্দেশ্য, চলতি চিট ব্যবসায়কে রাজ্য সরকার বা ইউনিয়ন টেরিটোরিগুলির প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে আনা যাতে তারা দেশের সর্বত্র কাজকর্মে সমতা রক্ষা করে সুস্থ ও সরলভাবে অগ্রসর হতে পারে। এ এ্যাক্ট বেশ কিছু রাজ্য ও ইউনিয়ন টেরিটোরিতে কার্যকর হয়েছে। যথা, রাজ্যগুলির মধ্যে, কর্ণাটক, পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু এবং ইউনিয়ন টেরিটোরিগুলির মধ্যে চণ্ডীগড়। তাছাড়া মহারাষ্ট্র, মেঘালয়া,

মণিপুর, হিমাচল প্রদেশ, হরিয়ানা, সিকিম, দিল্লী, দাদরা ও নগর হাভেলী, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপ এবং লাক্ষাদ্বীপে এ এ্যাক্ট কার্যকর হচ্ছে। রাজ্য ও ইউনিয়ন টেরিটোরিগুলি এজন্য চিট ফাণ্ড রুলস তৈরি করছে। এ ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া এদের মডেল রুলস দিয়ে সাহায্য করছে।

ব্যাঙ্কিং লজ (এ্যামেণ্ডমেণ্ট) এ্যাক্ট 1984 রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট, 1934-এ একটি নতুন অধ্যায় III-C যুক্ত করেছে। এর ফলে অসংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির উপর আমানত গ্রহণ করা সম্পর্কে বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে। নির্দিষ্ট হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি, "আত্মীয়বর্গ" বাদ দিয়ে, 25 জনের বেশি লোকের কাছ থেকে আমানত নিতে পারবে না। অংশদারী ব্যবসার ক্ষেত্রে এর সংখ্যা অংশীদার প্রতি 25-এর বেশি হতে পারবে না। তবে এক্ষেত্রে মোট আমানতকারীর সংখ্যা কোন অবস্থাতেই 250 জনের বেশি হতে পারবে না। ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত অসংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশনে আমানতকারীদের সংখ্যা অংশীদারী ব্যবসায়ের সংখ্যার প্রায় অনুরূপ। আমানতের পরিমাণের পরিবর্তে আমানতকারীদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্য যাতে আমানত গ্রহণকারীরা বহু অজ্ঞ ও অশিক্ষিত আমানতকারীদের দ্বারস্থ হতে না পারে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার এক নির্দেশের ফলে হায়ার পারচেজ ও হাউজিং ফিনান্স কোম্পানিগুলিকে ভারতে (a) নিজেদের সঙ্গে নগদ টাকায়, অথবা (b) কোন সিডিউল্ড ব্যাঙ্কের একাউণ্টকে (যাবতীয় দায়মুক্ত), অথবা (c) পরিচ্ছন্ন অনুমোদিত সিকিউরিটিতে (যার মূল্য বাজার মূল্য দ্বারা নিরূপিত হবে), অথবা (d) আংশিক নগদ টাকা, আংশিক এরূপ একাউণ্ট বা আংশিক এরূপ সিকিউরিটিতে রাখতে হবে এবং এর মূল্য সংশ্লিষ্ট কোম্পানির হিসাব খাতায় যে কোন দিন ব্যবসায়ের শেষে দেখানো আমানতের 10 শতাংশের কম হওয়া চলবে না। 1984 সনের 30 মার্চ এ নির্দেশ সংশোধন করা হয় যার ফলে নগদ টাকা ধরে রাখার পূর্ব-নির্দেশ বাতিল হয়ে যায়।

নন-ব্যাঙ্কিং কোম্পানিগুলির আমানত বৃদ্ধি লক্ষণীয়। 1983 সনের 31 মার্চ 5,356 কোম্পানির মোট আমানতের পরিমাণ ছিল 9,194 কোটি টাকা যেখানে 1982 সনের 31 মার্চ 5,420 কোম্পানির মোট আমানতের পরিমাণ

ছিল 5,492 কোটি টাকা। 1983 সনের 31 মার্চের 9,194 কোটি টাকার আমানতে 2,557 নন-ফিনান্সিয়াল কোম্পানির অংশ ছিল 6,746 কোটি টাকা বা 73·6 শতাংশ। বাকী 2,202 কোটি টাকা বা 23·9 শতাংশ ও 228 কোটি টাকা বা 2·5 শতাংশ ছিল যথাক্রমে 2,296 ফিনান্সিয়াল কোম্পানিগুলি ও 503 বিবিধ নন-ব্যাঙ্কিং কোম্পানিগুলির (অর্থাৎ, চিট ফাণ্ড কোম্পানিগুলির) অংশ। নন-ব্যাঙ্কিং কর্পোরেট সেক্টরের মোট আমানতে অধিকাংশই (92·0 শতাংশ) ছিল পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিগুলির। এদের সংখ্যা 1,955 বা মোট প্রদর্শিত কোম্পানিগুলির 36·5 শতাংশ। বাকী 739 কোটি টাকা (8·0 শতাংশ) ছিল 3,401 প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিগুলির। এদের স্থান মোট প্রদর্শিত কোম্পানিগুলির 63·5 শতাংশ।

কারেন্সি

টাকার সাম্প্রতিক প্রসার

ব্যাপক অর্থে টাকার যোগান বলতে জনসাধারণের হাতে কারেন্সি, কমার্শিয়াল ও সমবায় ব্যাঙ্কগুলির মোট আমানত এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার কাছে রক্ষিত 'অন্যান্য' আমানতকে বুঝায়। এর সাঙ্কেতিক চিহ্ন M_3।*

1979 80 সনে M_3 পরিমাণ 6,051 কোটি টাকা বা 14·2 শতাংশ বৃদ্ধি পায়। 1978-79 সনে এ বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল 7,664 কোটি টাকা বা 22·0 শতাংশ। 1979-80 সনে M_3 পরিমাণ বৃদ্ধির মধ্যে 4,583 কোটি টাকা ব্যাঙ্কগুলির আমানত বৃদ্ধির পরিমাণ ও 1,104 কোটি টাকা জনসাধারণের হাতে কারেন্সি বৃদ্ধির পরিমাণ।

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া যে নীট ক্রেডিট দিয়েছে তার বৃদ্ধির পরিমাণ 1979-80 সনে 2,674 কোটি টাকা। 1978-79 সনে এ বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল 1,519 কোটি টাকা। কমার্সিয়াল ও সমবায় ব্যাঙ্কগুলি সরকারকে যে ক্রেডিট দেয় 1979 80 সনে তার বৃদ্ধির পরিমাণ 1,641 কোটি টাকা। 1978-79 সনে এর বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল 1,418 কোটি টাকা।

1979-80 কমার্সিয়াল সেক্টরে ব্যাঙ্ক ক্রেডিটের পরিমাণ (সবরকম পার্টিসিপেশন সার্টিফিকেট সহ) হ্রাস পায়। এর পরিমাণ 1978-79 সনে যেখানে ছিল 4,624 কোটি টাকা বা 20·5 শতাংশ সেখানে 1979-80 সনে এর পরিমাণ 4,223 কোটি টাকা বা 15·5 শতাংশ। কমার্সিয়াল সেক্টরে (সবরকম পি-সি-এস সহ) সমস্ত কমার্শিয়াল ও সমবায় ব্যাঙ্ক প্রদত্ত ক্রেডিটের মোট পরিমাণ 1979-80 সনে 3,479 কোটি টাকা বা 14·9 শতাংশ বৃদ্ধি পায়। 1978-79 সনে এ বৃদ্ধির পরিমাণ 4,471 কোটি টাকা বা 20·8 শতাংশ।

---

*M_1 = জনসাধারণের হাতে কারেন্সি + কমার্শিয়াল ও সমবায় ব্যাঙ্কগুলির চাহিদা আমানত + রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে রক্ষিত 'অন্যান্য' আমানত।

M_2 = M_1 + পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্কের আমানত।

M_4 = M_3 (জনসাধারণের হাতে কারেন্সি + কমার্শিয়াল ও সমবায় ব্যাঙ্কগুলির মোট আমানত + রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার কাছে রক্ষিত 'অন্যান্য' আমানত) + পোষ্ট অফিসের মোট আমানত।

1979-80 সনে ব্যাঙ্কিং সেক্টরে নীট বৈদেশিক বিনিময়ের পরিমাণ 676 কোটি টাকা বা 12·2 শতাংশ হ্রাস পায়। 1978-79 সনে এ ক্ষেত্রে বৃদ্ধির পরিমাণ 1,071 কোটি টাকা বা 23·9 শতাংশ।

1979-80 সনে রিজার্ভ টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এর মধ্যে জনসাধারণের হাতে থাকা টাকার পরিমাণ 1,104 কোটি টাকা। ব্যাঙ্ক রিজার্ভের (অর্থাৎ, ব্যাঙ্কের হাতে থাকা টাকা ও আর-বি-আই-এর কাছে ব্যাঙ্কগুলির ব্যালেন্স) বৃদ্ধির পরিমাণ 459 কোটি টাকা। 1979-80 সনে রিজার্ভ টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পাবার কারণ ভারত সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির কাছে আর-বি-আই-এর নীট ক্রেডিটের পরিমাণ বৃদ্ধি। 1978 79 এর পরিমাণ ছিল 1,519 কোটি টাকা ; 1979-80 সনে 2,674 কোটি টাকা। অর্থাৎ, আর-বি-আই-এর সরকারের কাছে নীট ব্যাঙ্ক ক্রেডিটের পরিমাণ 1979-80 সনে 27·8 শতাংশ বৃদ্ধি পায়। 1978-79 সনে এ বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল 18·5 শতাংশ। রিজার্ভ টাকার পরিমাণ বৃদ্ধির অপর কারণ আর-বি-আই কর্তৃক আই-ডি-বি-আই, এ-আর-ডি-সি প্রভৃতি উন্নয়নমূলক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে ঋণদান। 1978-79 সনে এ ঋণ প্রদানের পরিমাণ ছিল আই-ডি-বি-আই ও এ-আর-ডি-সি ক্ষেত্রে যথাক্রমে 182 কোটি টাকা ও 8 কোটি টাকা। 1979-80 সনে এর পরিমাণ যথাক্রমে 230 কোটি টাকা ও 120 কোটি টাকা।

আর-বি-আইর নীট বৈদেশিক বিনিময় সম্পদের পরিমাণ 1975-76 সন থেকে 1978-79 পর্যন্ত অব্যাহতরূপে বৃদ্ধি পেতে থাকে। 1975-76 সনে এ বৃদ্ধির পরিমাণ 971 কোটি টাকা। পরবর্তী বছরগুলিতে এ বৃদ্ধির পরিমাণ যথাক্রমে 2,032 কোটি টাকা, 1,260 কোটি টাকা ও 1,071 কোটি টাকা। 1979-80 সনে বৈদেশিক বিনিময় সম্পদের পরিমাণ 676 কোটি টাকা হ্রাস পায়। এর প্রধান কারণ 1980 ও 1981 সনের শেষে জনসাধারণের হাতে টাকার যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি। 1980 সনে জনসাধারণের হাতে টাকার যোগান 1979 সনের তুলনায় 3,119 কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়। 1981 সনে 1980 সনের তুলনায় এ বৃদ্ধির পরিমাণ 2,804 কোটি টাকা।

জনসাধারণের হাতে টাকার যোগানের ক্রমবৃদ্ধির পরিমাণ
(কোটি টাকা)

ডিসেম্বরের শেষে	বার্ষিক	পরিবর্তন	
	কারেন্সি	আমানত	মোট যোগান
1975	305	785	1090
1979	+1343	+726	+2069
1980	+1794	+1325	+3119
1981	+1139	+1 57	+2804

সূত্র: ইণ্ডিয়া 1982।

1983-84 সনে M_3-র বৃদ্ধির পরিমাণ লক্ষণীয়—12,699 কোটি টাকা বা 17·4 শতাংশ। 1982-83 সনে এ বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল 10,442 কোটি টাকা বা 16·7 শতাংশ। 1983-84 ও 1982-83 সনে M_1 বৃদ্ধির পরিমাণ যথাক্রমে 4,491 কোটি টাকা বা 15·7 শতাংশ ও 3,806 কোটি টাকা বা 15·4 শতাংশ। M_2 বৃদ্ধির পরিমাণ যথাক্রমে 4,543 কোটি টাকা ও 3,951 কোটি টাকা। শতাংশের দিক থেকে উভয় ক্ষেত্রেই বৃদ্ধি 14·6 শতাংশ। M_4 বৃদ্ধির পরিমাণ যথাক্রমে 13,413 কোটি টাকা বা 16·5 শতাংশ ও 11,268 কোটি টাকা বা 16·1 শতাংশ।

1983-84 সনে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় M_3 লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পাবার কারণ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক সরকারকে ক্রেডিট দেয়ার নীট পরিমাণ অতিমাত্রায় বৃদ্ধি এবং ব্যাঙ্কিং সেক্টরের নীট বৈদেশিক বিনিময় সম্পদের অবনতি ঘটা সত্ত্বেও কারেন্সির প্রসারের উপর তার প্রভাবের অভাব। 1983-84 সনে নীট ব্যাঙ্ক ক্রেডিট বৃদ্ধির পরিমাণ 5,818 কোটি টাকা বা 16·7 শতাংশ। 1982-83 সনে এর পরিমাণ ছিল 4,734 কোটি টাকা বা 15·7 শতাংশ। বাণিজ্য সেক্টরে ব্যাঙ্ক ক্রেডিটের প্রসার হ্রাস পায়। 1983-84 সনে এর পরিমাণ ছিল 7,929 কোটি টাকা বা 15·5 শতাংশ; 1982-83 সনে 8,796 কোটি টাকা বা 20·5 শতাংশ। 1983-84 সনে কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কগুলির বর্ধিত ক্রেডিট (5,504 কোটি টাকা) প্রধানত খাদ্য সংগ্রহ খাতে ব্যয় হয়। এর পরিমাণ 1,057 কোটি টাকা। 1982-83 সনে এর পরিমাণ

ছিল 838 কোটি টাকা। খাদ্য ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রদত্ত ক্রেডিটের পরিমাণ ছিল 1983-84 ও 1982-83 সনে যথাক্রমে 4,447 কোটি টাকা ও 4,974 কোটি টাকা।

1983-84 সনে ব্যাঙ্কিং সেক্টরের নীট বৈদেশিক বিনিময় সম্পদের হ্রাসের পরিমাণ 104 কোটি টাকা। 1982-83 সনের তুলনায় (895 কোটি টাকা) এর পরিমাণ অনেক কম। 1983-84 ও 1982-83 সনে ব্যাঙ্কিং সেক্টরের নীট অর্থ সম্পর্কিত নয় (নন-মনিটারি) এমন দায় (ব্যাঙ্কগুলির মেয়াদী আমানত ছাড়া) বৃদ্ধির পরিমাণ যথাক্রমে 981 কোটি টাকা ও 2,2?8 কোটি টাকা। 1983-84 সনে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এরূপ দায়ের পরিমাণ 458 কোটি টাকা হ্রাস পায়। পক্ষান্তরে 1982-83 সনে তা 239 কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়।

টাকার সরবরাহ (কোটি টাকা)

বিষয়	মার্চের শেষ শুক্রবার				তারতম্য (শতাংশ)			• মার্চ-জুন	
	1981	1982	1983	1984*	1981-82	1982-83	1983-84	1983	1984
M_1	23,117	24,719	28,535	33,026	+7·0	+15·4	15·7	+1,576	+2,285
M_2	25,355	27,080	31,031	35,574	+6·8	+14·6	+14·6	+1,480	+2,285
M_3	55,358	62,426	72,868	85,567	+12·8	+16·7	+17·4	+4,181	+5,017
M_4	61,870	69,896	81,164	94,577	+13·0	+16·1	+16·5	+4,202	+5,017

M_1, M_2, M_3, M_4 সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলির জন্য 476 পৃঃ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

* অনুমিত।

সূত্র : রিপোর্ট অন কারেন্সি এণ্ড ফিনান্স 1983-84, Vol. I, p 120, আরবিআই।

আর্থিক অনুপাত ও টাকার গুণক (মার্চের শেষ শুক্রবার)

বিষয়	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84*
আর্থিক অনুপাত (Monetary Ratios)					
(a) কারেন্সি / মোট আমানত	33·7	32·4	30·3	29·7	29·8
(b) কারেন্সি / M_3	25·0	24·3	23·2	22·9	22·9
প্রান্তিক অনুপাত (Incremental Ratios)					
(a) কারেন্সি / মোট আমানত	28·2	25·9	16·6	26·3	30·2
(b) কারেন্সি / M_3	21·3	20·8	14·5	20·8	22·9
টাকার গুণক (Money Multiplier)					
M_3/RM†	2·8	2·9	3·1	3·2	3·0
প্রান্তিক টাকার গুণক (Incremental Money Multiplier)					
M_3/RM†	2·5	3·7	4·2	3·9	2·2

* অনুমিত। † রিজার্ভ টাকা।

সূত্র : রিপোর্ট অন কারেন্সি এণ্ড ফিনান্স 1983-84, Vol. I, p 128, আরবিআই।

টাকায় আয়ের বেগ

	উৎপাদন ব্যয়ে (at factor cost)		
আর্থিক বছর	নীট জাতীয় আয় (চলতি দামে) বৃদ্ধি / শতাংশ	M_3 বৃদ্ধি / শতাংশ	M_3-র আয়ের বেগ
(1)	(2)	(3)	(4)
1978-79	7·6	20·3	2·2
1979-80	9·0	20·2	2·0
1980-81	19·6	16·4	2·1
1981-82	15·3	17·3	2·0
1982-83*	9·9	14·3	2·0
1983-84*	19·4	17·1	2·0

* অনুমিত।

M_3-র আয়ের বেগ অর্থাৎ, গড় M_3-তে চলতি দামে উৎপাদন ব্যয়ে জাতীয় আয়ের অনুপাত।

সূত্র: রিপোর্ট অন কারেন্সি এণ্ড ফিন্যান্স 1983-84, Vol. I, p 129, আরবিআই।

23 পুঁজিতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক ও মিশ্র অর্থনীতি

পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতি

'পুঁজিতন্ত্র'-এর সংজ্ঞা কি ? অস্ট্রিয়ান স্কুলের মতে পুঁজিতন্ত্র হচ্ছে এমন একটি প্রথা যে প্রথায় উৎপাদন সরাসরি না করে ঘোরানো পথে করা হয়। কিন্তু এ ধারণা নির্ভুল বলা চলে না। আদিম যুগ ছেড়ে দিলেও সব যুগেই উৎপাদন কমবেশি ঘোরানো পদ্ধতিতেই হয়েছে। বর্তমানের কম্যুনিস্ট দেশগুলিতেও তাই হচ্ছে। তাছাড়া এ সংজ্ঞাতে পুঁজির মালিক কে এ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি আসছে না।

আবার কারো কারো মতে পুঁজিতন্ত্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদেরই একটি দিক। পুঁজিতন্ত্রে রয়েছে ব্যক্তি স্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। আর্থিক ক্ষেত্রে পুঁজিতন্ত্রের অর্থ ব্যক্তিগত উদ্যোগের পূর্ণ স্বাধীনতা। সরকারের 'অবাধ নীতি' বা হস্তক্ষেপ না করার নীতি এর প্রতীক। এ ধারণাও সম্পূর্ণ নির্ভুল নয়। কারণ অবাধ প্রতিযোগিতার হদিস পৃথিবীর অর্থনৈতিক ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া শক্ত।

পৃথক মতে, পুঁজিতন্ত্রে উৎপাদনের উপকরণ এক শ্রেণী লোকের মালিকানায়। এ মালিক শ্রেণীর স্বার্থ শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের বিপরীত। মালিক শ্রেণীর মুখ্য উদ্দেশ্য মুনাফা, শ্রমিক শোষণ।

এ মতও বিতর্কমূলক। মানুষের অর্জনস্পৃহা তার আদিম স্পৃহাই বলা চলে। পুঁজিতন্ত্রে এ রূপ উগ্র হয়ে উঠেছে মাত্র। নতুন কিছুই নয়।

কার্ল মার্কসের মতে পুঁজিতন্ত্র হচ্ছে উৎপাদনের এমন এক পদ্ধতি যেখানে শ্রমিকেরা উৎপাদনের উপকরণের মালিকানা থেকে বঞ্চিত। এর মালিকানা মুষ্টিমেয় এক শ্রেণী লোকের হাতে। শ্রমিকেরা তাদের কাছে শ্রম-শক্তি বিক্রয় করে দেয়। বিনিময়ে তারা যে মূল্য পায় তা দিয়ে তাদের কোন-মতে জীবনধারণ সম্ভব হয় মাত্র। কিন্তু মালিকেরা পুরো সময় শ্রম-শক্তিকে খাটিয়ে নিয়ে যে মূল্য উৎপাদন করে তা তাদের জীবিকার জন্য যে মূল্য দেয়া

হয় তার চেয়ে বেশি। এমনি করে শ্রম-শক্তি থেকে সৃষ্টি হয় উদ্বৃত্ত মূল্য যা মুনাফারই অপর নাম।

মার্কস ও মারস্থাল যে পুঁজিতন্ত্রের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন তা ছিল উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইংল্যাণ্ড, পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকায় বিকাশমান শিল্পমুখী পূর্ণ পুঁজিতন্ত্র। 1939-45 সনের পরে সে পুঁজিতন্ত্রের রূপ অনেকাংশে পাল্টিয়েছে। নতুন পুঁজিতন্ত্র অনেক বেশি উন্নত, অনেক উচ্চ শিল্প শিখরে সমাসীন ও কল্যাণমূলক রাষ্ট্র-পুঁজিতে রূপান্তরিত। একে অনেকে 'জনগণের পুঁজিতন্ত্র' বলে অভিহিত করে থাকেন।

বর্তমানে পুঁজি রাষ্ট্রেও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ রয়েছে। এ সমাজব্যবস্থাও অ-মুনাফা সেক্টরের (পেনসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্যবীমা, সস্তা পরিবহণ, পরিবেশ পরিশোধন প্রভৃতি) উদ্ভব হয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে পুঁজিতন্ত্রে প্রতিষ্ঠানগত পরিবর্তনও উল্লেখযোগ্য। যথা, একচেটিয়া কারবার, জয়েণ্ট স্টক কোম্পানি, মালটিন্যাশনাল কর্পোরেশন, আপোসমুখী শ্রমিক ও মালিক সংস্থা। তাছাড়া অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য আয়ের পুনর্বণ্টন এবং প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়নের ফলে উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে 'সর্বহারা' শ্রমিকের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে; পুঁজি ও শ্রমিকের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে; উৎপাদকেরা তাদের উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা সৃষ্টি করার জন্য সবসময় চেষ্টা করে যাচ্ছে যাতে মন্দা না আসে। সেবা সেক্টরের কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে; সাধারণভাবে পরিকল্পিত অর্থনীতির ধারণাও গৃহীত হয়েছে। কোম্পানিগুলি তাদের নিজস্ব ও অর্থ সংস্থাগুলির ঋণ সম্পদের সাহায্যে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করে চলেছে; তারা আর ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের উপর বিশেষ নির্ভরশীল নয়।

এসব পরিবর্তন সত্ত্বেও পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে সামাজিক ন্যায় ও সাম্য, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং তার সঙ্গে জড়িত রাজনৈতিক স্বাধীনতা অপূর্ণ থেকে গেছে। অর্থনৈতিক অপচয় ও অস্থিরতা এবং বেকারত্ব আজও পুঁজিতন্ত্রের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হয়ে রয়েছে। সংক্ষেপে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, শোষণ, শ্রেণী-বিরোধ ও অর্থনৈতিক সঙ্কট থেকে পুঁজিতন্ত্র আজও মুক্ত নয়।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি

পুঁজিতন্ত্রের যেমন কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই, সমাজতন্ত্রেরও তাই। তবে সমাজতন্ত্রকে চিহ্নিত করা কঠিন নয়। সমাজতন্ত্র হচ্ছে এমন একটি

অর্থনৈতিক সংগঠনের প্রতিফলন যেখানে সমাজের উৎপাদনের সব উপকরণের মালিক প্রতিটি মানুষ। কোন বস্তুগত সম্পত্তিই ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, সব সম্পত্তি সামাজিক সম্পত্তি। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সামাজিক সম্পদের উন্নয়ন ঘটবে এবং সমাজের প্রতিটি মানুষ সম অধিকারে এর ফলাফলের অধিকারী হবে। সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য, উৎপাদনের উপকরণে সামাজিক মালিকানা, সমতা, সামাজিক কল্যাণ, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার বিলোপ সাধন ও শ্রেণীহীন সমাজ।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিও পরিশুদ্ধ নয়। বিপরীত যুক্তিও রয়েছে। যেমন, প্রতিযোগিতা মানুষের প্রকৃতি। অর্থনৈতিক ক্ষেত্র থেকে প্রতিযোগিতা সরিয়ে নেয়ার অর্থ কাজের উৎসাহে বাধা সৃষ্টি করা। যোগ্যতা স্বীকৃতি চায়—সামাজিক ও আর্থিক মূল্যে। আর্থিক ক্ষেত্রে তা মুনাফা। মুনাফা ছাড়া ব্যবসায় বাণিজ্যে প্রেরণা আসে না। সব মানুষ সমান প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না। বৈষম্যকে অস্বীকার করা, বাস্তবকে অস্বীকার করারই সামিল। সুতরাং পূর্ণ সমতা অবাস্তব ধারণা। যে অর্থনীতিতে বাজার পদ্ধতির অভাব সে অর্থনীতিতে সম্পদ বণ্টন বৈজ্ঞানিক হতে পারে না। তাছাড়া সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে ভোগকারীর কোন স্বাধীনতা নেই। কেন্দ্রগত পরিকল্পনা আমলাতন্ত্রের পরম পৃষ্ঠপোষক এবং নানাপ্রকার প্রশাসনিক জটিলতার সৃষ্টিকারী।

মিশ্র অর্থনীতি

পুঁজিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মত মিশ্র অর্থনীতিরও কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই। কারো কারো মতে মিশ্র অর্থনীতি 'নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি', আবার কারো কারো মতে 'দ্বৈত অর্থনীতি'। কেহ কেহ আবার মিশ্র অর্থনীতিকে 'ভারসাম্য অর্থনীতি'ও বলে থাকেন। মিশ্র অর্থনীতির ব্যাপকতাও কম নয়। সামুয়েলসনের দৃষ্টিতে আমেরিকার অর্থনীতিও মিশ্র অর্থনীতি। সে অর্থে কম্যুনিস্ট দেশগুলির অর্থনীতিও মিশ্র অর্থনীতির চিহ্ন ধারণ করতে পারে। কারণ এসব দেশেও রয়েছে সমাজতন্ত্র ও পুঁজিতন্ত্রের কিছুটা সংমিশ্রণ।

মিশ্র অর্থনীতি সম্পূর্ণ পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতি নয়; সম্পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিও নয়—উভয়ের সংমিশ্রণ। এ সংমিশ্রণ সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, মিশ্র অর্থনীতিতে মালিক ও পরিচালকরূপে সরকারের ভূমিকা এত

বিশাল মনে হবে যেন পুঁজির অধিকারী ও অবাধ উদ্যোগ এক ও অভিন্ন। অন্যভাবে বলা যায়, মিশ্র অর্থনীতি পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতি ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সমন্বয়।

বৈশিষ্ট্য ঃ সরকারের প্রচেষ্টায় স্থাপিত ও পরিচালিত উদ্যোগ বা পাবলিক সেক্টর এবং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত উদ্যোগ বা প্রাইভেট সেক্টর এ দুয়ের অর্থনৈতিক সহাবস্থান মিশ্র অর্থনীতির মূল বৈশিষ্ট্য। উভয় উভয়ের পরিপূরকরূপে অবস্থান করছে, তবে এ সহাবস্থানের পেছনে একাধিপত্যের নীরব সংগ্রামের উপস্থিতি অস্বীকার করা যায় না। পাবলিক সেক্টর নিঃসন্দেহে প্রধান ও পরিচালকের ভূমিকায়। প্রাইভেট সেক্টরের ভূমিকা মূলত পরিপূরকরূপী। প্রাইভেট সেক্টর পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতির কতিপয় বৈশিষ্ট্যের ধারক। পাবলিক সেক্টরের মুখ্য উদ্দেশ্য সমাজ কল্যাণ, সামাজিক ন্যায় ও সাম্য প্রতিষ্ঠা। প্রাইভেট সেক্টর মুনাফামুখী, তবে তা সরকারী নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মিশ্র অর্থনীতিতেও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সম্ভব। সরকারের বিরাট ও ব্যাপক ভূমিকা থাকাতে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রয়েছে এবং সম্পদ বণ্টনেও অপচয় কম। মিশ্র অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতায় বাধা নেই। বাজার পদ্ধতি রয়েছে, তবে তা সম্পূর্ণ অবাধ নয়; যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণাধীন। গণতান্ত্রিক অধিকাররূপে ভোগ-কারীদের প্রভুত্ব স্বীকৃত। ব্যক্তিবিশেষের আয়, ব্যয় ও সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের উপর নিয়ন্ত্রণ উল্লেখযোগ্য নয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারও স্বীকৃত। পেশা গ্রহণ ও বর্জনের স্বাধীনতার উপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। জাতীয় স্তরে এরূপ সহাবস্থানের অপর একটি সুবিধা পুঁজিতান্ত্রিক ও সমাজ-তান্ত্রিক উভয় দেশের সঙ্গেই সুষম সম্বন্ধ রক্ষা করে চলা যায়।

পূর্বেই ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে বাস্তবে দেখা যায় পাবলিক ও প্রাইভেট সেক্টরের সহাবস্থানের মধ্যে এক তীব্র সংঘাত গড়ে ওঠে। পাবলিক সেক্টরের প্রাধান্য স্বীকার করে নিতে প্রাইভেট সেক্টর সম্মত নয়। পাবলিক সেক্টরের প্রতি সরকারের দুর্বলতা ও অসীম অনুগ্রহ এবং তাদের প্রতি সাধারণত বিরূপতা প্রাইভেট সেক্টরের বিক্ষোভের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পাবলিক সেক্টরের ব্যর্থতার জন্য প্রাইভেট সেক্টরকে আংশিক দায়ী করা বা অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রাইভেট সেক্টরের অসমর্থতা অথবা প্রাইভেট সেক্টরের

আপেক্ষিক সাফল্যজনিত পাবলিক সেক্টরের মনোগত বিরূপতা পরস্পরের প্রতি সহযোগিতার পরিবর্তে সংঘাতকেই আশ্রয় দিয়ে থাকে।

উপসংহার ঃ পুঁজিতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র দুটো বিপরীত ধারণা। একই সমাজে উভয়ের স্থায়ী সহাবস্থান এক অবাস্তব ধারণা বলে উল্লেখ করলে অযৌক্তিক হবে না। এরূপ সংমিশ্রণে অর্থনৈতিক সঙ্কট তীব্র ও গণতন্ত্র বিপন্ন হতে বাধ্য। প্রসঙ্গক্রমে, সহাবস্থান ও উচ্চতর সংশ্লেষণ বা সমন্বয় এক নয়। মিশ্র অর্থনীতি পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতি বা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির কোনটিরই পরবর্তী উন্নত স্তর নয়—মধ্য পথ অবলম্বন মাত্র। প্রয়োজন, সংশ্লেষণ ও তৃতীয় স্তর।

24 পাবলিক সেক্টর ও জয়েন্ট সেক্টর

পাবলিক সেক্টর পরিচিতি

"পাবলিক সেক্টর" বলতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সরকারের সরাসরি উদ্যোগকে বুঝায়।

পাবলিক সেক্টর ও প্রাইভেট সেক্টরের সহাবস্থানের অপর নাম মিশ্র অর্থনীতি। মিশ্র অর্থনীতি সমাজতন্ত্র ও পুঁজিতন্ত্রের মধ্য পথ। ভারতের শিল্প নীতিতে মিশ্র অর্থনীতিকে গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তৎকালীন ভারতের প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর বক্তব্য, রাষ্ট্র রাজনৈতিক ক্ষমতার দিক থেকে অতিশয় শক্তিশালী। যদি তাকে অর্থনৈতিক দিক থেকেও অতিশয় শক্তিশালী করে তোলা হয় তবে সে নিছক ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়াবে। এ চিন্তার ধারকদের মতে অর্থনৈতিক কারণে প্রাইভেট সেক্টরকে সম্পূর্ণ অপসারিত করা সঙ্গত হবে না। কারণ এর ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে জটিলতা সৃষ্টি হবে তা সহজে পূরণ করার ক্ষমতা ভারত সরকারের নেই। তাছাড়া ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্র এত বিশাল ও সম্প্রসারণশীল যে, ব্যক্তিগত উদ্যোগ ব্যাহত হলে দ্রুত শিল্পোন্নয়ন সম্ভব হবে না। তবে প্রাইভেট সেক্টর যাতে একচেটিয়া স্বার্থ গঠন করার সুযোগ না পায় বা অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে জাতীয় স্বার্থের বিরোধী হয়ে উঠতে না পারে সেজন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা, নিয়ন্ত্রণ ও পরিকল্পনার প্রয়োজন। পাবলিক সেক্টর এ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার মুখ্য ভূমিকাতে রয়েছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পাবলিক সেক্টরের নেতৃত্বে ও তার পরিপূরকরূপে প্রাইভেট সেক্টরকে গ্রহণ করা হয়েছে।

সমর্থনে যুক্তি

পাবলিক সেক্টরের সমর্থনে যেসব যুক্তি রাখা হয় তা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

(1) আদর্শগত। সমাজতন্ত্রের প্রথম ও প্রধান শর্ত উৎপাদনের উপকরণগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা ও রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে রাখা। ভারত সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী অতএব রাষ্ট্র পাবলিক সেক্টরে উদ্যোগী।

(2) প্রাইভেট সেক্টরের সীমাবদ্ধতা॥ প্রাইভেট সেক্টর সরাসরি উৎপাদনমূলক উদ্যোগে বিনিয়োগ করতে আগ্রহান্বিত, সামাজিক ভিত-কাঠামো ক্ষেত্রে নয়। কারণ তারা সাধারণত মুনাফার স্বার্থকতাই বোঝে, জনকল্যাণের স্বার্থকতা নয়। তাছাড়া ভিত-কাঠামো গঠন করার জন্য যে পরিমাণ সম্পদ ও উন্নতমানের প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োজন তা সংগ্রহ করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তদুপরি এরূপ ক্ষেত্রে মুনাফা কম ও মুনাফা লাভের জন্য দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয়। সংক্ষেপে, প্রাইভেট সেক্টর এরূপ ক্ষেত্রে আকৃষ্ট নয়।

যেসব ক্ষেত্রে প্রচুর বিনিয়োগের প্রয়োজন, (যেমন, ইস্পাত প্রকল্প) বা জাতীয় স্বার্থে যে শিল্পে রাষ্ট্রের একচেটিয়া মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ থাকা দরকার (যেমন, দেশরক্ষা সম্পর্কিত শিল্প ও রেলপথ) সেসব শিল্প অনিবার্য-রূপে পাবলিক সেক্টরভুক্ত হয়।

(3) প্রাইভেট সেক্টরের ত্রুটি॥ প্রাইভেট সেক্টর সামাজিক ন্যায়-নীতির বা জনকল্যাণের ধার ধারে না। সর্বোচ্চ মুনাফা এর মূল লক্ষ্য। এজন্য অসাধু পদ্ধতি অবলম্বন করতেও উহা দ্বিধা বোধ করে না। প্রাইভেট সেক্টর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একচেটিয়া স্বার্থ গড়ে তুলতে চায় ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা মুষ্টিমেয় শিল্প গৃহের হাতে কেন্দ্রীভূত করে জাতির অর্থনীতি ও রাজনীতিতে নিজের প্রভুত্ব বিস্তার করতে সচেষ্ট। তাছাড়া প্রাইভেট সেক্টর খাদক ও শ্রমিক স্বার্থ উপেক্ষা করে চলে। শ্রমিক অসন্তোষ প্রাইভেট সেক্টরেই বেশি।

প্রাইভেট সেক্টরের ব্যাঙ্কগুলি কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প এবং কৃষি, ক্ষুদ্র স্ব-নিযুক্ত ব্যক্তি ও দুর্বল শ্রেণীদের ঋণ না দিয়ে বৃহৎ ও স্বজনপোষিত শিল্প-বাণিজ্যে ঋণ দিয়ে থাকে। এর ফলে ক্রেডিট বণ্টন ক্ষেত্রে ভারসাম্যের অভাব ঘটে। প্রাইভেট সেক্টরের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণে আমানতকারীদের অর্থ নিরাপদ নয়। ভারতের ব্যাঙ্কিঙের ইতিহাসে ব্যাঙ্কের কাজকর্ম গুটিয়ে নেয়ার ইতিহাস বিরল নয়।

(4) কেন্দ্র পরিকল্পিত ও নিয়ন্ত্রিত পরিকল্পনার উদ্দেশ্য॥ কেন্দ্র পরিকল্পিত ও নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতিতে পাবলিক সেক্টরের প্রধান ও সম্প্রসারণশীল ভূমিকা থাকে। জাতীয় সম্পদ সংগ্রহ ও একীভূত করা এবং বিভিন্ন সেক্টরের মধ্যে তার সুষম বণ্টন কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার দায়িত্ব। কেন্দ্র সামাজিক ও আদর্শের

সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প-বাণিজ্য সংস্থাগুলির মারফত এ দায়িত্ব পালন করে। জাতীয় স্বার্থে ও নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষ প্রাইভেট সেক্টরের হাতে সীমিত দায়িত্ব দেয়া হয়ে থাকে।

(5) আঞ্চলিক বৈষম্য। প্রাইভেট সেক্টর মুনাফার লোভে আঞ্চলিক বৈষম্য বৃদ্ধি করে চলে। একমাত্র পাবলিক সেক্টরের মাধ্যমেই আঞ্চলিক বৈষম্য সমস্যার সমাধান করা সম্ভব।

ভিলাই, রাউরকেল্লা, দুর্গাপুর প্রভৃতি অনুন্নত অঞ্চলে যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা পাবলিক সেক্টরের উদ্যোগ থাকাতেই সম্ভব হয়েছে।

(6) মুনাফা পুনর্বিনিয়োগ। প্রাইভেট সেক্টরের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি মুনাফার বেশ কিছু অংশ লভ্যাংশরূপে শেয়ার-হোল্ডারদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়। অবশিষ্ট অংশ পুনরায় বিনিয়োগ করা বা না করা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটির ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। ফলে কার্যকর মূলধনের অভাব দেখা দেয়। পাবলিক সেক্টর এ ত্রুটি থেকে মুক্ত।

(7) লভ্যাংশ। প্রাইভেট সেক্টরে লভ্যাংশ শেয়ার-হোল্ডাররা ভোগ করে। পাবলিক সেক্টরের উদ্বৃত্ত জাতীয় সম্পদরূপে গৃহীত হয়।

(8) নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা। পাবলিক সেক্টরভুক্ত-শিল্পের উপর সরকারের সর্বময় নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকার ফলে সরকার প্রয়োজন মত দামের পরিবর্তন সাধন করে মুদ্রাস্ফীতির প্রকোপ হ্রাস করতে পারে। তাছাড়া আন্তর্জাতিক দামের সঙ্গে সমতা রক্ষা করে চলাও সম্ভব হয়। জনগণের স্বার্থে স্বল্প মুনাফা বা লাভও-নয়-ক্ষতিও নয় নীতিতে দাম নির্ধারণ করা পাবলিক সেক্টরের পক্ষেই সম্ভব।

(9) মজুরির সমতা। পাবলিক সেক্টর বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের মধ্যে শ্রম মূল্যের সমতা এনে শ্রমিক-প্রশাসনিক সম্পর্কের উন্নতি সাধন করতে অনেক বেশি সমর্থ।

(10) আমদানি পরিবর্ত। একমাত্র পাবলিক সেক্টরের উদ্যোগই ভারতের মত বিশাল দেশকে স্বয়ম্ভর করে তুলতে পারে। কারণ এজন্য যে সামগ্রিক জাতীয় স্বার্থসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গী, পরিকল্পন, বিনিয়োগ, নিয়ন্ত্রণ ও দক্ষ রূপায়ণ দরকার তা একমাত্র পাবলিক সেক্টরের পক্ষেই সম্ভব। প্রাইভেট সেক্টরের দৃষ্টিভঙ্গী মুনাফা-সর্বস্ব। তাছাড়া সমগ্র অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার

সুযোগ ও ক্ষমতাও তার নেই। সে সুযোগ ও ক্ষমতা একমাত্র রাষ্ট্রেরই আছে।

(11) অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্রুত ও সমতাসম্পন্ন হওয়ার সুযোগ। পাবলিক সেক্টর আর্থিক ভিত-কাঠামো সৃষ্টি ও বিভিন্ন উপকরণ উৎপাদন করে পরোক্ষে বা অপরোক্ষে প্রাইভেট সেক্টরকে সাহায্য করতে পারে। প্রাইভেট সেক্টর যেসব ক্ষেত্রে উদ্যোগ নিতে সমর্থ নয় বা ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে বা যেসব ক্ষেত্র প্রাইভেট সেক্টরের মালিকানায় বা নিয়ন্ত্রণে থাকা জাতীয় স্বার্থে সমর্থনীয় নয় সেসব ক্ষেত্রে পাবলিক সেক্টর স্বয়ং উদ্যোগী হতে পারে। পাবলিক সেক্টরের এ ভূমিকার ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন পিছিয়ে পড়ার হাত থেকেই শুধু মুক্তি পাবে তা নয়, উন্নয়ন দ্রুততর ও সমতাপূর্ণ হবার সুযোগ পাবে।

বিপক্ষে যুক্তি

(1) পদ্ধতিগত অসুবিধা। পাবলিক সেক্টরকে আমলাতান্ত্রিক রীতি-নীতির মধ্য দিয়ে তাদের পরিকল্পনাগুলির অনুমোদন নিতে হয়। ফলে অহেতুক সময় নষ্ট হয়। যার ফলে যে দাম স্তর, শর্তাদি ও সম্ভাবনার ভিত্তিতে প্রকল্পের পরিকল্পনা করা হয়েছিল তা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়ায়। পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব হয়। ফলে ব্যয়ভার বৃদ্ধি পায়। প্রাইভেট সেক্টর আমলা পদ্ধতি থেকে মুক্ত বলে দ্রুত নীতি নির্ধারণ, পরিকল্পন ও তা রূপায়ণ করতে সমর্থ হয়।

(2) প্রয়োজনাতিরিক্ত মূলধন বিনিয়োগ। ত্রুটিপূর্ণ পরিকল্পন, কর্মসূচী রূপায়ণে বিলম্ব, বিদেশ থেকে শর্তাধীন সাহায্য গ্রহণ (যেমন, সাহায্য-দানকারী দেশ থেকে আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ক্রয় করার বাধ্যবাধকতা (আন্তর্জাতিক দাম নির্বিশেষে) শ্রমিক তোষণ নীতি প্রভৃতি কারণে পাবলিক সেক্টরে প্রয়োজনাতিরিক্ত মূলধন বিনিয়োগ সমস্যা দেখা দেয়। এ প্রসঙ্গে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন, হিন্দুস্থান এরোনেটিকস ও ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়েছে।

(3) প্রয়োজনাতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগ। প্রয়োজনের অতিরিক্ত শ্রমিক ও উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগের ফলে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায়, কাজকর্মেও শিথিলতা দেখা দেয়। প্রশাসনিক নিয়মানুবর্তিতার অভাবে সামগ্রিকভাবে

উৎপাদনের উৎকর্ষ বিঘ্নিত হয়। প্রাইভেট সেক্টরে সর্ববিষয়ে ব্যবসাগত সতর্ক দৃষ্টির প্রভাব থাকাতে এ রকম অপচয় ঘটার সুযোগ কম।

(4) দক্ষতার স্বীকৃতির অভাব। পাবলিক সেক্টরের তুলনায় প্রাইভেট সেক্টরে দক্ষতার স্বীকৃতি অনেক বেশি। প্রাইভেট সেক্টরে যেকোন দক্ষ কর্মী যে কোন উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হওয়ার আশা রাখতে পারে। প্রাইভেট সেক্টরে কাজ করার স্বাধীনতা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণের সুযোগও অনেক বেশি। পাবলিক সেক্টরে স্বজন পোষণের আধিক্য দেখা যায়।

(5) পরিচালনায় উদ্যোগ নেয়া ব্যাপারে বাধা। পাবলিক সেক্টরকে তাদের কাজকর্মের জন্য সংসদের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। অর্থাৎ, জনসাধারণের তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। ফলে প্রশাসনিক উদ্যোগ নেয়া ব্যাপারে উৎসাহের অভাব ঘটে।

(6) পাবলিক সেক্টর সমাজকল্যাণমুখী নীতির ভিত্তিতে গঠিত বলে সর্বোচ্চ মুনাফা নীতির বিরোধী। মুনাফাগত ব্যবসায়িক মানসিকতার অভাবে পাবলিক সেক্টর উৎকর্ষের দিক থেকে প্রাইভেট সেক্টরের তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে। পাবলিক সেক্টরের অধিকাংশ সংস্থা বর্তমানেও সরকারের অর্থ সাহায্যে চলছে।

(7) 'ওভারহেড' ব্যয়ের আধিক্য। পাবলিক সেক্টরে কর্মীদের জন্য গৃহ নির্মাণ, চিকিৎসা, শিক্ষা ও তাদের অবসর সময় যাপনের সুব্যবস্থা প্রভৃতি কারণে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়। ফলে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ, প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে পিছিয়ে আসতে হয়। যার ফলে উৎপাদন ব্যয় আরো বৃদ্ধি পায়।

(8) সুপরিকল্পন, সুদক্ষ পরিচালকের অভাব প্রভৃতি। বর্তমান অবস্থায় যে পরিমাণ উৎপাদন সম্ভব তা অপেক্ষা অনেক বেশি উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন যন্ত্রপাতি ক্রয় করার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই যন্ত্রপাতির উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ সুযোগ নেয়া সম্ভব হয় না। এর ফলে গড় উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায়। উৎপাদন ও আনুষঙ্গিক কাজের জন্য যে উপকরণ ক্রয় করা হয় সুদক্ষ পরিচালনার অভাবে তার অপচয়ও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য।

(9) চাকরির দিক থেকে পাবলিক সেক্টর প্রাইভেট সেক্টরের তুলনায় সাধারণত কম আকর্ষণীয়। ফলে পাবলিক সেক্টর প্রথম শ্রেণীর শিল্প পরিচালকদের সেবা থেকে বঞ্চিত হয়। নিয়োগ নীতির ত্রুটি (যেমন,

এ্যাডমিনিসস্ট্রেটিভ সার্ভিস থেকে স্বল্পকালের জন্য কোন অফিসারকে এনে পাবলিক সেক্টরের কোন গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার সর্বোচ্চ পদে বসিয়ে দেয়া) দূর করার এবং পাবলিক সেক্টরের পরিচালনার জন্য এক শ্রেণী সুদক্ষ কর্মী সৃষ্টি ও তাদের যোগ্যতা-ভিত্তিক পদোন্নতির পথ সুনিশ্চিত করার যুক্তি স্বীকৃত হলেও তা যথাযথ কার্যকর করা হয় না।

(10) তথাকথিত আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করার অজুহাতে, বস্তুত রাজনৈতিক চাপে, যে স্থানে যে প্রকল্প স্থাপন করা অর্থনীতির দিক থেকে বাঞ্ছনীয় নয় তা বাঞ্ছিত বলে গ্রহণ ও কার্যকর করা হয়। দলীয় রাজনীতির হাতিয়াররূপে সংগঠিত শ্রমিক ইউনিয়নগুলির অশুভ প্রতিযোগিতা পাবলিক সেক্টরকে আরো সমস্যা সঙ্কুল করে তোলে।

সাম্প্রতিক কাজকর্ম

পাবলিক সেক্টরে যেসব শিল্প রয়েছে তাদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয় : (i) জনকল্যাণমূলক শিল্প। যথা, রেলপথ, সড়ক, পরিবহণ, বন্দর, ডাক ও তার, শক্তি ও সেচ প্রকল্প। (ii) কেন্দ্র ও রাজ্যের বিভাগীয় শিল্প সংস্থা। যথা, চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস, ইনটিগ্র্যাল কোচ ফ্যাক্টারী ও নানা প্রকার দেশরক্ষা শিল্প প্রতিষ্ঠান। (iii) যেসব শিল্প ও বাণিজ্যিক উদ্যোগ যারা কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের কাছ থেকে শেয়ার মূলধন ও ঋণরূপে তাদের অধিকাংশ ফিনান্স পেয়ে থাকে।

1981 সনের 31 মার্চে কেন্দ্রীয় পাবলিক সেক্টরের উদ্যোগের সংখ্যা ছিল 185। এর মধ্যে 116 উদ্যোগ দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয়, 52 সেবা, 10 নির্মাণ ও 7 বীমা কোম্পানি। 1969-70 সনে বিনিয়োগের (শেয়ার ও ঋণ) পরিমাণ ছিল 4,301 কোটি টাকা। 1980-81 সনে তা বৃদ্ধি পেয়ে 21,126 কোটি টাকা হয়। 1980-81 সনে এ পর্যন্ত মোট লেনদেনের পরিমাণ ছিল 23, 90 কোটি টাকা। অর্থাৎ, 1980-81 সনে 1979-80 সনের তুলনায় লেনদেন বৃদ্ধির পরিমাণ 23 শতাংশ।

পাবলিক সেক্টরভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির রপ্তানির পরিমাণ 1980-81 সনে 2,212 কোটি টাকা। 1979-80 সনে এর পরিমাণ ছিল 1,912 কোটি টাকা। 1980-81 সনে এদের মুনাফার পরিমাণ, সুদ দেয়ার পরে কিন্তু কর দেয়ার আগে, 39·16 কোটি টাকা। সে বছর 94 উদ্যোগের মোট মুনাফার পরিমাণ ছিল 792 কোটি টাকা। 74 উদ্যোগের মোট লোকসানের পরিমাণ

753 কোটি টাকা। 1979-80 ও 1980-81 সনের মধ্যে পাবলিক সেক্টরের উদ্যোগগুলি কর্তৃক মোট সম্পদ সৃষ্টির পরিমাণ 9,212 কোটি টাকা।

1982-83 সনের সুরুতে কেন্দ্রীয় পাবলিক সেক্টরে (অ-বিভাগীয়) মোট বিনিয়োগের পরিমাণ 24,000 কোটি টাকা। উদ্যোগের সংখ্যা 203। কেন্দ্রীয় পাবলিক সেক্টরের উদ্যোগগুলির বিনিয়োগ ক্ষেত্র প্রধানত ভিত-কাঠামো। যথা, ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং, ইস্পাত ও খনি। বর্তমানে পাবলিক সেক্টরের উদ্যোগগুলি মাধ্যমিক ও ভোগ্যদ্রব্যও উৎপাদন করছে। যথা, ইলেকট্রিক দ্রব্য, ফটো শিল্প, অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি, ঔষধপত্র, বস্ত্র প্রভৃতি। পাবলিক সেক্টরে কতিপয় বাজারকরণ ও বাণিজ্যিক উদ্যোগ গঠিত হয়েছে। যথা, স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন, মিনারেলস এণ্ড মেটালস ট্রেডিং কর্পোরেশন, টি ট্রেড়িং কর্পোরেশন প্রভৃতি। প্রযুক্তিবিদ্যা, পরামর্শ প্রদান ও নির্মাণের জন্যও অর্থ বিনিয়োগ করা হচ্ছে।

পাবলিক সেক্টরের দ্রুত প্রসার লক্ষণীয়। 1970-71 সনে (চলতি দামে) নীট দেশীয় উৎপাদনে পাবলিক সেক্টরের অংশ ছিল 14·5 শতাংশ। 1982-83 সনে এর পরিমাণ অনুমিত 23·5 শতাংশ।

পাবলিক সেক্টরের কাজকর্ম প্রধানত কয়লা, বিদ্যুৎ, লৌহ ও ইস্পাত, কাগজ প্রভৃতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরে আবদ্ধ। এর ফলে অবশ্য প্রাইভেট সেক্টরের প্রসারের পথ সহজ হয়েছে। মূলধন গঠনেও পাবলিক সেক্টরের ভূমিকা উল্লেখ্য। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দেশের মোট স্থূল স্থির মূলধন গঠনে পাবলিক সেক্টরের অংশ ছিল 41 শতাংশ ও ষষ্ঠ পরিকল্পনার সুরুতে এর পরিমাণ 47 শতাংশ। কর্মসংস্থানের দিক দিয়েও দেখা যায় 1981 সনে সুসংগঠিত শিল্প ক্ষেত্রে মোট নিয়োগের 67·5 শতাংশ পাবলিক সেক্টরভুক্ত। 1982 সনের ডিসেম্বরের শেষে পাবলিক সেক্টরে 16,278 হাজার লোক যুক্ত ছিল ; প্রাইভেট সেক্টরে এর সংখ্যা ছিল 7,525।

মন্তব্য

পাবলিক সেক্টরের আর্থিক ও উৎপাদনগত কাজকর্ম সন্তোষজনক বলা চলে না। অধিকাংশ সংস্থাগুলি লোকসানে বা অতি সামান্য মুনাফায় চলে। 1978-79 সনে সমষ্টিগতভাবে এদের লোকসানের পরিমাণ 40 কোটি টাকা, 1979-80 সনে 74 কোটি টাকা ও 1980-81 সনে 203 কোটি টাকা। 1981-82 সনে মুনাফার পরিমাণ 485 কোটি টাকা। 1982-83 সনে

সর্বোচ্চ পরিমাণ মুনাফা হয়। মুনাফার পরিমাণ 599·48 কোটি টাকা। এ মুনাফার উৎস প্রধানত তেল কোম্পানিগুলি। অ-তেল এককগুলির অসমর্থতার কারণ প্রচুর বিনিয়োগ ও দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ উৎপাদন। 1982 সনের মার্চে তেল সেক্টরে বিনিয়োগের পরিমাণ 1,300 কোটি টাকা যেখানে ইস্পাত সেক্টরে বিনিয়োগের পরিমাণ 4,673 কোটি টাকা, কয়লা সেক্টরে 2,606 কোটি টাকা। মুনাফার পরিমাণ ও অন্যান্য সেক্টরের কাজকর্ম আশানুরূপ না হওয়ার কারণ প্রধানত বিদ্যুতের অভাব। 1983 সনে এপ্রিল, মে ও জুনে বিদ্যুৎ হ্রাসের পরিমাণ 50 থেকে 100 শতাংশ।

প্রাইভেট সেক্টরের রুগ্ন এককগুলি অধিগ্রহণ করার ফলে পাবলিক সেক্টরকে 1982-83 সনে 200 কোটি টাকা ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। শিপিং সেক্টরকেও মাসুল হ্রাস করার প্রতিযোগিতার কারণে ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। রাজ্যস্তরে যেসব পাবলিক সেক্টর উদ্যোগ আছে তাদের অধিকাংশই সরকারের ভরতুকিতে চলে। যেমন, পরিবহণ, বিদ্যুৎ ও দুগ্ধ সরবরাহ।

বিনিয়োগের তুলনায় পাবলিক সেক্টরের লেনদেনের আশাব্যাঞ্জক নয়। 1971 সন থেকে 1981-82 সন পর্যন্ত লেনদেন বিনিয়োগ অনুপাত 1971 সনে 0·71, 1981-82 সনে 1·66। লেনদেন নিয়োগ অনুপাতের উন্নতি লক্ষণীয়। 1970-71 সনে গড়ে কর্মী প্রতি লেনদেন ছিল 50,136 টাকা, 1981-82 সনে এর পরিমাণ দাঁড়ায় 1,91,600 টাকা। লেনদেন মূলধনের অনুপাতেও উন্নতি দেখা যায়। 1970-71 সনে এ অনুপাত 88·1 শতাংশ, 1981-82 সনে 160 শতাংশ। স্থূল মুনাফা-বিনিয়োগের অনুপাত 1970-71 সনে 3·12 শতাংশ, 1981-82 সনে 12·00 শতাংশ।

মিশ্র অর্থনীতি ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেয়ার ভূমিকায়, সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনায়, আঞ্চলিক বৈষম্য লাঘব করা ব্যাপারে, সাহায্যকারী ও ক্ষুদ্র শিল্প সংগঠনের সহায়করূপেও পাবলিক সেক্টর আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করতে সমর্থ হয়নি।

প্রস্তাব

(1) পাবলিক সেক্টর সমাজতন্ত্রের পথে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। কিন্তু এর সামাজিক বা অর্থনৈতিক গুণগত বা সংখ্যাগত লক্ষ্য কোথাও সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত নয়। পাবলিক সেক্টরভুক্ত শিল্প একটি নয়, অনেক। উদ্দেশ্যও তাদের পৃথক। পৃথক পৃথক শিল্পের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে ব্যক্ত

হওয়া প্রয়োজন। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকলে পরিচালকদের পক্ষে দায়িত্ব নেয়া ও দক্ষতার সঙ্গে সে দায়িত্ব পালন করা সহজ হয়।

(2) পাবলিক সেক্টরে দাম নির্ধারণ নীতি অস্পষ্ট ও অসঙ্গতিপূর্ণ। সমাজ কল্যাণের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে, অর্থনৈতিক মূল বিধিগুলি মনে রেখে পাবলিক সেক্টরভুক্ত শিল্পগুলির দাম নির্ধারণ নীতি সম্পর্কিত সুষ্ঠু সিদ্ধান্তে পৌঁছানো দরকার।

(3) প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্ব যথার্থ যোগ্য ব্যক্তিদের দিতে হবে। রাজনীতি বা স্বজনপোষণ নীতি বর্জন করে চলতে হবে। তারা ভৌগোলিক, সামাজিক আর্থিক প্রভৃতি সবদিক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করে প্রকল্প নেবে। প্রকল্প অনুমোদনের পর যথাসম্ভব সত্বর তা রূপায়ণের ব্যবস্থা করতে হবে।

(4) পাবলিক সেক্টরের প্রতিটি কাজে অতিশয় সংসদীয় সতর্কতা পরিহার করা সঙ্গত।

(5) উৎপাদন বহুমুখী ও রপ্তানি-ভিত্তিক করে তুলতে হবে। এর ফলে বিস্তৃত বাজারের সুযোগ পাওয়া যাবে। কলকারখানার পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হয়ে উঠবে। উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পাবে।

(6) শ্রমিক ইউনিয়নগুলির শিল্পবিরোধী কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। শ্রমিকেরা যাতে সঙ্গত মজুরি পায় ও অন্যান্য শ্রমিক কল্যাণমূলক সুবিধা পাওয়া সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

পাবলিক সেক্টরের দাম নির্ধারণ নীতি

কতিপয় তত্ত্ব

(i) প্রান্তিক ব্যয় নীতি। এ নীতি অনুযায়ী স্থির ব্যয়কে দাম নির্ধারণে ধরা হয় না। প্রান্তিক ব্যয়ে সুদকেও দাম নির্ধারণে ধরা হয় না। প্রান্তিক ব্যয় দ্বারা দাম নির্ধারিত হলে উদ্যোগটির কাজকর্মের মান নির্ণয় করা সম্ভব হবে না। যে ক্ষেত্রে ক্ষতির প্রশ্ন রয়েছে সে ক্ষেত্রে ভরতুকির প্রশ্নও আসছে। ভরতুকির মারফত আয়ের এরূপ পুনর্বণ্টন সামাজিক দিক থেকে কতটা সাম্যের পরিচয় সে প্রশ্নও রয়েছে। প্রান্তিক ব্যয় নীতির ভিত্তিতে দাম নির্ধারিত হলে ভারী শিল্পগুলি প্রচুর ক্ষতির সম্মুখীন হবে। কারণ এসব ক্ষেত্রে স্থির ব্যয়ের অনুপাত পরিবর্তনশীল ব্যয় অপেক্ষা অনেক বেশি।

(ii) লাভও নয়, লোকসানও নয়। এ দাম নীতির সমর্থকদের বক্তব্য,

জনস্বার্থে সরকারী উদ্যোগগুলি এমনভাবে তাদের পণ্যদ্রব্যের দাম নির্ণয় করবে যাতে সব মূলধন ব্যয় মিটাবার পর তাদের লাভ বা লোকসান কোনটাই না হয়। সেবামূলক উদ্যোগের ক্ষেত্রে দাম তাদের আপেক্ষিক ব্যয়ের সমান রাখতে হবে।

ক্ষতি স্বীকার করে কোন উদ্যোগ পরিচালনার অর্থ এক শ্রেণী ভোগকারীর স্বার্থে সরকারের ভরতুকির আশ্রয় গ্রহণ করা। আর এ ভরতুকির টাকা যোগাড় করার জন্য সরকারকে করের হার বৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতির সাহায্য নিতে হয়। তাছাড়া নতুন রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ক্ষেত্রে এ নীতি কার্যকর করা সহজসাধ্য নয়। কারণ শিল্পটিকে অধিগ্রহণ করার জন্য সরকারকে যে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে বা এর মূলধন ঋণ পরিশোধের জন্য যে অর্থ সংগ্রহ করতে হবে তা যদি অতিরিক্ত কর আদায় করে সংগ্রহ করার চেষ্টা করা হয় তাহলে দেশের অর্থ-নীতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে। এ নীতির ফলে পরিচালকদের যোগ্যতার পরিমাপ করা সম্ভব হবে না।

সরকারী উদ্যোগগুলির মুনাফার সমর্থনে বলা যেতে পারে যে, উন্নতিশীল দেশে পাবলিক সেক্টরের এক বিরাট ভূমিকা রয়েছে। এবং পাবলিক সেক্টরে বিনিয়োগ সরকারের আয়ের অন্যতম প্রধান সূত্র। পাবলিক সেক্টরকে মুনাফা করতে না দেয়া হলে এর প্রসার সম্ভব হবে না, সরকারের আয়েও সঙ্কটের সৃষ্টি হবে।

পাবলিক সেক্টরের মুনাফা শ্রমিক স্বার্থের অনুকূলে। শ্রমিক মুনাফার অধিকারী হয়ে লাভবান হবে। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে, মুনাফার একাংশ আবার বিনিয়োগ করা হয়। এভাবে উদ্যোগটির নিজের সম্পদ বৃদ্ধি পেতে থাকে। মূলধনের দিক থেকে উদ্যোগটি স্বয়ম্ভরতার দিকে এগিয়ে যায়। 'মুনাফা' যোগ্যতার মাপকাঠি রূপে গৃহীত হলে পরিচালকদেরও কাজকর্মের দক্ষতাও বৃদ্ধি পাবে।

অপর দিকে এও বলা যেতে পারে যে, যেহেতু সরকারী উদ্যোগগুলি সাধারণত একচেটিয়া প্রকৃতির ও তাদের উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিশীল সুতরাং দাম বৃদ্ধি করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। দাম বৃদ্ধি দ্বারা মুনাফা অর্জন বা বৃদ্ধি সাফল্যের পরিচয় নয়, বরঞ্চ দক্ষতার অভাবকে চেপে যাওয়ার সামিল। অবশ্য সরকারের সামাজিক দায়িত্বের পরিপ্রেক্ষিতে এমনও বলা যেতে পারে যে, সার (দৃষ্টান্তস্বরূপ) যদি উৎপাদন ব্যয়ের কম দামে বিক্রয়

করা হয় তবে সমূহ যে ক্ষতি হবে তার চেয়ে ভবিষ্যতে অনেক বেশী লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ সারের দাম কম হলে সারের ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে, অর্থাৎ, উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। সরকার ও সমাজ উভয়ই পরিণামে লাভবান হবে।

(iii) গড় ব্যয় নীতি। গড় ব্যয় দ্বারা দাম নির্ধারণের সমর্থনে বলা চলে যে, এমন অনেক সেবামূলক উদ্যোগ আছে যেসব ক্ষেত্রে প্রান্তিক ব্যয় নির্ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন। যথা, ডাক বিভাগ। ভারতের যেকোন জায়গায়ই একটি পোস্টকার্ড পাঠানো হোক না কেন তার দাম পনেরো পয়সা। দূরত্ব যাই হোক না কেন একই দাম নেয়ার কারণ প্রতি ক্ষেত্রে দূরত্বের ভিত্তিতে প্রান্তিক ব্যয় সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া প্রশাসনিক জটিলতা ও ব্যয়ের দিক থেকে বিবেচনা করলেও প্রতি ক্ষেত্রে দূরত্ব ভেদে দাম নির্ণয় করা যুক্তিযুক্ত নয়। যেসব উদ্যোগ ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তাদের দাম গড় ব্যয়ের সমান হলে উৎপাদন বৃদ্ধি ও দাম হ্রাস সম্ভব হবে এবং সামাজিক কল্যাণ সাধিত হবে। গড় ব্যয় দাম নীতি গৃহীত হলে ভরতুকির দায় থেকেও সরকার রেহাই পাবে।

(iv) প্রভেদাত্মক দাম নীতি। অঞ্চলভেদে, সেবার প্রকৃতিভেদে বা ক্রেতাভেদে একই জিনিসের পৃথক দাম নেয়ার সমর্থনে বলা যায় যে, এর ফলে উদ্যোগটির পক্ষে তার মোট উৎপাদন ব্যয় তুলে নেয়া সম্ভব হবে। পরিবহণ ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কম মাসুল নেয়া হয়। ফলে স্বল্প দামের দ্রব্যের পক্ষে বিস্তৃত বাজারের সুযোগ নেয়া সম্ভব হয়; পরিবহণ শিল্পেরও প্রসার লাভ ঘটে। প্রভেদাত্মক দাম নীতির কার্যকারিতা চাহিদার অস্থিতিস্থাপকতার উপর নির্ভরশীল। এ নীতি ক্রমবর্ধমান উৎপাদন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার সুযোগ বেশি।

ভারতে পাবলিক সেক্টরের মূল্য নীতি

আমাদের দেশের সরকারী উদ্যোগ বা পাবলিক সেক্টর কোন নির্দিষ্ট দাম নীতি দ্বারা পরিচালিত হয় না। সাধারণভাবে বলা চলে, মুনাফা অর্জন করা উদ্যোগগুলির লক্ষ্য। তবে তা সমাজ কল্যাণবিরোধী মূল্যে নয়। মোটামুটি সামাজিক কল্যাণ ও সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তিতে দাম নির্ধারিত হয়। হিন্দুস্থান এন্টিবায়োটিকস মোটামুটি মুনাফাও নয়,

ক্ষতিও নয় এ দাম নীতি অনুসরণ করে চলেছে। ডাক ও তার বিভাগও সামান্য মুনাফা রেখে দাম নির্ধারণ করে। সার প্রভৃতি ক্ষেত্রে দাম উৎপাদন ব্যয়ের কম। এসব ক্ষেত্রে ভরতুকি দেয়া হয়। বিদ্যুৎ ও বিমান শুল্কের হার প্রভেদাত্মক দাম নীতির ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। রেলের ভাড়া যাত্রীদের বা মালের ব্যয়ভার বহন করার ক্ষমতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। সরকারের মতে পরিকল্পিত উন্নতিশীল দেশে পাবলিক সেক্টরের পক্ষে একই রকম দাম নীতি অনুসরণ করা সম্ভব নয়।

এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস কমিশনের অভিমত

এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস কমিশনের মতে :

(i) শিল্প ও ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রে যেসব সরকারী উদ্যোগ রয়েছে তাদের মুনাফা অর্জনের দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। এর ফলে তাদের মূলধন ও সরকারের আয় বৃদ্ধি পাবে।

(ii) জনস্বার্থে সরকার প্রদত্ত নির্দেশ ছাড়া কোন সরকারী উদ্যোগের পক্ষে ক্ষতি স্বীকার করে দাম নির্ণয় করা চলবে না।

(iii) সেবামূলক উদ্যোগগুলির উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে, মুনাফার দিকে নয়। প্রান্তিক ব্যয় ও দাম সমান না হওয়া পর্যন্ত উৎপাদন বৃদ্ধি অসঙ্গত হবে না।

(iv) যতদূর সম্ভব কলকারখানার উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার প্রয়োজন।

উপসংহার

পাবলিক সেক্টরের জন্য কোন নির্দিষ্ট দাম নীতি নির্ধারণ করে দেয়া সম্ভব নয়, সঙ্গতও নয়। বিশেষত যেখানে পাবলিক সেক্টরের প্রতিযোগীরূপে প্রাইভেট সেক্টরের অবস্থান, সাধারণভাবে বলতে গেলে, মুনফামুখী। তবে অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠায় পাবলিক সেক্টরের ভূমিকা রয়েছে। সুতরাং দক্ষতা বৃদ্ধি, দাম হ্রাস, উৎপাদন বৃদ্ধি ও উৎপাদনের সুষম বণ্টন তার দাম নীতির মৌল ভিত হওয়া সঙ্গত।

জয়েন্ট সেক্টর

'জয়েন্ট সেক্টর' সম্পূর্ণ রাষ্ট্রায়ত্তকরণ ও অবাধ প্রাইভেট উদ্যোগের মধ্যে একটা মীমাংসামূলক ব্যবস্থা। জয়েন্ট সেক্টরের উদ্দেশ্য একদিকে প্রাইভেট সেক্টরের একচেটিয়া ক্ষমতা বা অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূতকরণ প্রচেষ্টা প্রতিহত করা অন্যদিকে প্রাইভেট সেক্টরের সহজাত গুণাবলীর সহযোগিতায় পাবলিক সেক্টরের দক্ষতা বৃদ্ধি করা। জয়েন্ট সেক্টরের স্বীকৃতির অর্থ পাবলিক সেক্টর যে পরিচালনার দিক থেকে প্রাইভেট সেক্টর অপেক্ষা অনেক কম দক্ষ তা স্বীকার করে নেয়া।

দত্ত কমিটির (1969) মতে প্রাইভেট সেক্টরের ক্ষেত্রে মুষ্টিমেয়র হাতে অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার যে আশঙ্কা রয়েছে তা থেকে মুক্তি পেতে হলে পাবলিক সেক্টরের পত্তন ও প্রসার যেমন সঙ্গত তেমনি পাবলিক সেক্টরকে অর্থনৈতিক দিক থেকে অধিকতর অর্থপূর্ণ করে তুলতে হলে প্রাইভেট সেক্টরকে তার অংশীদার করে নেয়া সমীচীন। জয়েন্ট সেক্টরের বৈশিষ্ট্য হবে পাবলিক ও প্রাইভেট সেক্টরের যুক্ত মালিকানা, যুক্ত নিয়ন্ত্রণ ও যুক্ত পেশাদারী পরিচালনা।

1970 সনে ভারত সরকার কর্তৃক জয়েন্ট সেক্টর নীতি গৃহীত হয়।

সমর্থনে যুক্তি

(1) জয়েন্ট সেক্টর প্রাইভেট সেক্টরের অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা রোধ করতে সাহায্য করবে। প্রাইভেট সেক্টরে সরকারী মালিকানা ও পরিচালনার অনুপ্রবেশের ফলে প্রাইভেট সেক্টরের একচেটিয়া কারবার ও অসাধু কার্যকলাপ বন্ধ হবে।

(2) প্রাইভেট সেক্টরের মুখ্য উদ্দেশ্যে সর্বোচ্চ মুনাফা করা। সরকারের অনুপ্রবেশের ফলে জয়েন্ট সেক্টরকে সঙ্গত দাম, যথাস্থানে বিনিয়োগ, গবেষণা, উৎপাদনশীলতা ও রপ্তানি বৃদ্ধি প্রভৃতির দিকে নজর দিতে হবে।

(3) প্রাইভেট সেক্টর দেশের সামগ্রিক উন্নতি ও সামাজিক কল্যাণের প্রতি আগ্রহশীল নয়। তাই তারা আঞ্চলিক বৈষম্য সমস্যা উপেক্ষা করে চলে। জয়েন্ট সেক্টর তাদের এ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটাবার সুযোগ পাবে।

(4) নানাবিধ সরকারী বিধিনিষেধের মধ্যে প্রাইভেট সেক্টরকে

কাজকর্ম করতে হয়। যেমন, মূলধন সংগ্রহ, শিল্প প্রসার, উপকরণ আমদানি প্রভৃতি সম্পর্কিত নানারকম সরকারী নিয়ন্ত্রণ। সরকারের মালিকানা ও পরিচালনা যুক্ত হওয়ার ফলে এসব অসুবিধা অনেকটা লাঘব হবে। ফলে উৎপাদনে সমৃদ্ধি দেখা দেবে।

(5) জয়েণ্ট সেক্টর পাবলিক সেক্টর ও প্রাইভেট সেক্টরের মধ্যে এক পরীক্ষামূলক সমঝোতা। অনেকে এর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা প্রকাশ করেন। কারণ এ যুক্ত প্রচেষ্টার মধ্যে প্রাইভেট সেক্টরের উদ্যোগী ও প্রতিযোগী মনোভাবের সঙ্গে পাবলিক সেক্টরের সামাজিক কল্যাণ ও সামাজিক নিয়মানুবর্তিতার সমন্বয় ঘটবে।

সমস্যা

(1) জয়েণ্ট সেক্টরে সরকারী ও বেসরকারী অংশীদারদের ভূমিকা ও স্বার্থ সুনির্দিষ্ট নয়।

(2) জয়েণ্ট সেক্টরের প্রধান উদ্দেশ্য অনুন্নত অঞ্চলের উন্নয়ন, অর্থনৈতিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ ও শিল্পোন্নয়ন দ্রুততর করা। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে বেসরকারী উদ্যোগ সরকারের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ নিয়ে কম শেয়ারের অংশীদার হয়েও বৃহৎ প্রকল্পের অনুমোদন লাভ করছে। অর্থাৎ, পূর্বে প্রাইভেট সেক্টর যেসব সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল তা পাওয়ার অধিকারী হয়েছে। ফলে প্রাইভেট সেক্টর জয়েণ্ট সেক্টরের সুবিধা নিয়ে অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠছে।

(3) জয়েণ্ট সেক্টরে সরকার চাইছে প্রতি পদে হস্তক্ষেপ ; বেসরকারী স্বার্থ চাইছে ন্যূনতম হস্তক্ষেপ। এ পরস্পরবিরোধী সম্পর্ক জয়েণ্ট সেক্টরের উন্নতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

(4) প্রাইভেট সেক্টরের ধারণা সরকারের উদ্দেশ্য জয়েণ্ট সেক্টরের মাধ্যমে বেসরকারী উদ্যোগকে খর্ব করে পাবলিক সেক্টরের একচেটিয়া প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত করা। এ মানসিকতা স্বভাবতই সহযোগিতা ও উন্নয়নের পরিপন্থী।

উপসংহার

পরস্পরবিরোধী স্বার্থ হওয়া সত্ত্বেও যদি জয়েণ্ট সেক্টরকে সমাজতান্ত্রিক নীতির অঙ্গরূপে স্বীকার করে নিতে হয় তবে এ প্রচেষ্টাকে কার্যকর করে

তোলার জন্য সরকারী ও বেসরকারী স্বার্থের মধ্যে একতাবোধ স্থাপন করতে হবে। প্রাইভেট সেক্টরের যেসব শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি যথেষ্ট সম্পদশীল ও পরিচালনাগত দক্ষতায় উন্নত প্রধানত তাদেরই সঙ্গে যুক্ত প্রচেষ্টায় যুক্ত হওয়া সঙ্গত। এর ফলে উভয়েই উভয়ের বিশেষ গুণের প্রভাবে উপকৃত হতে পারবে ও তাদের উন্নতমানের কাজের পরিচয় শিল্প ক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সমর্থ হবে।

25 অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন

বিভিন্ন ক্ষেত্রের কাঠামোর পরিবর্তনের রূপ

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা জাতীয় অর্থনৈতিক কাঠামো আধুনিকীকরণের উদ্যোগ নেয়। ফলে কাঠামোগত যে পরিবর্তন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে তার মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখযোগ্য।

(1) স্থূল দেশীয় উৎপাদনের বিন্যাসে পরিবর্তন।

লক্ষণীয় স্থূল দেশীয় উৎপাদনে কৃষি ও সংশ্লিষ্ট সেক্টরের অংশ হ্রাস পাচ্ছে। 1950-51 সনে উৎপাদনের 58·9 শতাংশ এ সেক্টর থেকে পাওয়া গেছে। 1978-79 সনে তা হ্রাস পেয়ে 41·6 শতাংশ হয়। অপর দিকে, খনি, ম্যানুফ্যাকচারিং ও নির্মাণের অংশ 14·9 শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 22·5 শতাংশ হয়। এ দ্বারা শিল্প সেক্টরের উন্নয়ন সূচিত হচ্ছে।

(2) ভিত স্থাপক ও মূলধন দ্রব্য সম্পর্কিত শিল্পের প্রসার ও উন্নয়ন ঘটেছে। স্বাধীনতার পূর্বে দেশে বস্ত্র, লৌহ ও ইস্পাত ও শর্করা শিল্পের মত কয়েকটি শিল্প মাত্র গড়ে উঠেছিল। স্বাধীনতার পর পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্যোগে স্বয়ম্ভরতা ও বিবিধ শিল্পোন্নয়ন নীতি গ্রহণের ফলে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। শিল্প উৎপাদন ক্ষেত্রে খাদ্য, বস্ত্র প্রভৃতি অতি প্রচলিত শিল্পের শতাংশ হ্রাস পায় এবং রসায়ন ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের শতাংশ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার দ্রুত উন্নয়ন ঘটে।

এ প্রসঙ্গে পাবলিক সেক্টরের প্রসার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 1960-61 সন থেকে 1977-78 সনের মধ্যে খনি ও সংগঠিত ম্যানুফ্যাকচারিঙে সংযোজিত মূল্যে পাবলিক সেক্টরের অংশ 8·1 শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 28·9 শতাংশ হয়। পাবলিক সেক্টরের উদ্যোগেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন ভিত ও ভারী শিল্প সংগঠন সম্ভব হচ্ছে। ইস্পাত, অ-লৌহ ধাতু, পেট্রোলিয়াম, সার, পেট্রো-কেমিক্যাল ও ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে পাবলিক সেক্টরের ভূমিকা জাতীয় অর্থনীতিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। পাবলিক সেক্টর যে ভিত-কাঠামো গড়ে তুলেছে তার সুযোগ নিয়ে

স্থূল দেশীয় উৎপাদনের বিন্যাস (1970-71 দামে) (শতাংশ)

ক্রমিক নং	সেক্টর	প্রাক্-পরিকল্পনা 1950-51	I-শেষে 55-56	II-শেষে 60-61	III-শেষে 65-66	বার্ষিক পরিকল্পনা শেষে 68-69	IV-শেষে 73-74	V-শেষে 78-79
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	কৃষি ও সংশ্লিষ্ট সেক্টর	58·9	57·3	54·2	45·6 (49·9)	46·3	45·2	41·6
2.	খনি, ম্যানুফ্যাকচারিং ও নির্মাণ	14·9	15·9	17·7	22·0 (20·0)	21·2	21·6	22·5
3.	বিদ্যুৎ, গ্যাস, জল সরবরাহ, পরিবহণ, স্টোরেজ ও সংযোগ	3·9	4·2	4·9	6·1 (5·4)	6·4	6·8	7·4
4.	সেবা	22·3	22·6	23·2	26·3 (24·5)	26·1	26·4	28·5
		100·0	100·0	100·0	100·0	100·0	100·0	100·0

দ্রষ্টব্য : বন্ধনীতে প্রদত্ত সংখ্যা 1964-65 সনের। 1965-66 খরা বছর।

সূত্র : ষষ্ঠ পরিকল্পনা।

শিল্প কাঠামোর পরিবর্তন ধারা (শতাংশ)

ক্রমিক নং	সেক্টর	রেজিষ্টার্ড	ম্যানুফ্যাকচারিং-এ সংযোজিত মূল্য
(0)	(1)	(2)	(3)
		1970-71	1977-78
1.	খাদ্য	9·3	9·9
2.	বস্ত্র	20·1	19·4
3.	রবার, রসায়ন ও পেট্রোলিয়াম	17·3	19·9
4.	অ-ধাতু খনিজ দ্রব্য	4·0	4·1
5.	ভিত ধাতু	9·9	10·2
6.	ইঞ্জিনিয়ারিং	24·9	25·9
7.	অন্যান্য	14·5	10·6
	মোট	100·0	100·0

সূত্র : ষষ্ঠ পরিকল্পনা।

প্রাইভেট সেক্টরও পাশাপাশি দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। অয়েল এণ্ড ন্যাচারেল গ্যাস কমিশন, ডিপার্টমেণ্ট অব স্পেস প্রভৃতি সংস্থা প্রযুক্তি-বিত্থার গবেষণা ক্ষেত্রে যুগান্তরের সূচনা করেছে।

শিল্পদ্রব্যের আমদানির উপর নির্ভরতা হ্রাস পেয়েছে। প্রাক্-পরিকল্পনা-কালীন (1950-51 সনে) দেশীয় যোগানে আমদানিকৃত লৌহ ও ইস্পাতের অংশ ছিল 25·2 শতাংশ, যন্ত্রপাতির 68·9 শতাংশ, পেট্রোলিয়ামের 92·5 শতাংশ ও নাইট্রোজেনযুক্ত সারের 72·5 শতাংশ (1951-52)। 1977-78 সনে এদের পরিমাণ যথাক্রমে 1·1, 15·3, 63·1, ও 27·5 শতাংশ।

(3) পাবলিক সেক্টরের পাশাপাশি প্রাইভেট সেক্টরের যাতে দ্রুত উন্নয়ন সম্ভব হয় সেজন্য সরকার সচেষ্ট। আর্থিক সংস্থাগুলির ঋণ দেয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবার ফলে প্রাইভেট সেক্টরভুক্ত শিল্পগুলির সুলভ শর্তে ও সহজে ক্রেডিট পাওয়ার পথ সুগম হয়েছে। এ সমস্ত আর্থিক সংস্থাগুলি

আমদানি পরিবর্ত

(দেশীয় যোগানে আমদানির শতাংশ)

ক্রমিক নং	বিষয়	প্রাক্-পরিকল্পনা 1950-51	I-শেষে 55-56	II-শেষে 60-61	III-শেষে 65-66	বার্ষিক পরিকল্পনা শেষে 68-69	IV-শেষে 73-74	77-78
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	খাদ্যশস্য	5·9	1·7	4·7	9·5	5·6	4·3	0·2
2.	লৌহ ও ইস্পাত	25·2	39·9	35·7	16·7	9·3	18·5	1·1
3.	যন্ত্রপাতি*	68·9	41·0	40·7	27·8	24·6	17·0	15·3
4.	পেট্রোলিয়াম**	92·5	93·8	94·6	76·6	66·2	70·8	63·1
5.	নাইট্রোজেনযুক্ত সার	72·5†	39·8	80·3	58·3	60·9	38·3	27·5

* স্থূল বিনিয়োগে যন্ত্রপাতির উপকরণে আমদানির শতাংশ।

** জানুয়ারী-ডিসেম্বরের ভিত্তিতে।

† 1951-52 সন।

সূত্র : ষষ্ঠ পরিকল্পনা।

1979 সনের মার্চ পর্যন্ত প্রাইভেট সেক্টরে 5000 কোটি টাকা ক্রেডিট দিয়েছে। সরকারের উদ্যোগের ফলে কাঁচামাল সরবরাহ, বাজারকরণ, প্রযুক্তিবিদ্যা ও পরিবহণ ক্ষেত্রে উন্নয়ন ঘটেছে। ফলে প্রাইভেট সেক্টর এর সুযোগ নিতে সমর্থ হয়েছে। ক্ষুদ্র শিল্প ও গ্রামীণ শিল্পীদের জন্য উৎপাদন ক্ষেত্র সংরক্ষণ, চাহিদা সুনিশ্চিতকরণ ও রাজস্ব ব্যাপারে নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রাইভেট সেক্টরে শিল্প বিনিয়োগের ধরন নিয়ন্ত্রণের জন্য ইনডাস্ট্রিজ (ডেভেলাপমেণ্ট এণ্ড রেগুলেশন) এ্যাক্ট এবং পরবর্তীকালে এরই বিস্তৃতরূপ মোনোপলিজ এণ্ড রেসট্রিকটিভ ট্রেড প্র্যাকটিসেস এ্যাক্ট প্রবর্তিত ও অন্যান্য পন্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

(4) কৃষিক্ষেত্রে প্রভূত পরিবর্তন ঘটেছে। "কৃষি বিপ্লব" ভারতের কৃষি সেক্টরের প্রাচীন কাঠামো ভেঙে ফেলছে। উচ্চ ফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার, সেচ, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তিবিদ্যা, সুলভ শর্তে ঋণদান, জমিদারী সহ বিবিধ মধ্যস্বত্বভোগীদের উচ্ছেদ, পরিবহণ ও বাজার সংগঠনের উন্নয়ন, কৃষিদ্রব্যের দাম নির্দিষ্টকরণ, সরকারী সংগ্রহ ও বণ্টন ব্যবস্থা, কৃষি গবেষণা প্রভৃতি ভারতের কৃষিদের মধ্যে যে জাগরণ এনেছে, খাদ্যশস্য উৎপাদনে যে স্বয়ম্ভরতা সম্ভব করে তুলেছে তা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। 1950-51 সন থেকে 1978-79 সন পর্যন্ত কৃষি উৎপাদন বছরে গড়ে 2·7 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। 1966-67 সন থেকে 1968-69 সন পর্যন্ত এ বৃদ্ধির হার ছিল বছরে গড়ে 6·2 শতাংশ। প্রাক্-পরিকল্পনাকালীন (1950-51) দেশীয় খাদ্যশস্য যোগানে আমদানিকৃত খাদ্যশস্যের পরিমাণ ছিল 5·9 শতাংশ। 1977-78 সনে এর পরিমাণ 0·2 শতাংশ

[কৃষি প্রযুক্তিবিদ্যায় যে পরিবর্তন ঘটেছে পরের পৃষ্ঠায় তা দেখানো হল]।

(5) কৃষি ঋণ ও কৃষি বাজার ক্ষেত্রেও অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সমবায় আন্দোলন কর্মমুখী হয়ে উঠেছে। ব্যাঙ্কিং কাঠামোতে বিশেষ পরিবর্তন ঘটেছে। ল্যাণ্ড ডেভেলাপমেণ্ট ব্যাঙ্ক, রিজিওন্যাল রুরাল ব্যাঙ্ক ও শীর্ষ প্রতিষ্ঠানরূপে এগ্রিকালচারেল রিফিনান্স এণ্ড ডেভেলাপমেণ্ট কর্পোরেশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা এবং এদের মারফত কৃষকদের মেয়াদী ঋণ দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কৃষি বাজার ক্ষেত্রে ফুড কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া খাদ্যশস্য ব্যবসায় এক বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। সমবায় বাজার ও

কৃষি প্রযুক্তিবিদ্যায় পরিবর্তনের ধারা

বিষয়	প্রাক্-পরিকল্পনা 1950-51	পঞ্চম পরিকল্পনা শেষে 1978-79
1. স্থূল বপ্ত অঞ্চলে		
স্থূল সেচের অংশ (শতাংশ)	17·1	28·0
2. সার ব্যবহার (কেজি/হেক্টর)	0·5	29·5
3. উচ্চ ফলনশীল বীজের অধীনে চাল ও গম অঞ্চলের শতাংশ		
(a) চাল	2·5*	41·8
(b) গম	4·2*	71·1
4. গড় উৎপাদন		
(a) চাল (কুইণ্টাল/হেক্টর)	6·7	13·3
(b) গম (কুইণ্টাল/হেক্টর)	6·6	15·7

* 1966-67 সন।

সূত্র : ষষ্ঠ পরিকল্পনা।

প্রোসেসিং-এ উন্নতি সাধিত হওয়াতে উৎপাদক ও ভোগকারী উভয়ই উপকৃত হয়েছে। দুগ্ধ ক্ষেত্রে সমবায় সমিতি গঠন ও শহরাঞ্চলে দুগ্ধ সরবরাহ সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকার কর্মসূচী কার্যকর করার ফলে দুগ্ধ সরবরাহ সমস্যা অনেকটা লাঘব হয়েছে। সংক্ষেপে, কৃষি ঋণ ও বাজার ক্ষেত্রের মধ্যে এবং কৃষি ও মধ্যজীবীদের মধ্যে যে অসম সম্পর্ক ছিল তা অনেকটা দূরীভূত হয়েছে যার ফলে কৃষি উন্নয়নের পথ থেকে অনেক বাধাবিঘ্ন সরে গেছে।

(6) সরকারী প্রচেষ্টা ও আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগের ফলে রেলপথ, জলপথ ও সংযোগ সেক্টরে প্রভূত পরিবর্তন এসেছে, দ্রুত সম্প্রসারণও ঘটছে। ভারতীয় রেলপথ বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ রেলপথ ব্যবস্থা। ভারতীয় জাহাজ পরিবহণ পৃথিবীর প্রথম ষোলটি দেশের মধ্যে একটি। আন্তঃ ও বহিঃসংযোগ ক্ষেত্রেও ভারত উন্নত দেশগুলির পাশাপাশি রয়েছে।

(7) কুড়িটি বৃহৎ ব্যাঙ্ক ও সমস্ত বীমা কোম্পানীগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করার ফলে দেশের ক্রেডিট ব্যবস্থা বর্তমানে সরকারের নিয়ন্ত্রণে বলা যেতে

পারে। সামাজিক কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে ক্রেডিট সংস্থাগুলি শিল্পোন্নয়নের জন্য ঋণ দিচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে ঋণ দেয়া ব্যাপারে দুর্বল শ্রেণীভূক্ত ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। ক্ষুদ্র চাষী, ক্ষুদ্র শিল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ও স্ব-নিযুক্ত ব্যক্তিরা সহজে ও সুলভ শর্তে ব্যাঙ্ক ক্রেডিট পাওয়ার অধিকারী হয়েছে। আমদানি-রপ্তানি, বাণিজ্য, শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণমূলক ক্ষেত্রেও ব্যাঙ্ক ক্রেডিটের প্রসার সাধন করা হয়েছে। শিল্পনীতিতে প্রাইভেট সেক্টরকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। এ সেক্টরের উদ্যোগে বেশ কিছু সংখ্যক উন্নয়নমূলক আর্থিক সংস্থা গঠিত হয়েছে। সঞ্চয় সংগ্রহ ও সঞ্চয়ে উৎসাহিত করার জন্য ব্যাঙ্ক, জীবনবীমা, শেয়ার ও ঋণপত্র, পেনসন ফাণ্ড প্রভৃতির প্রসার ও উন্নতি সাধন করা হয়েছে।

(8) শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, গৃহনির্মাণ প্রভৃতি সামাজিক কল্যাণ সেক্টরেও উল্লেখ্য পরিবর্তন ঘটেছে। গত তিরিশ বছরে 119 বিশ্ববিদ্যালয়, 1650 কলেজ, 5 প্রযুক্তিবিদ্যা সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান, 150 ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, 100 মেডিক্যাল কলেজ ও 350 পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতি বছর প্রায় 150,000 যোগ্যতাপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী ও টেকনিসিয়ান সৃষ্টি হচ্ছে। বর্তমানে এদের সংখ্যা 25 লক্ষ। তাছাড়া 130 বিশেষ ধরনের গবেষণাগারও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রাথমিক স্তরে (প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী) শিক্ষার্থীদের সংখ্যা 1950-51 সনে ছিল 223 লক্ষ, 1979-80 সনে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে 905 লক্ষ। দুর্বল শ্রেণীদের মধ্যেও শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে।

সরকার ও জনকল্যাণমূলক সংগঠনগুলির চেষ্টায় ছোট্ট পরিবার, সুখী পরিবার ও সুস্থ রাখো স্বাস্থ্য এ মনোভাব অতি সাধারণ মানুষের চিন্তাকেও স্পর্শ করতে পেরেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়েছে। মৃত্যুর হারও হ্রাস পেয়েছে। গত তিরিশ বছরে বাসস্থান প্রকল্পে পাবলিক সেক্টর ও প্রাইভেট সেক্টরের সমষ্টিগত ব্যয়ের পরিমাণ প্রায় 15,793 কোটি টাকা।

26 সরকারের আয়-ব্যয়

সরকারের আয়-ব্যয় বলতে সরকারের আয়, ব্যয়, ঋণ, আয়-ব্যয় পরিচালনা ও বাজস্ব নীতিকে বুঝায়। সরকারের আয়-ব্যয় নীতির গুরুত্ব অস্বীকার করা চলে না। বস্তুত সরকারের রাজস্ব নীতি দেশের অর্থনৈতিক কাজকর্মের স্তরকে প্রভাবিত করার এক অতি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। সাধারণ-ভাবে বলতে গেলে রাজস্ব নীতির উদ্দেশ্য বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা, অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করা এবং সম্পদ ও আয় বণ্টনে অসমতা লাঘব করা। ভারতের মত উন্নয়নশীল কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা-ভিত্তিক দেশের কাছে রাজস্ব নীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য দ্রুত মূলধন গঠন ও বিনিয়োগের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা।

আয়ের সূত্র

কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ের সূত্রগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা হয় : করলব্ধ আয় ও অ-করলব্ধ আয়। করলব্ধ আয়ের সূত্র, আয়ের উপর কর, সম্পত্তি ও সম্পদের উপর কর ও পণ্যদ্রব্যের উপর কর। অ-করলব্ধ আয়ের সূত্রের মধ্যে রয়েছে, সরকারী উদ্যোগ থেকে অর্জিত আয়, কারেন্সি ও মুদ্রা সরবরাহ সূত্রে প্রাপ্ত আয়, প্রশাসনিক আয় প্রভৃতি।

রাজ্য সরকারগুলির আয়ের সূত্র, করলব্ধ আয় ও অ-করলব্ধ আয়। করলব্ধ আয়ের সূত্রের মধ্যে রয়েছে আয়কর, সম্পত্তি কর ও পণ্যদ্রব্যের উপর কর। অ-করলব্ধ আয়ের সূত্র প্রশাসনিক সূত্র থেকে প্রাপ্ত অর্থ, সরকারী উদ্যোগগুলির উদ্বৃত্ত ও সুদ। তাছাড়া রয়েছে কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত গ্র্যাণ্টস্-ইন-এড।

দৃশ্যতঃ, কেন্দ্র ও রাজসরকারগুলির আয়ের সূত্র এক হলেও প্রকৃতিগত-ভাবে তা পৃথক। কেন্দ্রের আয়ের প্রধান সূত্র আমদানি-রপ্তানি শুল্ক, ইউনিয়ন আবকারী শুল্ক, কর্পোরেশন কর, আয়কর (কৃষি আয় কর ছাড়া) ও সম্পত্তি কর। 1971-72 সন থেকে ব্যক্তি বা অবিভক্ত হিন্দু পরিবারের মালিকানাভুক্ত কৃষি সম্পদ সম্পদ করের আওতায় আনা হয়েছে। অবশ্য কৃষি সম্পদ করলব্ধ নীট অর্থ রাজ্যগুলির মধ্যে গ্র্যাণ্টস্-ইন-এড রূপে বণ্টন

করে দেয়া হয়। রেলপথ এবং ডাক ও তার বিভাগকে তাদের মুনাফার নির্দিষ্ট অংশ জেনারেল রেভিন্যু তহবিলে জমা দিতে হয়।

রাজ্যগুলির আয়ের প্রধান সূত্র রাজ্য সরকার কর্তৃক ধার্য কর ও শুল্ক, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ধার্য করের কিছু অংশ ও কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত গ্র্যান্টস্। সম্পত্তি কর, বিক্রয় কর, আমোদ কর, পেশা কর, চুঙ্গী ও অন্তঃকরও রাজ্য সরকারগুলির আয়ের সূত্র।

রাজস্ব নীতি

রাজস্ব বা বাজেট নীতি বলতে সরকারের নির্দিষ্ট আর্থিক ও সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গৃহীত কর, সরকারী ব্যয় ও ঋণ ব্যবস্থাকে বুঝায়।

ভারতের রাজস্ব নীতির প্রধান উদ্দেশ্য সামাজিক ন্যায়সহ অর্থনৈতিক উন্নয়ন। রাজ্যস্তরেও অনুরূপ নীতি গৃহীত। পাবলিক সেক্টরের বিনিয়োগের অধিকাংশই মৌল ও ভারী শিল্প, যানবাহন, সংযোগ, শক্তি প্রভৃতির উন্নয়নের জন্য ব্যয়িত হয়। রাজস্ব নীতির অপর প্রধান উদ্দেশ্য পাবলিক সেক্টরের পাশাপাশি প্রাইভেট সেক্টরের উন্নয়ন সাধন। এজন্য প্রাইভেট সেক্টরকে কর সম্পর্কিত সুবিধা, উন্নয়নমূলক কাজের জন্য বিশেষ সুবিধা, রপ্তানি বাণিজ্যে উৎসাহ দেয়ার জন্য শুল্কের সুবিধা প্রভৃতি দেয়া হয়।

রাজস্ব নীতির উপর কর্মসংস্থানের প্রসার সম্ভাবনা অনেকাংশে নির্ভর করে। কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করার জন্য যেসব প্রকল্প গ্রহণ করা হয় তার পশ্চাতে রাজস্ব নীতির ভূমিকা রয়েছে। কারণ এসব প্রকল্প রূপায়ণের জন্য বিশেষ আর্থিক সুযোগসুবিধা প্রয়োজন। সরকারের সামাজিক ন্যায় নীতি বাস্তবযুক্ত করার জন্য ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পগুলিকে রাজস্বগত সুবিধা দান, দুর্বল শ্রেণীদের সহজ শর্তে ঋণদান, তাদের কর্মসংস্থান, প্রত্যক্ষ কর বৃদ্ধি, করলব্ধ অর্থ শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় এম-আর-টি-পি এ্যাক্ট প্রণয়ন প্রভৃতি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

রাজস্ব নীতির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখা। ঘাটতি বাজেট, মৌল ও ভারী শিল্পে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, দেশরক্ষা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক পরিকল্পনায় ব্যয়াধিক্য প্রভৃতি কারণে মুদ্রা-স্ফীতি ঘটে। অ-পরিকল্পনা খাতে ব্যয় হ্রাস, পরোক্ষ কর হ্রাস, অপরোক্ষ কর বৃদ্ধি, কর ফাঁকি ও এড়িয়ে যাবার পথ রোধ, কালোবাজার বন্ধকরণ,

মুদ্রানীতি ও রাজস্ব নীতির মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন প্রভৃতি ব্যবস্থা অবলম্বন দ্বারা মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখা যেতে পারে। ভারতের রাজস্ব নীতিতে এর গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছে। তবে এসব প্রচেষ্টা সফল হয়েছে বলা চলে না।

1983-84 সনের কেন্দ্রীয় বাজেট সম্পর্কে বক্তৃতা প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী বলেন, করের হারের যথোপযুক্ত বিন্যাস করা ছাড়াও যাতে সব শ্রেণীর মানুষরা তাদের দেয় কর যথাসময় দেয় সেজন্য আনুষঙ্গিক প্রশাসনিক ও আইনগত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে। সরকার কর ফাঁকি ও কর এড়িয়ে যাওয়া বন্ধ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সঞ্চয় এমন সব প্রকল্পে বিনিয়োগ করা হবে যাতে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ও সাধারণ মানুষ উপকৃত হয়। স্বল্প সঞ্চয়কারীদের সঞ্চয়ে আরো উৎসাহ দেয়ার জন্য 5-ইয়ার পোস্ট অফিস টাইম ডিপোজিটস ও রেকারিং ডিপোজিটের সুদের হার বার্ষিক 10·5 শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে 11·5 শতাংশ করা হয়। স্পেশাল ডিপোজিটস অব এমপ্লোয়িজ প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ও অন্যান্য বেসরকারী প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, গ্র্যাচুইটি ও সুপার এ্যানুয়েসন ফাণ্ডের উপর সুদের হার 1 শতাংশ বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এর ফলে সাধারণ কর্মী ও ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারীরা উপকৃত হবে। স্ব-নিযুক্ত ও অন্যান্য উপার্জনকারীদের স্বার্থে পাবলিক প্রভিডেন্ট ফাণ্ড স্কীমের বিধিনিষেধ আরো শিথিল করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে চাঁদাদাতাদের 15 বছরের পরও একাউন্ট রাখার অনুমতি দেয়া হবে। বার্ষিক চাঁদার উচ্চতম সীমা 40,000 টাকা করা হয়। কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কগুলির আগামের উপর সুদের হারের উচ্চতম সীমা 19·5 শতাংশ থেকে হ্রাস করে 18 শতাংশ করা হয়। কৃষি, ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ও রপ্তানির উপর অপেক্ষাকৃত কম সুদ ধার্য করার নীতি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া কর্তৃক ঘোষিত হয়েছে। অনাবাসিক ভারতীয়রা যাতে তাদের সঞ্চিত বৈদেশিক বিনিময় দেশে পাঠাতে পারে ও বিনিয়োগে উৎসাহিত হয় সেজন্য তাদের ক্ষেত্রে আরো সুবিধা দেয়ার প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

1985-86 সনের কেন্দ্রীয় বাজেটে ব্যক্তিগত আয়ের উপর করের ছাড়ের সীমা 15,000 টাকার পরিবর্তে 18,000 টাকা করার ফলে 10 লক্ষ লোক আয়কর থেকে অব্যাহতি পেয়েছে। আয়করের হারও সর্বস্তরে হ্রাস করা হয়েছে। এর ফলে ব্যক্তিগত আয়ের উপর সর্বোচ্চ প্রান্তিক আয়করের হার 61·875 শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে 50 শতাংশ হয়েছে। বাধ্যতামূলক

আমানত স্কীম 1985 সনের পহেলা এপ্রিল থেকে বিলোপ করা হয়েছে। সম্পদ করের ক্ষেত্রেও করের হার হ্রাস করা হয়েছে। ফলে সর্বোচ্চ প্রান্তিক করের হার 5 শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে 2 শতাংশ হয়েছে। এস্টেট ডিউটি 16 মার্চ 1985 সন থেকে তুলে নেয়া হয়েছে। করভার লাঘব করার ফলে স্বল্প সঞ্চয় বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হয়েছে। অবশ্য ব্যয় বৃদ্ধি পাবার ফলে জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধির আশঙ্কা উপেক্ষা করার নয়।

1985-86 সনের জন্য কোম্পানিগুলির উপর আয়করের মৌল হার 5 শতাংশ পয়েণ্ট হ্রাস করা হয়েছে। নির্দিষ্ট শ্রেণীর ঘনসন্নিবিষ্ট কোম্পানিগুলির উপর ধার্য আয়করের মৌল হার 10 শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এর ফলে যে সমস্ত কোম্পানি কর্মসংস্থান-ভিত্তিক কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত তারা সবিশেষ উপকৃত হবে। রপ্তানিকারীরা যাতে তাদের রপ্তানি মুনফার 50 শতাংশ পর্যন্ত রিজার্ভ একাউণ্টে রেখে দিতে পারে সেজন্য আয়কর আইন সংশোধন করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। উদ্দেশ্য যাতে রপ্তানি ভিত্তিক কার্যক্রম আধুনিকীকরণের পথে সম্পদের অভাব বাধা সৃষ্টি না করে।

ব্যাঙ্কগুলির উপর থেকে সুদের উপর ধার্য সুদকর তুলে নেয়া হয়েছে। 1985 সনের 31 মার্চ থেকে এ নির্দেশ কার্যকর করা হয়েছে।

পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে অশোধিত পেট্রোলিয়মের উপর সহায়ক শুল্কের হার প্রতি মেট্রিক টন 100 টাকা থেকে বৃদ্ধি করে 300 টাকা করা হয়েছে। বারোটি দ্রব্যের উপর থেকে রপ্তানি শুল্ক তুলে নেয়া হয়েছে। মণিমুক্তা শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কতিপয় যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের আমদানি ব্যাপারে সুবিধা দেয়া হয়েছে। উন্নত ধরনের কমপিউটার যা দেশে তৈরি হয় না তার উপর থেকে বহির্বাণিজ্য শুল্ক তুলে নেয়া হয়েছে। কাঁচা পশমের উপরও বহির্বাণিজ্য শুল্ক মূল্য অনুযায়ী 50 শতাংশ থেকে হ্রাস করে 40 শতাংশ করা হয়েছে। উদ্ভিজ্জ দ্রব্য, সিমেণ্ট, মারবেল ব্লক, স্ল্যাব, টাইলস, জৈব রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতির উপর আবকারী শুল্কের হার বৃদ্ধি বা নতুন করে ধার্য করা হয়েছে। তাছাড়া ছাপাবার কাগজ, লেখার কাগজ, বিড়ি, সাবান প্রভৃতির উপরও আবকারী শুল্ক ধার্য করা হয়েছে।

রাজস্ব নীতি দ্বারা অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায় সাধন উদ্দেশ্য কতটা সাফল্য লাভ করেছে সে সম্বন্ধে প্রশ্ন রয়েছে। এ কথা বলা অসঙ্গত নয় যে, বর্তমানে আমাদের দেশে অর্থনৈতিক ক্ষমতা কতিপয় ব্যক্তির হাতে

কেন্দ্রীভূত হবার মূলে সরকারের রাজস্ব নীতি। মুদ্রাস্ফীতি রোধ করার জন্য সতর্কতামূলক পন্থা গ্রহণ করা সত্ত্বেও মুদ্রাস্ফীতি সমস্যা জটিল আকার ধারণ করেছে। এর মূলেও সরকারের ব্যর্থ রাজস্ব নীতি। সরকারের দেশীয় ও বিদেশীয় ঋণের ভার প্রচুর বৃদ্ধি পেয়েছে। নতুন ঋণের অধিকাংশই সুদ বাবদ দেয় অর্থের প্রয়োজনেই নিঃশেষিত হয়ে যায়। এমন কি ব্যালেন্স অব পেমেণ্টস-এ ঘাটতির চাপ রোধ করা প্রধানত বৈদেশিক ঋণের আনুকূল্যেই সম্ভব হচ্ছে। ইণ্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেণ্ট এসোসিয়েশন (আই-ডি-এ) ও ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ককে অর্থদান ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি যে নীতি গ্রহণ করেছে এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থাগুলির কাছে ভারতের নিবিড় প্রতিযোগী-রূপে চীনের আবির্ভাব ভারতের বহির্বাণিজ্য তথা উন্নয়ন পরিকল্পনা ক্ষেত্রে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজস্ব নীতিতে দেশকে স্বয়ম্ভর করে তোলার প্রতি শিথিলতা প্রদর্শন এর মূল কারণ বলা অসঙ্গত হবে না।

রাজস্ব নীতি ধনবণ্টনে বৈষম্য হ্রাস করতে সমর্থ হয়নি ; বরঞ্চ বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে। এর কারণ প্রধানত পরোক্ষ করের ব্যাপ্তি ও বর্ধিত হার, প্রাইভেট সেক্টরের প্রসার সাধন, কর ফাঁকি দেয়ার ও এড়িয়ে যাওয়ার প্রচুর সুযোগ ও মুদ্রাস্ফীতি। মুদ্রাস্ফীতির ফলে দুর্বল শ্রেণী ও অসংগঠিত সেক্টরের দারিদ্র্য বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধির অনুপাতে তাদের আয় বৃদ্ধি পায় না। ব্যবসায়ী শ্রেণী মুদ্রাস্ফীতির ফলে লাভবান হয়। মূলগতভাবে দুর্বল শ্রেণীদের ক্ষেত্রে এমন কোন সম্পদ সৃষ্টি হয়নি যা তাদের আয় বৃদ্ধি করে চলতে পারে।

কেন্দ্র-রাজ্য আর্থিক সম্পর্ক

ভারতের সংবিধানে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করে দেয়া হয়েছে। ইউনিয়ন তালিকাভুক্ত ক্ষমতা একান্তভাবে কেন্দ্রের উপর ন্যস্ত। রাজ্য তালিকাভুক্ত ক্ষমতা সাধারণভাবে রাজ্যগুলির উপর ন্যস্ত। সংযুক্ত তালিকাভুক্ত ক্ষমতাতে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়েরই অধিকার আছে। তবে কোন বিরোধ উপস্থিত হলে কেন্দ্রের অধিকারই নিরঙ্কুশ বলে মেনে নিতে হবে। রাজ্য তালিকাভুক্ত বা সংযুক্ত তালিকাভুক্ত নয় এমন কোন 'অবশিষ্ট' বিষয়ের উপর আইন করার অধিকার একমাত্র কেন্দ্রের উপরই ন্যস্ত।

রাজ্যগুলি তাদের নিজস্ব করলব্ধ অর্থ ছাড়াও কেন্দ্রের কাছ থেকে

অর্থসাহায্য পেয়ে থাকে। যথা, কতিপয় শুল্ক যা কেন্দ্র কর্তৃক ন্যস্ত কিন্তু তা রাজ্যগুলি সংগ্রহ করে এবং নিজস্ব তহবিলে জমা করে নেয়। যথা, স্ট্যাম্প শুল্ক ও ওষুধপত্র তৈরি করার উপর ধার্য আবকারী শুল্ক। আবার এমন কতগুলি কর আছে যা কেন্দ্র কর্তৃক ন্যস্ত ও সংগৃহীত, কিন্তু এর সম্পূর্ণ অর্থই রাজ্যগুলির প্রাপ্য। যথা, উত্তরাধিকার ও এস্টেট কর, মাল ও যাত্রীদের উপর ধার্য অন্ত কর, রেল মাসুল ও ভাড়ার উপর কর, ভবিষ্যৎ বাজার ও স্টক এক্সচেঞ্জের লেনদেনের উপর কর, সংবাদপত্র ক্রয়বিক্রয়ের উপর কর ও সংবাদপত্রে প্রদত্ত বিজ্ঞাপনের উপর কর। কেন্দ্র কর্তৃক ন্যস্ত ও সংগৃহীত আয়ের উপর করলব্ধ (কর্পোরেশন কর ও কতিপয় ইউনিয়ন আবকারী শুল্ক ছাড়া) অর্থ কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী বন্টিত হয়। কেন্দ্র কর্তৃক রাজ্যগুলিকে গ্র্যাণ্টস-ইন-এড বাবদ অর্থ দেয়া হয়। কেন্দ্রের অনুমতি সাপেক্ষ রাজ্যগুলি বাজার থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকেও তারা ঋণ নিতে পারে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়াও তাদের ওয়েজ এণ্ড মিনস ঋণ দিয়ে সাহায্য করে থাকে।

কেন্দ্রের উপর রাজ্যের অধিকতর দাবি

বর্তমানে কিছু কিছু রাজ্য অধিক ক্ষমতার দাবিতে সরব হয়ে উঠেছে। এর পেছনে রাজনীতি ও নিজেদের ব্যর্থতা স্বীকার না করার কৌশল থাকতে পারে, তবে বিষয়টি যে অর্থনীতির দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা অস্বীকার করা সমীচীন নয়। অধিকতর আর্থিক ক্ষমতার দাবির পেছনে যে সব যুক্তি দেখানো হয় ভি. কে. আর. ভি রাওয়ের মতে তা নিম্নরূপ।

(i) কেন্দ্র কর্তৃক ন্যস্ত ও সংগৃহীত করের পর্যাপ্ত অংশ রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হয় না। ফলে রাজ্যগুলি অর্থাভাবে তাদের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে সমর্থ হয় না।

(ii) রাজ্যগুলিকে পরিকল্পনা গ্র্যাণ্টস, ঋণ ও অন্যান্য এড হক গ্র্যাণ্টের জন্য কেন্দ্রের উপর নির্ভর করতে হয়। এর ফলে তাদের উন্নয়নমূলক কাজকর্ম ব্যাহত হয়।

(iii) কেন্দ্র তার বাজেটের বাইরেও প্রভূত আর্থিক সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। যথা, পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্কগুলির সম্পদ ছাড়াও এল-আই-সি, আই-ডি-আর, ইউনিট ট্রাস্ট ও প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের সম্পদ। তাছাড়া

বৈদেশিক আর্থিক সাহায্য ও ঘাটতি বাজেট মিটাবার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া থেকে প্রাপ্ত অর্থও উল্লেখ্য। এসব সম্পদের অংশবিশেষ পাবার জন্য রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রের উপর নির্ভর করে থাকতে হয়।

(iv) রাজ্য সরকারগুলিকে তাদের বার্ষিক পরিকল্পনা বাধ্যতামূলকভাবে অনুমোদনের জন্য প্ল্যানিং কমিশনের কাছে পেশ করতে হয়। এমনকি এ প্রসঙ্গে এমন সব বিষয়ও দাখিল করতে হয় যা রাজ্যগুলির দায়িত্বাধীন। এ পদ্ধতি রাজ্য সরকারগুলির অধিকারে হস্তক্ষেপ মাত্র।

(v) রাজ্যগুলির শিল্প, বাণিজ্য ও আর্থিক নীতির উপর কেন্দ্রের হস্তক্ষেপের একচ্ছত্র অধিকার থাকার ফলে রাজ্যগুলির উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়।

(vi) সংযুক্ত তালিকায় এমন অনেক বিষয় রাখা হয়েছে যা রাজ্য তালিকাভুক্ত হওয়া সঙ্গত। অনেক সময় কেন্দ্রীয় সরকার এ তালিকাভুক্ত বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন করার আগে রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করে না।

(vii) রাজ্য সরকারদের প্রশাসনিক ব্যাপারে কেন্দ্রীয় আমলাদের নির্দেশ দান রাজ্যের প্রশাসন ক্ষেত্রে কেন্দ্রের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ মাত্র।

কেন্দ্রীয় সরকারের বক্তব্য

কেন্দ্র-রাজ্য সম্বন্ধের পুনর্বিন্যাসের যে দাবি উঠেছে বা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের যে অভিযোগ শোনা যায় সে সম্পর্কে কেন্দ্রের নিজেস্ব কোন বক্তব্য ব্যক্ত না হলেও বিভিন্ন সূত্র থেকে যা প্রকাশ পেয়েছে তা থেকে বলা চলে :

(i) কেন্দ্রের সম্পদ সীমিত অথচ দায়িত্ব সে অনুপাতে ঢের বেশী এবং তা রাজ্যগুলির দায়িত্ব অপেক্ষা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

(ii) রাজ্যগুলি নিজস্ব সম্পদ বৃদ্ধি করার ব্যাপারে আগ্রহান্বিত নয়। কেন্দ্রের উপর নির্ভরতা তাদের আর্থিক নীতির অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য এর ব্যতিক্রম আছে। রাজ্যগুলির রেভিন্যু একাউণ্টে মোট ব্যয়ে নিজস্ব অংশের পরিমাণ : 1951-52 সনে 80·90%, 1960-61 সনে 73·08%, 1970-71 সনে 60·45%, 1980-81 সনে 66·73% ও 1981-82 সনে 67·16%।

(iii) রাজ্যগুলি পরিকল্পনার বাইরে অর্থ ব্যয় ও অপচয় করতে ব্যস্ত

উৎসাহী, উন্নয়নমূলক কাজে তত উৎসাহী নয়। এজন্য তারা খুশিমত ওভার ড্রাফট নিয়ে মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি করতেও কুণ্ঠিত নয়।

(iv) পশ্চাৎপদ রাজ্যগুলির প্রতি বিশেষ যত্ন নেয়া কেন্দ্রের প্রধান জাতীয় কর্তব্য। একে পক্ষপাতিত্ব বলা চলে না।

(v) অর্থ বণ্টন বা ঋণ প্রভৃতি দেয়া ব্যাপারে কেন্দ্র কোনপ্রকার বৈষম্যমূলক আচরণ করে না। ভারতের স্বার্থ অখণ্ড।

(vi) রাজ্য প্রশাসনে হস্তক্ষেপ করা বা কোন রাজ্য সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার অভিযোগ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

(vii) রাজ্যগুলিকে যথোচিত ক্ষমতা ও সাহায্য দেয়া ও কেন্দ্রকে দুর্বল করে রাজ্যগুলিকে ক্ষমতাশীল করে তোলা এক কথা নয়। শক্তিশালী কেন্দ্র গড়ে তোলার দিকে দৃষ্টি রেখেই ভারতের সংবিধান রচিত হয়েছে।

কেন্দ্রের বিরুদ্ধে কতিপয় রাজ্যের বিরূপ মন্তব্য যে সবক্ষেত্রেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত তা বলা সঙ্গত হবে না। কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের পুনর্বিন্যাসের যথার্থই প্রয়োজন রয়েছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের বিভিন্ন দিক পরীক্ষা করে দেখার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত করেছে।

ফিনান্স কমিশন

ভারতের সংবিধানের 280 (1) ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি প্রতি পাঁচ বছর অন্তর ফিনান্স কমিশন নিযুক্ত করেন। প্রয়োজন মনে করলে এর আগেও তাঁর কমিশন নিযুক্ত করার সংবিধানিক অধিকার আছে। কমিশনকে রাষ্ট্রপতির কাছে নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে সুপারিশ করতে হবে।

(i) সংবিধানের বারো খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে উল্লিখিত বিধানগুলি অনুযায়ী নীট করলব্ধ অর্থ যা ইউনিয়ন ও রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন করে দিতে হবে বা দেয়া যেতে পারে সে সম্পর্কে ও প্রত্যেক রাজ্যের অংশ সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ।

(ii) কনসোলিডেটেড ফাণ্ড অব ইণ্ডিয়া থেকে রাজ্যগুলিকে গ্র্যাণ্টস-ইন-এড দেয়ার নীতি নির্ধারণ।

(iii) সংবিধানের 278 অথবা 306 ধারা অনুযায়ী প্রথম সিডিউল্ডের

'পার্ট বি'তে উল্লিখিত কোন রাজ্য সরকারের সঙ্গে ভারত সরকারের চুক্তির শর্তগুলির প্রয়োজনীয়তা বা অপ্রয়োজনীয়তা।

(iv) সুস্থ আর্থিক ব্যবস্থার জন্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অন্য যে বিষয় কমিশনের বিবেচনার জন্য পাঠান হবে।

প্রথম ফিনান্স কমিশন, 1951

প্রথম ফিনান্স কমিশনের উল্লেখযোগ্য সুপারিশ :

(i) আয়করের 55 শতাংশ রাজ্যগুলির জনসংখ্যা ও আয়কর সংগ্রহের ভিত্তিতে তাদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া। জনসংখ্যার ভিত্তিতে বণ্টন করা হবে 80 শতাংশ ; 20 শতাংশ বণ্টন করা হবে সংগ্রহের ভিত্তিতে।

(ii) তামাক (সিগ্রেট ও সিগার সহ), দেয়াশলাই ও উদ্ভিজ্জ দ্রব্যের উপর ধার্য আবকারী শুল্কলব্ধ নীট অর্থের 40 শতাংশ রাজ্যগুলির মধ্যে জনসংখ্যার ভিত্তিতে বণ্টন করে দেয়া যেতে পারে।

(iii) পাট রপ্তানি শুল্কের পরিবর্তে পাট চাষকারী রাজ্যগুলিকে গ্র্যাণ্টস-ইন-এড দেয়া। পাট রপ্তানি শুল্কে তাদের অংশ বৃদ্ধি করতে হবে। যথা, পশ্চিম বাংলা পাবে 47·5 শতাংশ, বিহার 23·8 শতাংশ, আসাম 23·8 শতাংশ ও ওড়িষ্যা 34·8 শতাংশ।

(iv) আসাম (100 লক্ষ টাকা), মহীশূর (40 লক্ষ টাকা), ওড়িষ্যা (75 লক্ষ টাকা), পাঞ্জাব (125 লক্ষ টাকা), সৌরাষ্ট্র (40 লক্ষ টাকা), ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন (45 লক্ষ টাকা) ও পশ্চিম বাংলাকে (80 লক্ষ টাকা) বিশেষ গ্র্যাণ্টস-ইন-এড দেয়া যেতে পারে।

(v) প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিহার, মধ্যপ্রদেশ, হায়দ্রাবাদ, ওড়িষ্যা, রাজস্থান, পাঞ্জাব, মধ্যভারত ও পেপসুকে 4 বছরের জন্য গ্র্যাণ্টস-ইন-এড দেয়া।

দ্বিতীয় ফিনান্স কমিশন, 1956

আয়করে রাজ্যগুলির অংশ 55 শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে 60 শতাংশ করা হয়। যেসব দ্রব্যের উপর ধার্য আবকারী শুল্কলব্ধ অর্থ রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হত তাদের সংখ্যা 3 থেকে বৃদ্ধি করে 8 করা হয়। অপর দিকে আবকারী শুল্কলব্ধ অর্থে রাজ্যগুলির অংশ 40 শতাংশ থেকে হ্রাস করে 25 শতাংশ করা হয়। পাট রপ্তানি শুল্ক ও গ্র্যাণ্টস-ইন-এডের ক্ষেত্রে

সামান্য পরিবর্তন করা হয়। এস্টেট ডিউটিলব্ধ সমস্ত অর্থ, কৃষি জমির উপর ধার্য ও ইউনিয়ন টেরিটোরির সঙ্গে যুক্ত এস্টেট ডিউটি ছাড়া, রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন করে দেয়া।

তৃতীয় ফিনান্স কমিশন, 1960

রাজ্যগুলির আয়করের অংশ 60 শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে $60\frac{2}{3}$ শতাংশ করা হয়। এ বৃদ্ধির কারণ কর্পোরেশন করলব্ধ অর্থ বিভাজ্য সম্পদের ধারণা থেকে সরিয়ে আনা। ইউনিয়ন টেরিটোরিগুলির জন্য আয়করলব্ধ নীট অর্থের 2·5 শতাংশ একান্ত করে রাখা হয়।

আবকারী শুল্ক ক্ষেত্রে রাজ্যগুলির অংশ 25 শতাংশ থেকে হ্রাস করে 20 শতাংশ করা হয়। অপর দিকে দ্রব্য সংখ্যা 8 থেকে বৃদ্ধি করে 35 করা হয়। কটন রেওন, আর্ট শিল্ক, সিল্ক ও উলেন ফ্যাবরিকস, চিনি এবং তামাকের উপর বিক্রয় করের পরিবর্তে যে অতিরিক্ত শুল্ক ধার্য করা হয়েছে তার বার্ষিক 1 শতাংশ জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য ছেড়ে দিয়ে বাকী প্রাপ্ত অর্থ রাজ্যগুলির মধ্যে 1956-67 সনের সংগ্রহের ভিত্তিতে বণ্টন করে দেয়া। 1961 সনে রেলের মাসুলের উপর কর ধার্য করার আইন বাতিল করে দেয়া হয়। এর ফলে হঠাৎ আয় হ্রাস পাওয়ার দরুন রাজ্যগুলির যাতে অসুবিধার কারণ না হয় সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকার তাদের এড হক গ্র্যাণ্ট বাবদ 1961-66 সন পর্যন্ত প্রতি বছর 12·5 কোটি টাকা করে দিতে বাধ্য থাকবে।

চতুর্থ ফিনান্স কমিশন, 1964

আয়করলব্ধ অর্থের 75 শতাংশ রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন করে দেয়ার সুপারিশ করা হয়। চলতি ও আগামী চার বছরের মধ্যে আবকারী শুল্ক থেকে যে অর্থ সংগৃহীত হবে তার 20 শতাংশ রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন করে দেয়া। এস্টেট ডিউটি ব্যাপারে ইউনিয়ন টেরিটোরিগুলির অংশ 1 শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে 2 শতাংশ করা।

পঞ্চম ফিনান্স কমিশন, 1969

আয়করলব্ধ অর্থের নীট 75 শতাংশ ও আবকারী শুল্কের 20 শতাংশ রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে বণ্টন করে দেয়া। উভয় ক্ষেত্রেই আগাম সংগৃহীত কর বা শুল্কলব্ধ (1972-73 সন থেকে) অর্থ বিভাজ্য সম্পদ রূপে গণ্য করা। আয়করলব্ধ অর্থ বণ্টনের ভিত্তি হবে জনসংখ্যার জন্য 90 শতাংশ ও এসেসমেণ্টের জন্য 10 শতাংশ। আবকারী শুল্কলব্ধ অর্থের 80

শতাংশ জনসংখ্যার ভিত্তিতে বন্টিত হবে। বাকী 20 শতাংশের দু-তৃতীয়াংশ সে সমস্ত রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন করে দেয়া যাদের জনপ্রতি আয় জাতীয় জনপ্রতি গড় আয় অপেক্ষা কম। অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ অন্যান্য রাজ্যগুলির মধ্যে তাদের আপেক্ষিক অনুন্নত অবস্থার ভিত্তিতে বণ্টন করা। অতিরিক্ত আবকারী শুল্কলব্ধ অর্থ বণ্টন ব্যাপারে জনসংখ্যা ও বিক্রয় কর উভয়কেই সম গুরুত্ব দিতে হবে। চতুর্থ ফিনান্স কমিশনে শুধু বিক্রয় কর সংগ্রহের উপরই গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল। পঞ্চম ফিনান্স কমিশনে আইনবিহিত গ্র্যাণ্টসের পরিমাণ হ্রাস ও এস্টেট ডিউটিতে ইউনিয়ন টেরিটোরিগুলির অংশ 2 শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে 3 শতাংশ করার জন্য সুপারিশ করা হয়।

ষষ্ঠ ফিনান্স কমিশন, 1972

উল্লেখ্য সুপারিশসমূহ :

(i) আয়করে রাজ্যগুলির অংশ নীট 75 শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে 80 শতাংশ করা হয়। বণ্টন ভিত্তির কোন পরিবর্তন করা হয় না।

(ii) ইউনিয়ন আবকারী শুল্কে রাজ্য সরকারগুলির অংশ 20 শতাংশই রাখা হয়। তবে 1976-77 সন থেকে সহকারী আবকারী শুল্কের বণ্টন ভিত্তির পরিবর্তন সাধন করা হয়। অনুন্নত অবস্থার ভিত্তিতে বণ্টনের অংশ 20 শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে 25 শতাংশ করার সুপারিশ করা হয়। জনসংখ্যার ভিত্তিতে বণ্টনের ভাগ 80 শতাংশ থেকে হ্রাস করে 75 শতাংশ করা হয়। অনুন্নত অবস্থার মাপকাঠি রূপে আপেক্ষিক জনপ্রতি আয়কে ধরা হবে।

অতিরিক্ত আবকারী শুল্ক সম্বন্ধে কমিশনের সুপারিশ, ইউনিয়ন টেরিটোরিগুলির প্রাপ্য অংশ বাদ দিয়ে, নীট সমস্ত সংগৃহীত অর্থ রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন করে দেয়া। বণ্টনের ভিত্তি, জনসংখ্যার ভিত্তিতে 70 শতাংশ, রাজ্যের নিজস্ব উৎপন্ন দ্রব্যের (রাজ্যের চলতি দামে) ভিত্তিতে 20 শতাংশ ও অতিরিক্ত আবকারী শুল্ক দেয় দ্রব্যের উৎপাদনের ভিত্তিতে 10 শতাংশ।

(iii) এস্টেট ডিউটি ও রেলযাত্রীদের ভাড়ার উপর ধার্য করের অবলুপ্তির কারণে ক্ষতিপূরণ বাবদ দেয় গ্র্যাণ্টসের বণ্টন ভিত্তির কোন পরিবর্তন করা হয়নি। কৃষি সম্পত্তির উপর দেয় সম্পদ কর বণ্টনের ভিত্তি

সম্পর্কে বলা হয় যে, এ খাতে প্রাপ্ত অর্থ রাজ্যগুলির মধ্যে প্রত্যেক রাজ্যে অবস্থিত কৃষি সম্পত্তির মূল্যের, যা সংশ্লিষ্ট বছরের এসেসমেন্টের জন্য ধরা হয়েছে, ভিত্তিতে বন্টিত হবে।

(iv) পাঁচ বছরের (1974-79) পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতের ঘাটতি মিটাবার জন্য 21 রাজ্যের মধ্যে 14 রাজ্যের জন্য মোট 2510 কোটি টাকা গ্র্যান্টস-ইন-এড বাবদ দেয়ার সুপারিশ করা হয়।

(v) 1974 সনের মার্চের শেষে কেন্দ্রের কাছে রাজ্যগুলির মোট ঋণের পরিমাণ 8400 কোটি টাকা। কমিশনের সুপারিশ, 15 থেকে 30 বছরের মধ্যে এ ঋণ পরিশোধের সুবিধা দিতে হবে। তাছাড়া পঞ্চম পরিকল্পনা-কালীন মোট 1970 কোটি টাকা ঋণ লাঘব করতে হবে। এ অর্থ দিয়ে রাজ্যগুলি তাদের পরিকল্পনা বহির্ভূত মূলধন ঘাটতির অধিকাংশ মিটাতে সক্ষম হবে।

সপ্তম ফিনান্স কমিশন, 1977

1977 সনে সপ্তম ফিনান্স কমিশন নিযুক্ত হয়। 1979 সনের 1 এপ্রিল থেকে পাঁচ বছরের জন্য কমিশন সুপারিশ রাখে। কর ও শুল্ক বণ্টন এবং রাজ্যগুলিকে গ্র্যান্টস-ইন-এড দেয়া নীতি সম্পর্কে সুপারিশ করা ছাড়াও রাজ্যগুলির পরিকল্পনার বহির্ভূত মূলধন ঘাটতির পরিমাপ ও এ সম্পর্কে কি করণীয় সে সম্পর্কেও কমিশনকে সুপারিশ করার নির্দেশ দেয়া হয়। তাছাড়া রাজ্যগুলির রিলিফ বাবদ যে অর্থের প্রয়োজন সে সম্পর্কে পর্যালোচনা ও নীতি নির্ধারণ করার নির্দেশও কমিশনকে দেয়া হয়।

1978 সনের অক্টোবরে কমিশন রিপোর্ট পেশ করে। সরকার কমিশনের প্রায় সব সুপারিশই মেনে নেয়। যে সব সুপারিশ মেনে নেয়া সম্ভব হয়নি তা হচ্ছে মদ্যপান নিষিদ্ধ করায় ফলে রাজ্য সরকারগুলির আবকারী আয়ে যে ক্ষতি হবে তা পূরণ করার জন্য তাদের গ্র্যান্টস-ইন-এড দেয়া ও স্বল্প সঞ্চয়ের বিরুদ্ধে তাদের অপরিশোধিত ঋণকে চিরস্থায়ী ঋণে রূপান্তরিত করা।

কমিশন যেসব সুপারিশ করেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য :

(i) নীট আয়করলব্ধ অর্থে রাজ্যগুলির অংশ 80 শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে 85 শতাংশ করা।

(ii) বিদ্যুতের উপর ধার্য আবকারী শুল্ক ছাড়া অন্যান্য মৌল আবকারী শুল্কে রাজ্যগুলির অংশ দ্বিগুণ করা।

(iii) বিদ্যুতের উপর ধার্য আবকারী শুল্কলব্ধ নীট অর্থ সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিকে ফিরিয়ে দেয়া।

(iv) 1979-84 সনে আটটি রাজ্যকে গ্র্যান্ট বাবদ মোট 1173 কোটি টাকা দেয়া। কমিশনের মতে এ আটটি রাজ্যের রেভিন্যু একাউন্টে ঘাটতি দেখা দেয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

(v) 22 রাজ্যের মধ্যে 17 রাজ্যকে 437 কোটি টাকা গ্র্যান্ট দেয়া। এ গ্র্যান্ট সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলি তাদের প্রশাসনের কয়েকটি ক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য ব্যয় করবে। যথা পুলিস, বিচার, রেভিন্যু, জেলা ও উপজাতি প্রশাসন প্রভৃতি।

(vi) রাজ্যগুলি যাতে তাদের পরিকল্পনা বহির্ভূত মূলধন ঘাটতি মিটাতে পারে সেজন্য কমিশন রাজ্য সরকারগুলির কেন্দ্রীয় ঋণ পরিশোধ সম্পর্কিত একটি স্কীম ভারত সরকারের কাছে পেশ করে। এ স্কীম গৃহীত হলে 943 কোটি টাকা কেন্দ্রীয় ঋণ বাতিল করে দেয়া সম্ভব হবে।

(vii) খরাত্রাণের জন্য কমিশন বার্ষিক যে অর্থ দেয়ার সুপারিশ করেছে তার বাইরেও রাজ্যগুলি তাদের পরিকল্পনা খাতে বরাদ্দ অর্থের 5 শতাংশের অনধিক খরাত্রাণ বাবদ ব্যয় করবে বলে ধরা হয়েছে। খরাত্রাণের জন্য যদি এর অধিক অর্থ ব্যয় হয় তবে সেই বর্ধিত অর্থভার কেন্দ্রীয় সরকারকে অর্ধেক গ্র্যান্ট ও অর্ধেক ঋণ রূপে বহন করতে হবে।

(viii) বন্যা, ঘূর্ণবায়ু প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটলে কেন্দ্রীয় সরকারের রিলিফ ফাণ্ড থেকে সংশ্লিষ্ট রাজ্যকে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত যে অনুদান দেয়া হবে তার বাইরে যে অর্থ ব্যয় হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে সে অতিরিক্ত ব্যয়ের 75 শতাংশ নন-প্ল্যান গ্র্যান্ট রূপে দিতে হবে।

অষ্টম ফিনান্স কমিশন, 1982 : অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট

অষ্টম ফিনান্স কমিশন অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট পেশ করেছে। কমিশনের সুপারিশগুলির মধ্যে রয়েছে, আয়কর, ইউনিয়ন আবকারী শুল্ক, বিক্রয়-করের পরিবর্তে অতিরিক্ত আবকারী শুল্ক ও এস্টেট ডিউটি সম্পর্কিত বর্তমান বণ্টন ব্যবস্থা 1984-85 সনের আর্থিক বছরের জন্য অপরিবর্তিত থাকবে। সিকিমকে ইউনিয়ন আবকারী শুল্ক, বিদ্যুতের উপর ধার্য আবকারী শুল্ক সহ,

ও বিক্রয় করের পরিবর্তে অতিরিক্ত আবকারী শুল্কের অংশ দেয়ার সুপারিশ করা হয়েছে।

নয়টি রাজ্যকে তাদের রেভিন্যু একাউন্টের অবশিষ্ট ঘাটতি পূরণের জন্য মোট 494·83 কোটি টাকা দেয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। যথা,

রাজ্য	(কোটি টাকা)
আসাম	38·17
হিমাচল প্রদেশ	91·15
জম্মু ও কাশ্মীর	114·85
মণিপুর	56·08
মেঘালয়	40·27
নাগাল্যাণ্ড	81·12
সিকিম	11·96
ত্রিপুরা	53·34
পশ্চিম বাংলা	7·89

রেল যাত্রীদের ভাড়ার উপর করের পরিবর্তে গ্র্যাণ্ট ও কৃষি সম্পত্তির উপর সম্পদ কর সম্পর্কিত বর্তমান ব্যবস্থা 1984-85 সনের জন্য সাময়িক-ভাবে বহাল থাকবে। 1979-80 সন থেকে 1983-84 সন পর্যন্ত রাজ্য সরকারগুলিকে স্বল্প সঞ্চয়ের বিরুদ্ধে যে ঋণ দেয়া হয়েছে বা অন্য খাতে প্রদত্ত ঋণ 1984-85 সন পর্যন্ত উদ্ধার করা চলবে না।

উপসংহার

1951 সন থেকে 1979 সন পর্যন্ত কেন্দ্র থেকে রাজ্যগুলিতে 55,797 কোটি টাকা দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে 37·0 শতাংশ ফিনান্স কমিশনগুলির সুপারিশ অনুযায়ী, 35·7 শতাংশ প্ল্যানিং কমিশনের নন-স্ট্যাটুটারি এজেন্সিগুলির মারফৎ ও 27·3 শতাংশ অর্থ মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য সূত্র থেকে। এ অর্থের পরিমাণ রাজ্য সরকারগুলির পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। তাই অনেক রাজ্য সরকারকে কেন্দ্রীয় ঋণ ও আগামের সাহায্য নিতে হয়। রাজ্য সরকারগুলিকে প্রদত্ত কেন্দ্রীয় ঋণ ও আগামের পরিমাণ 1982-83 (রিভাইজড বাজেট) সনে 6,07,469 লক্ষ টাকা। বাজেটে ধরা হয়েছিল মাত্র 3,86,375 লক্ষ টাকা। 1983-84 সনের বাজেটে এ খাতে বরাদ্দের পরিমাণ 4,16,358 লক্ষ টাকা।

ইউনিয়ন টেরিটোরিগুলির ক্ষেত্রে এর পরিমাণ যথাক্রমে 11,669 লক্ষ টাকা, 10,918 লক্ষ টাকা ও 12,580 লক্ষ টাকা।

এ দ্বারা কেন্দ্রীয় অর্থ সাহায্যের উপর রাজগুলির ক্রমবর্ধমান মুখাপেক্ষিতার পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যভাবে বলা চলে, এ কারণে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে রাজ্যগুলির বিক্ষোভ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অষ্টম ফিনান্স কমিশন (1984-89)

1982 সনে ওয়াই. বি. চবনের সভাপতিত্বে অষ্টম ফিনান্স কমিশন নিযুক্ত হয়। কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলি নিম্নে বর্ণনা করা হল।

I. আয়কর

(1) নীট আয়করলব্ধ অর্থের 1·792 শতাংশ ইউনিয়ন টেরিটোরিগুলিকে দিতে হবে।

(2) ইউনিয়ন টেরিটোরিগুলি ও ইউনিয়নভুক্ত কর্মীদের বেতনাদি দেয়া বাবদ অংশ বাদে নীট আয়করলব্ধ অর্থের 85 শতাংশ রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন করে দিতে হবে।

রাজ্যগুলিকে প্রতি বছর দেয় ভাগের 10 শতাংশ তাদের কর সংগ্রহের ভিত্তিতে বণ্টন করে দিতে হবে। বাকী 90 শতাংশ তাদের মধ্যে নিম্নলিখিতভাবে বণ্টন করে দিতে হবে।

(a) জনসংখ্যার* ভিত্তিতে : 25 শতাংশ।

(b) ব্যাপ্ত জনপ্রতি আয় গুণিত জনসংখ্যা : 25 শতাংশ।

(c) 1976-77 সন থেকে 1978-79 সন—এ তিন বছরের ভিত্তিতে নির্ধারিত সর্বোচ্চ গড় জনপ্রতি আয়বিশিষ্ট রাজ্যের (পাঞ্জাব) গড় জনপ্রতি আয় থেকে সংশ্লিষ্ট রাজ্যেরা† গড় জনপ্রতি আয়ের ব্যবধান গুণিত রাজ্যটির জনসংখ্যা : 50 শতাংশ।

II. ইউনিয়ন আবকারী শুল্ক

(1) জাতীয় স্তরে ইউনিয়ন আবকারী শুল্কলব্ধ অর্থে রাজ্য সরকারগুলির ভাগ, বিদ্যুৎ শুল্ক বাদে, 45 শতাংশ; কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য 55 শতাংশ।

---

* 1971 সনের লোকসংখ্যার ভিত্তিতে।

† পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গড় জনপ্রতি আয়বিশিষ্ট রাজ্যকে (হরিয়ানা) ধরতে হবে। অর্থাৎ, পাঞ্জাব ও হরিয়ানার আয়ের ব্যবধান এক্ষেত্রে সম পরিমাণ।

এ 45 শতাংশের 40 শতাংশ রাজ্যগুলির মধ্যে নীট আয়করলব্ধ অর্থ বণ্টনের ভিত্তিতে বণ্টন করে দিতে হবে। অবশিষ্ট 5 শতাংশ সেসব রাজ্যগুলির প্রাপ্য হবে যাদের আয়কর ও শুল্কের, আবকারী শুল্ক ও রেলযাত্রীদের উপর ধার্য করের পরিবর্তে দেয় গ্র্যাণ্টস সহ, অংশ পাওয়ার পরেও আয়-ব্যয়ে ঘাটতি থেকে যাবে। গ্র্যাণ্টস-ইন-এড দিয়ে সরাসরি ঘাটতি মিটাবার পরিবর্তে এভাবে ঘাটতি মিটাবার সুপারিশ এই প্রথম।

(2) বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপর ধার্য আবকারী শুল্কলব্ধ নীট অর্থের সবটাই রাজ্যগুলির মধ্যে সংগ্রহের সম পরিমাণে বা সংশ্লিষ্ট রাজ্যের উপর আরোপের পরিমাণের ভিত্তিতে বণ্টন করে দেয়া হবে।

(3) এডিশনাল এক্সসাইস ডিউটিস (টেক্সটাইলস এণ্ড টেক্সটাইল আর্টিক্যালস) এ্যাক্ট, 1978 অনুযায়ী সংগৃহীত শুল্ক এবং আইন দ্বারা নির্দিষ্ট বিশেষ উদ্দেশ্যে সংগৃহীত সেসলব্ধ অর্থের কোন ভাগ রাজ্যগুলির প্রাপ্য হবে না।

III. গ্র্যাণ্টস-ইন-এড

(1) কমিশন ঘাটতি রাজ্যগুলির বার্ষিক বৃদ্ধির হার 5 শতাংশ করার উদ্দেশ্যে গ্র্যাণ্টস দেয়ার সুপারিশ করেছে। এগারোটি রাজ্য এ গ্র্যাণ্টসের সুবিধা পাবে। রাজ্যগুলি যথা—আসাম, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর, মণিপুর, মেঘালয়, নাগাল্যাণ্ড, ওড়িষ্যা, রাজস্থান, সিকিম, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গ। তাছাড়া তাদের অতিরিক্ত মহার্ঘ ভাতা দেয়ার জন্য রেভিন্যু খাতে যে ঘাটতি দেখা দেবে তা পূরণের জন্যও গ্র্যাণ্টস দেয়া হবে।

(2) প্রশাসনের উন্নতি বিধান ও বিশেষ সমস্যার প্রয়োজনে সতরোটি রাজ্যকে গ্র্যাণ্টস দেয়া হবে। প্রশাসনের উন্নয়নের জন্য বরাদ্দের মোট পরিমাণ 914·55 কোটি টাকা, বিশেষ সমস্যার জন্য 52·78 কোটি টাকা। মোট 967·33 কোটি টাকা। এ খাতে সর্বাধিক গ্র্যাণ্টস পাবে মধ্যপ্রদেশ (157·69 কোটি টাকা), তারপর বিহার (130·27 কোটি টাকা), পশ্চিমবঙ্গ (126·37 কোটি টাকা) ও উত্তরপ্রদেশ (108·18 কোটি টাকা)।

(3) প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতি কারণে রাজ্যগুলির যে ব্যয় হবে তা মিটাবার জন্য তাদের বার্ষিক গ্র্যাণ্টস দিয়ে সাহায্য করা হবে। এর পরিমাণ 120·375 কোটি টাকা। এগারোটি রাজ্যকে এ গ্র্যাণ্টস দেয়া হবে।

রাজ্যগুলি যথা, অন্ধ্রপ্রদেশ, আসাম, বিহার, গুজরাট, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর, কর্ণাটক, কেরল, মধ্যেপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্র।

(4) ঘাটতি রাজ্যগুলিকে 1985 সনের 1 এপ্রিল থেকে চার বছরের জন্য প্রতি বছর তাদের 1984-89 সনের মধ্যে নতুন করে গৃহীত ঋণের উপর সুদ বাবদ নীট অতিরিক্ত দায় পূরণের জন্য গ্র্যাণ্টস দেয়া হবে। ঘাটতি রাজ্যগুলিকে 1985-86 সন থেকে 1988-89 সন পর্যন্ত তাদের 1984-85 সনে পরিসমাপ্ত প্ল্যান স্কীমের জন্য দায়বদ্ধ অতিরিক্ত ব্যয়ভার পূরণের জন্যও গ্র্যাণ্টস্ দেয়া যেতে পারে।

IV. বিক্রয় করের পরিবর্তে অতিরিক্ত আবকারী শুল্ক

বস্ত্র (টেক্সটাইল), চিনি ও তামাকের উপর ধার্য অতিরিক্ত আবকারী শুল্কলব্ধ নীট অর্থ নিম্নলিখিতভাবে বণ্টন করে দেয়া হবে।

(a) 2·391 শতাংশ ইউনিয়ন টেরিটোরিগুলিকে দেয় বাবদ অর্থ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে থাকবে।

(b) বাকী অর্থ 22 রাজ্যের মধ্যে নির্দিষ্ট শতাংশের ভিত্তিতে বণ্টন করে দেয়া হবে।

V. এস্টেট শুল্ক

(1) ইউনিয়ন টেরিটোরিগুলির সঙ্গে যুক্ত কৃষি জমি ছাড়া সম্পত্তির উপর ধার্য এস্টেট শুল্কলব্ধ নীট অর্থ রাজ্যগুলির মধ্যে চলতি পদ্ধতি ও নীতি অনুযায়ী বণ্টন করে দেয়া হবে। এ উদ্দেশ্যে ইউনিয়ন টেরিটোরিগুলিক একক রূপে গণ্য করা হবে।

(2) বাকী নীট অংশ প্রতি বছর রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হবে। প্রত্যেক রাজ্যে অবস্থিত এবং শুল্ক নির্ধারণে গৃহীত স্থাবর ও অস্থাবর এ উভয় সম্পত্তিকে একসঙ্গে ধরে তাদের স্থূল মূল্যের অনুপাতে বণ্টন করা হবে। রাজ্যের বাইরে অবস্থিত রাজ্যের সম্পত্তিকে রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত বলে গণ্য করা হবে।

(3) সিকিমের ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি ও নীতি প্রযোজ্য হবে এবং যে তারিখ থেকে এ শুল্ক ধার্য করা হবে সে তারিখ থেকে রিপোর্টের কার্যকাল পর্যন্ত (1989 সন) তা বলবৎ থাকবে।

VI. রেল যাত্রীদের ভাড়ার উপর ধার্য করের পরিবর্তে গ্র্যাণ্টস

উল্লিখিত উদ্দেশ্যে বার্ষিক গ্র্যাণ্টের পরিমাণ 1984-85 সন থেকে

1988-89 সন পর্যন্ত প্রতি বছর **95** কোটি টাকা করা হয়। সপ্তম ফিনান্স কমিশন এক্ষেত্রে **23·12** কোটি টাকা বণ্টনের জন্য সুপারিশ করেছিল।

VII. কৃষি সম্পদের উপর সম্পদ করের জন্য গ্র্যাণ্ট

কৃষি সম্পদের উপর সম্পদ করের জন্য যে গ্র্যাণ্ট দেয়া হবে তাতে প্রত্যেক রাজ্যের অংশ সংশ্লিষ্ট বছরে রাজ্যটির নীট সংগ্রহের সম পরিমাণ হবে।

VIII. রিলিফ ব্যয়

এ ব্যাপারে কিছু পরিবর্তন সাপেক্ষ চলতি ব্যবস্থাকেই গ্রহণ করা হয়েছে। পরিবর্তনের মধে উল্লেখ্য **:** রাজ্যগুলি প্রান্তিক অর্থের 50 শতাংশ দেবে ; বাকী 50 শতাংশ কেন্দ্রীয় সরকার প্রতি বছর গ্র্যাণ্টস-ইন-এড বাবদ দেবে; প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের নিজের অংশ সম্পূর্ণ ব্যয়িত হয়ে গেলে কেন্দ্রের অংশ থেকে ব্যয় করা চলবে।

IX. পরিকল্পনা বহির্ভূত মূলধন ঘাটতি

(1) ঋণ উপশমের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা বহির্ভূত মূলধন ঘাটতির পরিমাণ পরিশোধিত ওভারড্রাফট ঋণ ও ক্ষুদ্র সঞ্চয় ঋণ বাদ দিয়ে নির্ধারণ করা হয়েছে।

(2) 1982-83 ও 1983-84 সনে রাজ্যগুলিকে যে ওভারড্রাফট ঋণ দেয়া হয়েছে সেজন্য কোন উপশমের সুপারিশ করা হয়নি।

(3) ক্ষুদ্র সঞ্চয় ঋণ পরিশোধ ব্যাপারে কোন উপশমের সুপারিশ করা হয়নি। 1984 সনে পরিশোধনীয় ঋণ এর ব্যতিক্রম হবে।

(4) উদ্বাস্তু প্রভৃতি ব্যক্তিদের উপশম ও পুনর্বাসনের জন্য প্রদত্ত ঋণ পরিশোধের প্রয়োজন হবে না।

X. সাধারণ মন্তব্য

(1) ফিনান্স কমিশনের সুপারিশকাল পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সমকাল হওয়া।

(2) কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রণালয়ে একটি স্থায়ী বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা। এ বিভাগের প্রধান কাজ হবে কমিশনের সুপারিশগুলি যথাযথ কার্যকর হচ্ছে কিনা তার উপর নজর রাখা।

(3) রাজ্যগুলির অর্থ দপ্তরেও এরূপ একটি করে স্থায়ী বিভাগ প্রতিষ্ঠা।

(4) ভবিষ্যতে কমিশনগুলিকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়ের সম আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা দেয়া।

কেন্দ্র থেকে সম্পদ স্থানান্তরিতকরণের পরিমাণ

অষ্টম ফিনান্স কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কর, শুল্ক ও গ্র্যান্টস-ইন-এড বাবদ 1984-89 সনে মোট 39,452·01 কোটি টাকা কেন্দ্র থেকে রাজ্যগুলিতে স্থানান্তরিত করা হবে। প্রথম পরিকল্পনা থেকে পঞ্চম পরিকল্পনা পর্যন্ত এর পরিমাণ ছিল 21,206 কোটি টাকা। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় এর পরিমাণ 22,888 কোটি টাকা। সপ্তম ফিনান্স কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী 1979-84 সনের মধ্যে কেন্দ্র থেকে রাজ্যগুলিতে এরূপ সম্পদ স্থানান্তরিত-করণের পরিমাণ 20,842·97 কোটি টাকা।

ফিনান্স কমিশনের সুপারিশক্রমে কেন্দ্র থেকে রাজ্যগুলিতে সম্পদ স্থানান্তরিতকরণের পরিমাণ 1951-52 সন থেকে 1983-84 সন পর্যন্ত কর, শুল্ক ও গ্র্যান্টস

		(কোটি টাকা)
প্রথম পরিকল্পনা	(1951-56)	447
দ্বিতীয় পরিকল্পনা	(1956-61)	918
তৃতীয় পরিকল্পনা	(1961-66)	1,590
তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনা	(1966-69)	1,782
চতুর্থ পরিকল্পনা	(1969-74)	5,421
পঞ্চম পরিকল্পনা	(1974-79)	11,048
ষষ্ঠ পরিকল্পনা	(1979-84)	22,888
অষ্টম কমিশন	(1984-89)	39,452

সূত্র: রিপোর্ট অব দ্য এইটথ ফিনান্স কমিশন, 1984।

রাজ্যভিত্তিক বন্টন : অষ্টম ফিনান্স কমিশন (1984-89)

রাজ্য	মোট অর্থ (কোটি টাকা)	শতাংশ
1. অন্ধ্রপ্রদেশ	2896·52	7·34
2. আসাম	1607·48	4·07
3. বিহার	4220·47	10·70
4. গুজরাট	1489·05	3·77
5. হরিয়ানা	439·22	1·11
6. হিমাচল প্রদেশ	774·37	1·96
7. জম্মু ও কাশ্মীর	1119·69	2·84
8. কর্ণাটক	1727·97	4·38
9. কেরল	1288·25	3·27
10. মধ্যপ্রদেশ	2957·68	7·50
11. মহারাষ্ট্র	2635·42	6·68
12. মণিপুর	469·05	1·19
13. মেঘালয়	381·86	0·97
14. নাগাল্যাণ্ড	527·42	1·34
15. ওড়িষ্যা	1909·66	4·84
16. পাঞ্জাব	646·15	1·64
17. রাজস্থান	1676·17	4·25
18. সিকিম	104·45	0·27
19. তামিলনাড়ু	2464·94	6·25
20. ত্রিপুরা	561·18	1·42
21. উত্তর প্রদেশ	6105·03	15·47
22. পশ্চিমবঙ্গ	3449·98	8·74
মোট	39452·01	100·00

সূত্র : রিপোর্ট অব দ্য এইটথ ফিনান্স কমিশন, 1984।

উপসংহার ও মন্তব্য

অষ্টম ফিনান্স কমিশনের সুপারিশ নিয়ে এক নতুন বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। বিধিমত কমিশনের সুপারিশের কার্যকাল 1984 সনের 1 এপ্রিল থেকে 1989 সনের 31 মার্চ পর্যন্ত। কমিশনের রিপোর্ট বিলম্বে পাওয়ার দরুন রিপোর্টটি 1984 সনের জুলাইতে সংসদে পেশ করা হয় এবং সরকারী-ভাবে গৃহীত হয় যে, 1984-85 সনের জন্য কমিশনের অন্তর্বর্তীকালীন সুপারিশগুলিই বলবৎ থাকবে এবং 1985-86 সন থেকে কমিশনের চূড়ান্ত রিপোর্টের সরকার অনুমোদিত সুপারিশগুলিকে কার্যকর করা হবে। এর ফলে কিছু কিছু রাজ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। কেহ কেহ আবার পঞ্চম ফিনান্স কমিশনের নজির টেনে বলেন যে, পঞ্চম কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশে অনুরূপ বিলম্ব হলেও এর সুপারিশগুলি কার্যকর করা স্থগিত রাখা হয়নি। সরকার পক্ষ তা অস্বীকার করে না। তবে বলা হয়, অষ্টম কমিশনের সুপারিশগুলি 1984-85 সন থেকে কার্যকর করতে গেলে সরকারের 1400 কোটি টাকা সংগ্রহ করতে হবে। এত টাকা এত স্বল্প সময়ে ও লোকসভা নির্বাচনের মুখে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। পঞ্চম কমিশনের ক্ষেত্রে এ টাকার পরিমাণ ছিল সামান্য, মাত্র 63 কোটি টাকা। সরকারের পক্ষ থেকে এও বলা হয় যে, যাতে এ কারণে কোন রাজ্যই আর্থিক দুরবস্থার সম্মুখীন না হয় সে দিকে সরকারের সতর্ক দৃষ্টি থাকবে। তবে এটা অস্বীকার করা চলে না যে, সরকারের এ সিদ্ধান্ত একপেশে ও অগণতান্ত্রিক। কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত ছিল রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া।

অষ্টম কমিশনে 1984-89 সনের মধ্যে কেন্দ্র থেকে রাজ্যগুলিতে 39,452 কোটি টাকা স্থানান্তরিত করার সুপারিশ রয়েছে। সাম্প্রতিক দাম স্তরের অবস্থা বিবেচনা করলে এ অর্থের পরিমাণ তাৎপর্যপূর্ণ নয়। কেন্দ্রের আয়ের শতাংশ রূপে মূল্যায়ন করতে গেলে দেখা যাবে প্রথম পরিকল্পনায় কেন্দ্রের মোট আয়ের 43 শতাংশ রাজ্যগুলিকে দেয়া হয়েছিল। পঞ্চম পরিকল্পনায় দেয়া হয়েছিল 31 শতাংশ। কেন্দ্রের 1984-85 সনের বাজেটে এর পরিমাণ ধরা হয়েছে 32 শতাংশ।

অষ্টম ফিনান্স কমিশনে আয়কর ও আবকারী শুল্ক ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি

অবলম্বন করা হয়েছে তার ফলে বিহার, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও ওড়িষ্যা বিশেষভাবে উপকৃত হবে। অন্য দিকে শিল্পে উন্নত রাজ্যগুলি, যথা গুজরাট, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, তামিলনাড়ু ও পশ্চিম বাংলা, পূর্বের তুলনায় কম অংশের অধিকারী হবে। অবশ্য এরূপ অসম বণ্টন আঞ্চলিক আর্থিক অসমতা হ্রাস করতে সাহায্য করবে।

1952-57 সনে ফিনান্স কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী যে সম্পদ কেন্দ্র থেকে রাজ্যগুলিতে স্থানান্তরিত করা হয় তার মধ্যে করলব্ধ সম্পদের অংশ ছিল 88 শতাংশ; 1974-79 সনে এর পরিমাণ 76·7 শতাংশ, এবং এ সময়কালীন গ্র্যাণ্টস মারফত যে সম্পদ স্থানান্তরিত করা হয় তার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 11·9 শতাংশ ও 23·3 শতাংশ। এ দ্বারা কেন্দ্রের উপর রাজ্যগুলির আর্থিক নির্ভরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে বোঝা যায়।

কর

কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির আয়ের প্রধান সূত্র কর। 1951-52 সনে উভয়ের যুক্ত মোট চলতি আয়ে করের অংশ ছিল 88·6 শতাংশ। 1982-83 সনে তা হ্রাস পেয়ে 79 শতাংশ হয়। 1951-52 সনে জাতীয় আয়ে করলব্ধ আয়ের অংশ ছিল 7·4 শতাংশ। 1981-82 সনে তা বৃদ্ধি পেয়ে 19·7 শতাংশ হয়।

অপ্রত্যক্ষ করের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সে অনুপাতে প্রত্যক্ষ কর কম বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর কারণ জনসংখ্যার অতি নগণ্য অংশ প্রত্যক্ষ করের আওতায় আসে। অপ্রত্যক্ষ কর ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে প্রায় সব ব্যক্তিকেই দিতে হয়। 1985-86 সনের বাজেট অনুযায়ী মাত্র 30 লক্ষ লোক আয়করের আওতায় আসছে।

1983-84 সনের কেন্দ্রীয় বাজেটে (একাউন্টস) মোট করলব্ধ আয়ের পরিমাণ ছিল 19533·81 কোটি টাকা। এর মধ্যে দ্রব্য ও সেবার উপর ধার্য করের পরিমাণ ছিল 16208·62 কোটি টাকা। 1985-86 সনের বাজেটে এদের পরিমাণ ধরা হয়েছে যথাক্রমে 24465·95 কোটি টাকা ও 20799·52 কোটি টাকা।

কেন্দ্রীয় সরকারের রেভিন্যু একাউন্টে মোট আয়ে অ-কর আয়ের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম। 1983-84 সনের বাজেটে (একাউন্টস) মোট আয়ের পরিমাণ 31332·80 কোটি টাকা, অ-কর আয়ের অংশ মাত্র 11798·99 কোটি টাকা। 1985-86 সনের বাজেটে এদের পরিমাণ যথাক্রমে 40763·91 কোটি টাকা ও 16297·96 কোটি টাকা।

প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ উভয় ক্ষেত্রেই করের চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আয়করের স্তর এরূপভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে যে, একমাত্র উচ্চ আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরই আয়কর দিতে হচ্ছে। সম্পদ করের নিম্নতর সীমা পরিবর্তিত হওয়াতে সম্পদ করদাতাদের সংখ্যাও হ্রাস পেয়েছে। অপ্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্র বিস্তৃত করা হয়েছে। সাধারণত বিলাস দ্রব্যের উপর অপ্রত্যক্ষ কর ধার্য করা হলেও অনেক নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপরও অপ্রত্যক্ষ কর ধার্য করা হয়েছে যার ফলে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র শ্রেণীর মানুষদের প্রকৃত আয় হ্রাস পাচ্ছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ চা, চিনি, কফি, সিগ্রেট, কেরোসিন, রেল যাত্রীদের উপর শুল্ক প্রভৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে।

কর কাঠামোর বৈশিষ্ট্য

ভারতের কর কাঠামোর নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষণীয়।

(i) অপ্রত্যক্ষ করের পরিমাণ বৃদ্ধি। এর কারণ প্রত্যক্ষ কর বৃদ্ধির সুযোগ সীমিত ও প্রত্যক্ষ কর ফাঁকি দেয়া ও এড়িয়ে যাওয়া সহজ।

(ii) সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি পাবার ফলে করের হারের উপর চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অপ্রত্যক্ষ করের উপর এ চাপ অপেক্ষাকৃত বেশি।

(iii) কৃষি ক্ষেত্রে করের চাপ অ-কৃষি ক্ষেত্রে করের চাপের তুলনায় অনেক কম। গ্রামাঞ্চল অপেক্ষা শহরাঞ্চল থেকেই অনেক বেশি অপ্রত্যক্ষ করলব্ধ অর্থ সংগৃহীত হয়।

(iv) কর ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে কালোবাজার প্রাধান্য বিস্তার করে চলেছে। কর ফাঁকি দেয়ার উদ্দেশ্যে বৃহৎ করদাতারা তাদের বিনিয়োগের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। যেমন, ব্যক্তিগত আয়কে কর্পোরেট আয়ে বা দীর্ঘকালীন মূলধন লাভে রূপান্তরিতকরণ, ট্রাস্ট গঠন, গিফট্ দেয়া প্রভৃতি। এর প্রভাব জাতীয় বিনিয়োগের উপর প্রতিফলিত হচ্ছে। করের চাপ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এক শ্রেণী লোকের বিলাস দ্রব্যের উপর ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(v) ভারতীয় কর কাঠামো অনমনীয় ও জটিল। এর ফলে জাতীয় আয়ের সঙ্গে কর কাঠামো সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে পাচ্ছে না। কর পদ্ধতির জটিলতার জন্য ধনী করদাতাদের পক্ষে কর ফাঁকি দেয়া সহজ হয়, সাধারণ করদাতারা অযথা হয়রানি হয়। ওয়ানচু কমিটির মতে কর ফাঁকি দেয়ার কারণ, করের উচ্চ হার, কনট্রোল ও লাইসেন্স প্রথা, রাজনৈতিক দলগুলিকে অনুদান দেয়া, অসাধু ব্যবসায় পদ্ধতি, ব্যবসায় সম্পর্কিত ব্যয়ের উচ্চতম সীমা নির্ধারণ ও কোন কোন ব্যয় নিষিদ্ধকরণ, বিক্রয় কর ও অন্যান্য লেভির উচ্চ হার, কর আইনের প্রয়োগে শিথিলতা ও নৈতিক মানের অবনতি।

কৃষি কর

সমর্থনে যুক্তি

কৃষি আয়ের উপর কর ধার্য করার সমর্থনে বলা হয়।

(1) ভারত কৃষি প্রধান দেশ। অতএব দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যয় যাতে কৃষির বিশেষ অবদান থাকা আবশ্যক।

(2) ভারতের কৃষিরা সাধারণত নিজেদের পরিবারদের ভরণপোষণের প্রয়োজন মিটাবার জন্য উৎপাদন করে থাকে। এর ফলে বাজারে কৃষি দ্রব্যের যোগানের অভাব ঘটে, শিল্পোন্নয়ন ব্যাহত হয়। এমন কি কৃষি উৎপাদন কম হওয়ার ফলে সাধারণভাবে সব জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি পায়। এ অবস্থা দূর করার জন্য, অর্থাৎ, বাজার উদ্বৃত্তের পরিমাণ বৃদ্ধি করার জন্য কৃষি কর ধার্য প্রয়োজন। উৎপাদকদের উপর বাধ্যতামূলক লেভি ধার্য করলে তারা উৎপাদন বৃদ্ধি করতে বাধ্য হবে। এ পন্থা অবলম্বন করে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জাপান সুফল পেয়েছে।

(3) পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষি উন্নয়নের জন্য প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করা হচ্ছে। এক শ্রেণী কৃষকদের আয়ও প্রচুর বৃদ্ধি পেয়েছে। অথচ তাদের বর্ধিত আয় ও সঞ্চয়ের অংশ কররূপে সংগ্রহ করার বিশেষ কোন চেষ্টা সরকারের নেই। এর ফলে ধনী কৃষকেরা আরো ধনী হচ্ছে। পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য যে অর্থ প্রয়োজন তার অভাব থাকা সত্ত্বেও কৃষি সঞ্চয়ে হাত দেয়া হচ্ছে না। ফলে শহরের সঞ্চয়কারীদের উপর অসঙ্গত চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। কারণ ধনী কৃষকদের যেখানে কৃষি কর দিতে হচ্ছে না, স্বল্প সঞ্চয়কারী হওয়া সত্ত্বেও তাদের আয়কর দিতে হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখযোগ্য, জাতীয় বিনিয়োগের এক বিশেষ অংশ কৃষি উন্নয়নের জন্য ব্যয়িত হয়।

দেখা যাচ্ছে, প্রথম পরিকল্পনায় যেখানে কৃষি ও সেচ খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ 31·3 শতাংশ সেখানে রাজ্যগুলির নিজস্ব কর সম্পদে কৃষি আয়-করের পরিমাণ 2 শতাংশ। চতুর্থ ও পঞ্চম পরিকল্পনায় তা 1 শতাংশেরও কম। ফলে অ-কৃষি সেক্টরের উপর করের চাপ এসে পড়ে। 1968-69 সনে কৃষি সেক্টরে জনপ্রতি করের পরিমাণ ছিল 26·0 টাকা যেখানে অ-কৃষি সেক্টরে জনপ্রতি করের পরিমাব 174·00 টাকা।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষি ও সেচের উপর বিনিয়োগের পরিমাণ

পরিকল্পনা	মোট বিনিয়োগের শতাংশ
প্রথম	31·3
দ্বিতীয়	20·9
তৃতীয়	20·5
তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনা	23·8
চতুর্থ	23·3
পঞ্চম	20·6

সূত্র : আর-বি-আই।

কৃষির উপর কর

পরিকল্পনা	কৃষি আয়কর রাজ্যগুলির নিজস্ব কর সম্পদের শতাংশরূপে
প্রথম	2·0
দ্বিতীয়	2·0
তৃতীয়	1·4
পরিকল্পনায়বিরতি	1·1
চতুর্থ*	0·7
পঞ্চম*	0·7

* অনুমিত।

সূত্র : আর-বি-আই।

(4) রাজ্যগুলির আয়ের দুটো প্রধান স্থিতিস্থাপক সূত্র ভূমি রাজস্ব ও কৃষি কর এবং বিক্রয় কর। ভূমি রাজস্ব ও কৃষি করের প্রতি ক্রমাগত আনুকূল্য দেখাবার ফলে রাজ্যগুলির কর কাঠামোর পরিবর্তন ঘটেছে ও আর্থিক সাহায্যের জন্য কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কৃষি ও অ-কৃষি সেক্টরে করের আপেক্ষিক চাপ

বছর	কৃষি সেক্টর		অ-কৃষি সেক্টর	
	জনপ্রতি কর	জনপ্রতি আয় ও করের অনুপাত	জনপ্রতি কর	জনপ্রতি আয় ও করের অনুপাত
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1951-52	8·0	3·8	41·8	9·5
1955-56	9·5	5·4	38·4	8·9
1960-61	13·4	5·6	68·9	13·0
1968-69	26·0	6·5	174·0	19·1

সূত্র : এম. জে. কে. থাবরাজ, ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট অব গভর্ণমেন্ট, Table XXIV, পৃ: 213।

রাজ্যগুলির কর কাঠামোর পরিবর্তন

(রাজ্যগুলির মোট করলব্ধ আয়ের শতাংশ)

কর	1960-61	65-66	70-71	75-76	77-78
1. ভূমি রাজস্ব	21	13	7	7	4
2. কৃষি আয়কর	2	1	1	1	1
3. রাজ্য আবকারী শুল্ক	12	11	13	12	13
4. বিক্রয় কর	35	44	50	54	56
5. পরিবহণ কর	10	8	11	11	11
6. স্ট্যাম্পস ও রেজিষ্ট্রেসন	9	9	8	6	6
7. প্রমোদ কর	3	4	4	4	4
8. বিদ্যুৎ শুল্ক	3	4	4	3	3
9. অন্যান্য কর ও শুল্ক	5	6	2	2	2
মোট	100	100	100	100	100

সূত্র : সপ্তম ফিনান্স কমিশন।

বিরুদ্ধ যুক্তি

(1) কৃষি উন্নয়নের জন্য যেসব পন্থা গ্রহণ করা হয়েছে তার সুফল মুষ্টিমেয় কৃষক পেয়েছে মাত্র। এ সময় কৃষি কর ধার্য করা সমীচীন হবে না। রাজনৈতিক দলগুলি এ যুক্তির প্রবল সমর্থক।

(2) জাতীয় স্বার্থে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির চেতনা কৃষকদের মধ্যে সবে দেখা দিয়েছে। কিন্তু কৃষি ক্ষেত্রের কাঠামোগত অসুবিধার ফলে তা এখনও গভীরতা লাভ করেনি। এ অবস্থায় কৃষি কর তাদের উদ্যমকে ব্যাহত করতে পারে।

(3) ধনী কৃষকদের অনেকেই তাদের করমুক্ত আয়ের বেশকিছু অংশ জমি, কৃষি যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের উন্নতির জন্য ব্যয় করে থাকে। এর ফলে সরকারের উপর তাদের নির্ভরশীলতা হ্রাস পাচ্ছে।

(4) কৃষকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হওয়ার সঙ্গে শিল্পজাত অনেক দ্রব্যই তাদের অধিক দামে অধিকতর পরিমাণে ক্রয় করতে হচ্ছে। ফলে তাদের উপর পরোক্ষ করের চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(5) প্রশাসনিক অসুবিধার দিকও উপেক্ষণীয় নয়। কৃষি আয় যথাযথ নির্ধারণ করা সহজসাধ্য নয়। কারণ কৃষি দ্রব্যের দাম স্থিতিশীল নয়। ফলে কৃষি আয় যথেষ্ট পরিবর্তনশীল। বহুপ্রকার ভূমি স্বত্ব প্রথার প্রচলন থাকার ফলে প্রকৃত করদাতাকে চিহ্নিত করাও কঠিন। এ সব কারণে কৃষি কর সংগ্রহের জন্য যে ব্যয় হবে তা বিবেচনা করলে আর্থিক দিক দিয়ে কৃষি কর ধার্য করা সমীচীন হবে কিনা সে প্রশ্নও রয়েছে।

কমিটি অন ট্যাক্সেসন অব এগ্রিকালচারেল ওয়েলথ এণ্ড ইনকাম (রাজ কমিটি)

1972 সনের ফেব্রুয়ারীতে কে. এন. রাজের সভাপতিত্বে এ কমিটি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হয়। কৃষি সম্পদ ও আয়ের উপর কর ধার্য করার ফলাফলের বিভিন্ন দিক পরীক্ষা করে দেখে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করার জন্য কমিটিকে নির্দেশ দেয়া হয়।

কমিটির প্রধান সুপারিশগুলি :

(i) যেসব কৃষকদের আয়কর নির্ধারণ করার মত তাদের অন্য কোন আয়ের সূত্র নেই সেসব কৃষকদের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান এগ্রিকালচারেল হোল্ডিংস ট্যাক্স ধার্য করা সঙ্গত।

(ii) যেসব কৃষকদের কর দেয়ার মত অ-কৃষি আয় আছে তাদের ক্ষেত্রে আয়করের উদ্দেশ্যে মোট আয় নির্ধারণ কালে তাদের কৃষি আয়কেও গণনার মধ্যে আনা যেতে পারে।

(iii) গবাদি পশু, মৎসচাষ, পোল্ট্রি, ভেরি প্রভৃতি সূত্র থেকে প্রাপ্ত আয়ও করভুক্ত করা সঙ্গত।

(iv) কৃষি সম্পত্তির উপর কর প্রথা প্রবর্তন করা যেতে পারে।

(v) কৃষি জমি হস্তান্তরকরণের উপর মূলধন কর ধার্য করা সঙ্গত।

রাজ কমিটির সুপারিশগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এগ্রিকালচারেল হোল্ডিংস ট্যাক্স। এ কর সম্পর্কে সাধারণ প্রতিক্রিয়া এই যে, ধারণাটি অতিরিক্ত মৌলিক, অর্থাৎ কার্যকর করার পক্ষে অতিরিক্ত জটিল। সাধারণভাবে রাজ্য সরকারগুলি এ সুপারিশ গ্রহণ করতে সম্মত হয় না। কেন্দ্রীয় সরকার কমিটির কৃষি আয় ও অ-কৃষি আয়ের আংশিক মিশ্রণ সুপারিশটি গ্রহণ করে ও 1973-74 সনের বাজেটে তা কার্যকর করে।

সরকারী ঋণ

সরকারী ঋণ সরকারের ফিনান্সের এক নির্ভরযোগ্য সূত্র। কর, শুল্ক প্রভৃতি আয় দ্বারা বর্তমানে সরকারী ব্যয় মিটানো সম্ভব নয়। এর অনিবার্য ফলস্বরূপ সরকারী ঋণের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সরকারী ঋণকে দুভাগে ভাগ করা হয়ঃ দেশীয় ঋণ ও বিদেশীয় ঋণ। দেশীয় ঋণ দেশ থেকে নেয়া হয়। বিদেশীয় ঋণ বিদেশী সরকার বা নাগরিক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে নেয়া হয়। সরকারী ঋণকে আবার উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল ঋণ রূপেও ভাগ করা হয়। উৎপাদনশীল ঋণ বলতে সে ঋণকে বুঝায় যার বিনিয়োগলব্ধ আয় দ্বারা বার্ষিক সুদ পরিশোধ করা ছাড়াও আসল টাকার কিছু পরিমাণ প্রতি বছর শোধ করা সম্ভব। জনকল্যাণের জন্য গৃহীত ঋণ এ অর্থে উৎপাদনশীল নয়। তবে সামাজিক ও জাতীয় স্বার্থে তাকে উৎপাদনশীল ঋণ রূপে অভিহিত করা চলে। অনুৎপাদনশীল ঋণ সম্পদ ও আয় সৃষ্টি করতে সাহায্য করে না। যেমন, যুদ্ধের জন্য গৃহীত ঋণ। এরূপ ঋণ জাতীয় অর্থনীতিতে ভারস্বরূপ। সরকারী ঋণকে আবার ফাণ্ডেড ও আনফাণ্ডেড বা ফ্লোটিং ঋণরূপে গণ্য করা হয়। ফাণ্ডেড ঋণ দীর্ঘমেয়াদী ঋণ। আনফাণ্ডেড ঋণ স্বল্পমেয়াদী ঋণ। চলতি প্রয়োজন মিটাবার জন্য এ ঋণ গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

ঋণ গ্রহণের কারণ

(i) বর্তমান সমাজে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সরকার একমাত্র আইন ও শৃঙ্খলার ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করে না, কোন ব্যাপারেই নিরপেক্ষ দর্শক মাত্র নয়। বর্তমানে বিবিধ জনকল্যাণমূলক কাজ সম্পাদনের দায়িত্ব সরকারের; ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প ক্ষেত্রেও সে অন্যতম প্রধান শরিক বা উদ্যোগী। তাছাড়া দেশরক্ষা ও খরা-বন্যার মত জরুরী অবস্থার মোকাবিলাও তাকে করতে হয়। মহাকাশে অভিযান তার অতি সাম্প্রতিক কাজকর্মের অঙ্গস্বরূপ। সংক্ষেপে, সরকারের ব্যয় খাতে যে পরিমাণ আর্থিক দায়িত্ব তাকে নিতে হয় সে অনুপাতে বাজেটের ধরা-বাঁধা সূত্র থেকে আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে না। আয়-ব্যয়ের এ ঘাটতি মিটাবার অন্যতম পথ ঋণ গ্রহণ।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, 1948 সনের তুলনায় 1984-85 সনে ভারত সরকারের রেভিন্যু একাউন্টে ব্যয়ের পরিমাণ 100 গুণেরও বেশী বৃদ্ধি

পেয়েছে। বৃদ্ধির পরিমাণ 400 কোটি টাকা থেকে 40251 কোটি টাকা। 1985-86 সনে এ ব্যয় বৃদ্ধির পরিমাণ 46,398 কোটি টাকা।

(ii) যুদ্ধ ও যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্য সরকারকে ঋণের শরণাপন্ন হতে হয়। 'ঠাণ্ডা যুদ্ধ' ও সম্প্রতি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইঙ্গিত পৃথিবীকে এমন আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছে যে, দেশরক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি যে কোন সম্ভাব্য পরিমাণকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

(iii) মন্দাকালীন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য যে প্রচুর পরিমাণ বিনিয়োগ দরকার তা সম্ভব করে তোলার জন্যও ঋণ গ্রহণ করতে হয়।

আয় বণ্টনের উপর ঋণের প্রভাব

ঋণলব্ধ অর্থ বিনিয়োগ দ্বারা যে উন্নয়ন প্রকল্প রূপায়িত হয় তার ফলে একশ্রেণী লোক উপকৃত হয়। পরোক্ষে তাদের প্রকৃত আয় বৃদ্ধি পায়। অপর দিকে যারা সরকারকে ঋণ দেয় তাদের আয়ও হ্রাস পায় না। কারণ তাদের ঋণ নিরাপদ ও সুদ অর্জনকারী। সরকারের ঋণ যদি প্রধানত সমাজের দুর্বল শ্রেণীর আর্থিক ও উন্নয়নের জন্য ব্যয়িত হয় তবে অসম সম্পদ ও আয় বণ্টন এবং আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস পাবে। অবশ্য সরকারী ঋণ যদি দাম বৃদ্ধির সহায়ক হয় তবে বিপরীত ফল দেখা দেবে। সুদসহ ঋণ পরিশোধ বস্তুত করদাতাদের টাকা ঋণদাতাদের হাতে তুলে দেয়া। এরূপ হস্তান্তর ধন বণ্টনে বৈষম্য সৃষ্টি করে।

বিদেশীয় ঋণের ফলাফল ঋণের ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। ঋণ যদি অতিপ্রয়োজনীয় ভোগ্যদ্রব্য আমদানি করার জন্য ব্যয়িত হয় তবে তা মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস করতে সাহায্য করবে। যদি তা যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য মূলধন দ্রব্য আমদানি করার জন্য ব্যয়িত হয় তবে তা সমূহ মুদ্রাস্ফীতির কারণ ঘটলেও ভবিষ্যত দ্রুত শিল্পোন্নয়নের পথ প্রশস্ত করবে। বিদেশীয় ঋণ যদি যুদ্ধ বা যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্য গ্রহণ করা হয় তবে তা বিনিয়োগের দিক থেকে কোন সুফলের কারণ হবে না। বিদেশীয় ঋণের উপর সুদ বাবদ যে অর্থ দিতে হয় তা প্রকারান্তরে দেশের টাকা বিদেশে স্থানান্তরিতকরণ। এক অর্থে তা দেশের পক্ষে ক্ষতি কর। বস্তুত সুদ ও আসল বাবদ বিদেশীয় ঋণ পরিশোধ করার জন্য যে পরিমাণ রপ্তানি-উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করা প্রয়োজন কোন উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে তা সম্ভব নয়। ফলে বিদেশীয় ঋণ উন্নয়নশীল দেশের কাছে স্থায়ী সমস্যা রূপে দেখা দেয়। বিদেশীয় ঋণের উপর নির্ভরতা

জাতীয় অর্থনীতিকে অনেকটা অনিশ্চয়তার মধ্যে রাখে ও অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বিদেশের হস্তক্ষেপের পথ প্রশস্ত করে।

ঋণের ভার

সাধারণভাবে বলা চলে, সরকারী ঋণ দেশের অর্থনীতি ক্ষেত্রের ভারস্বরূপ। কারণ সরকারী ঋণ অতিরিক্ত করের পৃথক নাম মাত্র। দ্বিতীয়ত; সরকারী ঋণ দিয়ে ব্যয় মিটানো অধিকতর ব্যয়বহুল। কারণ এ ঋণের উপর সুদ দিতে হয়। তৃতীয়ত, বেসরকারী ঋণের বোঝা ভবিষ্যৎ করদাতাদের উপর এসে পড়ে। চতুর্থত, অতিরিক্ত সরকারী ঋণ সরকারের আর্থিক দুরবস্থার পরিচয়। ফলে ভবিষ্যতে ঋণ সংগ্রহ ব্যাপারে তা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। পঞ্চমত, সরকারী ঋণ আয় বণ্টনে বৈষম্য বৃদ্ধি করে। কারণ ধনীরাই সরকারকে ঋণ দেয় ও সুদ উপভোগ করে। সরকারী ঋণ কালোবাজারের টাকা পরিশুদ্ধ করার সুযোগ করে দেয়।

এমনও বলা হয় যে, দেশীয় ঋণ কোন ভার সৃষ্টি করে না। কারণ তা দেশের মধ্যেই সম্পদ হস্তান্তরকরণ মাত্র। ডাল্টন উভয় দৃষ্টিভঙ্গীর উত্তরে সরকারী ঋণকে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ভার এবং টাকার ভার ও প্রকৃত ভার রূপে ভাগ করেছেন। তার মতে দেশীয় ঋণ প্রত্যক্ষ টাকার ভার থেকে মুক্ত। কারণ সুদ দেয়ার জন্য সরকার কর ধার্য করে যে অর্থ সংগ্রহ করে তা সুদ দেয়ার জন্যই ব্যয় করে। বিদেশীয় ঋণের ক্ষেত্রে যেহেতু এ সুদ বাবদ প্রদত্ত অর্থ বিদেশে চলে যায় সেহেতু তা জাতির উপর প্রত্যক্ষ ভারস্বরূপ।

ধনীরা ঋণবাবদ সুদ পরিশোধ করার জন্য যে কর দেয় তার অনুপাত যদি তারা যে সরকারী সিকিউরিটি ক্রয় করেছে সে অনুপাতের থেকে কম হয়, অন্যদিকে দরিদ্র ও মধ্যবিত্তদের ক্ষেত্রে যদি করের পরিমাণ বেশি হয় তাহলে সরকারী ঋণকে প্রত্যক্ষ প্রকৃত ভার বলা যাবে। এর ফলে আয় বণ্টনে বৈষম্য বৃদ্ধি পাবে। ঋণ সেবার জন্য সরকার যদি অধিক পরিমাণ কর ধার্য করে তাহলে করদাতাদের কাজ ও সঞ্চয়ের প্রতি উৎসাহ হ্রাস পাবে। উৎপাদন ব্যাহত হবে। ঋণ সেবার চাপ বৃদ্ধি পেলে তা মিটাবার জন্য সরকারকে অনেক উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক প্রকল্পের উপর বিনিয়োগ হ্রাস করতে হবে। ফলে উন্নয়ন ও সামাজিক কল্যাণসাধন ব্যাহত হবে। বিদেশীয় ঋণের ক্ষেত্রে এ অপ্রত্যক্ষ ভারের উদ্ভবের কারণ ঋণ সেবার জন্য যে অতিরিক্ত কর আদায় করা হয় তার প্রতিক্রিয়ায় উৎপাদন ব্যাহত হয়।

বিদেশীয় ঋণ সেবার জন্য সরকারকে ব্যয় সঙ্কোচন নীতির আশ্রয় নিতে হয়। এর ফলেও জাতীয় উন্নয়ন ব্যাহত হয়।

সরকারী ঋণের পরিমাণ

1947 সনের ডিসেম্বরে ভারত-পাকিস্তান চুক্তিক্রমে অবিভক্ত ভারতের প্রায় সব সরকারী ঋণের দায়িত্বই ভারত সরকার গ্রহণ করে। পাকিস্তানের অংশের পরিমাণ মাত্র 300 কোটি টাকা। 1955 সন থেকে 50 সম কিস্তিতে পাকিস্তানের এ অর্থ ভারতকে দেয়ার কথা। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন কিস্তির টাকা তার কাছ থেকে পাওয়া যায়নি।

1950-51 সন থেকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সুরু হয়। বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেতে থাকে। সেসঙ্গে সরকারের ঋণের পরিমাণও বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ভারত সরকারের ঋণ (কোটি টাকা)

	1950-51	1960-61	1965-66	1977-78
	(1)	(2)	(3)	(4)
দেশীয় ঋণ	2022·30	3978·00	5416·64	19025·29
বিদেশী ঋণ	32·03	760·96	2590·62	8984·74
মোট	2054·33	4738·96	8007·26	28010·03

সূত্র : কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট।

দেখা যাচ্ছে, দেশীয় ও বিদেশীও উভয় ঋণের পরিমাণই বৃদ্ধি পেয়েছে। 1950-51 সনের 31 মার্চ দেশীয় ঋণের পরিমাণ ছিল 2022 কোটি টাকা। বিদেশীয় ঋণের পরিমাণ ছিল মাত্র 32 কোটি টাকা। 1978 সনের 31 মার্চ এদের পরিমাণ যথাক্রমে 19025 কোটি টাকা ও 8985 কোটি টাকা।

ভারত সরকারের জন ঋণের পরিমাণ 1983-84 সনের মার্চের শেষে 65356 কোটি টাকা। 1982-83 ও 1981-82 সনের তুলনায় 1983-84 সনে ঋণ বৃদ্ধির পরিমাণ যথাক্রমে 7·8 শতাংশ ও 26·3 শতাংশ বলে অনুমান করা হয়েছে। 1984 সনের মার্চের শেষে বিদেশীয় ঋণের পরিমাণ 14773 কোটি টাকা। 1983 সনের মার্চের শেষে এ বৃদ্ধির পরিমাণ 12.4 শতাংশ

এবং 1982 সনের মার্চের তুলনায় 11·5 শতাংশ। ভারত সরকারের অভ্যন্তরীণ ঋণের পরিমাণ 1984 সনের মার্চের শেষে 50045। পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বৃদ্ধির পরিমাণ 6·6 শতাংশ ও 1982 সনের মার্চের তুলনায় 31·7 শতাংশ।

ভারত সরকারের ঋণের বৈশিষ্ট্য

(i) ভারত সরকার সাধারণত উন্নয়নমূলক কাজের জন্ত ঋণ গ্রহণ করে থাকে। [টেবিল পৃঃ ৫৪৪]

(ii) দেশীয় ও বিদেশীয় উভয় ঋণের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিদেশীয় ঋণ বৃদ্ধির হার দেশীয় ঋণ বৃদ্ধির হার অপেক্ষা বেশি।

1950-51 সনে দেশীয় ঋণ ও বিদেশীয় ঋণের পরিমাণ যথাক্রমে 2022·30 কোটি টাকা ও 32·03 কোটি টাকা। 1983-84 (বাজেট) সনে এদের পরিমাণ যথাক্রমে 50048·68 কোটি টাকা ও 14790·46 কোটি টাকা।

(iii) স্থায়ী ঋণে চলতি ঋণের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। অস্থায়ী ঋণে ট্রেজারী বিলের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি।

1950-51 সনে মোট দেশীয় ঋণে স্থায়ী ঋণের পরিমাণ ছিল 71·5 শতাংশ; অস্থায়ী ঋণের পরিমাণ 28·5 শতাংশ। 1977-78 সনে এদের পরিমাণ যথাক্রমে 49·3 শতাংশ ও 50·7 শতাংশ।

(iv) সরকারী ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন সুদের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। 1950-51 সনে সুদের পরিমাণ ছিল 37 কোটি টাকা, 1981-82 সনে 3195 কোটি টাকা ও 1983-84 (বাজেট) সনে 4700 কোটি টাকা। [টেবিল পৃঃ ৫৪৪]

রাজ্য সরকারগুলির ঋণের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাদের ঋণের প্রধান সূত্র কেন্দ্রীয় সরকার। অন্য কথায়, কেন্দ্রীয় সরকারের উপর তাদের আর্থিক নির্ভরতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ভারত সরকারের মূলধন বিনিয়োগ (কোটি টাকা)

	1950-51	1960-61	1977-78	1982-83 (রিভাইজড)	1985-86 (বাজেট)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. সাধারণ সেবামূলক কাজ	496·74	956·10	4188·38	7235·07	19261·00
2. সামাজিক ও সর্বজনীন সেবামূলক কাজ	26·25	76·83	720·35	1399·52	2887·00
3. অর্থনৈতিক সেবা	965·02	2557·28	16204·71	30350·21	14863·00
মোট	1488·01	3590·21	21113·44	38984·80	37011·00

সূত্র : কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট।

ভারতের বৈদেশিক ঋণ ও ঋণ সেবা (মিলিয়ন US $)

	1974	1976	1978	1979	1980	1981	1982	1983
মোট ঋণ	11594·2	13396·1	15571·5	15911·1	17685·8	18113·3	19659·3	21429·2
ঋণ সেবা	1565·9	1733·3	1925·6	2016·2	2011·8	1980·7	1810·9	1616·5

সূত্র : ওয়ার্ল্ড ডেট টেবলস, 1984-85, ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক।

রাজ্য সরকারগুলির ঋণ (কোটি টাকা)

31 মার্চ	1971	1981	1982	1983	1984 (রিভাইজড)	1985 (বাজেট)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. অভ্যন্তরীণ ঋণ	1847	4452	5639	5221	5959	6922
2. কেন্দ্রীয় সরকার থেকে প্রাপ্ত ঋণ ও আগাম	6365	17071	19071	23550	26722	29609
3. প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড প্রভৃতি	537	2450	2912	3642	4503	5328
মোট	8749	23973	27622	32413	37184	41859

সূত্র: আর-বি-আই।

সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সুরু (1950-51) থেকে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির ব্যয়ের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। 1950-51 সনে উভয়ের যুক্ত ব্যয়ের পরিমাণ ছিল মাত্র 983 কোটি টাকা। 1982-83 সনে তা বৃদ্ধি পেয়ে 52057 কোটি টাকা হয়। 1984-85 সনের বাজেটে এর পরিমাণ ধরা হয়েছে 65708 কোটি টাকা।

1950-51 সনে কেন্দ্রীয় সরকারের রেভিন্যু একাউণ্টে ব্যয়ের পরিমাণ 385 কোটি টাকা, ক্যাপিটাল একাউণ্টে 125 কোটি টাকা; মোট 510 কোটি টাকা।

1950-51 সনে রাজ্য সরকারগুলির ক্ষেত্রে রেভিন্যু একাউণ্টে মোট ব্যয়ের পরিমাণ 374 কোটি টাকা, ক্যাপিটাল একাউণ্টে 99 কোটি টাকা; মোট 473 কোটি টাকা।

1981-82 সনে কেন্দ্রীয় সরকারের রেভিন্যু একাউণ্টে ব্যয়ের পরিমাণ 15300 কোটি টাকা, ক্যাপিটাল একাউণ্টে 10279 কোটি টাকা; মোট 25579 কোটি টাকা।

1981-82 সনে রাজ্য সরকারগুলির ক্ষেত্রে রেভিন্যু একাউণ্টে ব্যয়ের পরিমাণ 15537 কোটি টাকা, ক্যাপিটাল একাউণ্টে 6654 কোটি টাকা; মোট 22191 কোটি টাকা।

1950-51 সনের তুলনায় 1981-82 সনে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়ের পরিমাণ প্রায় 50 গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আরো লক্ষণীয় যে, কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় স্তরেই ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। 1950-51 সনে কেন্দ্রীয় সরকারের মোট ব্যয়ের পরিমাণ 510 কোটি টাকা। 1981-82 সনে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় 25579 কোটি টাকা বা 50 গুণ। এ সময়কালীন রাজ্য সরকারগুলির ব্যয় 473 কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 22191 কোটি টাকা, অর্থাৎ 21718 কোটি টাকা বৃদ্ধি পায় বা প্রায় 47 গুণ হয়।

1950-51 সনের তুলনায় 1981-82 সনে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির রেভিন্যু একাউণ্টে মোট ব্যয় বৃদ্ধির পরিমাণ 30078 কোটি টাকা। এ সময়কালীন তাদের ক্যাপিটলে একাউণ্টে ব্যয় বৃদ্ধির পরিমাণ 16709 কোটি টাকা। মূলধন খাতে ব্যয় বৃদ্ধি উন্নয়ন সূচক।

জাতীয় আয় বৃদ্ধির তুলনায় সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি উল্লেখ্য। 1951-52

সনে সরকারী ব্যয় বৃদ্ধির পরিমাণ 9·4 শতাংশ, 1960-61 সনে 21·9 শতাংশ, 1970-71 সনে 25·7 শতাংশ ও 1979-80 সনে 36·1 শতাংশ। কিন্তু এ সময়কালীন প্রকৃত জাতীয় গড় আয় বৃদ্ধির হার মাত্র 3·6 শতাংশ। এ অবস্থা দাম বৃদ্ধির পরিচয়।

কারণ ঃ সরকারী ব্যয় বৃদ্ধির কারণ মূলত—

(i) সরকারের অর্থনৈতিক কাজকর্মের প্রসার। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলি বর্তমানে বহু শিল্প ও বাণিজ্যের মালিক ও পরিচালক। এসব শিল্প-বাণিজ্যে তাদের প্রচুর পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ ও ঋণ দিতে হয়। ক্ষেত্রবিশেষে ভরতুকি দিতে হয় ও রুগ্ন শিল্পকে সুস্থ করে তোলার দায়িত্ব নিতে হয়। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক অস্থিরতা ও তেল, সার, যন্ত্রপাতি প্রভৃতির আমদানি মূল্য প্রচণ্ড বৃদ্ধি পাওয়াতে জাতীয় অর্থনীতিতে যে সঙ্কট দেখা দিয়েছে তার মোকাবিলা করার জন্যও তাদের ব্যয় বৃদ্ধি করতে হচ্ছে।

(ii) ভারত জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র। জনসেবার জন্য, বিশেষত দুর্বল শ্রেণীদের সার্বিক উন্নতি সাধন, ও সামগ্রিকভাবে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য সরকারকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্বল্প দামে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বণ্টন প্রভৃতি ব্যয়ভারের দায়িত্ব নিতে হচ্ছে।

(iii) পৃথিবীময় যুদ্ধের হাওয়া, বিশেষত ভারতের পশ্চিম ও পূর্ব দিক যে কোন মুহূর্তে বহিঃশত্রু দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকাতে দেশরক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পরিসংখ্যানে (পৃঃ ৫৪৮) দেখা যাচ্ছে, 1983-84 সনের বাজেটে রেভিন্যু একাউণ্টে 1974-75 সনের তুলনায় উন্নয়ন ব্যয় বৃদ্ধির পরিমাণ পাঁচ গুণেরও বেশি। এ সময়কালীন রেভিন্যু একাউণ্টে দেশরক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় তিন গুণ। ক্যাপিটাল একাউণ্টে উন্নয়ন ব্যয় বৃদ্ধির পরিমাণও প্রায় তিন গুণ।

রাজ্যগুলির ক্ষেত্রেও উন্নয়ন ব্যয় বৃদ্ধি ঘটেছে। 1976-77 সনে উন্নয়ন ব্যয়ের পরিমাণ মোট 5369·3 কোটি টাকা, 1979-80 সনে 8898·6 কোটি টাকা। এ সময়কালীন অ-উন্নয়ন ব্যয়ের পরিমাণ যথাক্রমে 2478·3 কোটি টাকা ও 3459·1 কোটি টাকা। ক্যাপিটাল একাউণ্টের অধিকাংশ অর্থই ঋণ পরিশোধের জন্য ব্যয়িত হয়। 1979-80 সনে মোট 5720·7 কোটি টাকার মধ্যে ঋণ পরিশোধ, ঋণ ও আগাম বাবদ দানের পরিমাণ 3016·5 কোটি টাকা।

কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় (কোটি টাকা)

	1974-75	1980-81	1982-83 (রিভাইজড)	1983-84 (বাজেট)
রেভিন্যু				
1. উন্নয়ন ব্যয় (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, গবেষণা প্রভৃতি)	1758·47	5614·39	8014·80	9066·06
2. দেশরক্ষা	1920·21	3540·38	4805·93	5363·66
3. অন্যান্য (প্রশাসন, পেনসন, গ্র্যাণ্টস প্রভৃতি)	2114·61	5388·84	6594·26	7989·15
মোট	5793·29	14543·61	19414·99	22418·87
ক্যাপিটাল				
1. উন্নয়ন ব্যয় (সামাজিক ও সর্বজনীন সেবা, অর্থনৈতিক সেবা এবং সাধারণ সেবা)	1418·79	3049·56	4139·00	4018·92
2. দেশরক্ষা	192·06	326·39	544·07	607·34
3. অন্যান্য	19·35	606·75	169·69	156·95
4. ঋণ ও আগাম (রাজ্য ও ইউনিয়ন টেরিটোরিজ)	2629·24	5650·55	9973·20	7633·95
মোট	4259·44	9633·25	14825·96	12417·16

সূত্র : কেন্দ্রীয় বাজেট 1983-84 ।

26 মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশন

মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশন

মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশন (এমএনসি)-এর কোন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই। কারো কারো মতে এমএনসি হচ্ছে এমন একটি উদ্যোগ যা বিদেশে সরাসরি বিনিয়োগ করে। অর্থাৎ, যে উদ্যোগ একাধিক দেশে আয় সৃষ্টিকারী সম্পদের মালিকানায় বা নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। অন্যকথায়, উদ্যোগটি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উৎপাদনে লিপ্ত। আবার কারো কারো মতে এমএনসি হচ্ছে এমন একটি উদ্যোগ যা একাধিক দেশের বিভিন্ন শিল্প সংস্থার মালিক বা নিয়ন্ত্রক। আবার এরূপও বলা হয় যে, এমএনসি হচ্ছে এমন একটি ব্যবসায় কর্পোরেশন যার মালিকানা, পরিচালনা, উৎপাদন ও বাজারকরণ বহু দেশব্যাপী।

বৈশিষ্ট্য

এমএনসির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখযোগ্য।

(i) বৃহৎ আয়তন। এমএনসির আয়তন বৃহৎ। 1971 সনে প্রথম 90 সম্পদ সৃষ্টিকারী সংস্থার মধ্যে 29 এমএনসি, বাকীগুলি জাতীয় সংস্থা।

(ii) আন্তর্জাতিক কাজকর্ম। এমএনসির কাজকর্ম বহু দেশব্যাপী। বিদেশে এর শাখা বা সহযোগী সংস্থা রয়েছে। শাখাগুলি স্থানীয় মূলধন বা পরিচালনার সাহায্য নেয় না। এমএনসির সহযোগী সংস্থাগুলি যদিও নিমন্ত্রক দেশে সংগঠিত, কিন্তু তাদের অধিকাংশ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা এমএনসির হাতেই ন্যস্ত। অর্থাৎ, এমএনসি এদের মালিকানা ও পরিচালনা উভয়েরই অধিকারী। এমএনসির কর্মপরিধির ব্যাপকতার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত আমেরিকার পেপসি কোলা কোম্পানি। কোম্পানিটি 114 দেশে কর্মরত।

(iii) সীমিত সংখ্যা। এমএনসিগুলির সংখ্যা কম, কিন্তু তাদের বাজার প্রায় পৃথিবীব্যাপী। এর ফলে তারা প্রচুর মুনাফা করতে সমর্থ হয়। তাদের প্রভুত্ব ও দুর্নীতির কারণের মূলেও তাদের এ সীমিত সংখ্যা।

(iv) আমেরিকার আধিপত্য। 1971 সনে প্রথম শ্রেণীর 25 এমএনসির মধ্যে 18 আমেরিকাতে প্রতিষ্ঠিত। সে বছর মোট সরাসরি বৈদেশিক বেসরকারী বিনিয়োগে যুক্তরাষ্ট্রের অংশ ছিল 52 শতাংশ।

(v) সম্পদ স্থানান্তরিতকরণ। এমএনসি সাধারণত একসঙ্গে বহু সম্পদ অপর দেশে স্থানান্তরিত করে থাকে। যথা, প্রযুক্তিবিদ্যা, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, তৈরী দ্রব্য, পরিচালনা বিদ্যা প্রভৃতি।

(vi) স্বতঃস্ফূর্ত বিবর্তন। এমএনসিগুলি সাধারণত বিবর্তনের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে বিদেশে সহযোগী সংস্থা স্থাপনের মূলে রয়েছে নিমন্ত্রক দেশের বিস্তৃত বাজার, সুলভ শ্রমিক, কাঁচামাল প্রভৃতি।

এমএনসিগুলির বিনিয়োগের ফলে যে সব উন্নতিশীল দেশগুলি তাদের বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করতে সমর্থ হয়েছে তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্রেজিল, মেক্সিকো, হংকং, ফিলিপাইনস, সিঙ্গাপুর ও দক্ষিণ কোরিয়া। সেসব উন্নতিশীল দেশগুলিই এমএনসিগুলিকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে যেসব দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও অনুকূল অর্থনৈতিক পরিবেশ রয়েছে, বিশেষত, বাজারের সম্ভাবনা, সস্তা শ্রমিক, তেল ও প্রাকৃতিক সম্পদের সুযোগ, এবং অনুকূল কর নীতি। উন্নতিশীল দেশগুলিতে এমএনসিগুলির বিনিয়োগ সাধারণত ম্যানুফ্যাকচারিং ও সেবা সেক্টরে সীমাবদ্ধ। প্রাকৃতিক সম্পদ প্রকল্পে তাদের বিনিয়োগ কম।

বিনিয়োগের উদ্দেশ্য

এমএনসিগুলির সরাসরি বিদেশে বিনিয়োগ করার পেছনে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য লক্ষণীয়।

(i) প্রতিযোগিতার ও সংরক্ষণমুক্ত দেশগুলির অর্থনৈতিক সম্ভাবনার সুযোগ গ্রহণ করা।

(ii) বিদেশে সস্তা শ্রমিক পাবার সম্ভাবনা।

(iii) বহুমুখী বিনিয়োগের সম্ভাবনার ফলে আয় স্থিতিমূলক হওয়ার নিশ্চয়তা।

(iv) বিদেশে উদ্যোগ সৃষ্টি করে প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি সাধন।

(v) নিজেদের দেশে নানারকম নিয়ন্ত্রণ (যথা এন্টিট্রাস্ট এ্যাক্ট) থেকে মুক্ত হওয়া।

সমর্থনে যুক্তি

এমএনসিগুলির উপস্থিতির ফলে নিমন্ত্রক দেশগুলি নিম্নলিখিতভাবে লাভবান হয়।

(i) এমএনসিগুলি নিমন্ত্রক দেশগুলির বিনিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। ফলে তাদের আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়।

(ii) অন্যান্য দেশ, বিশেষত উন্নতিশীল দেশগুলি, তাদের সহায়তায় উন্নত প্রযুক্তবিদ্যার অধিকারী হচ্ছে।

(iii) এমএনসিগুলির কাজকর্মের ফলে নিমন্ত্রক দেশগুলিতে বিরাট পরিচালনাগত পরিবর্তন ঘটছে।

(iv) এমএনসিগুলি নিমন্ত্রক দেশগুলির রপ্তানি বৃদ্ধি ও আমদানি হ্রাস করতে সাহায্য করেছে।

(v) বিভিন্ন দেশে তাদের উৎপাদন সংস্থা থাকার ফলে বিভিন্ন দেশের উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যে সমতা সৃষ্টি সম্ভবপর হয়ে উঠছে।

(vi) অনুন্নত দেশগুলিতে বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে সংযোজনার অভাব রয়েছে। এমএনসিগুলি নিমন্ত্রক দেশগুলির এ অভাব দূর করতে সাহায্য করছে। তারা সংযোগ সাধনমূলক শিল্প গড়ে তোলার জন্যও সাহায্য করছে।

(vii) প্রচুর সম্পদ ও সম্ভাবনার অধিকারী হওয়ার ফলে এমএনসিগুলি গবেষণা ক্ষেত্রে যুগান্তর ঘটিয়েছে।

(viii) তারা নিমন্ত্রক দেশগুলির একচেটিয়া সংস্থার মূলে আঘাত হানতে সমর্থ হয়েছে এবং শিল্প ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করেছে।

(ix) এমএনসিগুলির কাজকর্মের ফলে সরকারের পক্ষে আয়কর, কোম্পানি কর, পণ্যদ্রব্য কর প্রভৃতির মারফত আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। এদের মুনাফার উপর কর ধার্য করেও আয় বৃদ্ধির পথ সুগম হয়েছে।

(x) এমএনসিগুলি বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যের বাজারের মধ্যে সংযোজন সাধনে সমর্থ হচ্ছে। এর ফলে একই দ্রব্য বিভিন্ন দেশে যুক্তিযুক্ত দামে বিক্রয় করা সম্ভব হয়ে উঠছে। বিভিন্ন দেশের শিল্পগুলি একই প্রথায় গড়ে উঠছে। প্রাকৃতিক দূরত্ব লোপ পাচ্ছে। অজ্ঞতাও দূর হচ্ছে। এমএনসি

গুলির পক্ষে সংরক্ষিত দেশে শিল্প সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে সে দেশের সংরক্ষণের বাধা এড়ানো সম্ভবপর হয়েছে।

বিরুদ্ধে যুক্তি

(i) এমএনসির প্রযুক্তিবিদ্যা পৃথিবীব্যাপী সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের জন্য উদ্ভাবিত ; দরিদ্র দেশগুলির উন্নয়ন প্রয়োজনে এর প্রাসঙ্গিকতা কম।

(ii) এমএনসিগুলি প্রচুর সম্পদ ও ক্ষমতার অধিকারী। তাদের পক্ষে নিমন্ত্রক দেশগুলির অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ এড়িয়ে যাওয়া বা উপেক্ষা করা অসম্ভব কিছুই নয়। তাদের কাজকর্ম নিমন্ত্রক দেশগুলির স্বার্থবিরোধী হওয়ার আশঙ্কা রাখে। নিমন্ত্রক দেশগুলির রাজনীতিতে তাদের পরোক্ষ হস্তক্ষেপের প্রমাণ রয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।

(iii) এমএনসিগুলির কাজকর্মের ফলে নিমন্ত্রক দেশগুলির ব্যালেন্স অব পেমেন্টস-এ প্রতিকূল অবস্থা দেখা দিতে পারে। মুনাফা স্থানান্তরিত করে তারা নিমন্ত্রক দেশের বৈদেশিক বিনিময় ক্ষেত্রে সঙ্কট সৃষ্টি করতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ভারত কোকাকোলা 6·6 লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে 1978 সন পর্যন্ত মোট প্রায় 6 কোটি টাকা বিদেশে স্থানান্তরিত করেছে।

(iv) এমএনসিগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন। তাদের শিল্প-বাণিজ্য শহরাঞ্চলে অবস্থিত এবং তারা যে ধনসম্পদ সৃষ্টি করে তা প্রধানত শহরাঞ্চলের আয় ও ভোগ বৃদ্ধির জন্য। এর ফলে অনুন্নত নিমন্ত্রক দেশগুলিতে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান ও আঞ্চলিক বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(v) এমএনসিগুলি উন্নতিশীল দেশগুলিতে উন্নত দেশগুলির ভোগলিপ্সা সৃষ্টি করছে। ভারতের মত যে দেশের 42 শতাংশেরও বেশী মানুষ দারিদ্র্য সীমারেখার নিচে বা প্রায় অনাহারে সেখানে তারা দুষ্প্রাপ্য জাতীয় সম্পদ ব্যবহার করে বিলাস দ্রব্য তৈরি করছে। বলা বাহুল্য, উন্নতিশীল দেশগুলিতে ভোগলিপ্সা বৃদ্ধি পাবার ফলে তাদের জাতীয় সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ব্যাহত হচ্ছে।

(vi) এমএনসিগুলি প্রাচ্য দেশগুলিতে পাশ্চাত্য অপসংস্কৃতি অনুপ্রবেশের অন্যতম সূত্র।

(vii) এমএনসিগুলির উপস্থিতি নিমন্ত্রক দেশগুলির দীর্ঘকালীন শিল্প উন্নয়নের পথে বিঘ্নস্বরূপ। যেসব শিল্প ক্ষেত্রে এদের অধিকার রয়েছে সেসব ক্ষেত্রে জাতীয় উদ্যোগের পক্ষে প্রতিষ্ঠালাভ করা প্রায় অসম্ভব বললেই চলে।

(viii) এমএনসিগুলির বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লেনদেনে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে যার গুরুত্ব উপেক্ষণীয় নয়। এরূপ দুর্নীতি যে কোন নিমন্ত্রক দেশের পক্ষেই রাজনৈতিক স্বার্থের দিক থেকেও বিপজ্জনক।

(ix) এমএনসিগুলি উন্নতিশীল দেশগুলির সুলভ শ্রমের সুযোগ নেয়ার জন্য সে দেশগুলিতে শিল্প স্থাপন করে থাকে। সুতরাং তারা নিজের দেশ ও নিমন্ত্রক দেশের শ্রমিকদের মধ্যে ব্যবধান রক্ষা করে চলে। তারা নিমন্ত্রক দেশের শ্রমিকদের কল্যাণ সাধনে উৎসাহী নয়। তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যাপারেও এদের আগ্রহের অভাব। এর ফলে নিমন্ত্রক দেশগুলিতে উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা তেমন প্রসার লাভ করছে না।

সাম্প্রতিক অবস্থা

এম-এন-সি সম্পর্কে সাধারণের মনোভাব পরিবর্তিত হচ্ছে। এমনকি কম্যুনিস্ট দেশগুলিও (কিউবা, চীন) তাদের স্বাগত জানাচ্ছে। কারণ—

(i) এমএনসিগুলির সঙ্গে নিমন্ত্রক দেশগুলির শর্ত নিয়ে বোঝাপড়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অপ্রয়োজনীয় প্রযুক্তিবিদ্যা আমদানি করার উপর অধিকতর নিয়ন্ত্রণ বিধি আরোপ করা সম্ভব হচ্ছে। উৎপাদনের পরিবর্তে গবেষণা ও উন্নয়ন এবং বাজারকরণের উপর অধিকতর গুরুত্ব দিতেও নিমন্ত্রক দেশগুলি সমর্থ হয়েছে।

(ii) এমএনসি ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য হ্রাস পেয়েছে। অন্যান্য উন্নত দেশও এমএনসির অধিকারী হয়েছে। উন্নতিশীল দেশগুলিও এ ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। ওপেক (ওজিইসি—অর্গানাইজেসন অব। পেট্রোলিয়াম এক্সপোর্ট কানট্রিজ) সহ ব্রেজিল, আর্জেণ্টাইনা, কলোম্বিয়া, হংকং, ভারত, পেরু, ফিলিপাইনস, সিঙ্গাপুর তাওয়াই ও রিপাবলিক অব কোরিয়া বর্তমানে মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশনের অধিকারী।

(iii) নিমন্ত্রক দেশগুলি বিভিন্ন বিদেশী কোম্পানির সঙ্গে শিল্প-বাণিজ্যে যুক্ত হয়ে পড়াতে এমএনসিগুলির মধ্যেও প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অধুনা নিমন্ত্রক দেশগুলি এমএনসির পরিবর্তে বিদেশীয় ক্ষুদ্র ও নমনীয় কোম্পানিগুলিকে প্রাধান্য দিচ্ছে। এর ফলে বৃহৎ এমএনসিগুলির একচেটিয়া প্রভাব হ্রাস পাচ্ছে।

ব্র্যাণ্ডট কমিশন (Brandt Commission)

ব্র্যাণ্ডট কমিশন আন্তর্জাতিক বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ করেছে।

(i) এমন একটি কাঠামো রচনা করতে হবে যাতে উন্নতিশীল দেশগুলি এবং এমএনসিগুলি উভয়ই চুক্তি-শর্ত অনুযায়ী সরাসরি বিনিয়োগ দ্বারা উপকৃত হতে পারে।

(ii) এমএনসি যে দেশে অবস্থিত সেদেশের সরকার বিদেশে বিনিয়োগ বা প্রযুক্তিবিদ্যা স্থানান্তরিত করার উপর কোন। বাধানিষেধ আরোপ করতে পারবে না। অনুরূপভাবে অন্য কোন নিয়ন্ত্রণমূলক পন্থাও যেমন, রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ বা বাজার বণ্টন ব্যবস্থা, অবলম্বন করা চলবে না।

(iii) নিমন্ত্রক ও নিমন্ত্রিত উভয় দেশই এমএনসির নৈতিক ব্যবহার, সংবাদ প্রকাশ, একচেটিয়া ব্যবসায়ের অনুশীলন, কার্টেল ও শ্রমের মান সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন করবে। এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক কোড ও নির্দেশ থাকা প্রয়োজন।

(vi) বৈদেশিক বিনিয়োগ সম্পর্কিত রাজস্ব ও তৎসংক্রান্ত নীতির ব্যাপারে উন্নতিশীল দেশগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান প্রয়োজন।

(v) সরাসরি বিনিয়োগ ও এমএনসিগুলির কাজকর্ম সম্পর্কে গৃহীত পন্থাগুলির ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা ও পরামর্শ করার জন্য আন্তর্জাতিক পদ্ধতি থাকা বাঞ্ছনীয়।

নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

উন্নতিশীল দেশগুলি মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশনগুলির কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য যে সব পদ্ধতি গ্রহণ করে থাকে তা প্রধানত—

(i) নির্দিষ্ট কাল ও সময়ের জন্য এমএনসিগুলির সাহায্য নেয়া। উদ্দেশ্য, স্থানীয় উদ্যোগগুলিকে এদের সহযোগিতায় মূলধন, প্রযুক্তিবিদ্যা ও পরিচালনায় দ্রুত স্বয়ম্ভর করে তোলা।

(ii) যেসব দেশীয় কোম্পানিগুলিকে এমএনসির প্রতিযোগিতায় সম্মুখীন হতে হচ্ছে তাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা।

(ii) যেসব নিমন্ত্রক দেশে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এমএনসিকে কাজ করার অনুমতি দেয়া হয় সেসব নিমন্ত্রক দেশে সে সময় অতিবাহিত হওয়ার

পর এমএনসিকে তার শেয়ারের একটি অংশ সে দেশে বিক্রয় করে দেয়ার জন্য বাধ্য করা হয়।

(iv) এমএনসিগুলির উপর উচ্চ হারে নানাবিধ কর ধার্য করা হয়।

(v) কোন কোন ক্ষেত্রে এমএনসির সঙ্গে রপ্তানি বিষয়ে তার বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে চুক্তি করে নেয়া হয়।

(vi) এমএনসিগুলিকে অন্যান্য বাধ্যবাধকতারও সম্মুখীন হতে হয়। যেমন, নিমন্ত্রক দেশে গবেষণার কাজ চালানো, পরিচালনায় স্থানীয় ব্যক্তিদের অংশ গ্রহণের অধিকার, তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার দায়িত্ব নেয়া এবং স্থানীয় লোকদের জন্য কর্মসংস্থান।

(vii) নিমন্ত্রক দেশের শিল্পগুলি যাতে এমএনসির সঙ্গে সুস্থ প্রতিযোগিতায় আসতে পারে সেজন্য এমএনসির একচেটিয়া ব্যবসায়ের কৌশল নিয়ন্ত্রণ করা।

তৃতীয় পৃথিবী ও মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশনস

ইনস্টিটিউট অব রিসার্চ এণ্ড ইনফরমেশন (জেনেভা)-এর এক সমীক্ষায় প্রকাশ যে, যেসব দেশ সম্প্রতি শিল্পে উন্নত হয়ে উঠেছে সেসব দেশেও (এনআইসি) মাল্টিন্যাশানাল কর্পোরেশন (এমএনসি) গড়ে উঠেছে। ভারত, হংকং, ব্রেজিল ও আর্জেন্টাইনা তাদের সমীক্ষার ক্ষেত্রে ছিল। দেখা যায়, বিদেশে ভারতের বিনিয়োগের পরিমাণ যুক্তরাষ্ট্রের ডলারের মূল্যে প্রায় 100 বিলিয়ন। এর মধ্যে ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ 85 শতাংশ। এনআইসিগুলির মধ্যে বিদেশে শিল্প ক্ষেত্রে বিনিয়োগে ভারতের স্থান দ্বিতীয়। প্রথম হংকং। তবে বিনিয়োগের ব্যাপারে ভারতের প্রবণতা বেশি। ভারতের শিল্প ও রপ্তানি বৃদ্ধি সন্তোষজনক নয়; উৎপাদন ব্যয়ও সাধারণত বেশি, প্রযুক্তিবিদ্যাও উন্নত নয়; তা সত্ত্বেও ভারতীয় উদ্যোগ বিদেশে সরাসরি বিনিয়োগ ক্ষেত্রে সাফল্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে সমর্থ হচ্ছে। তাছাড়া ভারত উন্নয়নের জন্য বৈদেশিক এমএনসিগুলির উপর নির্ভরশীল নয়। বস্তুত ভারতে দেশীয় প্রযুক্তিবিদ্যার প্রাধান্য দেখা যায়। দেশে উৎপাদন ব্যয় বেশি, ভিত-কাঠামোর (বিদ্যুৎ, শ্রমিক সমস্যা, সরকারী নিয়ন্ত্রণ নীতিতে স্থিতিশীলতা) অভাব প্রভৃতি কারণে

ভারতের বৃহৎ শিল্প সংস্থাগুলি বিদেশে বিনিয়োগের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে উঠেছে।

ভারত ও আর্জেণ্টাইনার বিনিয়োগ ক্ষেত্র প্রধানত বস্ত্রশিল্প, খাদ্য, প্রোসেসিং ও সরল ধাতব দ্রব্য উৎপাদন। সম্প্রতি কাগজ, রাসায়নিক দ্রব্য, সাংযোগিক তন্তু, জটিল ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদি উৎপাদন ক্ষেত্রেও তারা বিনিয়োগ করছে।

প্রযুক্তিবিদ্যার দিক থেকে হংকং-এর অগ্রসরতা উল্লেখ্য। হংকং-এর বিনিয়োগ প্রধানত শ্রম-নিবিড়, ক্ষুদ্রায়তন, অপেক্ষাকৃত সহজ ম্যানুফ্যাকচারিং ও প্রোসেসিং ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। ভারতের বিনিয়োগ প্রধানত প্রচলিত মূলধন ও সাধারণ ভোগ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে। এসব দ্রব্য উৎপাদনের জন্য আধুনিক ও প্রাচীন প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্য নেয়া হয়।

পরিশেষে বলা হয়েছে, তৃতীয় পৃথিবীর এমএনসিগুলি উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যায় উন্নত হয়ে উঠছে, কিন্তু তারা উন্নত বাজারকরণ পদ্ধতিতে পিছিয়ে আছে। একথা বলা প্রয়োজন যে, উন্নত দেশের এমএনসিগুলি যে উন্নত ধরনের প্রযুক্তিবিদ্যার অধিকারী তা বর্তমানে তৃতীয় পৃথিবীর এমএনসিগুলির সামর্থ্যের বাইরে।

আবার এও দেখা যাচ্ছে, কোন কোন ক্ষেত্রে তৃতীয় পৃথিবীর ও উন্নত দেশের এমএনসিগুলির উভয়েরই একই কর্মক্ষেত্র। এর ফলে এক নতুন গতির সঞ্চার হয়েছে—উভয়ের স্বার্থে যুক্ত সংস্থা গঠন। এ যুক্ত সংস্থার মাধ্যমে তৃতীয় পৃথিবীর এমএনসিগুলি নতুন বাজারের সুযোগ গ্রহণ করতে উৎসাহী। উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা যতই স্থানীয় প্রযুক্তিবিদ্যার সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করবে যুক্ত সংস্থাগুলি ততই প্রসারের পথে এগিয়ে যাবে বলে আশা করা হয়েছে।

উপসংহার

এমএনসি বিশ্ব অর্থনীতি ও রাজনীতি ক্ষেত্রে একটি আবশ্যিক অশুভ ঘটনা বলা যেতে পারে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের একচেটিয়া বিস্তার ও বিশ্বের সম্পদের উপর প্রায় একচেটিয়া অধিকার যেমন তাদের বিশ্ব পুঁজির রূপ দিয়েছে তেমনি তারা অর্থনীতির সর্বক্ষেত্রে, বিশেষত প্রযুক্তিবিদ্যা ও বাজারকরণ, বিপ্লব সৃষ্টি করে চলেছে। দরিদ্র দেশগুলিও তাদের সাহায্য

ছাড়া দ্রুত উন্নয়নের দ্বিতীয় পথ খুঁজে পাচ্ছে না। উন্নত দেশগুলিও কোন না কোন ভাবে এমএনসিগুলির জোটবদ্ধ সাম্রাজ্যের আশ্রিত হয়ে পড়েছে। এমনকি বর্তমানে কম্যুনিস্ট দেশগুলি যারা একচেটিয়া মূলধনের বিরুদ্ধে সরব, নিজ নিজ দেশে এমএনসিগুলিকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

আটটি দেশে (যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স, জাপান, সুইডেন, হল্যাণ্ড ও সুইজারল্যাণ্ড) পৃথিবীর 95 শতাংশ এমএনসিগুলি অবস্থিত। সমষ্টিগতভাবে তারা এমএনসির ব্যবসায় ও মুনাফার কমপক্ষে 75 শতাংশের অধিকারী। এদের ধ্বংস বা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা উন্নতিশীল দেশগুলির সাধ্য-সামর্থ্যের বাইরে। একমাত্র যে দেশগুলিতে তাদের উদ্ভব হয়েছে তারাই তাদের ধ্বংস বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কিন্তু তা বর্তমানে অলীক কল্পনা মাত্র।

পাশাপাশি উন্নতিশীল দেশগুলিতে এমএনসি গঠিত হবার ফলে বৃহৎ এমএনসিগুলির মধ্যে পরিবর্তন স্থচিত হচ্ছে। এদের একটি ধারা উভয়ের স্বার্থে যুক্ত সংস্থা গঠনের প্রতি উৎসাহী। এমএনসিগুলি যুক্ত সংস্থা কাঠামোর দিকে এগিয়ে যাবে, না তারা নিজ নিজ দেশের সীমার মধ্যে আবার স্থান করে নেবে তা বলা যায় না। তার ফলে বিশ্ব অর্থনীতি লাভবান হবে, না ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাও বর্তমানে বলার চেষ্টা বৃথা।

ভারতে মাণ্টিন্যাশনাল কর্পোরেশন

ভারত মাণ্টিন্যাশনাল কর্পোরেশনের প্রভাবমুক্ত নয়। আমাদের দেশে চতুর্থ পরিকল্পনার শেষাশেষি বিভিন্ন দেশের এমএনসির শাখার সংখ্যা ছিল 540। ক্রমে এ সংখ্যা হ্রাস পায়। পঞ্চম পরিকল্পনার শেষাশেষি এদের সংখ্যা দাঁড়ায় 358। চতুর্থ থেকে পঞ্চম পরিকল্পনাকালীন এমএনসি-গুলির ভারতীয় সহযোগীর সংখ্যা 188 থেকে হ্রাস পেয়ে 125 হয়। এদের মধ্যে যুক্তরাজ্য-ভিত্তিক সংস্থাগুলির সংখ্যা সর্বাধিক। যুক্তরাজ্যের পরে যুক্তরাষ্ট্রের প্রাধান্য। ভারতীয় সহযোগীগুলির কর্মক্ষেত্র প্রধানত প্রোসেসিং, ম্যানুফ্যাকচারিং, নির্মাণ, জনসেবা, ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহণ ও সংযোগ। অতিসমৃদ্ধ হোটেল, সামুদ্রিক দ্রব্যাদি, সৌন্দর্য বৃদ্ধিকর দ্রব্যাদি প্রভৃতি ক্ষেত্রেও এদের কাজকর্ম বিস্তার লাভ করেছে।

নিম্নে এমএনসিগুলির গতিপ্রকৃতির একটি তালিকা দেয়া হল।

মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশন

সংগঠিত	শাখার সংখ্যা চতুর্থ পরিকল্পনা	পঞ্চম পরিকল্পনা	সম্পদ (কোটি টাকা)
1. যুক্তরাজ্য	319	189	1659
2. যুক্তরাষ্ট্র	88	64	535
3. জাপান	21	17	64
4. ফ্রান্স	8	7	51
5. নেদারল্যাণ্ডস	6	5	74
6. যুগোস্লাভিয়া	3	3	5
7. অন্যান্য	195	73	13
মোট	540	358	2401

	ভারতীয় সহযোগীগুলির সংখ্যা চতুর্থ পরিকল্পনা	পঞ্চম পরিকল্পনা	সম্পদ (কোটি টাকা)
1. যুক্তরাজ্য	131	86	1050
2. যুক্তরাষ্ট্র	24	19	228
3. সুইজারল্যাণ্ড	11	6	60
4. সুইডেন	8	3	44
5. পশ্চিম জার্মানী	5	4	118
6. কানাডা	2	2	104
7. নেদারল্যাণ্ডস	1	1	60
8. অন্যান্য	6	4	43
মোট	188	125	1707

উপসংহার

বর্তমানে কোন উন্নতিশীল দেশের পক্ষেই এমএনসিগুলিকে উপেক্ষা করে উন্নয়নের পথে দ্রুত অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। এদের স্বীকার করে নিয়ে, এদের সাহায্যে ও সহযোগিতায় দেশকে দ্রুত সমৃদ্ধ করে তোলার মূলে যে সমস্যা তা হচ্ছে তাদের আগ্রাসী মুনাফা ও প্রভুত্বকে নিয়ন্ত্রণ করার সমস্যা। এ সমস্যার সমাধান শক্ত হলেও, অসম্ভব নয়। তাদের দুর্নীতিমূলক ও অসামাজিক কাজকর্মের বিরুদ্ধে পৃথিবীব্যাপী যে জনমত গড়ে উঠেছে তাতে তারা যথেষ্ট সর্তক হয়ে উঠেছে। তাদের মধ্যেও প্রতিযোগিতা তীব্র হয়ে উঠেছে। ভারতের মত উন্নতিশীল দেশগুলিও এ প্রতিযোগিতায় অংশ-গ্রহণ করে তাদের গতিপথের পরিবর্তনের সূচনা করছে। কোন দেশই বর্তমানে আর তাদের শর্তহীন নিয়ন্ত্রণবিহীন স্বাগত জানাচ্ছে না। বস্তুত সমস্যা সেখানে নয়, সমস্যা দেশের স্বার্থে এদের ব্যবহার করার কৌশল উদ্ভাবনে।

27 কালো টাকা ও কালো বাজার

কালো বাজার

কালো বাজার বলতে সে বাজারকে বুঝায় যে বাজারে কালো টাকায় জিনিসপত্র কেনা-বেচা হয়। কালো টাকা মানে 'কালো' কিছু নয়। যে টাকা কর ফাঁকি দিয়ে বা কর এড়িয়ে করদাতারা বা কর দেয়ার যোগ্যতার অধিকারীরা পকেটস্থ করে তাই কালো টাকা।

প্রসার

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে কালো টাকার প্রসার স্থুরু হয়। তৎকালীন ভারতের ব্রিটিশ শাসকগণ ভারতবাসীর অনিচ্ছা সত্বেও ভারতকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম শরিক করে নেয়। যুদ্ধকালীন সেনাবাহিনীদের প্রয়োজন মেটানোই সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ফলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়ে অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করা হয়। বাজারে টাকার সরবরাহ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তার পাশাপাশি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের সরবরাহ বৃদ্ধি পায় না। কারণ এ অতিরিক্ত টাকায় রুটি তৈরি হয়নি, হয়েছে বন্দুক। তাছাড়া সেনাবাহিনীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অসামরিক বাজার থেকে সাধারণের আবশ্যিক জিনিসপত্র সেনাশিবিরে সরবরাহ হতে থাকে। ফলে আবশ্যিক জিনিসপত্র দুষ্প্রাপ্য হয়ে ওঠে। এ অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য সরকার রেশন ও নিয়ন্ত্রিত দামের আশ্রয় নেয়। ভোগ্যদ্রব্যের অভাবের পুর্ণ স্থযোগ নেয় একশ্রেণীর শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা। তারা খোলা বাজারে মাল না পাঠিয়ে বা নিয়ন্ত্রিত দামে নির্দিষ্ট পরিমাণ মাল সরবরাহ না করে তা রাতের অন্ধকারে, পরে অবশ্য প্রকাশ্যেই, বেচাকেনা করতে থাকে। একশ্রেণীর সরকারী ও আধা-সরকারী কর্মচারী তাদের এ অসামাজিক কাজকর্মের দোসর হয়। এমনিভাবে গড়ে ওঠে কালো বাজার। কালো বা অবৈধ বাজারে কেনাবেচা করে বা ঘুষ নিয়ে যে টাকা অর্জিত হয় তা স্বভাবতই ব্যক্তি বা কোম্পানির আয়-খাতে দেখানো হয় না। ফলে তাতে কর দিতে হয় না। উপরন্তু কালো বাজারে উপার্জিত সব টাকাই আবার কালো বাজারে

বিনিয়োগ করার জন্য রেখে দিতে হয়। এমনিভাবে কালো টাকা সমাজের একাংশের হাতে স্তুপীকৃত হতে থাকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যে কালো বাজার জন্ম নিয়েছে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে তা দ্রুত শ্রীবৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যেতে যাকে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার একটি বৈশিষ্ট্য মুদ্রাস্ফীতি ও নিয়ন্ত্রণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন অবস্থার কিছুটা পুনরাবৃত্তি বলা যেতে পারে।

কালো টাকার উদ্ভবের চারটি বিশেষ উৎস: (i) অবৈধ কাজকর্ম। যথা, চুরি, জুয়া, চোরা কারবার ও ঘুষ। (ii) কর ফাঁকি দেয়া। (iii) কনট্রোল বা নিয়ন্ত্রণ। (iv) অসাধু রাজনীতিবিদ ও শ্রমিক নেতা।

(i) অবৈধ কাজকর্ম: অবৈধ কাজকর্ম যথা, ঘুষ। যে ঘুষ দেয় সে সাধারণত কোন না কোন খাতে তা ব্যয়রূপে দেখিয়ে আয়ের অঙ্ক কমিয়ে কর থেকে ছাড় পেতে পারে। কিন্তু যে ঘুষ নেয় অবৈধ বলে এ আয় তার পক্ষে আয়খাতে দেখাবার প্রশ্ন ওঠে না। কর ফাঁকি দিয়ে ঘুষের সব টাকাটাই সে পকেটস্থ করে। কালে টাকা করার একটি বড় পথ চোরা কারবার। বিদেশ থেকে বহির্বাণিজ্য শুল্ক এড়িয়ে কোন দ্রব্য দেশে নিয়ে আসা চোরা কারবারের সংজ্ঞায় পড়ে। তেমনি বিদেশে যে বৈদেশিক বিনিময় অর্জন করা হয় তা যদি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া বা তার অনুমোদিত কোন এজেন্টের মারফত ছাড়া দেশে স্থানান্তরিত করা হয় তা হলেও তা অবৈধ বলে গণ্য হবে।

যেসব দ্রব্য এরূপ চোরাপথে দেশে নিয়ে আসা হয় তা সাধারণত বিলাস দ্রব্য এবং কলকারখানায় প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল। এর পরিবর্তে দেশ থেকে যেসব দ্রব্য বেরিয়ে যায় তা সাধারণত খাদ্যদ্রব্য, রূপা, প্রাচীন মূল্যবান বস্তু প্রভৃতি। এমনকি অসহায় নারীরাও এ রপ্তানির তালিকাভুক্ত।

(ii) কর ফাঁকি দেয়া: অতি উচ্চ হারে কর ধার্য, স্বনিযুক্ত ব্যক্তিদের কর না দেয়ার সুযোগ, কর দেয়া পদ্ধতির জটিলতা প্রভৃতি কারণে অনেকে প্রত্যক্ষ কর ফাঁকি দেয়। পরোক্ষ কর যথা, কেন্দ্রীয় আবকারী শুল্ক, বিক্রয় কর ও চুঙ্গী কর, কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলির আয়ের মস্ত সূত্র। আবার এসব সূত্রেই কর ফাঁকি দেয়ার দুর্নীতি সর্বাধিক বললেই চলে।

(iii) কনট্রোল বা নিয়ন্ত্রণ : অত্যাবশ্যকীয় জিনিসপত্রের অভাব ঘটলে সরকার এদের দাম নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ফলে দ্বৈত দামের সৃষ্টি হয়—নিয়ন্ত্রিত দাম ও বাজার দাম। বাজার দাম স্বভাবতই অপেক্ষাকৃত বেশি। ফলে নিয়ন্ত্রিত দামের জিনিসপত্র চোরাই পথে বাজার দামে বিক্রয় হয়। জিনিসপত্রের সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও কালো টাকার উদ্ভব হতে পারে। বিক্রেতা তার জিনিস বিক্রয় করার জন্য এজেন্টদের যে অলিখিত 'ছাড়' দিয়ে থাকে তা কালো টাকা সৃষ্টিরই পথ।

(iv) অসাধু রাজনীতিবিদ ও শ্রমিক নেতা : ভোটের ব্যয় নির্বাহ বা ব্যক্তিগত আয় বৃদ্ধির জন্য অসাধু রাজনীতিবিদরা কালো টাকার মালিকদের উপদেষ্টা, সংরক্ষক ও শরিক হয়ে দাঁড়ায়। অসাধু শ্রমিক নেতারাও মালিকদের দালাল হয়ে শ্রমিকদের অজ্ঞতা ও নেতাদের উপর তাদের অসীম আস্থার সুযোগ নিয়ে গোপনে কালো বাজারের অংশীদারের ভূমিকা নেয়। এসব কারণে কালো টাকা আমাদের সমাজে মর্যাদাসূচক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পরিমাণ

আমাদের দেশে কালো টাকার পরিমাণ কত তার সঠিক নির্ণয় সম্ভব নয়। কারণ কালো টাকা একশ্রেণী লোকের গুপ্তধন। এর পরিমাণ নিছক অনুমান মাত্র। অধ্যাপক কালদোরের মতে (1953-54) কালো টাকার পরিমাণ জি-এন-পির 6 শতাংশ। ওয়াঞ্চু কমিটির অনুমান এর পরিমাণ জি-এন-পির 4 শতাংশ। ডি. কে. রঙনেকার-এর মতে কালো টাকার পরিমাণ জাতীয় আয়ের 6·8 শতাংশ। ওয়াঞ্চু কমিটি ও রঙনেকার উভয়েরই কালো টাকার নির্ধারণ কাল ষষ্ঠশতক। জে. সি সন্দেশারার (1981) নির্ধারণ মতে কালো টাকার পরিমাণ জাতীয় আয়ের 10 শতাংশ বা 11000 কোটি টাকা। ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব পাবলিক ফিনান্স (1985)-এর মতে কালো টাকার আয়ের পরিমাণ 36,786 কোটি টাকা।† অর্থাৎ 1983-84

† আয়কর দেয় অথচ তা দেয়া হয় না এরূপ কালো টাকার আয়ের পরিমাণ নিম্নরূপ :

সন 1975-76	···	9,958—11,870 কোটি টাকা
1980-81	···	20,362—23,678 কোটি টাকা
1983-84	···	31,584—36,786 কোটি টাকা

(পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সনের অনুমিত স্থূল দেশজ উৎপাদনের (1,72,739 কোটি টাকা) এক-পঞ্চমাংশের কিছু বেশি। এ গণনায় চোরা কারবার ও সমাজবিরোধী কাজকর্মের মারফত যে কালো টাকা সৃষ্টি হয় তা ধরা হয়নি। কর্পোরেট সেক্টরকেও এর আওতায় আনা হয়নি।

ক্ষতিকর

কালো টাকা ও কালো বাজার সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সবদিক দিয়েই ক্ষতিকর। কালো টাকা আবদ্ধ হয়ে থাকে, তা নয়। এ টাকা ভোগ্যদ্রব্যের উপর ব্যয় করা হয়, শিল্প ক্ষেত্রেও বিনিয়োগ করা হয়। ব্যয় মাত্রই আয় এবং সাধারণভাবে বিনিয়োগ মাত্রই জাতীয় আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি। সুতরাং অর্থনীতির দিক থেকে কালো টাকাকে সাদা টাকা থেকে পৃথক করে দেখার কি কারণ থাকতে পারে।

পৃথক করে দেখার কারণ :

(i) কালো টাকার বেশ একটা অংশ মণি-মুক্তা, প্রাসাদোপম অট্টালিকা ও বিলাস দ্রব্যের উপর ব্যয়িত হয়। অনুন্নত অর্থনীতিতে এ জাতীয় ব্যয় আর্থিক অপচয় মাত্র।

(ii) কালো টাকার প্রচলন বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে টাকার যোগান বৃদ্ধি পায় বা মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। কালো টাকার প্রচলন রোধ করার অসমর্থতা প্রকারান্তরে অতিরিক্ত মুদ্রাস্ফীতিকে স্বীকার করে নেয়া।

(iii) কালো টাকা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বহির্ভূত বলে কালো টাকার প্রচলন পরিকল্পনাকে বানচাল করে দেয়ার ক্ষমতা রাখে।

(iv) কালো টাকার ফলে খেটে খাওয়া মানুষ ও যারা মানবিক মর্যাদাবোধ নিয়ে চলে তাদের মধ্যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়, সামাজিক অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, জাতির সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধের উপর আঘাত হানে। এমনকি কালো টাকায় গড়ে ওঠা সংস্কৃতি জাতীয় সংস্কৃতির আধুনিক রূপ রূপে প্রতিভাত হয়।

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা হইতে)

স্থূল দেশজ উৎপাদনের শতাংশরূপে কালো টাকার পরিমাণ

সন 1975-76—1980-81 ... 15-18 শতাংশ

1983-84 ... 18-21 শতাংশ।

সরকারী প্রচেষ্টা

সরকার কালো বাজার রোধ করার জন্য নিম্নলিখিত পন্থা গ্রহণ করেছে।

(1) ডিমোনিটাইজেসন

(2) স্বেচ্ছায় প্রকাশ

(3) হানা

(4) স্পেশাল বেয়ারার বণ্ডস।

(1) ডিমোনিটাইজেসন। ডিমোনিটাইজেসন মানে চলতি কোন কারেন্সি নোটকে টাকার মর্যাদা থেকে চ্যুত করা। 1946 সনে প্রথম এ পন্থা গ্রহণ করা হয়। সে সময় বাজারে কারেন্সির পরিমাণ ছিল প্রায় 144 কোটি টাকা। ডিমোনিটাইজেসনের ফলে 9 কোটি টাকার মত আর্থিক সম্পদ সরকারের কাছে ফিরে আসে। 1978 সনে 1000, 5000 ও 10000 টাকা মূল্যের নোট বাতিল করে দেয়া হয়। এর পরিমাণ ছিল মোট 145 কোটি টাকা। এর মধ্যে 124 কোটি টাকার মূল্যের নোট রূপান্তরের জন্য সমর্পণ করা হয়। তার মধ্যে 116 কোটি টাকার মূল্যের নোট রূপান্তরের জন্য গৃহীত হয়। 29 কোটি টাকা কালো টাকা বলে ধরে নিয়ে বাজার থেকে তা তুলে নেয়া হয়। সে সময় জনসাধারণের হাতে মোট কারেন্সির পরিমাণ ছিল 8300 কোটি টাকা। বলা বাহুল্য, মাত্র 29 কোটি টাকা বাজার থেকে তুলে নেয়া প্রায় অর্থহীন বলা চলে।

(2) স্বেচ্ছায় প্রকাশ। 1951, 1965 ও 1975 সনে স্বেচ্ছায় কালো টাকা প্রকাশ স্কীম গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ, কালো টাকার অধিকারীদের স্বেচ্ছায় তাদের কালো টাকার পরিমাণ প্রকাশ করার সুযোগ দেয়া হয়। এ সুযোগ যারা গ্রহণ করবে তারা কালো টাকা রাখার অপরাধে দণ্ডিত হবে না; এমনকি কিছুটা পুরস্কৃত হবারও সুযোগ রয়েছে। 1951 সনে 70 কোটি টাকা স্বেচ্ছায় প্রকাশ করা হয়। 1965 ও 1975 সনে স্বেচ্ছায় প্রকাশিত কালো টাকার পরিমাণ যথাক্রমে 200 কোটি টাকা ও 1529 কোটি টাকা। 1951, 1965 ও 1975 সনে স্বেচ্ছায় প্রকাশিত কালো টাকার উপর প্রাপ্ত করের পরিমাণ যথাক্রমে 11 কোটি টাকা, 60 কোটি টাকা ও 248·7 কোটি টাকা। 1975 সনের স্বেচ্ছায় প্রকাশ স্কীমের ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, 240000 জন স্বেচ্ছায় কালো টাকার অধিকারী রূপে নিজেদের

নাম ঘোষণা করে। এদের মধ্যে 13 জনের ঘোষিত আয় ও সম্পদের পরিমাণ প্রত্যেকের 1 কোটি টাকার বেশি এবং তাদের মধ্যে আবার একজনের আয় ও সম্পদের পরিমাণ 2 কোটি 40 লক্ষ টাকা।

(3) হানা। আয়কর বিভাগ থেকে সন্দেহজনক ব্যক্তিদের বাড়ী হানা দিয়ে কালো টাকা উদ্ধারের চেষ্টা করা হয়। 1977 সনের এপ্রিল-ডিসেম্বর ও 1978 সনের এপ্রিল-ডিসেম্বরে যথাক্রমে 687 ও 377 স্থানে হানা দিয়ে যে সম্পদ উদ্ধার করা হয় তার পরিমাণ যথাক্রমে 119 লক্ষ টাকা ও 217 লক্ষ টাকা। অর্থাৎ, উদ্ধারের পরিমাণ নামমাত্র। উল্লেখ্য, কালো টাকার নেতাদের বাড়ী স্পর্শ করা হয়নি। তাছাড়া আদালতের আদেশে, সাক্ষী-প্রমাণের অভাবে, অব্যক্ত কারণে এ সামান্য উদ্ধারপ্রাপ্ত সম্পদের বেশ কিছু অংশ আবার কালো টাকার অধিকারীদের কাছেই ফিরে আসে। এ সম্বন্ধে সরকার সাধারণত নীরব।

(4) স্পেশাল বেয়ারার বণ্ডস স্কীম। এ স্কীম 1981 সনের জানুয়ারীতে কার্যকর করা হয়।

বৈশিষ্ট্য

(i) 1981 সনের 2 ফেব্রুয়ারী থেকে সরকারী 10 বছর মেয়াদী স্পেশাল বেয়ারার বণ্ডস ইস্যু করবে। এর মূল্য 10000 টাকা। দশ বছর পূর্ণ হলে বণ্ডহোল্ডারকে 10000 টাকা মূল্যের বণ্ডের পরিবর্তে 12000 টাকা দেয়া হবে।

(ii) এ বণ্ডে যে কোন পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করা যাবে।

(iii) মূল বণ্ডহোল্ডারকে বণ্ড কেনার টাকার সূত্র সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করা হবে না।

(iv) এ স্কীম কোনরকম করের আওতায় আসবে না।

(v) শুধুমাত্র এ বণ্ড কেনার অভিযোগে কোন বণ্ডহোল্ডারকে ইণ্ডিয়ান পেনাল কোড অথবা অন্য কোন প্রচলিত কেন্দ্রীয় আইনে অভিযুক্ত করা হবে না।

(vi) কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কগুলি, ঋণ নিয়ন্ত্রণ বিধি সাপেক্ষ, কোলাটারেল সিকিউরিটি রূপে এই বেয়ারার বণ্ড গ্রহণ করবে এবং তার বিরুদ্ধে আগাম দেবে। তবে ব্যাঙ্কগুলিকে বেয়ারার বণ্ড কেনার অনুমতি দেয়া হবে না।

তাদের আইনত যে সরকারী সিকিউরিটি রাখতে হয় বেয়ারার বণ্ডকে তার অংশবিশেষ করা চলবে না।

স্পেশাল বেয়ারার বণ্ডকে কেহ কেহ 'ব্ল্যাক বেয়ারার বণ্ড' বলে অভিহিত করে। কারণ এ হচ্ছে এমন একটি অভিনব স্কীম যে স্কীমে কালো টাকার সূত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন করা বারণ এবং কালো টাকা রাখার অভিযোগে অভিযুক্ত করাও নিষিদ্ধ। ফলে যারা সজ্জন প্রকৃতি ব্যক্তি, করপ্রথা মেনে চলেন আজ তারাই সমাজবিরোধী; সমাজবিরোধীরা মর্যাদাসম্পন্ন নাগরিক, সম্ভ্রান্ত, মান্যগণ্য ব্যক্তি। মোট কথা, এ স্কীম কালো টাকার মালিকদের সামাজিক স্বীকৃতি দেয়ার জন্য রচিত, তাদের কালো টাকাকে সাদা করার সুযোগ দেয়ার জন্য গৃহীত ও মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি করার জন্য পরিকল্পিত।

সরকারী মতে অবশ্য এ স্কীম রূপায়ণের ফলে কালো টাকার বেশকিছু অংশ সরকারের তহবিলে জমা পড়বে। অন্যথায় এ টাকা আবদ্ধ হয়ে থাকত বা ফটকাবাজীতে ব্যয় হত। সরকার এ টাকা উৎপাদনশীল ও সমাজ কল্যাণমূলক কাজে বিনিয়োগ করতে পারবে, ঘাটতি বাজেটের উপর চাপ কমবে, এমনকি করের বোঝা কমানোও সম্ভব হবে। দেখা যাচ্ছে, সরকারী মতে কালো টাকা সৃষ্টি করা অপরাধ নয়, কালো টাকার বা কালো বাজারের মালিক হওয়া অপরাধ নয়, অপরাধ তার অপব্যবহার।

এ স্কীমে 1000 কোটি টাকা সংগ্রহ করা সম্ভব হবে বলে ধরা হয়েছিল। আইনত কিছু বাধা কাটিয়ে ওঠার পর সরকার 1981 সনে এ স্কীমেরই কিছু হেরফের করে নেয়। যাহোক, স্পেশাল বেয়ারার বণ্ড স্কীমে মোট সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ 964 কোটি টাকা।

প্রস্তাব

কালো টাকা রোধ করার জন্য সাধারণত যেসব সুপারিশ করা হয়ে থাকে তা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

(i) পশ্চিম জার্মানী ও যুক্তরাষ্ট্রের মত নির্বাচন ও সাধারণ রাজনৈতিক কাজকর্মের ব্যয়ভার সরকারকে বহন করতে হবে। শ্রমিক ইউনিয়ন সহ প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে তাদের হিসাবপত্র প্রকাশ করতে হবে এবং তা অনুমোদিত হিসাব-পরীক্ষক কর্তৃক পরীক্ষিত হওয়া চাই।

(ii) ব্যক্তিগত আয় ও সম্পদের উপর করের চাপ কমাতে হবে ও কেহ

যাতে কর ফাঁকি না দিতে পারে সেজন্য কমপিউটারের ব্যবহার চালু করতে হবে।

(iii) উৎপাদন, বণ্টন ও দাম সম্পর্কিত নিয়ন্ত্রণ যতদূর সম্ভব কমাতে হবে।

(iv) ঘুষ, চুরি, চোরা কারবার, ফটকাবাজী প্রভৃতি কাজকর্ম কঠিন হস্তে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

(v) স্বল্প দামে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদির সরকারী বণ্টন ব্যবস্থা আরো ব্যাপক ও সুষ্ঠু করে তুলতে হবে।

(vi) কালো টাকার প্রবাহ বন্ধ করার জন্য অর্থনৈতিক, আইনগত ও জনমত গঠনগত পন্থা অবলম্বন করতে হবে।

(vii) মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। টাকার সরবরাহ জাতীয় আয় বৃদ্ধির হারের 3-4 গুণের বেশি হওয়া সঙ্গত নয়।

(viii) কালো টাকার অধিকারীদের নাম-ধাম জনগণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ ও তাদের কালো টাকা দ্বারা লব্ধ সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে হবে।

উপসংহার

কালো টাকা, কালো বাজার, অসাধুতা, অসামাজিকতা যেন বর্তমানে মানুষের জীবনাদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছে। উন্নত দেশগুলিতেও কালো টাকার প্রভাব কম নয়। কম্যুনিষ্ট দেশগুলিতেও, যেখানে গণতন্ত্র নিয়ন্ত্রিত, কালো টাকার প্রভাব এখন আর অস্পষ্ট নয়। আমাদের মত উন্নতিশীল দেশগুলিতে কালো টাকা নিঃসন্দেহে ও প্রকাশ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। ইণ্টার-ন্যাশনাল মনিটারী ফাণ্ডের এক সূত্রে প্রকাশ (1980) যুক্তরাষ্ট্রে কালো টাকার অংশ সে দেশের জি-এন-পির 33·5 শতাংশ। যুক্তরাজ্যে এর পরিমাণ 7·5 শতাংশ।

আমাদের দেশে কালো টাকা এক অপরূপ মর্যাদার অধিকারী হয়েছে। কালো বাজার অধুনা আর সমান্তরাল বাজার রূপে চিহ্নিত হচ্ছে না। সাদা বাজার ও কালো বাজারের সংমিশ্রণে এক অপরূপ আধুনিক ভারতীয় বাজার গড়ে উঠেছে। সরকারের ভুল সামাজিক মূল্যবোধ ও অর্থনৈতিক নীতি কালো বাজার সৃষ্টির মূলে। কঠিন হাতে তা দমন না করে বর্তমানে

সরকার কালো টাকার অংশীদার হওয়ার জন্য নানা ছলচাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করেছে। স্পেশাল বেয়ারার বণ্ড স্কীম এর প্রকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত। সম্প্রতি (1985) ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব পাবলিক ফিনান্স কালো টাকা সম্পর্কে যে সুপারিশ রেখেছে তাতেও এর প্রভাব দেখা যায়। বলা হয়েছে, সরকারের পক্ষ থেকে বস্তি উন্নয়ন বা এরূপ উদ্দেশ্যে 100 কোটি টাকার মত মূলধন নিয়ে একটি 'জাতীয় ভাণ্ডার' গঠন করতে হবে। অর্থের জন্য 7-10 বছর মেয়াদী ডিবেঞ্চার বাজারে ছাড়তে হবে। ডিবেঞ্চারের সুদের হার হবে 8 শতাংশ। ডিবেঞ্চারে যে টাকা বিনিয়োগ করা হবে সে টাকার সূত্র সম্পর্কে বিনিয়োগ-কারীকে কোন প্রশ্ন করা হবে না। এ পরিকল্পনা স্পেশাল বেয়ারার বণ্ডেরই প্রতিরূপ বলা চলে। ধীরে ধীরে কালো বাজারের বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিয়ে জীবন দর্শনের মূল্যবোধকে পাল্টাবার জন্য জনগণকে যে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে তা সরকারের জড়বাদী নীতিবোধেরই পরিচায়ক।

পরিশিষ্ট

কেন্দ্রীয় বাজেট 1986-87

উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য ঃ

(i) আয়-ব্যয়ের সূত্র

(প্রতি টাকা)

আয়	পয়সা	ব্যয়	পয়সা
(a) কর	50	(a) কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা	22
(b) অভ্যন্তরীণ ঋণ	14	(b) দেশরক্ষা	14
(c) অন্যান্য সূত্র থেকে প্রাপ্তি	14	(c) সুদ	14
(d) অ-কর	11	(d) রাজ্যগুলির প্রাপ্য (কেন্দ্রীয় অঞ্চলসহ)	29
(e) বৈদেশিক ঋণ	5	এর মধ্যে	
(f) ঘাটতি	6	কর	14
		সাহায্য	12
		অ-পরিকল্পনা সাহায্য	3
		(e) অন্যান্য অ-পরিকল্পনা ব্যয়	13
		(f) ভরতুকি	8
	100		100

দেখা যাচ্ছে, আয়ের প্রধান সূত্র কর ও ঋণ (69 শতাংশ)। ব্যয়ের প্রধান খাত কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা (22 শতাংশ)। ব্যয় বৃদ্ধির প্রধান সূত্র অন্যান্য অ-পরিকল্পনার ক্ষেত্র (13 শতাংশ)। অনুৎপাদনশীল ব্যয়ের ক্ষেত্র, —দেশরক্ষা, সুদ ও ভরতুকি (36 শতাংশ)।

(ii) কেন্দ্র, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলিতে 1986-87 সনে কোন্ খাতে কত ব্যয় হবে তার বিবরণ।

খাত	ব্যয়ের পরিমাণ (কোটি টাকা)
(a) কৃষি, গ্রামীণ উন্নয়ন, সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি	8479 (22%)
(b) এনার্জি	11939 (31%)
(c) শিল্প ও খনিজ	5405 (14%)
(d) যানবাহন	5165 (13%)
(e) সমাজসেবা	5822 (15%)
(f) অন্যান্য	2242 (5%)

* বন্ধনীতে মোট ব্যয়ের শতাংশ দেখানো হয়েছে।

লক্ষণীয়, এনার্জি (শক্তি, কয়লা ও পেট্রোলিয়াম) খাতে ব্যয় হচ্ছে সর্বাধিক (11939 কোটি টাকা, অর্থাৎ 31%)। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে 1985-86 ও 1986-87 সনে বিভিন্ন খাতে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনায় যে ব্যয় হবে তা সপ্তম পরিকল্পনায় (85-86—89-90) প্রস্তাবিত ব্যয়ের 41·2 শতাংশ। অর্থাৎ, এ দু-বছরে ব্যয়ের মাত্রা প্রায় পরিকল্পনা অনুসারী।

(iii) 1986-87 সনের বাজেটে মোট অর্থপ্রাপ্তি ধরা হয়েছে 48767 কোটি টাকা ও মোট ব্যয় 52862 কোটি টাকা। ঘাটতির পরিমাণ 4095 কোটি টাকা। এ ঘাটতি আংশিক মিটানো হবে অতিরিক্ত কর বসিয়ে; এর পরিমাণ 445 কোটি টাকা। অতিরিক্ত করের মোট পরিমাণ অবশ্য 488 কোটি টাকা। এ টাকা থেকে 43 কোটি টাকা রাজ্যগুলির অংশ রূপে চলে যাবে। এ অতিরিক্ত করের পরে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে 3650 কোটি টাকা। নিম্নের তালিকায় বিশদভাবে বিষয়টি দেখানো হল।

[পৃষ্ঠা ৫৭২ : বাজেট]

(iv) অতিরিক্ত করের বিবরণ নিম্নরূপ।

কর রাজস্ব (কোটি টাকা)

	1985-86	1986-87		
	রিভাইজড	চলতি	বাজেটে প্রস্তাব	মোট
স্থূল কর রেভিন্যু	28430	30468	488	30956
কর্পোরেশন কর	3118	3120	13	3133
আয় কর	2397	2580	8	2588
আবকারী শুল্ক	23	15	—	15
সম্পদ কর	110	100	—	100
গিফ্‌ট কর	11	11	—	11
কাস্টমস	9296	10000	407	10407
ইউনিয়ন আবকারী শুল্ক	12920	14082	60	14142
কেন্দ্রীয় অঞ্চলের কর*	468	523	—	523
অন্যান্য কর	87	37	—	37
বাদ : রাজ্যগুলির অংশ	7490	8217	43	8260
আয়কর	1846	2016	7	2023
এস্টেট শুল্ক	19	12	—	12
ইউনিয়ন আবকারী শুল্ক	5625	6189	36	6225
নীট কর রাজস্ব	20940	22251	445	22696

* স্থানীয় সংস্থাগুলিকে দেয়া অর্থ ছাড়া।

(v) গত বাজেটে প্রত্যক্ষ কর প্রথায় সংস্কার সাধন করা হয়। সাধারণভাবে করের হার কমানো হয়। ফলে কোন কোন মহলে এরূপ আশঙ্কা প্রকাশ পায় যে এর ফলে করলব্ধ অর্থের পরিমাণ হ্রাস পাবে। কিন্তু এর বিপরীত ফল দেখা দিয়েছে। এমনকি ব্যক্তিগত আয়কর লব্ধ অর্থের পরিমাণ বাজেটে যা ধরা হয়েছিল তার চেয়ে 36 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

[পৃঃ ৫৭২ : কর খাতে আয় বৃদ্ধি]

বাজেট (কোটি টাকা)

	1985-86 (রিভাইজড)	1986-87 (বাজেট)
মোট প্রাপ্তি	46017	49212†
কর রাজস্ব	20940	22696
অ-কর রাজস্ব	6231	6846
মূলধন প্রাপ্তি	18846	19670
মোট ব্যয়	50507	52862
অ-পরিকল্পনা ব্যয়	30011*	31867
পরিকল্পনা ব্যয়	20496	20995
সামগ্রিক ঘাটতি	—4490*	—3650
উদ্বৃত্ত/ঘাটতি, রেভিন্যু একাউন্ট	—5940	—6874

† অতিরিক্ত কর বাবদ যুক্ত হয়েছে 445 কোটি টাকা।

* রাজ্যগুলিকে তাদের ওভারড্রাফট মিটাবার জন্য মধ্যমেয়াদী ঋণ বাবদ দেয়া 1628 কোটি টাকা বাদ দিয়ে।

কর খাতে আয় বৃদ্ধি (কোটি টাকা)

	1984-85	1985-86	বৃদ্ধি (%) (1984-85 তুলনায় 1985-86 সনে)
করর্পোরেশন কর	2556	3118	22·0
আয়কর	1928	2397	24·3
কাস্টমস	7041	9296	32·0
কেন্দ্রীয় আবকারী শুল্ক	11151	12920	15·9
মোট	22676	27731	22·3

(vi) ভরতুকির পরিমাণ বৃদ্ধি একটি প্রবল সমস্যা বলে অর্থমন্ত্রী স্বীকার করেছেন।

অ-পরিকল্পনা ব্যয় ঃ ভরতুকি

প্রধান ভরতুকির বিষয়	1985-86 বাজেট	1985-86 রিভাইজড	1986-87 বাজেট
খাদ্য	1100	1650	1750
দেশীয় সার	1200	1600	1700
আমদানিকৃত সার	601	450	250
রপ্তানি উন্নয়ন	530	605	555
চিনি আমদানি	150	108	—
নিয়ন্ত্রিত বস্ত্র	53	52	52
রেলপথকে দেয়া ভরতুকি	109	120	147
সুদ ভরতুকি	216	336	287
মোট	3959	4921	4741

(vii) 1985-86 সনের রিভাইজড বাজেটের তুলনায় 1986-87 সনের বাজেটে কেন্দ্র থেকে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলিতে সম্পদ স্থানান্তরিত-করণের পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে।

কেন্দ্র হইতে সম্পদ স্থানান্তরিত করণ (কোটি টাকা)

	1985-86 রিভাইজড	1986-87 বাজেট
1. কর ও শুল্কের উপর রাজ্যগুলির অংশ	7490	8260
2. ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহের উপর ঋণ	2900	3200
3. অ-পরিকল্পনা গ্র্যাণ্টস ও ঋণ	4111	1892
4. রাজ্য ও কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলির পরিকল্পনার জন্য কেন্দ্রীয় সাহায্য*	6538 (727)	6464 (914)
5. কেন্দ্র কর্তৃক ও কেন্দ্রীয় উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত পরিকল্পনা স্কীমগুলিতে সাহায্য	2848	3208
6. মোট গ্র্যাণ্টস ও ঋণ (3+4+5)	13497	11564
7. বাদ : ঋণ ও আগাম ফেরত	1625	2316
8. রাজ্য ও কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলিতে নীট সম্পদ স্থানান্তরিতকরণ (1+2+6+7)	22262	26708

* বন্ধনীতে কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলির অতিরিক্ত প্রাপ্তির পরিমাণ দেখানো হয়েছে।

(viii) কেন্দ্রীয় পরিকল্পনায় 1985-86 ও 1986-87 সনে কোন খাতে কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় হচ্ছে সপ্তম পরিকল্পার পটভূমিতে তা নিম্নে দেখানো হল।

কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা 1985-86 ও 1986-87 (কোটি টাকা)

	সপ্তম পরিকল্পনা (84-85 দামে)	1985-86 রিভাইজড	1986-87 বাজেট	সপ্তম পরিকল্পনার* শতাংশ রূপে 85-86 ও 86-87 সনে ব্যয়ের পরিমাণ
কৃষি	4057	859	917	40·7
গ্রামীণ উন্নয়ন	4902	1234	1509	51·9
সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ	835	138	158	32·9
এনার্জি	31492	6405	7481	40·9
শিল্প ও খনিজ	18553	4914	4606	47·7
যানবাহন	16459	3240	3882	40·1
সমাজসেবা	10351	1693	1988	33·0
সংযোগ, আই এণ্ড বি	6366	1171	1225	35·0
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা	2303	406	495	36·3
অন্যান্য	216	34	39	31·4
মোট	95534	20094	22300	41·2

* 1985-86 ও 1986-87 সনের বিনিয়োগকে বছরে পাঁচ শতাংশ মূল্যবৃদ্ধি ধরে '84-85 সনের দামে মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস করা হয়েছে।

লক্ষণীয়, সপ্তম পরিকল্পনায় সবচেয়ে বেশি ব্যয় হয়ে এনার্জি ক্ষেত্রে (31492 কোটি টাকা), তারপর শিল্প ও খনিজ (18553 কোটি টাকা) এবং যানবাহন (16459 কোটি টাকা)। সপ্তম পরিকল্পনার পটভূমিতে দু-বছরে শতাংশের ভিত্তিতে সবচেয়ে বেশি ব্যয় হয়েছে গ্রামীণ উন্নয়ন ক্ষেত্রে (51·9%) ; তারপর শিল্প ও খনিজ (47·7%) এবং এনার্জি (40·9%) ক্ষেত্রের স্থান।

সপ্তম পরিকল্পনায় অনুমিত

কেন্দ্রীয় সরকারের মোট প্রাপ্তি ও মোট ব্যয় (কোটি টাকা)

মোট প্রাপ্তি		মোট ব্যয়	
কর রাজস্ব	110878 (40)	কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা	95534 (35)
অ-কর রাজস্ব	29879 (11)	রাজ্য ও কেন্দ্রীয়	
মূলধন প্রাপ্তি	29178 (11)	অঞ্চলগুলিতে সম্পদ	
অভ্যন্তরীণ ঋণ	26997 (10)	স্থানান্তরিতকরণ	39855 (14)
বৈদেশিক ঋণ	14500 (5)	অন্যান্য অ-পরিকল্পনা	
পাবলিক উদ্যোগগুলি		ব্যয়	31361 (11)
থেকে প্রাপ্ত সম্পদ	50688 (18)	ভরতুকি	18148 (7)
ঘাটতি	14000 (5)	দেশরক্ষা	45000 (16)
মোট	276120 (100)	সুদ	46222 (17)
			276120 (100)

* বন্ধনীতে মোট প্রাপ্তি/ব্যয়ের শতাংশ দেখানো হয়েছে।

(xi) ভারতসরকারের সাম্প্রতিক ঋণের অবস্থা নিম্নরূপ।

ঋণ (কোটি টাকা)

	31 মার্চ, 1986	31 মার্চ, 1987
অভ্যন্তরীণ ঋণ	70427·98	80642·08
বৈদেশিক ঋণ	18342·39	20949·53
মোট	88770·37	101591·51

বলা বাহুল্য, 1986-87 সনের বাজেটে সুদ বাবদ ধরা হয়েছে মোট ব্যয়ের 14 শতাংশ।

(ix) পাবলিক সেক্টরের কাজকর্ম আশানুরূপ নয়। ফলে সপ্তম পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার জন্য যে পরিমাণ সম্পদ পাবলিক সেক্টর থেকে পাওয়া যাবে বলে ধরা হয়েছিল তার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার জন্য অর্থের সূত্র

	সপ্তম পরিকল্পনা ('84-85 দামে) পরিমাণ	1985-86 রিভাইজড পরিমাণ	1986-87 বাজেট পরিমাণ
বাজেট থেকে প্রাপ্ত	44846 (47%)	13231 (66%)	13617 (61%)
পাবলিক উদ্যোগ থেকে প্রাপ্ত সম্পদ	50688 (53%)	6863 (34%)	8683* (39%)
মোট কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা	95534	20094	22300

* বণ্ড ইস্যু করে 1130 কোটি টাকা পাওয়া যাবে ধরে।

দেখা যাচ্ছে, সপ্তম পরিকল্পনা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার জন্য 53% সম্পদ আসবে পাবলিক উদ্যোগগুলি থেকে, কিন্তু 1985-86 সনের রিভাইজড বাজেটে এ ক্ষেত্র থেকে পাওয়া সম্পদের পরিমাণ মাত্র 34%। 1986-87 সনের বাজেটেও এর পরিমাণ ধরা হয়েছে মাত্র 39%। অর্থাৎ, পাবলিক উদ্যোগগুলির উদ্বৃত্তের উপর নির্ভর না করে অর্থমন্ত্রীকে অতিরিক্ত কর ও ঋণ সংগ্রহ দ্বারা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা রূপায়ণের দিকে এগোতে হচ্ছে।

(x) এ প্রসঙ্গে সপ্তম পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় সরকারের মোট প্রাপ্তি এবং মোট ব্যয়ের যে প্রস্তাব রাখা হয়েছে তার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

প্রস্তাব

1986-87 সনের বাজেটে অর্থমন্ত্রী যেসব প্রস্তাব রেখেছেন তাতে উল্লেখযোগ্য :

(i) ইনভেস্টমেণ্ট এলাউন্স স্কীমের পরিবর্তে ফ্যাণ্ডিং স্কীমের প্রবর্তন। আয়কর-দাতারা তাদের মুনাফার 20 শতাংশ পর্যন্ত ছাড় পাবে যদি এ মুনাফার টাকা তারা ইনডাস্ট্রিয়াল ডেভেলাপমেণ্ট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার কাছে আমানত রাখে অথবা প্লাণ্ট ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করার জন্য ব্যবহার করে। নিউ ফাণ্ডিং স্কীম চালু হলে, অর্থাৎ, 1987-88 আয়কর বছর থেকে, কোম্পানির উপর যে সারচার্জ দিতে হত ও যা প্রধানত ইনডাস্ট্রিয়াল ডেভেলাপমেণ্ট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার কাছে আমানতরূপে রাখা হত তার অবসান ঘটবে।

(ii) ক্যাপিটাল গেনস কর সম্পর্কে বলা হয়েছে যে সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণের তারিখ 1-1-64 পরিবর্তে 1-4-74 হবে। গৃহ ও জমি থেকে উদ্ভূত দীর্ঘমেয়াদী ক্যাপিটাল গেনস-এর ক্ষেত্রে ছাড়ের হার হবে 50 শতাংশ ; অন্যান্য সম্পত্তির ক্ষেত্রে 60 শতাংশ। প্রাথমিক ছাড়ের সীমা 5000 টাকা থেকে বৃদ্ধি করে 10,000 টাকা করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

(iii) দীর্ঘমেয়াদী রাজস্ব নীতির প্রতিবেদন অনুযায়ী চলতি নিয়মে পৃথক পৃথক সম্পত্তির উপর অবচয়ের যে সুবিধা দেয়া হচ্ছে তার পরিবর্তে কিছু সম্পত্তিকে একসঙ্গে ধরে (ব্লকস অব এসেস্টস) তার উপর অবচয়ের সুবিধা দেয়ার প্রস্তাব আনা হয়েছে। অবচয়ের হার হবে $33\frac{1}{3}$ শতাংশ ও 50 শতাংশ। যেসব কারখানা ও যন্ত্রপাতি দূষণ-বিরোধী কাজে ব্যবহার করা হয় এবং যা দেশজ প্রযুক্তিবিদ্যা ব্যবহার করে থাকে তাদের একটি ব্লকভুক্ত করে 50 শতাংশ হারে অবচয়ের সুবিধা দেয়া হবে।

(iv) বেতন আয়ের ব্যাপারে স্ট্যাণ্ডার্ড ডিডাকসন বৃদ্ধি করে 25 শতাংশের পরিবর্তে 30 শতাংশ করা হবে। এবং এর উচ্চতম সীমা 6000 টাকা থেকে বৃদ্ধি করে 10000 টাকা করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এর ফলে স্থির আয় গোষ্ঠীভুক্ত আয়করদাতাদের মধ্যে 3·5 লক্ষ লোক উপকৃত হবে।

(v) মেট্রোপলিটান শহরগুলিতে অবস্থিত 10 লক্ষ টাকার অধিক মূল্যের সম্পত্তি, যা বাজারে বিক্রয় করার জন্য দেয়া হয়েছে, বিক্রেতার সঙ্গে দামে একমত হয়ে ক্রয় করার ব্যাপারে সরকারের অগ্রাধিকার থাকবে।

(vi) গিফ্‌ট কর সংশোধন করা হবে। 20000 টাকা গিফ্‌ট পর্যন্ত করের আওতায় আসবে না ; করের হার হবে 30 শতাংশ।

(vii) দৌড় ও লটারি থেকে স্থূল প্রাপ্ত মুনাফার উপর 40 শতাংশ হারে কর ধার্য করা হবে।

(viii) দেশজ প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়নের জন্য ভেঞ্চার ফাণ্ড সৃষ্টি করা হবে। এ উদ্দেশ্যে বিদেশ থেকে প্রযুক্তিবিদ্যা ক্রয়মূল্যের উপর 5 শতাংশ হারে রিচার্চ এণ্ড ডেভেলাপমেণ্ট লেভি ধার্য করা হবে।

(ix) ক্ষুদ্রায়তন সেক্টরে কারখানা ও যন্ত্রপাতিতে বিনিয়োগের উধ্ব'তম সীমা 20 লক্ষ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে 35 লক্ষ টাকা করা হয়েছে। গত বছর যেসব ক্ষেত্রে এ সুবিধার সময়কাল 1985 সনের 17 মার্চ-এর পরে শেষ হয়েছে সেসব ক্ষেত্রেও এ ব্যবস্থা প্রযোজ্য হবে।

(x) মডিফাইড ভ্যালু এডেড ট্যাক্স (MODVAT) স্কীম প্রবর্তনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এর ফলে ম্যানুফ্যাকচারেরা উপকরণ ও কাঁচামালের উপর যে আবকারী শুল্ক দিয়েছে তার সবটাই তারা সঙ্গে সঙ্গে ফেরৎ পাবে। ফলে উৎপাদন ব্যয় বেশ কিছুটা হ্রাস পাবে। কারণ সুদ বাবদ ব্যয় হ্রাস পাবে।

(xi) ক্ষুদ্রায়তন এককগুলির জন্য নিউ স্কীম অব এক্সাইস কনসেসনস চালু করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এ স্কীম অনুযায়ী বছরে 7·5 লক্ষ টাকার ক্লিয়ারেন্স পর্যন্ত গোটা আবকারী শুল্ক থেকে অব্যাহতি পাওয়ার সুবিধা থাকছে। চলতি স্কীমে উৎপাদনের সীমা 40 লক্ষ টাকা অতিক্রম করে 75 লক্ষ টাকার সীমায় না পৌছানো পর্যন্ত পুরো শুল্ক দিতে হচ্ছে। এ সীমা অতিক্রম করলে এককটিকে সবরকম ব্যতিক্রম থেকে বঞ্চিত হতে হবে। এর ফলে ক্ষুদ্রায়তন এককগুলি একটি বিশেষ উৎপাদন সীমার নিচে থাকতে চেষ্টা করে অথবা উৎপাদনের পরিমাণ কম করে দেখাতে প্রলুব্ধ হয়। নিউ স্কীমে 7·5 লক্ষ টাকার ক্লিয়ারেন্সের উধ্বে' আবকারী কনসেসনের সুবিধা নির্ধারিত শুল্কের নিম্নে 10 শতাংশ পয়েণ্ট ফ্ল্যাট হারে দেয়া হবে। তবে আবকারী শুল্ক অন্তত 5 শতাংশ হওয়া চাই। এ কনসেসন পাবার উৎপাদন সীমা 75 লক্ষ টাকা। এককটির উৎপাদন 1·5 কোটি টাকার বেশি হলে সে আর এ কনসেসন পাবে না।

(xii) বাজেটে বাকী 32 দ্রব্য থেকেও স্পেশাল এক্সাইজ ডিউটি তুলে নেয়া হবে বলে প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

(xiii) রপ্তানি ও রপ্তানি দ্রব্য উৎপাদনে প্রেরণা দেয়ার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

(1) তামাক থেকে রপ্তানি শুল্ক তুলে নেয়া।

(2) পোষাক-পরিচ্ছদ শিল্পে সাধারণ ড্রব্যাকের হার 7·5 শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে 10 শতাংশ করা।

(3) জুতো সেক্টরকে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সাধারণ ব্যতিক্রম স্কীমের সুবিধা দেয়া।

(4) সামুদ্রিক দ্রব্যাদির প্রোসেসিং ও প্যাকেজিঙের জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ যন্ত্রপাতির উপর ধার্য আমদানি শুল্ক 100 শতাংশ থেকে হ্রাস করে 40 শতাংশ করা।

(5) সিগার, চুরট ও cigarilloes থেকে আবকারী শুল্ক তুলে নেয়া। হুকো তামাক থেকেও আবকারী শুল্ক তুলে নেয়ার প্রস্তাব রয়েছে।

(6) মণিমুক্তো তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় আরো কিছু যন্ত্রপাতির উপর থেকে আমদানি শুল্ক হ্রাস করা।

এছাড়া বস্ত্র শিল্প ও কাগজ শিল্পের উন্নয়নের জন্য নানারকম শুল্কের সুবিধা দেয়ার প্রস্তাব রাখা হয়েছে, অষুধপত্রের দাম হ্রাস করার জন্য আবকারী শুল্ক ও বহির্বাণিজ্য শুল্ক হ্রাস করা হবে। সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্য ব্রাস, চিরুণী, ছাতা, চক, স্টোভ প্রভৃতি দ্রব্য থেকে আবকারী শুল্ক তুলে নেয়া হবে। তাছাড়া তুলা, নারিকেলের শুষ্ক শাঁস ও ভেষজ তেল থেকে সেস তুলে নেয়া হচ্ছে।

রেল বাজেট 1986-87

রেলমন্ত্রী তাঁর 1986-87 সনের বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন, রেলপথের দুটো উদ্দেশ্য : স্থিতিপূর্ণ দাম সহ বৃদ্ধি এবং যুক্তিযুক্ত যাত্রী ভাড়া দ্বারা সাধারণ মানুষের ভার লাঘব করা। এ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর সাধারণ ও মাসিক সিজন টিকিটেরও ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব রাখেন নি। তবে 1-4-86 থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীর মেল ও এক্সপ্রেসের ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব রেখেছেন। বৃদ্ধির পরিমাণ 250 কিমি পর্যন্ত 7·5 শতাংশ, এর বেশি দূরত্বের জন্য 5 শতাংশ। প্রতি টিকিটে ভাড়া বৃদ্ধির পরিমাণ অন্যূন এক টাকা। দ্বিতীয় শ্রেণীর স্লিপার বার্থের সারচার্জ 500 কিমি দূরত্ব পর্যন্ত 10 টাকা, তদূর্ধ্ব দূরত্বের জন্য 15 টাকা। এয়ার কণ্ডিসনড চেয়ার কার, ফার্স্ট ক্লাস, এ. সি. টু-টিয়ার স্লিপার ও এয়ার কণ্ডিসনড ফার্স্ট ক্লাসের ভাড়া 12·5 শতাংশ বৃদ্ধি করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। রাজধানী এক্সপ্রেস ট্রেনগুলির সর্বশ্রেণীর বিশেষ ভাড়াও সমহারে বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া এ. সি. টু-টিয়ার স্লিপারের উপর সারচার্জ বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। বৃদ্ধির হার 1-500 কিমি, 5 টাকা ; 501-1000 কিমি, 10 টাকা ; 1001-1500 কিমি, 15 টাকা, 1501 কিমি ও ততোধিক, 20 টাকা। 13-33 বৎসর বয়স্ক যুব-গোষ্ঠীর অন্তত দশজন যদি একত্র দ্বিতীয় শ্রেণীতে 1000 কিমির বেশি রেলপথ ভ্রমণ করে তবে তাদের ভাড়ার উপর 25 শতাংশ ছাড় দেয়া হবে।

1986-87 সনের বাজেটে উদ্বৃত্ত দেখানো হয়েছে 69 কোটি টাকা।

রেলপথ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্বের প্রতিবেদন

(হাজার টাকা)

	রাজস্ব	
	1985-86 রিভাইজড	1986-87 বাজেট
মোট যাত্রী আয়	1715,00,00	1876,00,00
মোট আয়	6364,00,00	6844,00,00
সাসপেন্স	—25,00,00	—25,00,00
স্থূল প্রাপ্তি	6339,00,00	6819,00,00
মোট বিবিধ	147,62,05	177,69,09
মোট প্রাপ্তি	6486,62,05	6996,69,09

কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব থেকে রেলপথের জন্য ব্যয়ের প্রতিবেদন (হাজার টাকা)

	ব্যয়	
	1985-86 রিভাইজড	1986-87 বাজেট
ওয়ার্কিং ব্যয়	5793,00,00	6230,00,00
নীতি রচনা, নির্দেশনা, গবেষণা প্রভৃতি	46,12,05	52,69,09
দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ প্রভৃতি	27,50,00	30,00,00
ওপেন লাইন ওয়ার্কস	15,00,00	25,00,00
সাধারণ রাজস্বে প্রদান	520,00,00	590,00,00
উদ্বৃত্ত	85,00,00	69,00,00
মোট ব্যয়	6486,62,05	6996,69,09

পাঁচ শতাধিক পৃষ্ঠাব্যাপী এ বইটিতে ভারতের আধুনিক সমস্যা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থনীতির বিস্তৃত পটভূমিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোর দ্রুত উন্নয়নমুখী পরিবর্তন, কাঠামোগত এ পরিবর্তনের পেছনে শিল্পনীতির বিশেষ ভূমিকা, কৃষি সমস্যা, শ্রমনীতি, কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কে জটিলতা, কালো টাকা ও কালো বাজারের উদ্ভব, গতি ও প্রকৃতি, ভারতের মাল্টি-ন্যাশনাল কর্পোরেশনগুলির শরিক হওয়া, অষ্টম ফিনান্স কমিশনের বিশদ আলোচনা, সপ্তম পরিকল্পনার বিন্যাস ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজকর্মের ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং মডেলের ব্যাখ্যা প্রভৃতি জটিল বিষয়গুলি সহজ ও সুষ্ঠুভাবে সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানের সাহায্যে তুলে ধরা হয়েছে। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক হিসাবে লিখিত হলেও ভারতের অর্থনীতি সম্বন্ধে আগ্রহশীল সমাজ সচেতন পাঠকেরাও এ বই পাঠে উপকৃত হবেন।

চল্লিশ টাকা